দাশরথি
ও
তাঁহার পাঁচালী

দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, এম.এ., ডি.ফিল.
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, দক্ষিণ-কলিকাতা
মহিলা-শাখা (বাণিজ্য-বিভাগ), সিটি কলেজ, কলিকাতা

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, দোল পূর্ণিমা, ১৩৬৭

মূল্য : ১২·০০ (বারো টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট : শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ
শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী
শ্রীচরণকমলেষু

ভূমিকা

(১)

কবি, পাঁচালি, আখ্‌ড়াই, হাফ্‌-আখ্‌ড়াই শব্দগুলি যেন কোন সুদূর অনধিগম্য অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া আনে। অথচ এক শতাব্দী পূর্বে এইগুলিই জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি ও আনন্দের মুখ্য বাহন ছিল। কবি, পাঁচালি এখনও বর্তমান, তবে এখন যেন তাহারা অতীতের প্রেতাত্মারূপেই বর্তমানের বিসদৃশ পটভূমিকার বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণশীল। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ যখন কবিগান ও পাঁচালি শোনেন, তখন তাঁহারা যেন অপসৃত অতীতের একটা সেকেলে খেয়ালের কথঞ্চিৎ পুনরুজ্জীবন-কার্যে সহায়তা করিতেছেন এইরূপ মনোভাবই পোষণ করেন। ইহাদের যুগ প্রয়োজনের সঙ্গে কোন যথার্থ সম্পর্ক নাই। ইহারা বর্তমানের কোন কাজে লাগিবে না, কোন যাদুঘরে রক্ষিত এক প্রকার প্রাচীন কথাশিল্পের ধূলিলিপ্ত নিদর্শনরূপেই ইহাদের যতটুকু আবেদন—ইহাদের সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের চিন্তাধারা প্রায় এই জাতীয়। আখ্‌ড়াই ও হাফ্‌-আখ্‌ড়াই বিশিষ্ট শিল্প-প্রকরণরূপে কতটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছিল তাহা বলা দুরূহ। ইহারা প্রধানতঃ বাদ্যযন্ত্র-সমন্বিত একতান সঙ্গীতের সমধর্মী; কেবল কবি ও পাঁচালি হইতে প্রতিযোগিতার উত্তেজনা ও জয়ের জেদটুকুই ইহারা সংগ্রহ করিয়াছিল। আধুনিককালের উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-আসর হয়ত ইহাদেরই বিবর্তিত, মার্জিততর সংস্করণ; তবে মল্লযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ইহাতে ততটা প্রকট নহে। কিছুদিন পূর্বেও মার্গসঙ্গীতের মজলিশে গাইয়ে-বাজিয়ের মধ্যে রেষারেষি অশোভন উগ্র পর্যায়ে উঠিয়া সঙ্গীত-সুষমার অঙ্গহানি করিত; এ অভিজ্ঞতা অনেক সঙ্গীত-রসিকেরই আছে। নিতান্ত আধুনিককালে গাইয়ে বাজিয়ে একসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় ও কতকটা শিল্প-সৌকুমার্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হওয়ার ফলে এই গীতবাদ্যের পারস্পরিক শক্তিপরীক্ষা অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয় আখ্‌ড়াই, হাফ্‌-আখ্‌ড়াই বর্তমান কাল হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই—পরিবর্তিত নামে ও সূক্ষ্মতর রূপে ইহারা পূর্বতন ধারার অস্তিত্বেরই পরিচয় দিতেছে।

কিন্তু কবি ও পাঁচালি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। তাহাদের কাঠামো এখনও বজায় থাকিলেও তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে। এখনও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবিয়াল-দল সহরের সাংস্কৃতিক মঞ্চে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের দ্রুত উপস্থিত-রচনায় ও সমকালীন সমস্যার সরস আলোচনায় শুধু পল্লীঅঞ্চলের অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের নহে, মার্জিতরুচি নাগরিক শ্রোতৃবৃন্দেরও মনোরঞ্জন করেন। কিন্তু তথাপি লাঠিখেলা বা তীরন্দাজির প্রদর্শনীর মত ইহা অতীত কৌশলের প্রথাবদ্ধ পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে। সখ করিয়া আদা-নুন-মাখা চালভাজা ভক্ষণের মত, পৌষ-পার্বণের পিঠের রসাস্বাদনের মত, সৌখীনতর আহারে অভ্যস্ত ও উন্নততর রুচিসম্পন্ন বাঙালী সমাজের পক্ষে ইহা কেবল একটু স্বাদ-বদলান; উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত একটা ভদ্রতা-রক্ষার অরুচিকর প্রয়াসমাত্র। খাদ্যমূল্যের জন্য আদর ইহাদের আর নাই। যাত্রাগান থিয়েটারি নাটকের সজ্জাসমারোহ ও আধুনিক কালোপযোগী ভাবাদর্শ স্বীকার করিয়া এখনও টিঁকিয়া আছে। কথকতা আলঙ্কারিক গুরু-ভার খানিকটা বর্জন করিয়া ও নূতন ভাষণভঙ্গী ও ব্যাখ্যাকৌশলে-মণ্ডিত হইয়া সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীতে ও বিরলতর উপলক্ষে শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণে কিছুটা মিষ্টতা পরিবেশন করে। কবিগানের আধুনিক বিষয় অবলম্বনে নূতন নূতন পালা এখনও রচিত হইতেছে, কিন্তু ইহারা মাঝে মধ্যে কিঞ্চিৎ চমৎকৃতির সৃষ্টি করিলেও যুগরুচির সমর্থন-বঞ্চিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক মঞ্চে যে সমস্ত পরস্পরবিরোধী মতবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিনয় হইতেছে,—কবিগানে তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ছোট মুখে বড় কথা শোনার কৌতুককর অসামঞ্জস্যবোধের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। পূর্বের মত কেহই আর উদগ্র আগ্রহ লইয়া নূতন কথা শুনিবার জন্য, অতৃপ্ত রসবোধের চরিতার্থতার জন্য কবিগানের আসরে ভিড় করে না। যখন গ্রাম্য শ্রোতারা তাহাদের পরিচিত বৈষয়িক জগতের দুঃখ-দুর্দশা-অসুবিধার যথা বস্ত্রের দুর্মূল্যতা, কন্‌ট্রোলের অব্যবস্থা, পুলিশী জুলুম বা নির্বাচনী ফাঁকির-কথা কবিগানের মারফৎ অবগত হয়, তখন তাহারা একপ্রকার মৃদু আনন্দ উপভোগ করে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ আনন্দ পরিচিত অভিজ্ঞতাকে নূতনভাবে চিনিবার বা উচ্চ-পর্যায়ের ব্যক্তিদের কীর্তি ফাঁস করিবার আত্মপ্রসাদ।

এই কবিগান অশিক্ষিত জনসাধারণকেও একটু মৃদু চিমটি কাটার উত্তেজনা সরবরাহ করে, কোন আত্মভোলা আনন্দে বিহ্বল করে না।

পাঁচালি গানের মধ্যে জীবনস্পন্দন আরও স্তিমিত। দাশরথি ও তাঁহার ঈষৎ পরবর্তী যুগের পর আর নূতন পাঁচালি লিখিত হয় নাই, সখের দুই একটি দল ছাড়া আর নূতন কোন পেশাদারি দলও গঠিত হয় নাই। আমোদে-উৎসবে, পাল-পার্বণে পাঁচালি শুনিবার কোন প্রেরণা অনুভূত হয় কি না তাহাও সন্দেহ। কবিগান প্রচলিত, পাঁচালি অধুনা অপ্রচলিত। দাশরথির পালা যখন কালে-ভদ্রে অভিনীত হয়, তখন উহার বিশুদ্ধ অভিনয়-ভঙ্গীটা অপ্রধানই থাকে; উহার ছড়ার আবৃত্তি, উপমার সুদীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ পরম্পরা, সামাজিক দোষত্রুটির শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণ, এমন কি উহার সৌন্দর্যের মধ্যমণি অনুপ্রাস-প্রাচুর্যের ধ্বনি-গৌরব ও সুর-ঝঙ্কারও যেন ভিন্নজগৎবাসী, আগ্রহক্ষীণ শ্রোতার মনে অর্থহীন শব্দ-ঝন্‌ঝনির মত একটা অস্বচ্ছ কাকলী-কুহেলিকা বিস্তার করে। দাশুরায়ের বাক্‌শিল্পের সজীব ও সক্রিয় অংশ তাঁহার গানগুলি। তাঁহার কয়েকটি গান গভীর ভাবাত্মক ও উহাদের বাণী-সংযোজনা অর্থগৌরবের দোসর। অন্যান্য গানগুলির কাব্যমূল্য খুব বেশী না হইলেও উহারা মার্গসঙ্গীতের বিশুদ্ধ তালে ও রাগিণীতে বিধৃত বলিয়া কাব্যরসিক না হইলেও সঙ্গীতামোদীর তৃপ্তিকর। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দাশরথির গীতাবলী পল্লীবাঙলার সুদূরতম, নিভৃততম কোণেও বহুপ্রচলিত ছিল। এই গানগুলি যে রচনার অত্যল্পকালের মধ্যেই বাঙলাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও অসংখ্য সুরামোদীর মধুর কণ্ঠে অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল ইহাই দাশরথির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ।

(২)

পাঁচালির এই প্রায়াবলুপ্তির কারণ-অনুসন্ধান কৌতূহলোদ্দীপক। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাঁচালি-অভিধাটি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইত। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি সমস্ত মধ্যযুগের প্রধান ধারাই পাঁচালি-আখ্যাচিহ্নিত। এই আখ্যার উদ্ভব ও বিশিষ্ট লক্ষণ লইয়া জল্পনা-কল্পনার অভাব নাই। এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে পৌছান না গেলেও ইহা অনুমান

করা চলে যে মাঝে মাঝে গীতসংবলিত ও সুরসংযোগে আবৃত্ত বিবৃতিমূলক আখ্যান-কাব্যকেই পাঁচালি নামে অভিহিত করা হইত। ইহাতে সুরাশ্রয়ী আবৃত্তিই প্রধান ও গীতাংশ গৌণ ছিল। উনবিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে, সম্ভবতঃ দাশরথির অভিনব প্রয়োগ-কৌশলে পাঁচালি, নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। দীর্ঘ আখ্যান কাব্যের পরিবর্তে ছোট ছোট পালা গ্রথিত হইল; সংলাপে তীক্ষ্ণ উত্তর-প্রত্যুত্তর-নির্ভর নাটকীয়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল; পৌরাণিক বিষয়ের মধ্যেও সমসাময়িক সমাজ-সমালোচনার শ্লেষতীক্ষ্ণ বাচনভঙ্গী অন্তর্ভুক্ত হইল। ছড়া, প্রচলিত প্রবচন ও উপমা-সাদৃশ্যব্যঞ্জক উক্তি-পরম্পরা প্রচুর-বিন্যস্ত হইয়া ভক্তিপ্রতিপাদক আখ্যায়িকার সহিত বাস্তবরসচেতনার এক উপভোগ্য সংমিশ্রণ সাধন করিল। গীতি-উপাদান প্রবলতর হইয়া ভক্তিরসের যে প্রাধান্য প্রাকৃতরুচিসুলভ বস্তুরসের আধিক্যে ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছিল তাহা প্রতিরোধ করিয়া ভক্তির মূল সুরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। এই সমস্ত সংযোজন ও পরিবর্তনের ফলে পাঁচালি একটি মিশ্ররীতির কাব্যশিল্পের সদ্যোঅর্জিত মর্যাদায় আসীন হইল।

কিন্তু সঙ্কর কাব্যরীতি-প্রকরণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অনুকূল অবসর না পাইলে ক্ষণস্থায়িত্বের অভিশাপগ্রস্ত হয়। দাশরথির জীবনী হইতে জানা যায় যে তিনি প্রথম যৌবনে অক্ষয়া বাইতিনী নামে এক ইতরজাতীয়া কবিদল-নেত্রীর প্রণয়মুগ্ধ হইয়া তাহার দলে কবিগানের বাঁধনদাররূপে প্রবেশ করেন। এই ইতরোচিত কার্য ও কলঙ্কিত প্রণয়ের জন্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও পারিবারিক উৎপীড়ন ভোগ করিতে হয়। তাঁহার সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক শাস্তি হয় বিপরীত পক্ষের কবি-পাল্লাদারদের নিকট নিজ কুৎসিত রুচির জন্য শাণিত শ্লেষের ও ব্যক্তিগত আক্রমণের পাত্র হইয়া। গুরুজনের তিরস্কার, নীতিধর্মের দোহাই, কুলমর্যাদার আভিজাত্যবোধ তাঁহার যে নেশা ছুটাইতে পারে নাই, প্রতিপক্ষের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তাহাই সম্পন্ন করিল। ১৮৩৬ খৃঃ অঃ তিনি কবির দল ছাড়িয়া পাঁচালি রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন ও অল্পকাল মধ্যেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে মূঢ় গ্রাম্য কৃষক সকলেরই অবিমিশ্র প্রশংসাভাজন হইলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৫৭ খৃঃ অঃ) অন্যূন কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিনি পৌরাণিক ও লৌকিক বিষয় লইয়া সর্বশুদ্ধ

৬৪টি পালা রচনা করিয়া পাঁচালি রীতিকে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করেন।

এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে কবিগানের অব্যবহিত অভিজ্ঞতা, নিজ স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ও সুপটু ব্যঙ্গপ্রিয়তার সহিত সুগভীর ভক্তিরসের সমন্বিত মনোবৃত্তি লইয়া তিনি এই নূতন ধরণের কাব্যরীতি-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। এইরূপ মানসপ্রবণতা ও রচনা-পটুত্বই তাঁহার পাঁচালি রচনার উৎস। কবিগানের প্রত্যক্ষ প্রভাব ইহার উপর সুপরিস্ফুট। কবির লড়াইএর শাণিত উক্তি-গ্রন্থন, লোককে চমৎকৃত করিবার প্রয়াস, সামাজিক নীতিহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি ব্যঙ্গ তাঁহার হাতে পরিমার্জিত মণ্ডনকলায় অলঙ্কৃত ও অকৃত্রিম ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া এক নূতন আবেদন-শক্তির বাহনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই নানাজাতীয় উপাদানগুলির মধ্যে কোন স্বভাব-সাম্য ছিল না, কেবল তাঁহার অসাধারণ রচনাশক্তি ও জনমানসাভিজ্ঞতা এই বিসদৃশ ভাবধারাসমূহের মধ্যে এক শিথিল ও কষ্টসাধ্য সহাবস্থান ঘটাইয়াছে। তাঁহার মনীষার যাদুদণ্ডপ্রয়োগে তিনি ইহাদের মধ্যে এক সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে একলক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছেন, নানা কণ্ঠসমুত্থিত সুরবৈষম্যকে এক ভাবসংহতির বল্গায় বাঁধিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এই উপাদান-সাঙ্কর্য-গঠিত কাব্যশিল্প ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। কবিগান পাঁচালির বন্ধন ছেদন করিয়া নিজ নিয়ততর ক্ষেত্রে আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল। সামাজিক ব্যঙ্গ-নক্সা ভক্তি-নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া প্রহসনজাতীয় নাটকে একচ্ছত্র আধিপত্যে স্বপ্রতিষ্ঠ হইল। অনুচরবর্গ-পরিত্যক্তা ভক্তিদেবী কিছুকাল অপেক্ষার পর রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির পৌরাণিক নাটকে নূতন পূজামঞ্চ খুঁজিয়া পাইলেন। গীতপ্রস্রবণ গীতিনাট্যের সুরোচ্ছলতা-সঙ্গমে আপনার ক্ষুদ্রতর রসধারা মিলাইয়া দিল। এইভাবে পাঁচালি-সতীদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাহিত্য-তীর্থের ভিন্ন ভিন্ন পীঠস্থানে বিকীর্ণ হইয়া এই খণ্ডীকরণ-প্রক্রিয়ায় নিজ প্রাচীন সমন্বিত রূপটি হারাইয়া ফেলিল।

কিন্তু পাঁচালী-বিলুপ্তির প্রধান কারণ বাঙালীর মানসলোকের রূপান্তর। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য যে অবিচ্ছিন্ন-ভক্তিপ্রবাহে পুষ্ট হইয়াছিল সেই

ভক্তিস্রোত যুগপ্রভাবে বাঙালীর চিত্তে শুকাইয়া আসিল। নূতন যুগের আবহাওয়ায় ধর্মনির্ভর জীবনবোধ ও সাহিত্যচর্যা মানবিকতার বিচিত্র প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশের পথে অগ্রসর হইল। এই পরিবর্তনের ফলে বাংলার যে সাহিত্য ধর্মের একাধিপত্যের উপরে নির্ভরশীল ছিল তাহার মূলে রসসিঞ্চন ব্যাহত হইল। অবশ্য ধর্মের প্রতি যে লোকের আকর্ষণ একেবারে কমিয়া গেল তাহা নহে, কিন্তু ধর্মভাব-উদ্দীপনের জন্য নূতন ধরণের চিত্তাকর্ষক ও সৌন্দর্যবোধসমন্বিত সাহিত্যের প্রয়োজন অনুভূত হইল। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পাঁচালির পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত 'কৃষ্ণচরিত্র' ও নবীনচন্দ্রের ভক্তি-উদ্বেল, অথচ সমুন্নত জীবনাদর্শে মহীয়ান্ ত্রয়ীকাব্য শিক্ষিত ধর্মপিপাসু সমাজের মনোহরণ করিল। রামায়ণ ও ভাগবতের খণ্ড খণ্ড পাঁচমিশেলী পালার পরিবর্তে রাজকৃষ্ণ-গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের ভাবোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত, মানবহৃদয়ের দ্বন্দ্বসংঘাতে গতিবেগসম্পন্ন ও দেবমহিমা-প্রকটনে চিত্তদ্রাবী পৌরাণিক নাটকসমূহ আধুনিক মানুষের সংশয়-কুটিল মনে নূতন ভক্তিস্রোত বহাইয়া দিল। নিঃসংশয় বিশ্বাসের স্থির সরোবরে যে সমস্ত সহজাত কুমুদ কহ্লার ফুটিয়াছিল তাহারা ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু অন্বেষণ-ব্যাকুল চিত্তের বেগবান নদী-প্রবাহের উভয় তীরে যে সব যত্নরোপিত নূতন নূতন ফুল উৎপন্ন হইল তাহারা বর্ণে ও গন্ধে অপরূপ অনুভূতির ইঙ্গিত প্রসারিত করিল। দাশরথি এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-সমন্বিত ধর্ম-সংস্কারের শেষ দৃষ্টান্ত, পৌরাণিক ভক্তিবাদ ও কাব্য-প্রেরণার অন্তিম সঙ্গমতীর্থ। তাঁহার পর আর কোনও প্রতিষ্ঠাবান লেখক পুরাণ-কথার কাঁচা মালকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া একাধারে ভক্তিবৃত্তি ও সাহিত্য-সাধনার চরিতার্থতা সম্পাদনে ব্রতী হন নাই। তাঁহার পরবর্তী লেখকেরা পৌরাণিক আখ্যানকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যার দ্বারা শোধন করিয়া উহার অন্তর্নিহিত রসটুকুই কাব্যানুভূতির কটাহে ফুটাইয়া পরিবেশন করিয়াছেন—জনভোগ্য গুড় রসিকের আস্বাদ্য, সৌখীন রুচির তৃপ্তিকর মিষ্টান্নে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত ও দাশু রায়ের অনুপ্রাস-প্রিয়তা কতকটা কবিগানের শ্লিষ্ট প্রয়োগের উত্তরাধিকার; কতকটা পুরাতন বিষয়কে একটু নূতন আস্বাদন দিবার শিল্প-কৌশল। যজ্ঞকাষ্ঠ-ইন্ধনে জ্বালা আগুন নিবিবার অব্যবহিত

পূর্বে যেমন বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গের সশব্দ বর্ষণে নিজ নিঃশেষিতপ্রায় দাহশক্তির পরিচয় দেয়, পৌরাণিক চেতনাপুষ্ট সাহিত্যও তেমনি অনুপ্রাসের শব্দাড়ম্বর ও আয়ুহীন শিখার অগ্নিকণা-বিকিরণে নিজ অন্তিম ভস্মশয্যা বিছাইয়াছে।

(৩)

দাশরথি কিন্তু একদিক দিয়া বিশেষ সৌভাগ্যবান ছিলেন—তিনি আধুনিক রুচির অভিনন্দনহীন হইলেও তাঁহার পালাসংগ্রহে, কাব্য-সম্পাদনে ও জীবনী-রচনায় শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহপূর্ণ সমালোচকের অভাব হয় নাই। মনে হয় যেন তিনি প্রাচীন কাব্যধারার শেষ সংরক্ষক বলিয়াই তাঁহার প্রতি বহু অনুরূপ-রুচিসম্পন্ন ভক্ত শিষ্যের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি নিজে তাঁহার অনেকগুলি পালাকে পাঁচ খণ্ডে বিন্যস্ত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই মুদ্রণের তারিখ ১৮৪৮ খৃঃ অঃ ও ১৮৫১ খৃঃ অঃ বা পরবর্তী কোন বৎসর। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির অনুমত্যনুসারে রাজকিশোর দে, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল শীল, এবং পরে অরুণোদয় রায়, গৌরলাল দে, বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বসুমতীর রসভাণ্ডারের সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দাশরথির পালা প্রকাশ ও কাব্য-সমালোচনার দ্বারা বাঙালী পাঠকের সঙ্গে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এছাড়া চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত তাঁহার একটি তথ্য-পরিপূর্ণ জীবনীগ্রন্থও রচিত হইয়াছে। মোট কথা দাশরথি সম্বন্ধে আমরা যে পরিমাণ তথ্য ও গ্রন্থালোচনা পাইয়াছি তাঁহার সমকালীন অন্য কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি সম্বন্ধে আমরা তাহা পাই না। তাঁহার কবিত্বশক্তির নূতন আলোচনা ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে আর যে কোন অসুবিধাই থাকুক না কেন, উপকরণের কোন অভাব আছে এরূপ অভিযোগ অচল।

অতীব আনন্দের বিষয় যে আমার পরম স্নেহাস্পদ ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী আমার তত্ত্বাবধানে দাশরথির সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতি প্রয়োগে একটি সারগর্ভ গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.ফিল উপাধি অর্জন করিয়াছেন ও আমার বর্তমান রচনাটি এই গ্রন্থের ভূমিকারূপেই পরিকল্পিত। শ্রীমান্ হরিপদ এই নিবন্ধ-রচনায় যেরূপ শ্রম ও

বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য। তিনি এ সম্বন্ধে প্রায় জার্মাণ পণ্ডিতদের অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা ও বিষয়বস্তুর সামগ্রিক উপস্থাপনার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছেন। পাঁচালির উদ্ভব ও বিভিন্ন অর্থে ইহার নানা ব্যাখ্যার পূর্ণ তালিকা তিনি সঙ্কলন করিয়াছেন এবং যদিও এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই তথাপি পূর্বসূরীদের অভিমত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সাহায্যে তিনি আমাদের অনুমান-পরিধিকে যে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার পর কবি, আখ্‌ড়াই, হাফ-আখ্‌ড়াই প্রভৃতি সমজাতীয় গীত-প্রকরণের সহিত পাঁচালির কোথায় মিল ও কোথায় অমিল তাহাও তিনি অত্যন্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও ইহাদের সহিত তুলনায় পাঁচালির স্বরূপনির্ণয়ে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাছাড়া দাশরথির বিভিন্ন পালা-প্রকাশের তারিখ, বিভিন্ন খণ্ডে সন্নিবিষ্ট রচনাসমূহ, অন্য নামে প্রচলিত পালার প্রামাণিকতা প্রভৃতি রচনার মূল (text) নির্ধারণ ব্যাপারে তিনি যে যত্ন ও সতর্ক বিচার-বুদ্ধির নিদর্শন দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। ইহা ছাড়া, দাশরথির পালায় বিভিন্ন পুরাণ হইতে সংগৃহীত বিষয়-বিন্যাস, সমকালীন সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার মৌলিক রচনা, তাঁহার শ্লেষ-যমক-অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার-প্রয়োগের বিশিষ্টতা, তাঁহার রুচির শ্লীলতা-অশ্লীলতা সম্পর্কিত মতভেদ-কণ্টকিত প্রশ্ন ও প্রবাদ-বাক্যের সংখ্যাধিক্য ও যথাযথতা প্রভৃতি তাঁহার মননশীল আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সর্বশেষে তিনি দাশরথির পালা হইতে তাঁহার মানস-বৈশিষ্ট্য পরিচায়ক সুনির্বাচিত অথচ সংক্ষিপ্ত সংকলন সন্নিবিষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ পাঠকের পক্ষে দাশরথির সহিত পরিচিত হইবার পথ সুগম করিয়াছেন। এখন আর কাহাকেও দাশরথির রচনাভঙ্গী ও মনোলোক বুঝিতে হইলে বিরাটকায় ও বহুসংখ্যক শব্দভারবিপর্যস্ত পালাগুলির সমগ্র স্তূপ ঘাঁটিতে হইবে না, সংক্ষেপেই ও স্বল্পসময়ের মধ্যেই ইহা তাঁহার বোধগম্য হইবে। যখন আধুনিক কালে পাঠ্য-বিষয়ের পরিমাণ দিন দিন স্ফীততর হইতেছে ও নূতন নূতন লেখক তাঁহাদের রচনাসম্ভার লইয়া আমাদের মনোযোগের একাংশ দাবী করিতেছেন, তখন এই শ্রমলাঘব ও

সময়-সংকোচের মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। সুতরাং শ্রীমান্ হরিপদ শুধু তাঁহার বৈদগ্ধ্যের জন্য নহে, অনাবশ্যক বোঝা কমাইয়াও বঙ্গসাহিত্য-পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

(৪)

শ্রীমান্ হরিপদ তাঁহার গ্রন্থের শেষাংশে তাঁহার আলোচনা-পদ্ধতির সমীচীনতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিয়া আমার ভূমিকার উপসংহার করিব। দাশরথিকে আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডে বিচার করা ও তাঁহার রচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিরূপণ করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে তাঁহার মনে কিছু খটকা লাগিয়াছে। সমস্ত মধ্যযুগীয় সাহিত্য সম্বন্ধেই এই সংশয়ের প্রযুক্তি আছে বলিয়াই ইহার কিছু বিস্তারিত নিরীক্ষা প্রয়োজন। দাশরথি কি উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন ও কিরূপ ফলশ্রুতি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা শুধু তাঁহার প্রশ্ন নহে, তাঁহার পূর্বগামী সমস্ত মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সাধারণ প্রশ্ন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে সমস্ত মধ্যযুগীয় বাংলা লেখকই প্রধানতঃ দেব-মাহাত্ম্য-প্রচার ও ভক্তিরস-পরিবেশনের উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাব-কবি ছিলেন তাঁহাদের কাব্যে স্বতঃই কাব্যরসের স্ফূর্তি হইয়াছে, কিন্তু এই কাব্যরস বরাবরই তাঁহাদের মনে মনে বিষয়-গৌরবের অধীন ও ভক্তিরসের অনুবর্তী ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হয়ত মুখ্যতঃ ভক্তিপ্রভাবিত ছিলেন না, কেন না তাঁহাদের ভক্তি তখনও কোন দার্শনিক মতবাদের সুনির্দিষ্ট আধারে বিধৃত হয় নাই ও সর্বাতিশায়ী একাধিপত্যে কবিমনকে অভিভূত করে নাই। বড়ু বৃন্দাবনের লীলা-স্মৃতিতে আভীর-পল্লীর প্রকৃত জীবন-চেতনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন নাই—দেব-মহিমার দিগন্ত-প্রসারিত বেষ্টনী-রেখা তাঁহার অতি-সন্নিহিত বস্তুদৃশ্যকে ষোল আনা গ্রাস করে নাই। বিদ্যাপতি প্রাকৃত প্রেমের হাব-ভাব-ছলা-কলাময় ছবি আঁকিতে আঁকিতে যেন বৈষ্ণব প্রেম-সাধনার ভাবতন্ময়তা ইহার মধ্যে অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই আরোপ করিয়াছেন, তাঁহার রূপের তূলিকা অরূপের বর্ণপাত্রে ডুবাইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃসন্ধির পদগুলিতে প্রথম প্রেম-

মুগ্ধা গ্রাম্য বালিকার পিছন হইতে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা ঈষৎ উঁকি মারিতেছেন, কিন্তু রাধিকা পিছনেই আছেন, সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পল্লী প্রতিরূপটিকে নিজ জ্যোতির্মণ্ডলের অন্তরালে চাপা দেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুপম কাব্যশক্তি ও সৌন্দর্যবোধ ছত্রে ছত্রে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তথাপি মনে হয় যে দেহলাবণ্য আত্মিক দীপ্তিরই গৌণ বিচ্ছুরণ, দিব্য বিভার রূপ-উৎসার। ভক্তের আবেশ কবির রূপমুগ্ধতাকে সমান মর্যাদার স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। এক সিংহাসনে যুগ্ম রাজার স্থান হইয়াছে। তথাপি এখানে ভক্তির অগ্রাধিকার সম্বন্ধে কোনই সংশয় থাকে না। যেমন নিয়মতান্ত্রিক নৃপতি প্রজাকে তাঁহার ক্ষমতার অংশীদার করেন, তেমনি ভক্তিরাণী এখানে তাঁহার কাব্যানুচরীকে স্বামিশয্যার এক অংশের অধিকারিণী করিয়াছেন। তবে অনুগ্রহের দান যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যাহার করিতে কোন বাধা নাই। বৈষ্ণব কবিতার এই ভাবাদর্শদীপ্ত পরিমণ্ডলেও কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃত রুচির ধূলি-কণিকা প্রবেশ করিয়াছে। রাধার মান-অভিমান ও শ্লেষাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তি, সখীবৃন্দের বাস্তবগন্ধী পরিচর্যা, বৃন্দাদূতীর ভৎর্সনা-উপভোগ্য, স্পষ্টভাষণ-সরস দৌত্য, মিলনাতুর শ্রীকৃষ্ণের নানা উদ্ভট ছদ্মবেশে মানিনী নায়িকার সান্নিধ্যলাভ-কৌশল-এ সমস্তের মধ্যেই স্থূলরুচি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের ক্রমবিস্তৃত আয়োজন পরিস্ফুট। এখানে শিল্পকলাবোধ আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া জনমানসের অসংস্কৃত অভিলাষকে ছাড়পত্র দিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতে যে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে তাহা ততটা প্রাকৃত রুচির পরিতৃপ্তির জন্য নহে, যতটা ঘনীভূত ও ভাবতন্ময় ভক্তিরসের প্রয়োজনে। এই সমস্ত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ধর্মের যে ক্ষাত্র-আদর্শানুগামী, দার্শনিক তত্ত্বে দুরধিগম্য রূপ ছিল, উহাদের বাংলা অনুবাদে মূল ধর্মবোধের উপর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত, বহির্জগৎ হইতে নিবর্তিত প্রেমাবেশের একটি ঘন প্রলেপ সংযোজিত হইয়াছে। বাঙলার পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কোমলভাব-প্রধান জীবনচর্যাবৈশিষ্ট্যও ইহাতে আরোপিত হইয়া ইহাকে বাঙালী মনোধর্মের অনুকূল করিয়াছে। জ্ঞানের দুরূহ চর্চা হইতে ভক্তির রমণীয় আবেশে রূপান্তরই সাধারণ মানুষের চিত্তজয় করার পক্ষে যথেষ্ট আকর্ষণ। সুতরাং ইহার সহিত লঘুতর উপাদান সংমিশ্রণের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।

রামায়ণে রাক্ষস ও বানর সৈন্যের হাস্যকর আচরণ, অঙ্গদ ও রাবণের কবির লড়াইএর মত কথা-কাটাকাটি ; মহাভারতে শকুনি-দুঃশাসন প্রভৃতি ও বক-হিড়িম্ব চরিত্রের ইতর ধূর্ততা ও বীভৎসরসপ্রবণতা ; ভাগবতে গোপসমাজের অসংস্কৃত রীতি ও গ্রাম্য মূঢ়তা অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ-মহিমা-কীর্তনের মধ্যে সাধারণ জীবনের হাল্কা সুর সন্নিবিষ্ট করিয়া উহাদের স্বাদুতা বাড়াইত। মোট কথা, এই জাতীয় পুরাণে ভক্তির নেশার ও চমকপ্রদ আখ্যান-বস্তুর উপর আর কোন রং ফলাইয়া ইহাদিগকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা সেরূপ প্রকট নহে।

মঙ্গলকাব্যের বিস্তীর্ণ আখ্যান-অঙ্গনে এইরূপ সংমিশ্রণের প্রচুরতর ও প্রায় নিরঙ্কুশ অবসর ছিল। ইহারা স্বরূপতঃ পুরাণের লৌকিক সংস্করণ, নবোদ্ভিন্ন সাম্প্রদায়িক দেব-দেবীর মহিমা-প্রচার-উদ্দেশ্যে লিখিত। এই দেবদেবী আদিতে অনার্য-গোষ্ঠী-সম্ভব ও অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজাপাত্র ছিলেন। আর্যদেবমণ্ডলীতে ইহাদের স্থান করার চেষ্টা ও স্বীয় দৈবশক্তির পরিচয়-দানের মধ্যে একটা সম্ভ্রমহীন লোলুপতা ও পরিমিতিহীন আতিশয্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। পরিবার জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ও মানুষের ক্ষুদ্রতর স্বার্থচিন্তার মধ্যে ইহারা নামিয়া আসিয়া যে উৎপাত-উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছেন, আধার ও আধেয়ের মধ্যে যেরূপ অসামঞ্জস্য আনিয়াছেন, যেরূপ ছেলেমানুষী কল্পনার বাষ্পস্ফীতির উপর আপনাদের বেদী নির্মাণ করিয়াছেন, যে ইহাদের সম্বন্ধে ভক্তি অপেক্ষা কৌতুক-রসই বেশী মনে জাগে। কালকেতুর যে সংশয় দেবী পাছে তাঁহার দত্ত ধনের ঘড়া লইয়া চম্পট দেন তাহা তাহার অপেক্ষা পরিণত-বুদ্ধি পাঠকের মনেও প্রতিধ্বনিত হয়। এই অব্যবস্থিতচিত্ত দেবতার প্রসাদ কখন নিগ্রহে পরিণত হইবে এইরূপ দুশ্চিন্তা ভক্তমনেও অস্বস্তিকর হইয়া উঠে। কাজেই এই সমস্ত রচনায় নিম্নশ্রেণীর রুচিবিকার আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। নারীদের পতিনিন্দা, বাসর ঘরে অশালীন আমোদ-কৌতুক, নিম্নবর্ণের নরনারীর গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর রীতি-নীতির রঙ্গব্যঙ্গভরা চিত্র, মঙ্গলকাব্যের রসবিন্যাসে প্রাকৃত রুচির যে কত বড় স্থান ছিল তাহারই নিদর্শন। এমন কি নায়ক শ্রেণীর ব্যক্তির দুরবস্থাতেও লোকের কৌতুকরসই বেশী উদ্রিক্ত হইত, ইহাদের লাঞ্ছনা দেব-বিরোধী কার্যের ও গোঁয়ার মেজাজের ফল বলিয়া সহানুভূতির পরিবর্তে খুসির ভাগটাই বেশী

জাগাইত। দেবমন্দিরে যেমন আপামর সাধারণ ভিড় করিয়া আসিত, তেমনি দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যেও নিম্নশ্রেণীর রুচি, মেজাজ, জীবনবোধ, পাপপুণ্যের সংস্কার দেবতার সোনার দেউলের অব্যবহিত সান্নিধ্যে এক মৃৎ-প্রাচীরবেষ্টনী নির্মাণ করিত।

আমাদের সাধারণ লোকের মনে সম্ভ্রম ও বীভৎসতার মধ্যে যে কোন অসঙ্গতি ছিল না তাহা শিব ও কালীর মধ্যেই পরিস্ফুট। শিবের ভাংধুতুরা-সেবী-নেশাখোর ভঙ্গী ও কালীর মুণ্ডমালাশোভিত ও নগ্ন অশালীনতা তাঁহাদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। ইহাদের রূপ-পরিকল্পনার সূক্ষ্ম তাৎপর্য ইতর লোকের অনধিগম্য ছিল। তাহারা নিজেদের চালচুলোহীন দারিদ্র্য, অসংবৃত আচরণ ও বেশভূষার উদ্ভট অশোভনতাই এই দেব-দেবীর মধ্যে প্রতিফলিত দেখিয়া তাহাদিগকে বিশেষভাবে আপন জন বলিয়া ভাবিত। এখানে রুচিবিকারের সহিত স্থূল ভক্তিরস এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে এই উভয় উপাদানকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করাও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু উদ্ভট কাহিনীও গণমানসের আদিম সংস্কার হইতে উদ্ভূত হইয়া পৌরাণিক মর্যাদার শিষ্ট আচরণে মণ্ডিত হইয়াছে। উন্নত আধ্যাত্মিকতার তুলসীকুঞ্জ ও প্রাকৃত কল্পনার শেওড়া-ঝোপ আমাদের শিবায়ন, কালিকামঙ্গল ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের প্রশস্ত অঙ্গনে পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে।

(৫)

এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যসূত্র-অবলম্বনে ও ইহারই পটভূমিকায় দাশরথির পাঁচালির ভাবাদর্শ ও শিল্পরূপের বিচার করিতে হইবে। দাশরথির ভাবপ্রেরণা আধুনিক সাহিত্যিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই প্রাচীন পৌরাণিক বিষয়কে নূতনরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিষয়গুলি পুরাতন ও জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং এ সম্বন্ধে দাশরথির মৌলিক উদ্ভাবন বা শিল্পসম্মত বিন্যাসের কোন দায়িত্ব ছিল না। নূতন বিষয় সম্বন্ধে রচনা করিতে হইলে লেখককে যেমন একটি আঙ্গিক-পরিকল্পনা ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্ধারণ করিতে হয়, যেমন একটি

বিষয়ানুরূপ বিশেষ শিল্পরীতি নিজ কলা-বোধের সাহায্যে নির্মাণ করিতে হয়, দাশরথির ক্ষেত্রে তাহা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া অনভিপ্রেত ছিল। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিষয়ের মহিমাকে যতদূর সম্ভব লঘু রূপ দিয়া উহার ভক্তিরসকে প্রাকৃত রুচির নিকট আস্বাদনীয় করিয়া তোলা। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা ও রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের উপাখ্যানসমূহ বহুদিন হইতেই অশিক্ষিত কবি-য়ালদের হাতে উহাদের স্বভাব-মহিমা হারাইয়া ইতর-রুচিসুলভ, স্থূল আমোদের পোষক ও শিল্প-মার্জন-হীন বিকৃত রূপ গ্রহণ করিতেছিল। অবশ্য কবিয়াল-গোষ্ঠীর অকৃত্রিম ভক্তি ও কাহারও কাহারও স্বভাব-কবিত্ব ছিল বলিয়াই ইহারা একেবারে অমর্যাদার শেষ সীমায় পৌছে নাই। কিন্তু তথাপি কেষ্টা মুচির সখীসংবাদ ও এ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গির কালীস্তব যে জ্ঞানদাস ও রামপ্রসাদের পদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাব বিশুদ্ধির অনেক নিম্নতর পর্যায়ের তাহা নিঃসন্দেহ। দাশরথি কবিদলের সংস্রবেই তাঁহার রচনার শিক্ষানবীশী আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যদিও তাঁহার পাঁচালি ও পালাবিন্যাস রুচি ও কবিত্বশক্তির দিক দিয়া অভিজাত সাহিত্যের সন্নিহিততর, তথাপি ইহাতে যে কবিগানের রুচিবিকারের প্রভাব মোটেই দুর্নিরীক্ষ্য নয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে অবিরাম ক্রমাবরোহণের পথ বাহিয়া পুরাণ-মহিমা এবং বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর বিশুদ্ধ ভাবনির্যাস কবিগানের পঙ্কস্তরে নামিয়া আসিয়াছে, দাশরথি সেই নিম্নতম বিন্দু হইতে অনেকটা উর্ধ্বে উঠিলেও এই অবরোহণ-প্রক্রিয়ার পাতালমুখী টান ও পদক্ষেপের অস্থিরতা তাঁহার মধ্যে সুপ্রকট। সুতরাং কবিগানের ক্ষেত্রে আমরা সে শিল্পবিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করি, কবিগানের কিছুটা উন্নততর সংস্করণ কিন্তু গণমানসের একই রূপ তৃপ্তিবিধানকামী পাঁচালিতেও তাহা প্রযোজ্য।

কিন্তু দাশরথি আর এক দিক দিয়া একটা সচেতন সমাজ-পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনার উদ্দেশ্যকে তাঁহার পালাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এক মৌলিক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি যে ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক, ও তাঁহার সম্মুখে সমাজ-জীবনের দ্রুত পরিবর্তন-তরঙ্গের গতিবেগ সম্বন্ধে তিনি যে উদাসীন ছিলেন না, তাহা ভুলিলে চলিবে না। তিনি কেবল অতীত পৌরাণিক যুগের স্মৃতিরোমন্থনেই ব্যাপৃত ছিলেন না ; অতীতে অভিনীত যে নাটকের রং

অতিপরিচয় ও সুদূরত্বের ফলে ফিকে হইয়া আসিয়াছিল তাহাই তাঁহার সমস্ত অভিনিবেশকে গ্রাস করে নাই। সুদূর-অপসারিত পৌরাণিক যুগের অলৌকিক কাহিনীর অন্তরাল হইতে তিনি তাঁহার সমকালীন যুগের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানব-চরিত্র ও লোকরীতির বিপর্যয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন ও উহাদিগকে অভ্রান্ত ব্যঙ্গশরাঘাতে বিদ্ধ করিয়াছেন। সুপ্রাচীন ভক্তিরসকে তিনি নূতন আধারে, সমাজ-জীবনের নূতন পটভূমিকায় পরিবেশন করিয়াছেন। ব্যঙ্গবিশারদের অম্লরস এই ভক্তিরসের সহিত মিশিয়া পাঠকের রসনাকে এক নূতন স্বাদবৈচিত্র্য উপহার দিয়াছে। প্রাচীন যুগে ভক্তিরসের উদ্বোধনে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের আধুনিক রূপ তাঁহার সমাজ-সচেতন মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার ছড়া পরবর্তী যুগের জীবন-অভিজ্ঞতার সূচ্যগ্র প্রকাশ ও পৌরাণিক আখ্যানে সার্থক সংযোজনা। তিনি এক যুগের গাছে আর এক যুগের কলম লাগাইয়াছেন এবং ইহাতে যে উদ্ভিদ্-সাঙ্কর্য ঘটিয়াছে, তাহাতে তিনি কোন কলাগত অসঙ্গতি-বোধের দ্বারা পীড়িত হন নাই। যে অম্লকষায় বস্তুরসের অনুপান মিশাইলে দিব্য মধুর রস আধুনিক রুচির নিকট আস্বাদনীয় হইয়া উঠে তাহার প্রয়োগে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল না। মদের সঙ্গে হরিনাম বা কড়াই-ভাজার সহিত ভক্তিরসের সংমিশ্রণে তাঁহার রুচি বা বিবেকে বাধে নাই। বিশুদ্ধ-রস-পরিবেশন সাধারণের পক্ষে অরুচিকর হইবে কিন্তু ব্যঙ্গ-নক্সা-মেশানো অলৌকিক আখ্যান যে অশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দকে এই মিশ্র পানীয়ের প্রতি আরও উন্মুখ করিবে ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। তাই 'কলঙ্ক-ভঞ্জনে' জটিলা-কুটিলার মুখে তিনি বর্তমান যুগের কুঁদুলে ও হিংসুটে মেয়ের ভাষা আরোপ করিয়াছেন। তাই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের বর্তমান অধঃপতনের চিত্র তিনি পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তাই 'রামের বিবাহে' তিনি চালকলা-বাঁধা লোভী পুরোহিতের চিত্র আঁকিয়াছেন ও 'দক্ষযজ্ঞে' শ্বশুর-জামাইএর কলহকে তিনি বর্তমান সমাজে সুপ্রচলিত বিরুদ্ধ-বস্তু-পরম্পরার উপমাসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। এই স্থানে-কালে সুদূর-ব্যবহিত বিষয়-সমাবেশে যে কোন শিল্পগত ত্রুটি থাকিতে পারে ইহা তাঁহার ধারণাতেই ছিল না। তাঁহার রচনার রস আস্বাদন করিতে গেলে অনুশীলিত শিল্পের নিয়ম-কানুনকে

উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অযত্নন্যস্ত, অকস্মাৎ আগত, অসঙ্গতিপূর্ণ উপস্থাপনা-প্রাচুর্যকে উহার দোষে-গুণে মিশাইয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

সর্বশেষে দাশরথির আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দাশরথি শব্দকুশলী ও অলঙ্কার-প্রয়োগ-নিপুণ শিল্পী হইলেও, তাঁহার রচনায় সযত্ন সাধনার চিহ্ন থাকিলেও উহার অন্তঃপ্রেরণা অনেকটা লোকসাহিত্যধর্মী। উহা অভিজাত ভাবধারার লৌকিক সংস্করণ। এই রচনা ধীরে সুস্থে পাঠ করিবার জন্য লেখা নয়, দ্রুত আবৃত্তির মাধ্যমে চকিত মর্মগ্রহণ ও বিস্মিত রসোপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিত। সুতরাং ইহাতে মৌখিক রচনার ত্বরান্বিত প্রকাশ-ভঙ্গীই প্রকট। কাহিনী অতিপরিচিত না হইলে শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ শ্লিষ্ট অলঙ্কার-বহুল রচনার তাৎক্ষণিক অনুসরণ দুরূহ হইত। কাহিনীকে বুঝিবার জন্য মনঃসংযোগ করিতে হইলে উহার অলঙ্কার-শিঞ্জিনী ও বস্তু-কেন্দ্রিক শ্লেষাভিপ্রায় সঙ্গে সঙ্গে বোধশক্তিতে প্রতিভাত হইত কিনা সন্দেহ। কবিগানের ন্যায় আসরে বসিয়া ক্ষণিক প্রেরণায়, ঘাত-প্রতিঘাতের উত্তেজনায় রচিত না হইলেও দাশরথির পাঁচালির উদ্দেশ্য ও আবেদন প্রায় এক রকমই ছিল। গানের আসরে চমক-প্রত্যাশা-পিপাসু, কথার মারপেঁচে রস-গ্রহণে উৎসুক, একসঙ্গে ভাবাবেগে বিভোর ও উচ্চহাস্যে উতরোল জনসংঘের ছবি লিখিবার সময় তাঁহার কল্পনায় সর্বদাই প্রত্যক্ষবৎ উপস্থিত থাকিত। এই পারদধর্মী রচনা সর্বদাই সীমা ছাড়াইয়া যাইত, বাঁধা-ধরা শিল্পরীতির শাসনকে পদে পদে উল্লঙ্ঘন করিত, দেবলোক হইতে মর্তলোকে, ভাবরাজ্য হইতে বস্তুরাজ্যে, ভক্তি হইতে ব্যঙ্গশ্লেষে নিরঙ্কুশভাবে যাতায়াত-প্রবণতায় পথ হারাইত। ইহাকে পরিণত, প্রজ্ঞাশাসিত কাব্যের মানদণ্ডে বিচার করা বিচারশক্তিরই অপপ্রয়োগ। কাব্যে অমরতা ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, ইহার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনোরঞ্জন ও তাহার ভিতর দিয়া ধর্মবোধ-উদ্দীপন। অপেক্ষাকৃত মার্জিত-রুচি বিদগ্ধ শ্রোতারা হয়ত হাসিতে যোগ দিতেন, কিন্তু ইহারা প্রধানতঃ ভক্তিরসে আবিষ্ট হইয়াই দাশরথির রচনাশক্তির প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাইতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কাব্যাদর্শের দিক দিয়া খুব উন্নত না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যাহা করিতে

চাহিয়াছিলেন তাহাতে যে বিপুল ও অবিমিশ্র সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনস্বীকার্য। এইখানেই দাশরথির চিরন্তন প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু দাশরথির আর একটি শ্লাঘ্যতর পরিচয়ও আছে। সে যুগের অনেক বাঙালীর মত, তাঁহার রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাস্যকৌতুকের পিছনে একটি সত্যিকার ভক্তিপ্রবণ, ভাবের গভীরে আত্মনিমগ্ন হৃদয় ছিল। তাঁহার কতকগুলি গানে এই ভাবগভীরতার সুরটি আমাদিগকে শুধু মুগ্ধ করে না, অনুরূপ ভাব-গভীরতায় অভিভূতও করে। ছড়াকাটা, প্রবাদবাক্যমুখর, শ্লেষব্যঙ্গনিপুণ, হাসিখুসিতে মস্‌গুল এই কবি সময় সময় ঐকান্তিক আত্মনিবেদনে, ভগবৎ-প্রেমের আকুতিতে অধ্যাত্ম অনুভূতি ও কাব্যধর্মের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। 'দোষ কারো নয় গো মা', 'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল' এই দুইখানি গানের একটিতে মুমুক্ষুর কাতর আত্মসমীক্ষা, অন্যটিতে কল্পনারস-বিভোর বাৎসল্যবোধ অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কয়েকটি আত্মতত্ত্ব-মূলক গানে (ধনি আমি কেবল নিদানে) ও অন্ততঃ একটি প্রেমসঙ্গীতে (তেমনি সুখ সজনি লো বিচ্ছেদের পর পিরীতখানি) দাশরথির তত্ত্বজ্ঞতা ও কলাকৌশলের সুন্দর নিদর্শন মিলে। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গান 'হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি' দাশরথির মনোভঙ্গী ও অলঙ্কার-প্রয়োগের নিবিড় সংমিশ্রণে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ প্রতিনিধিত্বের অনন্যগৌরবে অধিষ্ঠিত। অলঙ্কার যে অকৃত্রিম ভাবাবেগের পরিপন্থী নয়, বরং গভীর মানস আকৃতি ও উদ্দীপনার সার্থক সমৃদ্ধিমান প্রকাশ তাহা এই গানে আশ্চর্যভাবে উদাহৃত হইয়াছে। ভক্তির ঘনপল্লব-প্রচ্ছায় বনস্পতিপুঞ্জে রূপক-চমকের বিজলীপ্রভা যে অপরূপ আলোকসজ্জা-সমারোহের সৃষ্টি করিয়াছে সেই আলোকোজ্জ্বল ভাব-বৃন্দাবনে ভক্তিরসিক ও কাব্যরসিক একসঙ্গে অন্তরের প্রণতি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হয়। দাশরথি শেষ বারের মত আমাদিগকে প্রেম-যমুনাকূলে আমন্ত্রণ করিয়া আশাবংশীবটমূলে বাঁশরীধ্বনি শুনাইয়াছেন। এই যমুনাকূলে বাঙালীর গতিপথ অব্যাহত হউক, এই বংশীরব তাহার কর্ণে অনন্তকাল ধরিয়া ধ্বনিত হইতে থাকুক; তাহা হইলেই দাশরথির স্মৃতি আমাদের মধ্যে অক্ষয় হইবে।

৩১, সাদার্ন এভিনিউ,
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। ফরিদপুর জেল হইতে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছি। মনে পড়ে কয়েক দিনের মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম-এ., পি-এইচ. ডি. মহোদয়ের একখানা ব্যক্তিগত পত্র পাইলাম। তিনি জানাইয়াছেন যে সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় "এম্ গ্রুপে" অর্থাৎ তন্ত্র ও শৈবধর্ম শাখায় কোন প্রশ্ন করা হয় না, কাজেই আমি যেন "এ গ্রুপে" অর্থাৎ সাহিত্য বিষয়ে এম-এ পরীক্ষা দেই। সেই সঙ্গে তিনি এক খণ্ড পাঠ্যসূচি-ও পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি শ্রীকাইল কলেজে (ত্রিপুরা) অধ্যাপনা করিবার সময়ে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সংস্কৃতে—তন্ত্র ও শৈবধর্ম বিষয়ে এম-এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছিলাম এবং যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি-ও লাভ করিয়াছিলাম। নানা কারণে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। জেলে আসিয়া পুরাতন অনুমতি একবার ঝালাই করিয়া লইলাম। মনে পড়ে যেন পরীক্ষার মাশুল-ও পাঠাইয়াছিলাম। তারপর এই পত্র আসিল।

খানিকটা বিব্রত বোধ করিলাম। স্বভাবতই বন্ধুরা নানা পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিলেন। সাহিত্যবিভাগেই পরীক্ষা 'দিয়া ফেলা' হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে মামলা করা পর্যন্ত এই পরামর্শের সীমা প্রসারিত। আমি বই সংগ্রহের জন্য বাড়িতে লিখিলাম; কিছু বই সংগৃহীত হইয়া আসিল এবং সেন্সরের সংকীর্ণ কণ্টকিত পথ অতিক্রম করিতে বেশ কিছু দিন চলিয়া গেল। পরীক্ষা দেওয়া হইবে না বুঝিয়াছিলাম—আংশিক সংগৃহীত পাঠ্য গ্রন্থাদি দর্শন করিয়া নিশ্চিত তথা নিশ্চিন্ত হইলাম।

মাসের কথা ঠিক মনে নাই। বসন্তের প্রথম। দুপুরে বেশ গরম পড়ে। আমি তখন থাকি রাজসাহী জেলের বিশ ডিগ্রীর দশ নম্বর সেলে। জেলের কঠোর আইনে ব্যারাক হইতে সেলে যাতায়াতের অবারিত পথ তখন কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়-সীমায় সঙ্কুচিত হইয়াছে। দুপুরে সঙ্গীরা যে

যাহার কুঠুরীতে নিদ্রায় বা কর্মে মগ্ন। আমি পিছনের অপরিসর বাগানে কর্মরত কয়েদীদের সহিত গল্প করিতে গেলাম। নানা গল্প-গুজবের ফাঁকে মাঝে মাঝে দুই-চারিটি বিড়ি দক্ষিণা দিয়া আমি পল্লী গ্রামের প্রবাদ ও লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করিতাম, গান শুনিতাম। বলা বাহুল্য যে এই কার্যে পাহারা সিপাইজীকে-ও খুশী করিয়া লইতে হইত। সেদিন গানের কথায় বাইশ-তেইশ বছরের একটি কয়েদী চাপা কণ্ঠে গান ধরিল—"হৃদি বৃন্দাবনে যদি বাস কর কমলাপতি।" আবার "ননদিনী বল নাগরে। ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" ভারি ভাল লাগিল। প্রশংসা করিলাম। ছেলেটি বলিল—"দাশু রায়ের গান এগুলি বাবু। পাঁচালী শুনবেন বাবু, দাশু রায়ের পাঁচালী?"—এই কথা বলিয়া সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া মনের আনন্দে—"কৃষ্ণশূন্য গোকুল কি প্রকার? যেমন—

বিষয়শূন্য নরবর, বারিশূন্য সরোবর, বস্ত্রশূন্য বেশ।
দেবীশূন্য মণ্ডপ, কৃষ্ণশূন্য পাণ্ডব, গঙ্গাশূন্য দেশ॥…

ইত্যাদি অনেকটা এক নিঃশ্বাসে গড় গড় করিয়া বলিয়া গেল।

চমৎকৃত হইলাম!

দাশরথির নাম জানিতাম। তাঁহার গান বা পাঁচালীর সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল না। আগ্রহ-ও বোধ করি নাই। সম্প্রতি বাড়ি হইতে সংস্কৃত গ্রন্থাদির সঙ্গে ভুলক্রমে বটতলার গৌরলাল দে সঙ্কলিত দশখণ্ডে সম্পূর্ণ একখানা মোটা দাশরথির পাঁচালী আসিয়াছিল। বইখানির প্রথম পালা, "শ্রীশ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ বিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন"—খানিকটা পড়িয়াছিলাম। মনে হইল "বিষয়শূন্য নরবর" ইত্যাদি যেন পড়িয়াছি। তাড়াতাড়ি কুঠুরীতে ফিরিয়া বইটা খুলিলাম। পড়িতে আরম্ভ করিলাম। …দাশরথি পড়িয়া ফেলিলাম।

মনে হইল পাঁচালী সাহিত্য, মুখ্যতঃ দাশরথি রায়ের পাঁচালী আলোচনার যোগ্য। আলোচনা করিতে লাগিলাম। "দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালীর" সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হইল। থিসিস হিসাবে ইহা দাঁড়ায় কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমার অগ্রজ-প্রতিম গৌহাটি কটন কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম-এ.

মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে আমি বাহিরে 'অনুবাদ সাহিত্য' সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলাম। খাতা চারিখানি, বোধ হয়, ফেরত আসিল ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। তখন রাজনৈতিক ঘটনার গতি দ্রুত বেগে ছুটিতেছে। সব জেল গুটাইয়া নিরাপত্তা রাজবন্দীদের দমদম জেলে আনা হইতেছে। এইটানে আমি-ও রাজসাহী জেলের পাত্তা গুটাইয়া দমদম হইয়া একবার বাহিরে আসিয়া পড়িলাম ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৬।

শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জেল হইতেই নানা বিষয়ে পত্রালাপ হইয়াছিল। নিরাপত্তা রাজবন্দীদের পরীক্ষাদি ব্যাপারে তো বটেই, ব্যক্তিগত অনেকগুলি বিষয়ে-ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের পরিবারকে তিনি যে অযাচিত সাহায্য করিয়াছেন—এই সুযোগে আজ তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। এখন বলিতে বাধা নাই যে বৃটিশ সরকারের সদা জাগ্রত গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া আমরা জেল হইতে বাহিরে যোগাযোগের কয়েকটি সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং ইহাদের একটি পথের সীমান্তে ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ। জেল হইতে বাহির হইয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। নাম-লেখা চিরকুটটি পাইয়া তিনি নিজে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রণাম করিতেই, তিনি আমাকে ধরিয়া ঘরে নিয়া গেলেন। নানা কথাবার্তার ফাঁকে তিনি বলিলেন—"তোমার থিসিস কোথায়, দাখিল কর এবার।" আমি দাখিল করিতে রাজী হইলাম না। কারণ জেলের একান্ত সীমাবদ্ধ সুযোগে যাহা করা হইয়াছে তাহা যে কত অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ তাহা আমি নিজেই জানি। কাজেই উহা পুনরালোচনা করা দরকার। ডঃ মুখোপাধ্যায় আমার কথা বুঝিলেন। বলিলেন —"বেশ তাই কর। তবে আমাকে একবার দেখিয়ে নিও। আর খুব যত্ন করে করো কাজটি। এই দিক দিয়ে-ও অনেক কাজ করবার ছিল তোমাদের। মনে রেখো এ-ও দেশ-সেবাই। মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা অভেদ। কিন্তু কি জান, কোন কাজই যেন কেউ সিরিয়াস্‌লি করে না।" ভাবিতেছি—আমি যে ফাঁকি দেই নাই, এবং যথাসাধ্য সিরিয়াসলি করিয়াছি একথা আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে জানাই কেমন করিয়া?

দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল বিধি রচিত হইবার পর নাম তালিকাভুক্ত করিলাম। তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ, পি-এইচ. ডি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গবেষণার তত্ত্বাবধান করিতে সম্মত হইলেন। বিষয় স্থির হইল "Bengali popular verses with special reference to Dasarathi Rai।" দাশরথি সহ সমগ্র জনসাহিত্য অর্থাৎ কবিগান, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ্-আখড়াই, টপ্পা, তর্জা প্রভৃতি আলোচনার বিষয়ের অঙ্গীভূত হইল। বছর দেড়েক কাজ করিয়া যখন অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছি তখন রচনার পরিধি ও আয়তন বেশ বিরাট ও বিপুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন, এম.এ, পি-এইচ. ডি. মহাশয়ের সহিত একদিন থিসিসের কথা বলিলাম এবং পরদিন দাশরথি সম্বন্ধে লিখিত সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি দেখাইলাম। তিনি বলিলেন যে শুধু দাশরথি লইয়াই ডি. ফিলের থিসিস হইতে পারে। বড় কাজটির প্রয়োজন হয় না। তখন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে খাতাগুলি দেখাইলাম। তিনি-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিলেন কিন্তু জনসাহিত্য সম্বন্ধে আরব্ধ কাজটি যেন পরিত্যাগ না করি সেই সম্বন্ধেও বলিয়া রাখিলেন। বিষয় পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিলাম। "দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী" বিষয়টি গবেষণার জন্য অনুমোদিত হইল।

প্রবন্ধটি রচনার পরও দীর্ঘ সময় গিয়াছে দাখিল করিতে। কারণ বাংলা টাইপ-লিখন কার্যটিও আমাকেই করিতে হইয়াছে। কলেজে অধ্যাপনার অবসরে কোন কোন দিন এক এক পাতা করিয়া টাইপ করিতাম এবং পূজার ছুটির সময় কয়েকদিনের জন্য যন্ত্রটি বাড়ীতে আনিয়া কাজ করিতাম। নিজে টাইপ করিবার সুবিধা এই যে আমার অগ্রসর চিন্তার সব কিছুই উহার অন্তর্ভুক্ত করা যাইত। তখনও অনেক বাকি, বিশেষতঃ পরিশিষ্টগুলির, যেমন দাশরথির শব্দ ও অর্থের বিচিত্র প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, তদানীন্তন রাঢ়ের গ্রাম্য জবানের তালিকা প্রভৃতির খসড়া করা বাকি ছিল। কিন্তু দাশরথির মৃত্যু-শত-বার্ষিকী আসিয়া গেল। কাজেই স্থির করিলাম ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর দাখিল করিব। ইহার মধ্যে যে পর্যন্ত প্রস্তুত করা ও টাইপ করা সম্ভব

ততখানিই দাখিল করিব। তাহাই করিলাম, কতগুলি অংশ আর যোগ করা হইল না। এই প্রসঙ্গে সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষ শ্রীঅরুণকুমার সেন, এম-এ, এম-এস-সি. ইকন্ (লণ্ডন), বার-এট-ল মহাশয়ের আনুকূল্য ও সহানুভূতির কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। শুধু কলেজের যন্ত্রটি ব্যবহার করিবার ও বাড়ীতে আনিবার অনুমতি দান করিয়া নহে, নানা ভাবে উৎসাহ দিয়া তিনি আমার স্তিমিত-প্রায় উদ্যমকে সর্বদা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, এবং সাফল্যের শেষে সমবেত ভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে সম্বর্ধনা-সম্মান দেখাইয়া পুরস্কৃত করিয়াছেন। এই সুযোগে আমার সহকর্মী বন্ধুদের ও ভোকেশনাল সেকসনের কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর যাঁহারা আমাকে এই প্রবন্ধ রচনা ব্যাপারে পরামর্শ ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ডঃ সুকুমার সেন ও অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম। তাঁহারা কেবল পরামর্শ দিয়া ও গ্রন্থাদি দ্বারাই সাহায্য করেন নাই, সর্বদাই উৎসাহ দিয়া, প্রেরণা দিয়া আমাকে অনিবার্য নিরুদ্যম ও হতাশা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ডঃ সুশীলকুমার দে এম-এ, পি.এইচ. ডি. শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ও শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া-ও উপকৃত হইয়াছি।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিপুল পাণ্ডিত্য ও সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তি বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত, এবং তাঁহার সুচিন্তিত গ্রন্থাদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। কিন্তু তাঁহার নির্দেশনায় কাজ করিবার সময়ে সুদীর্ঘকাল আমি যে একটি অপরিসীম স্নেহশীল, ধৈর্যশালী, ছাত্রবৎসল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি, তাহা একান্তভাবেই আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে-ও এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধানত হৃদয় তাঁহার অফুরন্ত স্নেহ-ঋণে চির-আবদ্ধ রহিল। এই সূত্রে আমার থিসিসের অন্যতম পরীক্ষক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., ডি.লিট. এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, এম.এ., পি-এইচ. ডি. মহাশয়ের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

গ্রন্থখানির প্রকাশন বিষয়ে বিশেষ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইতেছেন বাঙ্লা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার কর্মীবৃন্দ। শনিরঞ্জন প্রেসের কর্মদক্ষতা-ও স্মরণীয়। গ্রন্থখানিকে নির্ভুল ও শোভন ভাবে প্রকাশ করা ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বন্দী করিয়াছেন বন্ধুবর শ্রীশোভাকর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার বসু এবং সুসাহিত্যিক শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও এ. মুখার্জী কোম্পানীর সুযোগ্য কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রায়।

মূল থিসিসের সহিত মুদ্রিত প্রবন্ধের একটু পার্থক্য আছে। থিসিস-প্রবন্ধে 'ক'-পরিশিষ্টে দুইটি পালা পুরাপুরি মুদ্রিত হইয়াছিল নমুনা হিসাবে এবং একটি বিশিষ্ট শব্দসূচী 'শব্দবিচিত্রা' সন্নিবিষ্ট ছিল 'খ' পরিশিষ্টে। বর্তমান গ্রন্থে তাহা বর্জিত হইয়াছে। কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মৎসম্পাদনায় দাশরথির যে সমগ্র পাঁচালী পাঠান্তরাদি সহ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে বিশিষ্ট শব্দসূচী থাকিবে। সঙ্গীত সংগ্রহে-ও একই কারণে মাত্র ৫০টি সঙ্গীত শ্রেণী বিভাগ করিয়া নমুনা হিসাবে উল্লিখিত হইল। এইখানে লক্ষণীয় যে পূর্ব পরিকল্পনা সংশোধন করিয়া এই ক্ষেত্রে গানের জন্য স্বতন্ত্র পরিশিষ্ট চিহ্নিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ছাপা ভুল চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু খুব মারাত্মক নহে বলিয়া সংশোধন-পত্র দিলাম না।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৭
সিটি কলেজ
দক্ষিণ কলিকাতা (মহিলাশাখা)
২৮, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৮

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পাঁচালীর পটভূমি

ক

দেশের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনের বিচিত্র ধারা রাজনৈতিক পরিবর্তনের কুটিল খাত ধরিয়াই সর্বদা চলে না বটে, কিন্তু ইহারা যে পরস্পর সম্বন্ধনিরপেক্ষ নহে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সাহিত্য মানুষের মানস সৃষ্টি, আর মানুষ বাস করে পরিবর্তনশীল সমাজে, স্থান ও কালের অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের রস পান করিয়াই মানুষের মন পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়। কাজেই যত সূক্ষ্মভাবেই হউক না কেন, সাহিত্য বস্তুধর্মী হইতে বাধ্য এবং সর্বদাই তাহা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং অন্যান্য যে কোন সুদূরপ্রসারী ও গভীর সামাজিক আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত।

বঙ্গদেশের অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লব ও সাহিত্য-বিবর্তনের ধারা দুইটির মধ্যে এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ সাড়ে পাঁচশত বৎসরের পুরাতন ও জীর্ণ মুসলমান রাজশক্তির অবসানের এবং ক্রমশক্তিসংগ্রহে প্রবল ব্রিটিশ রাজশক্তির অভ্যুদয়ের যে সূচনা করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পুরাতন রাজশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার শেষ সংঘবদ্ধ সংগ্রাম সিপাহীবিদ্রোহের ব্যর্থতায়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণীর ঘোষণায় শুধু যে কোম্পানীর শাসন শেষ হইল তাহা নহে, বাঙ্গালীর তথা ভারতের এক অন্ধকারময় অনিশ্চয়তার যুগেরও অবসান হইল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, এই একশত বৎসর কাল বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ঘোর অনিশ্চয়তার যুগ। ইহার দ্বিতীয়ার্ধ রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সংগঠনী প্রতিভার চন্দ্রালোকে স্বচ্ছ ও

আলোকিত হইলেও প্রথমার্ধ কাল ছিল দ্রুতবিলীয়মান প্রাচীন সংস্কৃতির ভাঙ্গা টুকরার পাংশু রেণুজালে সমাকীর্ণ ও অস্বচ্ছ।

এই শতবৎসর কালে, বিশেষতঃ ইহার প্রথমার্ধে, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে বাঙ্গালী জাতি বিভিন্ন ও বিচিত্র উৎপীড়ন অসুবিধা ভোগ করিয়াছে। রাজস্ব আদায়ের নূতন নীতিতে বুনিয়াদী ভূস্বামিগণের বিলুপ্তি এবং নূতন জমিদার-গোষ্ঠীর হস্তে প্রজাপুঞ্জের দুঃসহ নির্যাতন, কোম্পানীর সর্বস্তরের কর্মচারীদের লোভ ও অসাধুতায় ন্যায়বিচারের সর্ববিধ প্রত্যাশার অবলোপ, দস্যুদলের উপদ্রবে গৃহে ও পথে সমভাবেই নিরাপত্তার অভাব এবং বাঙ্গালা দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকক্ষয়কারী মহামন্বন্তরের আবির্ভাব—সব মিলাইয়া এই সময় বাঙ্গালী জনসাধারণের চিত্তে ও চরিত্রে এক অসহায় বিমূঢ়তা ও বিহ্বলতা সৃষ্টি করিয়াছিল।[১]

এই শতবৎসরে (১৭৫৭-১৮৫৭) রাজ্যশাসনের নীতিও ছিল অনেকটা অনিশ্চিত ও সংশয়াকুল। বণিগ্‌বৃত্তি ও রাজ্যশাসন এই দুই বিপরীত প্রান্ত-সীমার মধ্যে শাসনদণ্ড অনেকটা অস্থির ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। কোম্পানীর দায়িত্বগ্রহণ ছিল দ্বিধাগ্রস্ত ও নিশ্চিত নীতিবর্জিত। ভারতবাসীকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা এই বিষয় লইয়া প্রবল মতদ্বৈধ এবং অনেকটা সুবিধাবাদ প্রণোদিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্কুচিত ও অনিচ্ছুক প্রবর্তন এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ এই অনিশ্চয়তাযুগের অবসান সূচনা করে।

এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল। তখন একদিকে নূতন সাহিত্যের জন্য মানসপ্রস্তুতি, অন্যদিকে ছিল শিথিলিত প্রাচীন সংস্কৃতির খণ্ড খণ্ড ভগ্নাংশ লইয়া একপ্রকার উদ্দেশ্যহীন গভীর তাৎপর্যবর্জিত সাময়িক সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব। সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ এই দুই সীমান্ত রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ধারার সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের

১। দ্রষ্টব্য :—History of Bengali Literature in the 19th Century—Dr. S. K. De, pp. 7-64.

তিরোধানে যুগাবসানের যে ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছিল, তাহাই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের চার বৎসর পরে এবং প্রাচীনপন্থী বাঙ্গালা সাহিত্যের শেষ সার্থক প্রতিনিধি, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি", ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেহান্তরের দুই বৎসর অন্তে মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশের মধ্যে পূর্ণপরিণতি লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই বৎসরই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে গুপ্তকবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত শতবৎসর কালকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাত্রিকাল বলিয়া অভিহিত করা যায়, যদিও ইহার দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্তনের উৎসাহ, বাঙ্গালা গদ্য প্রচেষ্টা, সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা উদয়দিগ্‌বলয়ে নূতন দিনের পূর্বাভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগীয় কাব্যগগনের শেষ সূর্য ভারতচন্দ্র অস্তমিত হইয়াছেন, অথচ নূতন যুগের তরুণ সূর্য মধু-বঙ্কিম তখনও শতবৎসরের অন্তরালে নিদ্রাচ্ছন্ন। এই রাত্রিতে শেষ প্রহরের চন্দ্রের মত বাঙ্গালা-সাহিত্যাকাশের অপর প্রান্তে উদিত হইয়াছিলেন গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁহার জ্যোতির কাকজ্যোৎস্নায় দিবসাগমের কিঞ্চিৎ পূর্বেই কাকলি ও কলগুঞ্জনে বঙ্গভারতীর সাহিত্যাঙ্গন মুখরিত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে গুপ্তকবির তিরোভাব আর টেকচাঁদ-মধুসূদন-দীনবন্ধু-বঙ্কিম-সাহিত্যের আবির্ভাব-কাল প্রায় অব্যবহিত।

কেবল দেহের খাদ্য লইয়া মানুষ বাঁচে না, মানুষ হিসাবে বাঁচিবার জন্য তাহাকে হৃদয়ের খাদ্যও অনুসন্ধান করিতে হয়। কাজেই চরম দুঃখদুর্দশার মধ্যেও মানুষ তাহার হৃদয়ক্ষুধা মিটাইবার উপায় স্বরূপ শিল্প ও সাহিত্যকে ত্যাগ করিতে পারে না। আলোচ্য শতবৎসরের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মধ্যেও বাঙ্গালী তাহা পারে নাই। এই শতবৎসরের রাত্রির স্তিমিতালোকের মধ্যে ছোট বড় বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষীণ জ্যোতি লইয়া বাঙ্গালা জনসাহিত্য-গগনে যাহারা ভিড় জমাইয়াছিল, বর্তমানে দিনের প্রখরালোকে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেলেও সে রাত্রিতে তাহাদের দাম ও দান কম ছিল না। কবি, তর্জা, কীর্তন, ঢপ, পাঁচালী, যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, হাফআখড়াই, ঝুমুর, টপ্পা প্রভৃতির বিপুল ও বিচিত্র আয়োজনে সমসাময়িক বাঙ্গালী জনসমাজের

আলোকিত হইলেও প্রথমার্ধ কাল ছিল দ্রুতবিলীয়মান প্রাচীন সংস্কৃতির ভাঙা টুকরার পাংশু রেণুজালে সমাকীর্ণ ও অস্বচ্ছ।

এই শতবৎসর কালে, বিশেষতঃ ইহার প্রথমার্ধে, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে বাঙালী জাতি বিভিন্ন ও বিচিত্র উৎপীড়ন অসুবিধা ভোগ করিয়াছে। রাজস্ব আদায়ের নূতন নীতিতে বুনিয়াদী ভূস্বামিগণের বিলুপ্তি এবং নূতন জমিদার-গোষ্ঠীর হস্তে প্রজাপুঞ্জের দুঃসহ নির্যাতন, কোম্পানীর সর্বস্তরের কর্মচারীদের লোভ ও অসাধুতায় ন্যায়বিচারের সর্ববিধ প্রত্যাশার অবলোপ, দস্যুদলের উপদ্রবে গৃহে ও পথে সমভাবেই নিরাপত্তার অভাব এবং বাঙ্গালা দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকক্ষয়কারী মহামন্বন্তরের আবির্ভাব—সব মিলাইয়া এই সময় বাঙালী জনসাধারণের চিত্তে ও চরিত্রে এক অসহায় বিমূঢ়তা ও বিহ্বলতা সৃষ্টি করিয়াছিল।[১]

এই শতবৎসরে (১৭৫৭-১৮৫৭) রাজ্যশাসনের নীতিও ছিল অনেকটা অনিশ্চিত ও সংশয়াকুল। বণিগ্‌বৃত্তি ও রাজ্যশাসন এই দুই বিপরীত প্রান্ত-সীমার মধ্যে শাসনদণ্ড অনেকটা অস্থির ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। কোম্পানীর দায়িত্বগ্রহণ ছিল দ্বিধাগ্রস্ত ও নিশ্চিত নীতিবর্জিত। ভারতবাসীকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা এই বিষয় লইয়া প্রবল মতদ্বৈধ এবং অনেকটা সুবিধাবাদ প্রণোদিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্কুচিত ও অনিচ্ছুক প্রবর্তন এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ এই অনিশ্চয়তাযুগের অবসান সূচনা করে।

এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল। তখন একদিকে নূতন সাহিত্যের জন্য মানসপ্রস্তুতি, অন্যদিকে ছিল শিথিলিত প্রাচীন সংস্কৃতির খণ্ড খণ্ড ভগ্নাংশ লইয়া একপ্রকার উদ্দেশ্যহীন গভীর তাৎপর্যবর্জিত সাময়িক সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব। সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ এই দুই সীমান্ত রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ধারার সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের

১। দ্রষ্টব্য:—History of Bengali Literature in the 19th Century—Dr. S. K. De, pp. 7-64.

তিরোধানে যুগাবসানের যে ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছিল, তাহাই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের চার বৎসর পরে এবং প্রাচীনপন্থী বাঙ্গালা সাহিত্যের শেষ সার্থক প্রতিনিধি, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি", ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেহান্তরের দুই বৎসর অন্তে মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশের মধ্যে পূর্ণপরিণতি লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই বৎসরই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে গুপ্তকবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত শতবৎসর কালকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাত্রিকাল বলিয়া অভিহিত করা যায়, যদিও ইহার দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্তনের উৎসাহ, বাঙ্গালা গদ্য প্রচেষ্টা, সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা উদয়দিগ্‌বলয়ে নূতন দিনের পূর্বাভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগীয় কাব্যগগনের শেষ সূর্য ভারতচন্দ্র অস্তমিত হইয়াছেন, অথচ নূতন যুগের তরুণ সূর্য মধু-বঙ্কিম তখনও শতবৎসরের অন্তরালে নিদ্রাচ্ছন্ন। এই রাত্রিতে শেষ প্রহরের চন্দ্রের মত বাঙ্গালা-সাহিত্যাকাশের অপর প্রান্তে উদিত হইয়াছিলেন গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁহার জ্যোতির কাকজ্যোৎস্নায় দিবসাগমের কিঞ্চিৎ পূর্বেই কাকলি ও কলগুঞ্জনে বঙ্গভারতীর সাহিত্যাঙ্গন মুখরিত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে গুপ্তকবির তিরোভাব আর টেকচাঁদ-মধুসূদন-দীনবন্ধু-বঙ্কিম-সাহিত্যের আবির্ভাব-কাল প্রায় অব্যবহিত।

কেবল দেহের খাদ্য লইয়া মানুষ বাঁচে না, মানুষ হিসাবে বাঁচিবার জন্য তাহাকে হৃদয়ের খাদ্যও অনুসন্ধান করিতে হয়। কাজেই চরম দুঃখদুর্দশার মধ্যেও মানুষ তাহার হৃদয়ক্ষুধা মিটাইবার উপায় স্বরূপ শিল্প ও সাহিত্যকে ত্যাগ করিতে পারে না। আলোচ্য শতবৎসরের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মধ্যেও বাঙ্গালী তাহা পারে নাই। এই শতবৎসরের রাত্রির স্তিমিতালোকের মধ্যে ছোট বড় বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষীণ জ্যোতি লইয়া বাঙ্গালা জনসাহিত্য-গগনে যাহারা ভিড় জমাইয়াছিল, বর্তমানে দিনের প্রখরালোকে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেলেও সে রাত্রিতে তাহাদের দাম ও দান কম ছিল না। কবি, তর্জা, কীর্তন, ঢপ, পাঁচালী, যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, হাফআখড়াই, ঝুমুর, টপ্পা প্রভৃতির বিপুল ও বিচিত্র আয়োজনে সমসাময়িক বাঙ্গালী জনসমাজের

মনের ক্ষুধা ও রসের তৃষ্ণা পরিপূর্ণভাবেই হয়ত মিটিয়াছিল। তারপর নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনভঙ্গী লইয়া যখন নবযুগের আবির্ভাব হইল, তখন সূর্যোদয়ে নক্ষত্রপুঞ্জের মত অকস্মাৎ তাহারা যেন দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

প্রাচীন ধারার অন্তর্ধান ও নূতন ধারার আবির্ভাব, এই দুই সীমান্তের মধ্যবর্তী শতবৎসর-পরিমিত যুগান্তর কালটি নানা দিক দিয়াই বাঙ্গালীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ। ইহার মধ্যে প্রতি পদে অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতার অন্ধকার আছে, দ্বিধা ও সংশয়ের চিত্তবিক্ষেপ আছে, বিভিন্ন ও কচিৎ বিপরীত ভাবসংঘাতের চকিত দ্যুতি ও সাড়ম্বর গর্জন আছে, কিন্তু তথাপি নবীন বঙ্গ ও বাঙ্গালীর সমুত্থানের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় জানিতে হইলে এই পথে বিচরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সাহিত্যের মধ্যে জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সেদিনকার বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচিনীতি, সমাজচেতনা ও সৌন্দর্যবোধ তৎকালীন জনসাহিত্যের মৃৎপাত্রের গাত্রে রেখাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের ছাত্রের নিকট এই যুগান্তর কালের দাম অসামান্য।

বাঙ্গালা সাহিত্য রসিক ও সমালোচকদের নিকটেও এই সময়ের মূল্য অপরিমেয়। কারণ সকল দেশ ও জাতির সাহিত্যই অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমাণ। বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবে এবং উপনদীর উদ্ভবে ও শাখানদীর সৃষ্টিতে যেমন করিয়া বহতা নদী কখনও বিপুল কখনও ক্ষীণ আকার ধারণ করে, গতিপথে কঠিন প্রস্তর ও উচ্চভূমিকে পাশ কাটাইয়া নিম্নভূমিকে আশ্রয় করিয়া কখনও বা বিচিত্রভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে কখনও বা ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা হয়, তেমনি সাহিত্যের ধারাও নানা কালের বিভিন্ন কদাচ বিপরীত পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র প্রাণরস পান করিয়া অবিচ্ছিন্ন বঙ্কিম গতিতে বহিয়া চলে। স্রোতোধারা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইলেও খাতরেখা দেখিয়া বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষাদ্বারা ভূতত্ত্ববিদ যেমন শুষ্ক নদীধারার যোগাযোগ ও সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারেন, সাহিত্যক্ষেত্রেও মানবমনের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াদি বিশ্লেষণ করিয়া তেমনিভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত সাহিত্যধারার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র ও সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যুগান্তর কালের রূপ ও সুর পূর্বাপর হইতে খানিকটা স্বতন্ত্র হইলেও মূল ধারা যে এক ও অবিচ্ছিন্ন

তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় তথা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যধারার সহিত এই যুগান্তর কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের যোগসূত্র কোথায়, কেন ও কেমন করিয়া এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন বিচিত্র রূপ হইল এবং কি ভাবে নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে ইহার মূল ধারাটি বিলীন হইয়া গেল, তাহা সবিস্তারে আলোচনা করিবার অবকাশ আলোচ্য প্রবন্ধে নাই। এইখানে অতিসংক্ষেপে, মাত্র সূত্রাকারে ইহার আলোচনা করিয়া একটিমাত্র শাখার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচ্য শতবৎসর পরিমিত যুগান্তর কালটিকে কেহ কেহ "গানের যুগ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্য সুরসংযোগেই গীত হইত, অর্থাৎ আসরে বসিয়া যন্ত্রতন্ত্রাদি সহযোগেই মঙ্গলকাব্যাদি গান করা হইত। তবু "গানের যুগ" বলিয়া একটি বিশেষ কালকে চিহ্নিত করা হইল কেন, তাহা চিন্তনীয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে মঙ্গলকাব্য, প্রাচীনপদ্ধতির পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যে গীত থাকিলেও কবি, টপ্পা, আখড়াই, নূতন পদ্ধতির পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যে গানের যতখানি গুরুত্ব ও প্রাধান্য আছে, উহাতে ততখানি

১। "বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে বিগত শতাব্দীর শেষভাগ ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ লইয়া এমন একটা সময় গিয়াছে, যাহাকে 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে। নিধুবাবু ও শ্রীধর কথকের আদিরসাত্মক সঙ্গীত, রাম বসু হরুঠাকুর প্রভৃতির কবির গান, দাশরথিরায়ের পাঁচালী—এই সময়ে রচিত হয়।"—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখিত রসভাণ্ডার গ্রন্থের ভূমিকা। পুনশ্চ: "১৭০০ শকের কিছু পূর্ব হইতে ১৭৫০-৫৫ শক (১৮২৮-১৮৩৩ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অনেকানেক মহাত্মা নানা বিষয়ের নানাবিধ গীত রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই সময়কে গানের যুগ বলা যাইতে পারে।"—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৭২।

ছিল না। টপ্পা ও আখড়াই প্রভৃতি একেবারেই গীত-সর্বস্ব ছিল, আবৃত্তির বা ছড়া কাটিবার স্থান বা সুযোগ তাহাদের মধ্যে ছিল না। কবি, নূতন পদ্ধতির পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যেও গানের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং রসিক শ্রোতার কাছে উহাদের মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে গানের একটি বিশেষ স্থান ছিল। অধিকন্তু এই সময়কার শ্রেষ্ঠ জনকবিগণ সঙ্গীতকার হিসাবেই বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে নাম করিয়াছিলেন। নিধুবাবুর ও শ্রীধর কথকের আদিরসাত্মক সঙ্গীত, রাম বসু হরুঠাকুর প্রভৃতির কবির গান, দাশরথি রায়ের পাঁচালী এই সময় রচিত হয়। এই সময়েই বাঙ্গালা দেশে কবিগানের প্রবল প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কবির লড়াই ও প্রতিযোগিতামূলক রীতি অন্যান্য শাখার মধ্যেও যথাসম্ভব সংযোজন করিবার ব্যবস্থা এবং আগ্রহ-ও এই সময় হইতেই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। মুখ্যতঃ এইদিকে নজর রাখিয়াই কেহ কেহ ইহাকে "কবিওয়ালাদের যুগ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১]

ইহার অন্যান্য কারণও বর্তমান। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক প্রমুখ ব্যবহারিক প্রচেষ্টা এবং সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক প্রমুখ সাংস্কৃতিক উদ্যম—এই দুই দিক হইতেই আলোচ্য শতবৎসর পরিমিত যুগান্তর কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। মোটামুটিভাবে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে ধরা যায় ইহার মধ্যবিন্দু। ইহার পূর্বার্ধে, অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ধারা নূতন সৃষ্টির অভাবে বৃষ্টিপাতহীন প্রদেশের অগভীর জলাশয়ের মত শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তারাম নাগকৃত দুর্গাপুরাণ (১৭৭৩) প্রমুখ কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য প্রয়াস, কাশীশ্বরকৃত ব্রহ্মোত্তর খণ্ড (১৭৯৫) জাতীয় কিছু অনুবাদ-প্রচেষ্টা এবং সাকের মামুদ, গরীবুল্লা, সৈয়দ হামজা প্রমুখ মুখ্যতঃ মুসলমান সাহিত্যিকদিগের আখ্যায়িকা কাব্যাদি রচনা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই এই সময়ে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে এই সময়ে প্রাচীন খাতের এই প্রক্ষীণ ধারা

১। "The interregnum till the emergence of the new literature was broken chiefly, if not wholly by the Kavi-wallas."—Bengali Literature in the 19th Century.—Dr. S. K. De, p. 38

অস্ফুট কলতানকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল বর্ষণ বিপুল শ্রাবণের অবিশ্রান্ত কোলাহলের মত কবিওয়ালাদের গান।

সমসাময়িক রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক অবস্থার কথা পূর্বে কিছুটা আলোচিত হইয়াছে।[১] পারিপার্শ্বিকের চাপে, এই সময়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত রাজা ও জমিদারশ্রেণীর ক্ষমতাহ্রাস ও অবলুপ্তির ফলে রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা নষ্ট হইয়া গেল এবং এই অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের পরিবেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যধারায় কোন প্রতিভাবান কবির উদ্ভবের অনুকূল অবস্থা রহিল না। রাজনৈতিক এবং তদনুযায়ী সমাজনৈতিক ক্ষমতার শাসনরজ্জু হস্তান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন ভাগ্যান্বেষীর দল সমাজের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন—আদর্শে, জীবনভঙ্গীতে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সমাজচেতনায় এক কথায় জীবনের মূল্যবোধে তাঁহারা খানিকটা নূতন আবেগ ও প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া আনিলেন। বুনিয়াদী শ্রেণীর পৃষ্ঠপুষ্ট গভীর ও পুরাতন কাব্যধারা অপেক্ষা হালকা, সহজবোধ্য, গীতবহুল ও সাধারণের কণ্ঠস্ফূর্ত নূতন সাহিত্য-ধারার প্রতি তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবেই সমধিক আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু এই সময়ের প্রথম দিকে কবি প্রমুখ জনসাহিত্য ধারাগুলি নূতন জমিদারশ্রেণীর নিকট হইতে যে বিশেষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষণা পাইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জনসাধারণের আগ্রহে ও আনুকূল্যে ইহারা নিজের বেগেই প্রথমার্ধে স্থান করিয়া লইয়াছিল। কাসিমবাজার, মুর্সিদাবাদ, নদীয়া হইতে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করিয়া হুগলী, চুঁচুড়া হইয়া অন্যান্য বিষয়ের সহিত সাহিত্যের আসরও জমিয়া উঠিল ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানী কলিকাতা নগরীতে। এই প্রসঙ্গে কবিগানের পূর্ণ ও পরিণত অবস্থার বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।"[২]

১। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায় ক-অংশ দ্রষ্টব্য।

২। লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৫।

পূর্বেই বলিয়াছি ইহা পূর্ণপরিণতির কথা। কবিগান সৃষ্ট হইয়াছিল ইহার অনেক আগে এবং যথাস্থানে তাহা আলোচনা করিব। মোটকথা তখন কবিসঙ্গীতের ঢোল ও কাঁসির প্রচণ্ড হট্টগোলের নীচে সমসাময়িক প্রাচীন-পন্থী কাব্যের মন্দিরা ও নূপুরধ্বনি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ধারা তখনও পুরাতন খাতরেখা ধরিয়াই মন্দবেগে তর তর করিয়া বহিতেছিল।

কিন্তু উত্তরার্ধে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই এই ধারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। এই নূতন খাত সৃষ্টির আদি ও মুখ্য বাস্তকার হইল শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, এই প্রতিষ্ঠান-যুগল। এই যুগল প্রতিষ্ঠানের গোমুখী হইতে ইংরাজ সংস্পর্শে ও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে নূতন নির্ঝরিণী নামিয়া আসিল, তাহাই উনবিংশ শতকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর মত বিশাল দেহে ও বিপুলবেগে বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচিত্র স্রোতকে ধারণ করিয়া চলিয়াছে। এই পুরাতন ও নূতন দুই শাখাকে যথাক্রমে ইংরাজী প্রভাববর্জিত ও ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট এই দুই নামে অভিহিত করা যায়।

ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট ধারার উৎস অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে নিহিত। এই শতকের অষ্টম দশকে চার্লস উইলকিন্‌স্ ছেনী কাটিয়া বাঙ্গালা অক্ষর তৈয়ারী করিয়াছিলেন। হালহেড রচিত ব্যাকরণের উদাহরণ ছাপিতে এই অক্ষর প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। গদ্যপ্রচেষ্টা এই সময় হইতেই নূতনভাবে ও প্রবলবেগে আরম্ভ হইল, এবং কোম্পানীর রাজ্যশাসন প্রয়োজন ইহাকে ত্বরান্বিত করিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর প্রয়োজনে বাঙ্গালা গদ্যে আইনের বই ছাপা হইল। তারপর মিশন প্রেস সহ শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যুগপৎ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল নববঙ্গ সাহিত্যধারার ভগীরথের মত। ইহার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল বাঙ্গালা গদ্যের তথা নববঙ্গ সাহিত্যের সংগঠনের যুগ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত চেষ্টা; ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলে লর্ড বেণ্টিঙ্কের ঘোষণা; বিভিন্ন কলেজ, ইংরাজী বিদ্যালয়, মেয়েদের বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, নানা প্রতিষ্ঠান ও সংঘ স্থাপন; সতীদাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ বিধান গ্রহণ প্রমুখ অসংখ্য সমাজ-সংস্কারমূলক

ও জনহিতকর কার্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছিল নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের তথা নূতন বাঙ্গালীর মানসসংস্থিতির বিপুলায়তন প্রাসাদ।

কিন্তু এই নূতন ইমারত গঠনের বিরাট কাজটি সহজে বিনা বাধায় সম্পাদিত হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র বন্ধ্যা ও একান্ত অরক্ষিত অবস্থায় ছিল না। কাজেই যাহারা এইখানে এতকাল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহারা বিনাযুদ্ধে একপদও পশ্চাদপসরণ করিয়া নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই। আলোচ্য শতবৎসর কালের উত্তরার্ধ, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকাল ইংরাজী প্রভাববর্জিত ও ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট এই দুই বিরোধী সাহিত্যের দ্বৈরথ সংগ্রাম কোলাহলে মুখর হইয়াছিল।

লক্ষণীয় এই যে কবি, নূতন পদ্ধতির পাঁচালী, আখড়াই, ঢপ, টপ্পা প্রমুখ প্রয়াসগুলি পুরোগামী হইলেও এই যুদ্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রক্ষীণ উত্তরাধিকারিগণও একেবারে পিছাইয়া থাকে নাই। বরঞ্চ বিগত পঞ্চাশ বৎসরের তথা গোটা অষ্টাদশ শতকের তুলনায়ও আলোচ্য অর্ধশতকে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে আনুপাতিক হিসাবে মঙ্গলকাব্য রচনা, পুরাণাদি অনুবাদ প্রচেষ্টা, গাথা-কাহিনী-আখ্যায়িকা প্রভৃতির সংখ্যা অধিকতর। একটা মজার কথা এই যে, শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত গদ্য বাইবেল তেমন সমাদৃত না হওয়ায় মিশন প্রাচীন পাঁচালী ভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। "খ্রীষ্টবিবরণামৃতং" এবং "নিস্তাররত্নাকর" নামে প্রাচীন ছাঁচে দুইখানা পদ্য পাঁচালী মিশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহা হউক এই অর্ধশতাব্দীর সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজী প্রভাববর্জিত শাখার কবিপ্রমুখ দলগুলি নিজেদের কাটিয়া ছাঁটিয়া, প্রয়োজনানুযায়ী সংযোগ সমন্বয় করিয়া কত ভাবে যে জনচিত্ত অধিকার করিতে, বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অতি বিচিত্র ও কৌতুকপ্রদ। এই যুদ্ধের পরিণামও সুবিদিত। ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার ভাবসংঘাত বাঙ্গালীর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে যে পরিবর্তন আনিয়াছিল, তাহার অদৃশ্য অস্ত্রাঘাতেই ইংরাজী প্রভাববর্জিত শাখা হতবল হইয়া ক্রমে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, গদ্য সাহিত্যের প্রয়াস ও প্রসার, সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের উদ্ভব এবং পড়িবার অভ্যাস বৃদ্ধি, ইংরাজী শিক্ষার

প্রভাবে রুচির পরিবর্তন, থিয়েটারের উৎপত্তি প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থা ও পরিবেশই প্রাচীন শাখার সংরক্ষণের প্রতিকূলতা করিয়াছে। ইংরাজী প্রভাববর্জিত শাখার নেতৃত্ব ছিল কবিওয়ালাদের হাতে। কাজেই নেতৃত্ব গৌরবের দিক হইতে এই সংগ্রামকালকে সাধারণভাবে কবিওয়ালাদের বহুরূপে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধপর্ব বলিয়াও আখ্যাত করা যায়।

গ

ইংরাজী-প্রভাববর্জিত শাখাতে প্রশাখার সংখ্যা অনেক। দাঁড়াকবি, তর্জা, পাঁচালী, ঢপ, যাত্রা, কীর্তন, ঝুমুর, বোলান, শাড়ি, জারি, মালসী, খেউড়, টপ্পা, আখড়াই, হাফআখড়াই, বাউল, ভাটিয়ালী, কথকতা, গম্ভীরা, আলকাফ, দেহতত্ত্ব, গাজীর গান, লেটোগীত, নলেগীত, ভাটেলগীত, পৌষপার্বণগীত, ছাটুগীত, রয়ানী, ভাসান, মানিকপীরের গীত, গুরুসত্য, ত্রিনাথের গান, চড়ক-পূজার গান, অষ্টক গীত, কানাইবলাই গীত, ছড়া প্রভৃতি সবগুলিই এই শাখার অন্তর্গত। বলা বাহুল্য যে বিষয়বস্তু, ঢঙ, সুর ও গাহনার রীতি ইত্যাদির বিচারে এইগুলি এক জাতির ও সমমানের নহে। বরঞ্চ স্থূলদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে সাদৃশ্য হইতে বৈসাদৃশ্যই বড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই দেখা যায় যে এই বিভিন্নতা-বৈসাদৃশ্যের অন্তরালে যে মূল স্রোতটি প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আলোচ্য শতবৎসর কালের ইংরাজী প্রভাববর্জিত ভাবধারারই বিভিন্ন ও বহুমুখী বিকাশ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে গীতের প্রাধান্য প্রভৃত এবং এই সাহিত্যের আবেদনও ছিল মুখ্যতঃ শ্রুতিগ্রাহ্য। আলোচ্য ইংরাজী প্রভাব-বর্জিত শাখার মধ্যেও গীতস্রোত অব্যাহত ধারায়, স্থানবিশেষে প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। সুর বা গীতের প্রাধান্যের দিক হইতে এই শাখাকে মুখ্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতগুলিকে বলা যায় গীতিপ্রধান, আর কতগুলিকে আখ্যায়িকা-প্রধান। গীতিপ্রধান ধারা কীর্তনাদির মত নানা বিশিষ্ট সুরের খাতে প্রবাহিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি বর্তমান কাল পর্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সবগুলির প্রেরণা বা উৎস এক নহে।

ইহা কোথাও হইতেছে বাউল, মালসী, সঙ্কীর্ণার্থে কীর্তন, দেহতত্ত্বাদির মত নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ কি সাধনার ক্রম; কোথাও বা শাড়ি, ভাটিয়ালী প্রভৃতির মত বিশেষ স্থানের বা বিশেষ শ্রেণীর নিজস্ব ভাবধারা ও ঐতিহ্যানুবর্তী প্রকাশ।

গীতিপ্রধান ও আখ্যায়িকাপ্রধান ধারা দুইটির মধ্যে মুখ্য পার্থক্য হইতেছে এই যে গীতিপ্রধান ধারাটি আখ্যায়িকাপ্রধান ধারার মত অতখানি পরিবর্তনসহ ও নমনীয় নহে। এই কারণে ইহাকে অবিমিশ্র গীত নামেও অভিহিত করা যায়। গীতিপ্রধান বা অবিমিশ্র গীতধারার প্রাণবস্তু হইতেছে বিশিষ্ট সুরপ্রবাহ। কোন বিশেষ সুরের পাথরে খোদাই নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইতেছে গীতের এই নির্ঝরিণী নির্দিষ্ট ভাববস্তুরূপ উৎসের প্রাচুর্য বা দৈন্য বহন করিয়া অর্থাৎ এই গীতধারা কখনও প্রবল, কখনও ক্ষীণ হইয়াছে বটে, কিন্তু কদাপি পথান্তর বা বিষয়ান্তর গ্রহণ করে নাই। ইহার রস আস্বাদন করিতে হইলে নির্দিষ্ট ভাব ও রূপের খাত ধরিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, ইচ্ছামত যে কোন দিকে খাল কাটিয়া ইহার মোড় ফিরান যাইবে না। বাউল, মালসী, ভাটিয়ালী, সঙ্কীর্ণার্থে কীর্তন প্রভৃতি এই জাতীয় গীতিপ্রধান বা অবিমিশ্র গীতধারার উদাহরণ।

পক্ষান্তরে আখ্যায়িকাপ্রধান ধারা হইতেছে অনেকটা বালুমাটিতে প্রবাহিত পদ্মার ধারার মত, প্রয়োজনে নিয়ত পথ পরিবর্তন করিয়া চলাই যেন তাহার স্বভাব। গীত এই শ্রেণীর মধ্যেও আছে এবং এই দিক হইতে ইহাকে আখ্যায়িকা-মিশ্র-গীত এই নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে। আসল কথা হইতেছে এই যে কোন একটি নির্দিষ্ট ভাব ও সুরের মধ্যে না থাকিয়া ইহার মূল আবেদন থাকে মুখ্যতঃ আখ্যায়িকার ধারাবাহিক বা বিচ্ছিন্ন বর্ণনা ও বিন্যাসের মধ্যে। কাহিনীর প্রয়োজনে বিষয়বস্তুর দিক দিয়া এই ক্ষেত্রে যেমন যে কোন জনপ্রিয় নূতনত্ব সংযোজনের স্বাধীনতা অবাধ, তেমনি গীতের ও সুরের দিক দিয়াও ইহা কোন বিশিষ্ট সুরের ধারক ও বাহক না হওয়ায়, সুবিধা ও সাধ্যমত যে কোন সুর গীতের যেমন খুশি, যতটুকু খুশি সাহায্য গ্রহণ করার পথও ইহাতে মুক্ত। ভাব ও রূপের অবাধ গ্রহণ, বর্জন, মিশ্রণ আখ্যায়িকাপ্রধান ধারার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। পাঁচালী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঁচালীতে ধারাবাহিক আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। কবি, হাফআখড়াই, ঢপ প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত। অবশ্য কবি বা হাফআখড়াই প্রমুখ গানে বহু খণ্ডিত কাহিনীর টুকরা বা তাহার আভাস ও সংস্কার থাকিলেও ধারাবাহিক কোন আখ্যায়িকা নাই। কিন্তু ইহার নির্দিষ্ট রেখাবদ্ধ ভাবরূপের মধ্যে বিভিন্ন সুরগীতের সংমিশ্রণ ও সংযোজনের অবাধ সুযোগ থাকায় এবং ইহা একটি-মাত্র বিশেষ ভাবমূলক সুরের বাহক না হওয়ায়—অর্থাৎ মুখ্যতঃ পরিবর্তনসহতার ও নমনীয়তার দিক হইতেই কবি, হাফআখড়াই প্রভৃতিকে আখ্যায়িকাপ্রধান শাখার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

গীতিপ্রধান ও আখ্যায়িকাপ্রধান এই দুইটি ধারার মধ্যে আপেক্ষিক তারতম্য থাকিলেও গীতের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। কিন্তু এই সময়ে সৃষ্ট আবৃত্তিমূলক বা তানপ্রধান কতগুলি ছড়ার বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এইগুলি সুর-তালে গীত হইত না, আবৃত্তি করা হইত। সাহিত্যের মুখ্য ধারার সহিত ততখানি সম্পর্কযুক্ত না হইলেও বস্তুবিবৃতির দিক হইতে বা ঐতিহাসিক বিষয়বিচারে ছড়ার গুরুত্ব নিতান্ত তুচ্ছ নহে। বরঞ্চ বলা চলে ছড়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম আদিম উপাদান। হয়ত পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্যের মূলেই প্রাথমিক প্রয়াস ও উপাদান হিসাবে নানাপ্রকারের ছড়া জাতীয় পদ্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। বাঙ্গালা সাহিত্যের মূলেও ছড়ার সংখ্যাল্পতা নাই। ডাক ও খনার বচন, ব্রতকথা ও মেয়েলী ছড়া ইত্যাদি এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য সময়ের ছড়াগুলির মধ্যে একটি বিশেষ রূপের ও ভঙ্গির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সময়ের অধিকাংশ ছড়াই অচিরকাল-ঘটিত কি সমসাময়িক কোন ঘটনার বিবরণ লইয়া রচিত। পুরাতন কাহিনী ও ধর্মবিশ্বাস এই সময়ে স্থানীয় দেবদেবীর মধ্যে নূতন ভাবে কি আকার পাইয়াছিল, তাহার কিছুটার সন্ধান এই ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান এবং বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে উহার যথেষ্ট মূল্য আছে। ভূমিকম্পের ছড়া, রাধামোহন সিরেস্তাদারের কীর্তি, চৌধুরীর লড়াই, নদীর পাঁচালী, রাস্তার ছড়া প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি পুঁথি[১] ছাড়াও

১। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ।

বিভিন্ন পত্রিকাতে[১] এই জাতীয় কিছু কিছু ছড়ার সংগ্রহ বাহির হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।[২]

ছড়া সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। বিবৃতিমূলক বলিয়া আখ্যায়িকা-প্রধান ধারার সহিত ছড়ার সহজ সম্পর্ক ছিল। কবিগানে ছড়া ছিল একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে এবং ক্রমশঃ জনরুচির অনুবর্তনে কবি হইতে পাঁচালীতে সংক্রামিত হইয়াছিল। কিন্তু হাফআখড়াইতে ছড়া যুক্ত হয় নাই।

যাহা হউক ইংরাজী-প্রভাববর্জিত জনসাহিত্য ও ইংরাজী-প্রভাবপুষ্ট নূতন সাহিত্যের দ্বৈরথ সংগ্রামের মধ্যে জনসাহিত্যের পক্ষে পুরোভাগে আসিয়াছিল মুখ্যতঃ আখ্যায়িকাপ্রধান ধারার রক্ষিদল। ইহার প্রধান কারণ এই যে গীতিপ্রধান ধারার মত আখ্যায়িকাপ্রধান ধারা রক্ষণশীল ও কোন অবিমিশ্র বিশিষ্টতার ধারক ছিল না। দীর্ঘস্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষায় উহাদের মধ্যে জৈবলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পারিপার্শ্বিকের অনুগত হইয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন ও প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট, প্রবল ও দীর্ঘজীবী করিবার অবিরাম প্রচেষ্টাকে জীবনের সাধারণ ধর্ম বলা যায়। আলোচ্য ইংরাজী-প্রভাববর্জিত আখ্যায়িকাপ্রধান শাখা কয়েকটির মধ্যেও পরিবর্জন, পরিবর্ধন ও সংমিশ্রণ দ্বারা পরিবর্তন ও রূপান্তর গ্রহণের বিপুল প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে ইহাদের সকলের মধ্যেই মিশ্ররূপ ও সমন্বয়ী সুর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘ

ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া এই মিশ্রণ বা সমন্বয়ের গুরুত্ব অত্যধিক, কাজেই প্রথমতঃ ইহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। ভাব ও বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিলে এই শতবৎসরের ইংরাজী-প্রভাবমুক্ত বাঙ্গালা সাহিত্যকে দুইটি বিশেষ স্বতন্ত্র ধারায় ভাগ করা যায়। একটি

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতি।

২। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯৪৯-৯৫৭।

ধর্মমূলক, অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় ধারাকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। ইহার প্রথমটি বৈষ্ণব পদাবলী অর্থাৎ রাগানুগা সমাজবিরোধী ভক্তির ধারা, এক কথায় রাধাকৃষ্ণের কথা বা "সৌন্দর্যের গান।"[১] দ্বিতীয়টি লৌকিক মঙ্গলকাব্যাদির দেবীমহিমাত্মক বৈধী ভক্তির ধারা, মুখ্যতঃ কালীকীর্তন, এক কথায় রামপ্রসাদী সঙ্গীতের ধারা বা "সমাজের গান।"[১] তৃতীয়টি নাথপন্থী যোগীদের ধর্ম ঠাকুরের এবং অংশতঃ সন্ন্যাসী শিবের গান অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত দুঃখবাদের গান, এক কথায় সমাজ-সংসার বিরাগী বাউল সঙ্গীতের ধারা বা "শুধুই মড়া কান্নার গান।"[২] আর ধর্মনিরপেক্ষ ধারার মধ্যে দেখা যায় নরনারীর পরস্পরের মধ্যে প্রতীকনিরপেক্ষ স্পষ্ট সরাসরি প্রেম প্রকাশের কথা।

বৈষ্ণব পদাবলী অথবা তাহার পূর্ব হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে মানুষের নিজের হৃদয়ের কথা, প্রেমের কথা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি ফুটিয়া উঠে নাই। মুখ্যতঃ রাধাকৃষ্ণাদির মাধ্যমে এবং গৌণতঃ দেবমহিমা কীর্তনের ফাঁকে ফাঁকে, ভক্তজীবনী বর্ণনায় মানুষের জীবনের কথা, হৃদয়ের কথা, প্রেমের কথা কিছুটা স্থান পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৈষ্ণব কবিতায়, "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান"—বলিয়া যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যাসুন্দর পালাতে যেখানে বিদ্যা ও সুন্দর পরস্পরকে প্রেমনিবেদন করিয়াছে, সেই প্রেম প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে দৈবী মহিমার কোন প্রভাব দেখা যায় কি? এই প্রেম কালী আরাধনার অঙ্গ বা রূপক এরূপ বলা যায় কি? অবশ্য এ প্রেম কালীর প্রশ্রয় প্রাপ্ত ও কালী ভক্তির বেড়াতে ইহার দুঃসাহসিকতা সুরক্ষিত। কিন্তু এই প্রেমের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে মানবের অসংস্কৃত রূপতৃষ্ণারই বাণী শোনা যায়। তাহা হইলেও ভারতচন্দ্র কিন্তু ইহাকে দেবমহিমা-সংস্রবশূন্য করিয়া প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। তবে ইহাও ঠিক যে বিদ্যাসুন্দরে

১। "হরপার্বতীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান।"—লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, ২য় সং, পৃঃ ৬২।

২। "বাউলের গানে নিছক বৌদ্ধভাব। বাউল শুধুই মড়াকান্না গাহিয়া বিরাগ জন্মায়।"—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত সাধক রামপ্রসাদ প্রবন্ধ।

সংশ্রবসূত্র ক্ষীণতর হইয়া উঠিয়াছে, এবং যে পরিমাণে এই সংশ্রব ক্ষীণ হইয়াছে, সেই পরিমাণে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লৌকিক কাব্যে বারমাস্যা জাতীয় অংশে মানুষের হৃদয়ের কথা অনেকখানি স্পষ্ট ও সরল হইলেও তাহা একান্ত ভাবে গতানুগতিক এবং কাহিনীর বিশেষ পরিবেশের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত নহে।

কিন্তু স্থূল ও অমার্জিত রুচিসম্পন্ন জনসাধারণের মধ্যে প্রতীক-নিরপেক্ষ সরাসরি হৃদয়াবেগের কথা, অর্থাৎ বিরহমিলনাত্মক প্রেমের কথা ভারতচন্দ্রের পূর্ব হইতেই যে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অনুমান করা চলে। বিদ্যা সুন্দরকে যে খেঁড়ু গানের প্রলোভন দেখাইয়াছিল,[১] সেই খেঁড়ু বা "খেউড়" গানই খুব সম্ভব বাঙ্গালাতে প্রেমিক প্রেমিকার সরাসরি হৃদয়াবেগ প্রকাশের প্রথম নিদর্শন। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে এই গীতের কোন নির্ভরযোগ্য প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে কবিসঙ্গীতের মধ্যে ইহাই একদিকে বিরহ এবং অন্যদিকে খেউড়, লহর, কবির টপ্পা ইত্যাদি এই দুই শাখায় যথাক্রমে মার্জিত ও অমার্জিত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবির খেউড় গানের নমুনা দেখিয়া এই মাত্র অনুমান করা যায় যে খেঁড়ুগানের আদিম রূপ অত্যন্ত স্থূল আদিরসাত্মক ছিল।

নানা পল্লীসঙ্গীতের মধ্যেও সরাসরি প্রেমের আবেদন শোনা যায়। পাঁচালীর বিষয়বস্তুতে অর্থাৎ নলিনী ভ্রমর, বিরহ প্রভৃতি পালাতে, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা গানে, আখড়াই, হাফআখড়াই গানের প্রণয়-গীতি ও প্রভাতী অংশে এবং সর্বোপরি টপ্পা গানের মধ্যে মানুষের সরাসরি প্রেম প্রকাশের ধারা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বহিয়া আসিয়া আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের মোহানায় প্রবল বেগে ও বিপুলাকারে মিলিয়াছে।

ধর্মীয় ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় শাখা দুইটি অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধারা ও মঙ্গলগীতাদি লৌকিক কাব্যের ধারা, এক কথায় বৈষ্ণব ধারা ও শাক্ত ধারা, অনেকক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী-ভাবাপন্ন হইলেও একে অন্যের গতি ও বৃদ্ধিকে কখনও ব্যাহত করে নাই। অধিকন্তু ইহারা পরস্পর

১। "নদেশান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।"

পরস্পরের অনুপ্রেরণা স্বরূপ হইয়া দীর্ঘদিন হইতেই পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে।[১] স্মরণযোগ্য যে এইখানে আমরা ইংরাজী-প্রভাববর্জিত সমগ্র অবিভক্ত ধারাটির ভাব ও বিষয়বস্তু লইয়াই আলোচনা করিতেছি। যাহা হউক, তারপর কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতার মাত্রা হ্রাস পাইয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ মীমাংসার মনোবৃত্তি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যাদি বৈষ্ণব বন্দনায়; অনুবাদ সাহিত্যে রামচন্দ্রাদির চণ্ডীপূজা ও তরণীসেনাদির বৈষ্ণবীয় ভক্তিতে; রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গীতে কৃষ্ণকালী প্রমুখ পালার জনপ্রিয়তার মধ্যে ইহার প্রচুর নিদর্শন মেলে। অষ্টাদশ শতকে এই সমন্বয় বা মিলন আরও গাঢ় হইয়াছিল। রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলীর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়া ও প্রভাব সুস্পষ্ট। আর এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে এই ক্ষেত্রে প্রভাব কেবল পূর্বের মত ঘটনাবিশেষ কি বস্তুবিশেষের গ্রহণ ও সংস্থানের মধ্যে বহিরঙ্গ ভাবে পড়ে নাই,—ইহা একেবারে কবির অন্তরে ভাবপ্রেরণার মধ্যে অন্তরঙ্গ রূপ গ্রহণ করিয়া সক্রিয় ভাবে কাজ করিয়াছে।

বর্জন হইতে গ্রহণের প্রয়োজন ও প্রয়াস অধিক বলিয়া সাধারণ মানুষের মন ভাবাবেগচঞ্চল ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লেষধর্মী ও সমন্বয়মুখী। বুদ্ধি দ্বারা আবেগ সংযত ও রুদ্ধ হইলে পর মনে বিশ্লেষণাত্মক ধর্ম জাগ্রত হয় এবং বিভেদ, বর্জন, বিরোধ সম্বন্ধে মন সচেতন ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই কারণেই জনসাধারণের মধ্যে মিশ্রণের, গ্রহণের, সমন্বয়ের বেগ বেশী; বুদ্ধির ভেদ দৃষ্টি হইতে হৃদয়ের মিলন-তৃষ্ণা অধিকতর বেগবতী।

১। "Baisnavism never disturbed seriously the uninterrupted course of Bengali literature from the earliest time down to the 18th century. Side by side with Baisnava songs and by lyrics flourished the traditional Chandi-poems, Manasa gan, Dharmamangal, Sibayana, which in form and spirit bear little kinship with Baisnava productions and which affiliates itself with earlier and later poetical literature of Bengal."—History of Bengali Literature in the 19th Century, Dr. S. K. De, p. 449.

আলোচ্য সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার ও বিচিত্র পরিবেশের কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই সময়ে উচ্চস্তরের কোন সাহিত্যরস আস্বাদনের মত অনুকূল মানসিক অবস্থা ছিল না। এই অনিশ্চয়তা ও শুষ্কতার মধ্যে সহসা উত্তাল হইয়া উঠিল প্রসাদী-সঙ্গীতের গভীর হৃদয়াবেগসমৃদ্ধ বিপুল ভাববন্যা। বাঙ্গালী সাধারণের হৃদয়ে ইহার প্রভাব অসামান্য। রামপ্রসাদী গীতের মৌলিক আবেদন মূলতঃ সমন্বয়ী, সম্প্রদায়বিদ্বেষবর্জিত ও সংশ্লেষধর্মী বলিয়া ইহার প্রভাবও গৌণভাবে বাঙ্গালীর সমন্বয়মুখী মনোবৃত্তির পরিপোষক হইয়াছিল। এই হৃদয়াবেগ ও সমন্বয়মুখী মনোভাবের তরঙ্গ উনবিংশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে।

এই সমন্বয়মুখিতার অন্যান্য কারণও থাকা সম্ভব। প্রথমতঃ, অবিমিশ্র আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার মত উচ্চ কবিপ্রতিভা উদ্ভবের অনুকূল পরিবেশ তখন কোন স্বতন্ত্র ধারার মধ্যেই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজীপ্রভাবপুষ্ট সাহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ইহার স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিকাপ্রধান গীতির পরিবর্তন ও সংযোজনমুখিতার মধ্যে। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে তখন শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, বাঙ্গালী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই সমন্বয়ের উদ্যম ও প্রয়াস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্ম সংস্কার প্রচেষ্টা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার মূলে একদিকে যেমন ছিল খ্রীষ্টধর্ম হইতে আত্মরক্ষার প্রেরণা, অন্যদিকে তেমনি ছিল নূতন পরিবেশের সহিত যথাযথ সামঞ্জস্যবিধান করিয়া লইবার প্রয়াস।

অবশ্য সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মধর্মের সমন্বয় প্রয়াস ও রামপ্রসাদের সমন্বয়মুখিতা ঠিক এক শ্রেণীর নহে। এই কারণে ব্রাহ্মধর্মের সমন্বয় প্রয়াস কোন প্রাচীনতর সমন্বয়পন্থী কবিই সহানুভূতির চোখে দেখেন নাই, অধিকন্তু ইহাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করিয়াছেন। আসল পার্থক্য হইল রামপ্রসাদের সমন্বয় ছিল দুই বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী গৌরবময় হিন্দু ভাবধারারই মিলন; আর ব্রাহ্মধর্ম চাহিয়াছিল অহিন্দু আচার-সংস্কারের সহিত আপোষ

বিধান করিতে। যাহা হউক অতঃপর ইহাই পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" মতবাদের মধ্য দিয়া ধর্ম ব্যাপারে মহাসমন্বয় সাধন করিয়াছিল।

মোট কথা, বাঙ্গালা জনসাহিত্যের বা ইংরাজীপ্রভাববর্জিত সাহিত্যের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটি ধারার সংমিশ্রণ ও সমন্বয় স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ভবানীবিষয়ক গীত ও সখীসংবাদ এই দুইটি কবি গাহনার অন্যতম অঙ্গ এবং যথাক্রমে ইহারা শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারার উপাদান লইয়া গঠিত। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে এই সময়ে কবিগানের প্রারম্ভে প্রচলিত কীর্তনের চালে গৌরচন্দ্রিকা না হইয়া ভবানীবিষয়ক গীত গাওয়া হইত। ইহার কারণ বিচার্য। মোটামুটি ভাবে ইহাকে তদানীন্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের প্রভাবহ্রাসের লক্ষণ বলিয়া অনুমান করা চলে কি? ভূমিকার ভবানী প্রশস্তি অন্ততঃ শাক্তধর্মের প্রবলতর প্রভাবের সাক্ষ্য। সখীসংবাদের প্রবর্তন কতখানি ধর্মের খাতিরে, আর কতখানি প্রেমের খাতিরে তাহা লইয়া তর্ক থাকিলেও ধর্মবিশ্বাসে মিশ্র-শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যে এই সংমিশ্রণ রীতি গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অনেকটা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যায়।

যাহা হউক, নূতন পদ্ধতির পাঁচালীতেও বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তাহার বিন্যাসবৈচিত্র্যের মধ্যে এই সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ইহার ছাপ অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, যখন নূতন পদ্ধতির পাঁচালী কবিগাহনার ঢং অনুসারে আরও খানিকটা পরিবর্তিত হইয়াছিল।[১] কালীয়দমন যাত্রা, চণ্ডী যাত্রা প্রভৃতিও মোটামুটি একই বিষয় প্রমাণ করে। আখড়াই সঙ্গীত মালসী অর্থাৎ দেবীবিষয়ক গীত দিয়া আরম্ভ হইত, আর প্রণয়সঙ্গীত ও প্রভাতী দিয়া শেষ হইত। প্রণয়সঙ্গীতের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আভাস পাওয়া যায়। হাফআখড়াই গাহনার ক্রম কবিগানের প্রায় সমান। সুতরাং এই সময়কার ইংরাজীপ্রভাববর্জিত সাহিত্যের প্রধান শাখাগুলির মধ্যে এই সমন্বয় বা সংমিশ্রণ একেবারে অপরিহার্য হইয়া

১। মনোমোহন গীতাবলী (১৮৮৭), পৃঃ ১৬১।

উঠিয়াছিল বলা যায়। এই বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে কেবল গাহনার রীতি, বিষয়বস্তু নির্বাচন ও গীতের সুরাদিতেই নহে, বাদ্যযন্ত্রাদির ব্যবহারেও এই মিশ্রণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কীর্তন গানের মৃদঙ্গ ও মন্দিরার একাধিপত্য কবিগানে ছিল না। সেখানে "ঢাকের ছোট ভাই ঢোল" ও কাঁসিকে অগ্রাধিকার ছাড়িয়া দিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরাদিকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছিল।[১] পাঁচালী ও অন্যান্য গীতের যন্ত্রাদি ব্যবহারের মধ্যেও উহার সাক্ষ্য মেলে।

বৌদ্ধভাব-প্রভাবিত গান সমাজবিরোধী ও সৌন্দর্যভোগবিরোধী ধারা; কাজেই সাধারণভাবে উহা সমাজ জীবনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ খাতে তির তির করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। জীবন দুঃখময়, সংসারে কদাচ শান্তি মেলে না, কাজেই এই অসার সংসার ত্যাগ করিয়া, বৈরাগী হইয়া নির্বাণ অনুসন্ধানে যাইতে হইবে; তাহাই পরম শান্তি ও চরম আশ্রয়। কিন্তু এই ধরণের নীরস, শুষ্ক, সর্বরিক্ত নির্বাণের আদর্শ বাঙ্গালী সমাজকে, বাঙ্গালীর রসলিপ্সু প্রেমিক অন্তরকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। বাউল বাঙ্গালীকে আকৃষ্ট করিয়াছে ক্ষণিকের একক সঙ্গীতে। সারারাত্রি ব্যাপিয়া আসরে বসিয়া দলবদ্ধ অবিরাম বাউল গীতে, চরম বৈরাগ্য ও পরম নির্বাণের গানে বাঙ্গালী শ্রোতৃ-সাধারণ কোন আকর্ষণ বোধ করে নাই। কারণ ক্ষণভঙ্গুর সংসারের বালুচরে মুহূর্তস্থায়ী জীবনের চকিতালোকে সুন্দরকে ভোগ করিবার আকণ্ঠ তৃষ্ণা, গভীরভাবে ভালবাসিয়া প্রিয়জনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবার, সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় বাঙ্গালীর ভাবধর্মের

১। কবিগানে ঢোলের সঙ্গত সম্বন্ধে 'প্রাচীন কবি' প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন: "তৎকালে (গোঁজলা গুঁইর সময়ে) টিকেরার বাদ্য সঙ্গত হইত।............এই তিন জন (লালু নন্দলাল, রঘু, রামজী) পুরাতন কবিওয়ালা। ইহাদের সময়ে কাড়ার 'বাদ্যে সঙ্গত' হইত। হরুঠাকুর প্রভৃতির সময়ে যোড়খাই, তৎপর ঢোলের সঙ্গত আরম্ভ হইল।"—সংবাদ প্রভাকর, ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬১, পৃঃ ৪।

মহাধমনীস্বরূপ। এই কারণেই বাঙ্গালীর জনপ্রিয় সাহিত্যে শ্মশানচারী বৈরাগী মহেশ্বরকে গৌরীর হাত ধরিয়া সংসার পাতিতে হইয়াছে, "নিবাত নিষ্কম্প ইব প্রদীপঃ" মহাযোগীর গান তুচ্ছ দাম্পত্য কলহে অমর হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমমাধুর্যে মুগ্ধ হইবার অন্যতম কারণও ইহাই। দুঃখকে মোটেই উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, কেবল নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হইয়াছে, অর্থাৎ দুঃখকে সংসারের একমাত্র বস্তু না জানিয়া 'সুখ দুঃখ দুটি ভাই' করিয়া দেখা হইয়াছে। রামপ্রসাদের সঙ্গীতে দুঃখবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন যাহা বলিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য: "বাউলের গানে নিছক বৌদ্ধভাব। বাউল শুধুই মড়াকান্না গাহিয়া বিরাগ শিখায়।"......বাউলের সুরের দুঃখবাদ ও রামপ্রসাদের দুঃখবাদে এই প্রভেদ। বাউল মানুষকে জীবনের প্রতিপদে শত দুঃখ দেখাইয়া শ্মশানের নির্বাণটাকে শেষাশ্রয় মনে করিয়াছে, রামপ্রসাদের দুঃখবাদে সংসারের শত দুঃখের প্রতি ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা যে মাতৃপাদপদ্মে শরণ লইলে দূর হয়, তাহা জোরের সহিত বলা হইয়াছে।[১]

স্থূলতঃ দীনেশচন্দ্রের বক্তব্যটির মধ্যে খানিকটা সত্য থাকিলেও এই সম্বন্ধে একটু মন্তব্য করা প্রয়োজন। বাউল ও রামপ্রসাদের পার্থক্য বিচারের সিদ্ধান্তটি সার্বিক সত্য নহে, আংশিক সত্য। কারণ আমরা রামপ্রসাদের অকুতোভয়তার সঙ্গে তাঁহার বৈরাগ্য ও "এ সংসার ধোঁকার টাটি" ধরণের প্রচার অর্থাৎ সংসারস্পৃহার অভাবটাও শিখি এবং হয়ত শেষেরটাই বেশী করিয়া শিখি। রামপ্রসাদের এই সংসারবিমুখিতার মধ্যে বাউলের ভাব প্রচ্ছন্ন আছে কি না কে জানে? যাহা হউক, মোট কথা এই যে সামগ্রিক ভাবে বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ মনকে বাউল গান আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, বাউল গানের কোন সাহিত্যিক কি স্বরূপগত মূল্য নাই। স্বীয় সাম্প্রদায়িক পরিবেশে বাউল গীতের উদ্ভব ও প্রভাব সর্বদাই ছিল, কিন্তু সাহিত্য ও সমাজে তাহা প্রসারিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতকের শেষ হইতে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বাউল গানের

১। 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চমৎকারিত্ব ও অতীন্দ্রিয় আবেদনের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলে সাম্প্রদায়িক বাউল দরবেশ ছাড়াও সেই সময়ে অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান বাউলগান রচনা করিয়া গিয়াছেন।[১] যাহা হউক, এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই সব নানা কারণে বাউল গানের ধারাটির কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব আলোচ্য কালের জনসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ধারার রূপ গ্রহণ করে নাই।

অতএব দেখা গেল যে বৈষ্ণব, শাক্ত ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রেমের তিনটি স্বতন্ত্র ধারাই তদানীন্তন ইংরাজীপ্রভাববর্জিত বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রগামী যোদ্ধদলে অর্থাৎ মুখ্যতঃ আখ্যায়িকাপ্রধান গানের মধ্যে মিশ্রিত ও সংযুক্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই সংমিশ্রণ বা সমন্বয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ও নবজাগ্রত ইংরাজী-প্রভাবপুষ্ট সাহিত্যের সার্থক বিরোধিতা। অবশ্য ইহার মধ্যেও রুচির ইতরবিশেষে কিছুটা শ্রেণীবিভাগ দেখা দিয়াছিল এবং তাহা দেওয়াই স্বাভাবিক। কবিগান সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন: "বিশিষ্ট জনেরা ভদ্র গানে এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত"।[২] এই 'ভদ্র গান' অর্থ সখীসংবাদ ও বিরহ।[৩] কবিগানের বিরহ গীতের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১। 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ' নামে হরিনাথ মজুমদার (সঙ্গীতসার সংগ্রহ ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৮): মনোমোহন বসু (মনোমোহন গীতাবলী, পৃ. ২০৫) প্রভৃতির বাউল গান দ্রষ্টব্য।

২। সংবাদপ্রভাকর, ১২৬১, ১লা অগ্রহায়ণ।

৩। "এমত জনরব যে বসন্তকালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি (নিতাই বৈরাগী) সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছিলেন। তাবৎ ভদ্রই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃপুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, 'হাদে দেখ লেতাই ফ্যার যদি কালকুকিলির গান ধল্লি তো দো' দেলাম—খাড় গা।' নিতাই তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহাদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।"—সংবাদপ্রভাকর, ১২৬১, ১লা অগ্রহায়ণ, পৃ. ৬।

পাঁচালীর মধ্যেও এই তিনটি ধারার মিশ্রণের সমর্থন পাওয়া যায়। কৃষ্ণায়ন ও রামায়ণের সহিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক রচনা পাচালীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবল বিষয় নির্বাচনে নহে, দাশরথির পাঁচালীতে বৈষ্ণব ও শাক্তদের মৌলিক অভিন্নতা প্রকাশক, 'শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব' নামে একটি স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ পালাই পাওয়া যায়। নরনারীর প্রেমের সরাসরি প্রকাশও পাঁচালীতে অপ্রতুল নহে। কবিসঙ্গীতের বিরহ গানের মত পাঁচালীতেও বিরহ পালা আছে। 'নলিনীভ্রমর কাহিনী' ইহারই রূপভেদ মাত্র। আখড়াই ও হাফআখড়াই গানে প্রণয়সঙ্গীতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দাশরথি পাঁচালীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন :

"সাধুর সন্তাপদূর জন্য যত সুমধুর সারতত্ত্ব হইল যোজন।
শ্রবণেতে জীবমুক্ত, ভারতী ভারতউক্ত, শ্রীগোবিন্দলীলানুকীর্তন॥
অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ, পরে কিছু অপরপ্রসঙ্গ।
প্রেমচাঁদ প্রেমমণি প্রেমবিচ্ছেদের বাণী রসিকরঞ্জন রসরঙ্গ"॥[১]

এই 'অপর প্রসঙ্গ' একাধারে বিরহ ও খেউড় গানের সমন্বিত রূপ। গুপ্ত কবি কথিত 'বিশিষ্ট' আর 'ইতর জন' আলাদা না হইয়া এক্ষেত্রে এক 'রসিক'-রূপের মধ্যেই মূর্ত হইয়াছে। কবিগানের বিরহ গীতের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা এবং পাঁচালীতে 'রসিকরঞ্জনের' প্রয়োজনীয়তার তাৎপর্য গভীর ও সুদূরপ্রসারী। কারণ পরবর্তী কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে মানুষের সরাসরি হৃদয়প্রকাশের ধারাটি যে ধীরে ধীরে অন্য সব ধারাকে গ্রাস করিয়া নূতন ও বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার আংশিক কৃতিত্ব যে ইংরাজী-প্রভাববর্জিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারার মধ্যেও নিহিত, সেই সত্যের ইঙ্গিতটি এইখানে সুস্পষ্ট।

৬

ইংরাজীপ্রভাববর্জিত এই মিশ্র সাহিত্যকে কবি, নূতন পদ্ধতির পাঁচালী, আখড়াই—মোটামুটি এই তিনটি মুখ্য ধারায় বিশ্লিষ্ট করা যায়। ভাব ও

১। দাশরথি রায়ের পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ২।

বিষয়বস্তু, গাহনার ক্রম ও ঢং, গীতের সুরতাল, আসরে গায়কদলের সংস্থান, উৎকর্ষবিচারের মান এবং বাদ্যযন্ত্রাদির ব্যবহার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি—এক কথায়, ইহার সম্পূর্ণ প্রয়োগপদ্ধতি আর সেই সঙ্গে কখনো শ্রোতৃমণ্ডলীর পার্থক্যাদি বিচার করিলেও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই ধারা তিনটির উৎস ও পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করিলে বক্তব্য বিষয় স্পষ্টতর হইবে মনে করিয়া সংক্ষেপে উহা আলোচনা করিতেছি।

চ

কবি, নূতন পদ্ধতির পাঁচালী ও আখড়াই এই মুখ্য তিনটি শাখার মধ্যে কবিগান অগ্রজ এবং আখড়াই কনিষ্ঠ। কবিগান কবে, কাহা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এই সম্বন্ধে প্রচলিত নানা মতের মধ্যে প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

[ক] গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন: "১৪০ বা ১৫০ বর্ষ বিগত হইল গোজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেসাদারী দল করিয়া ধনীগৃহে গাহনা করিতেন।"[১]—এই মতানুসারে ১১১২ সালে (১৭০৫ খ্রীঃ) কবির অস্তিত্ব ছিল বুঝা যায়।

[খ] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন: "The Kavi songs had originally constituted part of old Yatras or popular plays. The simple episodes in Yatras, especially those of the nature of light opera, were in course of time wrought into a separate class of songs, which were sung by those distinct bodies of professional bards called Kaviwallas, whose domain was thus completely severed from that of the Yatra parties."[২]

১। সংবাদপ্রভাকর, ১লা, অগ্রহায়ণ, ১২৬২।

২। History of Bengali Language and Literature—D. C. Sen, p. 679.

অন্যত্র : "কবিগণ প্রথমে দাঁড়া কবি নামে পরিচিত ছিলেন, আসরে দাঁড়াইয়া কবিরা কবিতা প্রস্তুত করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘু, মতে, নন্দ এই তিনজনই সর্বপ্রথম কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহারা বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর লোক।"[১] —দীনেশচন্দ্র তাঁহার অনুমানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। বাঙ্গালা একাদশ শতকের শেষের দিক হইলে ইংরাজী সপ্তদশ শতকেরও শেষ অংশ হয়। গুপ্তকবি অষ্টাদশ শতকের প্রথম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাজেই ইহাদের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নহে।

[গ] ডঃ সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন : "The existence of Kavi songs may be traced to the beginning of the 18th Century or even beyond it to the 17th, but the most flourishing period of the Kaviwallas was between 1760 and 1830."[২]

ডঃ দে কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় গুপ্ত কবির নির্দিষ্ট কালকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

[ঘ] ১৩১৩ সালে 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকার আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায় ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় লিখিত "কবিগানের উৎপত্তি" প্রবন্ধে কয়েকটি মতের আলোচনা আছে। উহাতে মুর্শিদকুলি খাঁর কালে কবি গানের উৎপত্তি হইয়াছে এমন কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উল্লেখ করা হয় নাই। যদুনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত "সীতারাম রায়" গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে সীতারামের সময়ে কবিগান হইত। সান্যাল মহাশয়ের মতে রঘুর সময় আসরে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে কবিতা প্রস্তুত করিবার নিয়ম প্রচলিত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতেছে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ আর সীতারাম রায়ের কাল হইতেছে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ। কাজেই গুপ্ত কবির অনুমান হইতে ইহার পার্থক্য খুব বেশি নহে।

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৬৩৬।

২। Bengali Literature in the 19th Century—Dr. S. K. De. p. 302.

[ঙ] ১৩১২ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় আনন্দচন্দ্র মিত্র কবিগান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে: "অভিনয়বিহীন গানের পালা ফলদায়ক করিতে হইলে গানের মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব, রসিকতা এবং লোকচরিত্র ও স্বভাবদর্শনের পরিচয় না থাকিলে চলে না। এই জন্য এই গানের নাম কবিগান।"—ইহাতে মিত্র মহাশয় কেন কবিগান বলা হয় তাহাই মাত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উদ্ভবের কোন সময় বা কারণাদি নির্দেশ করেন নাই।

[চ] সেকালের আমোদপ্রমোদ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থসংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রে (মাঘ, ১৭৮০ শক) লিখিয়াছেন যে কবিগানের প্রাদুর্ভাব হয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এবং "তাঁহার উৎসাহে যে খেউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারমাস বর্ণনে তাহার সম্যক প্রমাণ দিয়াছেন। ঐ খেউড় ও কবি যে কি প্রকার জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতা রক্ষা করিয়া বলাও দুষ্কর।"—এই অনুমানের পক্ষে তাঁহার প্রমাণ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ও গোপালভাঁড়ের রসিকতার স্থূলত্ব। এইখানে খেউড় ও কবি প্রায় একার্থেই ধরা হইয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

[ছ] "বোধহয় পাঁচালীর দাঁড়াকবি ও কাটনদারের অনুকরণে কবিগানের উৎপত্তি।"—এই মন্তব্য করিয়াছেন কুমুদবন্ধু সেন তাঁহার 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকে। কিন্তু মন্তব্যটিকে তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলেন নাই। মনে হয় প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালীতে মূল গায়েন দাঁড়াইয়া যে আবৃত্তি করিতেন, তাঁহাকেই তিনি দাঁড়াকবি ও কাটনদার বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালীর প্রাচীনত্বের কথা ভাবিয়া কবিগান তাহা হইতে উদ্ভূত মনে করিয়াছেন।

[জ] গঙ্গাচরণ বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন: "কালক্রমে সেই মহনীয় আখড়াই সঙ্গীতসংগ্রামকে কবির লড়াই করিয়া ফেলিল।............ কলিকাতায় ওস্তাদি কবির গান ও আখড়াই সঙ্গীত দুইই চলিত।............ কিন্তু বিলাসী ধনীগণ ঢোলের স্থলে ঢোলক ও কাঁসির স্থলে মন্দিরা চালাইলেন এবং দাঁড়াইয়া গানের পরিবর্তে বসিয়া গান করিতে লাগিলেন।.........

সুতরাং এই রীতি প্রচলিত হওয়ায় ব্যবসায়ী কবিদলের গান তখন হইতে 'দাঁড়াকবির গান' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পৃথক আকারে চলিতে লাগিল।"[১]—এই মতে সময়ের সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নাই। এইখানে বলা হইয়াছে যে আখড়াই গানের সহিত পার্থক্য সূচিত করিবার জন্যই আখড়াই গানের পরবর্তী যুগে দাঁড়াকবি নামটি কবিগানের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।

[ঝ] বিশ্বকোষের মত এই প্রকার: "এই দেশের মধ্যে এই কবিগানের ও কবিওয়ালাদিগের যে কতদিন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য হইয়া স্থির করা কঠিন। বোধ হয় কালিয়দমন যাত্রার অনেক পরে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং ঐ যাত্রাই ইহার নিদান ও উৎপত্তিস্বরূপ।......... বাঙ্গালা সনের একাদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রকৃত কবিগান ও কবিওয়ালার বিদ্যমান থাকার কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর পূর্বে আর কেহ প্রকৃত কবিওয়ালা বলিয়া ছিল না। কেহ কেহ বলেন মতে ও নন্দ কবিওয়ালার দল রঘুর পূর্ববর্তী। যাহা হউক ইহার পূর্বে বোধ হয় বহু লোক একত্র বসিয়া বৈঠক করিয়া কবির ন্যায় কোন একরকম গান করিতেন, যেহেতু উত্তর কালবর্তী কবিকে অনেক প্রাচীন লোক দাঁড়াকবি বলিতেন। ......যাহা হউক, এক মতে রঘু হইতেই দাঁড়া কবি বা প্রকৃত কবির সৃষ্টি বলা যাইতে পারে।"[২] —এই মতে যাত্রা হইতে কবির সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দী অর্থাৎ ইংরাজী সপ্তদশ শতকের আগে কবিগানের সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই, প্রথম কবি রঘু, মতান্তরে মতে ও নন্দ। রঘুই দাঁড়াকবির স্রষ্টা। এই সিদ্ধান্তগুলি ডঃ দীনেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

[ঞ] ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন: "অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোল কাঁসির সঙ্গতে গান করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজনে। এই ছড়াকে বলিত আর্যা অথবা তর্জা অথবা আর্যা-তর্জা। ....পরে এইরূপ বাঁধা ছড়ার আসরে যে উত্তর প্রত্যুত্তর বা বাকোবাক্য পদ্ধতি চলিত হয় তাহাই দাঁড়া কবি। দাঁড়া শব্দের অর্থ হইতেছে বাঁধা

১। হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস—গঙ্গাচরণ বিদ্যাসাগর।
২। বিশ্বকোষ, পৃঃ ৩২৬-৩২৭।

পদ্ধতি।"[১] —এই মতে ছড়াই কবিগানের মূল বীজ, ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজনে উৎসবের অঙ্গরূপে ইহার উদ্ভব, প্রত্যুত্তর পরবর্তী সংযোজনা, ও দাঁড়া অর্থে ইহার প্রাচীন রূপের বাঁধা পদ্ধতি। অষ্টাদশ শতকের বহু পূর্বেই ইহা প্রচলিত ছিল।

এক নজরে বুঝিবার জন্য যথারীতি সাজাইয়া এই মতগুলির একটি চুম্বক দিতেছি। ইহাতে কবিগানের সময়, উদ্ভব বীজ, প্রথম কবি কে, দাঁড়াকবি বলে কেন—এই সম্বন্ধে মোটামুটি তুলনামূলক বিচার এবং বিভিন্ন মতের ঐক্য ও অনৈক্য পর্যালোচনা করিবার সুবিধা হইবে।

মত	উদ্ভবকাল	উদ্ভববীজ	প্রথম কবি	দাঁড়াকবি
ক	আনুঃ ১৭০৫ খ্রীঃ	০	গোজলা গুঁই	০
খ	বাং ১১ শতক (ইং ১৭ শতক)	যাত্রার তরল অংশ	রঘু, মতে, নন্দ	দাঁড়াইয়া গানের জন্য
গ	১৭ শতক	০	০	০
ঘ	১৭-১৮ শতক	০	রঘু দাঁড়াকবি	দাঁড়াইয়া গানের জন্য
ঙ	০	০	কবিত্বপূর্ণ গান=	কবিগান
চ	১৮ শতক	০	০	০
ছ	০	পাঁচালী	০	দাঁড়াইয়া গানের জন্য
জ	০	আখড়াই	০	ঐ
ঝ	বাং ১১ শতক (ইং ১৭ শতক)	কালিয়দমন যাত্রা	রঘু, মতে, নন্দ	০
ঞ	১৮ শতকের আগে	ছড়া	০	বাঁধা পদ্ধতি জন্য

সবগুলি মত বিচার করিলে এমন অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে কবিগান যে উৎস হইতেই আসুক, উহার উদ্ভব হইয়াছিল ইংরাজী সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে এবং তাহার স্বর্ণযুগ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ।

শতকের কিঞ্চিদধিক প্রথম পাদ পর্যন্ত। এই যুগের অর্থাৎ কবির পরিণত রূপের কথা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কবিগানের চারিটি অঙ্গ ছিল; প্রথম গাওয়া হইত দেবী বিষয়ক গীত[১], পরে সখীসংবাদ, তারপর বিরহ, শেষে খেউড়-লহর।[২] দেবীবিষয়ক গীতের মধ্যে মালসী, ডাকমালসী, আগমনী ইত্যাদি বিখ্যাত। সখীসংবাদ বলিতে মুখ্যতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যের মাথুর লীলা বুঝায় অর্থাৎ শ্রীরাধা ও ব্রজগোপীদের নিকট হইতে দূতীরূপে কোন সখীর—সাধারণতঃ বৃন্দার—মথুরায় গমন ও কৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপ। কিন্তু কবি-সঙ্গীতে সখীসংবাদের মধ্যে শুধু শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলাই নহে, সমগ্র মহাভারতের কাহিনীও বর্ণিত হইয়া থাকে। মোটামুটি শ্রীকৃষ্ণ-সংস্রব-যুক্ত ঘটনাবলীকে কবিগানে সখীসংবাদ বলা হইয়া থাকে। সখীসংবাদ কথাটি কেন কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে রূঢ়ি হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সখীভাবের সাধনা-মাধুর্যের ইঙ্গিত ইহার মূলে থাকিতে পারে কি? কৃষ্ণ যাত্রায় সখীর ভূমিকাটি মুখ্য স্থান অধিকার করায় যে চমৎকারিত্ব সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রভাবও ইহাতে কম নহে বলিয়া অনুমিত হয়। সখী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক ভর্ৎসনা প্রয়োগরীতি, অর্থাৎ নায়ককে অপ্রস্তুত করার সুযোগই বোধ হয় ইহার কবিগানে অন্তর্ভুক্ত হইবার মুখ্য প্রেরণা হইয়া থাকিবে। শ্রোতারা এই ব্যঙ্গোক্তি বিশেষ উপভোগ করিত। ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালার সহিত ইহার সংস্রবও সখীসংবাদের জনপ্রিয়তার মূলে অনেকখানি কাজ করিয়াছে।

লক্ষণীয় এই যে ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের মহিমামূলক কোন পালা দেখা যায় না। মনে হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গৌণ প্রভাবের ফলেই ইহা হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, দেবীবিষয়ক গীত ও সখীসংবাদ যেমন যথাক্রমে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারার অংশবিশেষ, তেমনি বিরহ ও খেউড়-লহর হইতেছে ধর্মসম্পর্কবর্জিত লৌকিক ভাবধারার বাহন। বিরহ ছিল শিষ্ট ও ভদ্ররুচিসম্মত নরনারীর প্রেমের কথা। খেউড় ও লহর নাতিদীর্ঘ

১। করুণানিধান বিলাসে উদ্ধৃত মতে "গুরুদেবের গীত।"

২। আনন্দচন্দ্র মিত্রের মতে এই চারিভাগ যথাক্রমে—মালসী, সখী-সংবাদ, গোষ্ঠ ও কবি।—সাহিত্যসংহিতা, বৈশাখ, ১৩১২ সাল।

প্রশ্নোত্তরমূলক গীত ; ইহাতে থাকিত মোটা ভজনের অর্থাৎ স্থূলভাবের অশ্লীল গান। ইহাকে কবির লহর বা কবির টপ্পাও বলা হইত। পূর্ববঙ্গে এই জাতীয় গানকে বলা হয় 'লাল'। দেবীবিষয়ক ছাড়া অন্যান্য অংশে সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড়-লহরে গান হইত প্রশ্নোত্তর ভঙ্গীতে, ইহার পারিভাষিক নাম চাপান-কাটান বা -উতোর। ঝাঁঝটা বেশি হইত খেউড়-লহরে। দেবীবিষয়ক গীত, সখী-সংবাদ, বিরহ গান রচনা করিবার জন্য চিতেন, পরেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহরা, ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছন্দক্রম ছিল। চিতেন গাওয়া হইত সকলের আগে।[১] চাপানকাটান অর্থাৎ কবির লড়াইই কবি গানের মূল আকর্ষণ। একদল চাপান দিত, আর একদল উত্তর দিত। বাঁধা উত্তরের রীতি রহিত হইয়া পরবর্তী কালে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে অতি তৎপরতার সহিত আসরে বসিয়াই উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার রীতি চালু হয়। ইহাই ছিল দাঁড়াকবির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। গীতের বাঁধুনি, গাহনার চমৎকারিত্ব, বাজনার বিশেষ করিয়া ঢোলের কৃতিত্ব—সব বিচার করিয়া হারজিত নির্ণীত হইত। পরবর্তী কালে ইহা হইতে লঘুচালের কবির টপ্পা ও তর্জা সৃষ্টি হয়। এইখানে কবিগানের কয়েকটি নিদর্শন দিলাম।

১। ভবানীবিষয়ক :

মহড়া ওগো তারা গো মা

এবার দুর্গমেতে রক্ষা কর দক্ষনন্দিনী।
আমি এসেছিলেম ভবের হাটে,
চল্লেম ভূতের বেগার খেটে, মরি সংকটে,
আমার সঞ্চিত বিষয় বারভূতে খেলে সব লুটে।
পঞ্চভূতের ভাঙ্গবে এঘর, নাভিপদ্মে দিয়ে ঢুকর,
হৃদিপদ্মে দেখি যেন ঐ চরণ দুখানি॥

খাদ অনন্তরূপিণী ও মা অন্তর্যামিনী।

ফুঁকা এবার ভবের আশা মিথ্যা হলো ওগো তারা মা
আমি দারাপুত্রের মায়ার বশে, ডুবেছিলাম বিষয়বিষে

১। এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত : "মহড়ায় গীত ধরিয়া চিতেনে তাহা বিকাশ করিয়া ইত্যাদি।"—'গিরিশচন্দ্র', কুমুদবন্ধু সেন।

উপায় কি আজ করি, পাপে অঙ্গ হল ভারি,
হাল ছেড়েছে মনকাণ্ডারী, তরঙ্গে আতঙ্কে মরি,
বল মা কিসে তরি।

মেলতা
মা তোমা বই দীনের পক্ষে অন্য গতি কই
আমায় কালভয়েতে অভয় দিয়ে রাখ ত্রিগুণধারিণী।

১ চিতেন
মা অনাদ্যে ভবের কর্ণধার।
ভক্তি ভাবে যেজন ভাবে তোমায় শিবে মা,
সে জীবে করগো উদ্ধার॥

ফুঁকা
কিসে মুক্তি পাব ওগো তারা মা।
আমি এসে এবার ভবের কূলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে,
তবে দুর্গা এ কপালে কৈগো দয়া হলো॥

মেলতা
তাই তোমারে ভক্তি করি সাধন শক্তি নাই
তুমি নিজ গুণে মুক্তিপদ দিও মুক্তিদায়িনী॥

অন্তরা
ব্রহ্ম সনাতনী তুমি ভয়হারিণী বেদে, শুনি।
শ্রীমন্ত মশানে মরে তুমি রক্ষা করেছিলে তারে
ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে।
তোমায় চিনবে কেবা অচিন্তেময়ী চিন্তামণির শিরোমণি।

২ চিতেন
মা প্রসন্ন অন্নপূর্ণা হলে কাশীতে।
শক্তিরূপা, মুক্তিরূপা, বহুরূপা মা কত রূপ ধর জগতে॥

ফুঁকা
সবাই জানে তুমি জগতমাতা ওগো তারা মা,
তুমি গঙ্গারূপে মহীতলে সাগর বংশ উদ্ধারিলে
তোমার অপার লীলে।
আবার সীতা উদ্ধারিতে, অভয় দিলে অকালেতে
লংকাপুরে রঘুনাথে আপনি সদয় হলে॥

মেলতা
এই অধমে দয়াময়ী করগো নিস্তার।
তাই রঘু বলে নিদেন কালে দিও মা পদতরণী॥

—রঘুনাথ দাস

২। সখীসংবাদ :

মহড়া একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত
কে রথ আনিল গোকুলে।
রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে।
অক্রুর সহিতে কৃষ্ণ কেন রথে
বুঝি মথুরাতে চলিলে,
রাধায় চরণে ত্যজিলে
রাধানাথ কি দোষ রাধার পাইলে ॥

খাদ শ্যামভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে;
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী
নাহি অন্য ভাব, শুনহে মাধব
তোমার প্রেমের প্রয়াসী ॥

১ চিতেন নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী, আসি গোপী সকলে ॥
পাড়ন দিয়ে বিসর্জন কুলশীলে।
ফুঁকা এতেই হোলেম দোষী তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
মেলতা এই দোষে কি হে ত্যজিলে ॥

অন্তরা শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার হাস্য বদনে বংকিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥

২ চিতেন জনমের মত শ্রীচরণ দুখানি হেরি হে নয়নে শ্রীহরি।
পাড়ন আর হেরিব আশা না করি ॥
ফুঁকা হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
মেলতা হৃদে বজ্র হানি চলিলে ॥[১]

—হরু ঠাকুর

১। ডঃ সুশীলকুমার দে'র **History of Bengali Literature in the 19th Century** গ্রন্থে পাঠান্তর আছে।

৩। বিরহ :

মহড়া এ বসন্তে সখি পঞ্চ আমার কাল হল জগতে।
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে।
পঞ্চ যাতনা প্রায় নিশি পঞ্চ প্রহরেতে।
যদি পঞ্চামৃত করি পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ, হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ।
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম করেছিলেন যার
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চ শরেতে॥

চিতেন পঞ্চাক্ষর নাম মকরধ্বজ বিরহী রাজ্যে রাজন।
সহ সহচর পঞ্চশর রিপু হল ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চ জন॥
ভ্রমরকোকিলাদি পঞ্চস্বর, রাজা পঞ্চশর অঙ্গে হানে পঞ্চ শর
তাহে উনপঞ্চাশত মলয় মারুত সই
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চ যোগেতে॥

অন্তরা সই গ্রহ প্রকাশিলে পঞ্চম মঙ্গল, ফুলঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ॥
পঞ্চদশ দিনে হ্রাসবৃদ্ধি যার, তার কিরণেতে দহে প্রাণ॥

চিতেন পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার রাক্ষসের যে প্রধান
তার চিতা সম জ্বলিছে সখি পঞ্চম দুখেতে প্রাণ॥
যদি দ্বিপঞ্চদিকেতে চাই, পঞ্চরিপু পাই, পঞ্চসহকারী নাই,
কেবল পঞ্চম সাধ্যে পঞ্চ রিপুমধ্যে
আমি থাকি যেন সখি পঞ্চতপেতে॥

অন্তরা সই পঞ্চপাণ্ডবেরা খাণ্ডবকানন জ্বালায়ে ছিল যেমন
তেমনি এ দেহ জ্বালাচ্ছে সখি বসন্তের চর পঞ্চজন॥
পঞ্চম দ্বিগুণ দ্বিগুণ ক'রে করিতে চাহি ভক্ষণ
তাহে প্রতিবাদী হয়গো আসি, প্রতিবাসী পঞ্চজন।
বলে পঞ্চরিপু গেছে, প্রাণে সয়েছে, এ পঞ্চ কদিন আছে।
কিন্তু এ পঞ্চযাতনা প্রাণে আর সহে না
সই, এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে॥

—রামবসু

৪। লহর :

আমি মগধপতি জরাসন্ধ বটি হে কংসের শ্বশুর।
ওহে কংসের ভাগ্নে কৃষ্ণ, তুমি নাতি আমার, সম্বন্ধ মধুর॥
তোমার সঙ্গী দুটি পরিপাটি নামে ভীমার্জুন,
কৃষ্ণ, ভাল করে আজ আমারে দাও উহাদের পরিচয়।
উহার কোনটি তোমার পিসতুতো ভাই, কোনটি ভগ্নীপতি হয়?
ভদ্রঘরের মেয়ে বটে, সুভদ্রার বুদ্ধি ভাল নয়,
ওহে ভাইকে পতি করতে গেলে তোমার মত কে আর হয়?

ছ

আখড়াই গান বৈঠকী গান। নামের মধ্য দিয়াই ইহার পরিচয় ও আভিজাত্য সুপরিস্ফুট। রাজা নবকৃষ্ণের রাজসভার আওতায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল বলা চলে। কুলুইচন্দ্র সেন ও রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) এই নবপর্যায়ের আখড়াই গানের উদ্ভাবক। এই গানের উৎপত্তি সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত আছে। কয়েকটির উল্লেখ করি।

[ক] "শুনা যায় সার্ধশতাধিক বা প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের ভদ্রসন্তানগণদ্বারাই আখড়াই গানের সূত্রপাত হয়। কিন্তু সে আখড়াইতে আর নিধুবাবুর সময়ের আখড়াইতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তাঁহারা যৎসামান্য টপ্পার সুরে জঘন্য অশ্লীল ভাষায় গাহিতেন···শান্তিপুরের দেখাদেখি চুঁচুড়া ও পরে কলিকাতায় আখড়াই সংগ্রাম প্রচলিত হইয়া উঠে। ··মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে···সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কুলুইচন্দ্র সেন নামক জনৈক বৈদ্য ··আখড়াই গানের এত শ্রীবৃদ্ধি ও নূতন সৃষ্টি করেন যে তাঁহাকেই একপ্রকার ইহার জন্মদাতা বলিলেও বলা যায়"।[১] মনোমোহন গীতাবলীতে ইহা কথিত হইয়াছে। মনোমোহন গীতাবলীর প্রকাশ কাল ১২৯৩ সাল, মাঘ মাস অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। মনে হয় এই সময়েই মনোমোহনবাবু হাফআখড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া

১। মনোমোহন গীতাবলী, পৃঃ ৶; মনোমোহন বসু লিখিত ভূমিকাতে 'হাফআখড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।

থাকিবেন। তাহা হইলে আখড়াই গানের উদ্ভবকাল দাঁড়ায় ১৭৩৬ বা ১৮৮৬ খ্রীঃ অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের অন্ত্য পাদ বা অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি। "শুনা যায়" ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ মনোমোহনবাবু দেন নাই।

[খ] "৪৫৪ বৎসর পূর্বে বাং ৮৭২ সালে স্বর্ণনদীর তীরবর্তী ভাটকলাগাছি গ্রামে প্রথম রথযাত্রার দিন দুই দলে সঙ্গীত সংগ্রাম আরম্ভ করেন। প্রথম দলে হরিদাস ঠাকুর মূল গায়ক, স্বরূপ দামোদর ও সনাতন দাস ধারক থাকেন, দ্বিতীয় দলে নিত্যানন্দ কঠী মূল গায়ক, গোবিন্দ কঠী ও মাধব কঠী ধারক। এই ছয় জনই পণ্ডিত চক্রবর্তী ভট্ট বিষ্ণুরাম বাগচীর ছাত্র ও শিষ্য।"[১]—বাং ৮৭২ সন অর্থাৎ ১৪৬৫-৬৬ খ্রীঃ। কি প্রমাণবলে এই তারিখের উল্লেখ করা হইল বেদান্তবিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা লেখেন নাই।

[গ] "পাঁচালীর অনুকরণে কবির গানের অনুরূপে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে শান্তিপুরে আখড়াই গানের সৃষ্টি হয়। পরে সঙ্গীতশাস্ত্র পারদর্শী সুপণ্ডিত কুলুইচন্দ্র সেন নামক জনৈক ভদ্রলোক আখড়াই গানের অনেক সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন।"[২]—এই মন্তব্যের মধ্যে নূতন কিছুই নাই।

"আখড়াই গানের রচনা সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়বদ্ধ। তিনটি মাত্র গানে গাওনা শেষ হইত। প্রথমে মালসী অর্থাৎ দেবীবিষয়ক, তাহার পর প্রণয়গীতি,[৩] (সাধারণত মিলনের আর্তিসূচক), শেষে প্রভাতী (রজনীপ্রভাতে মিলনের সম্ভাবনা দূর হওয়াতে আক্ষেপ)। ইহাতে ধ্রুপদ-খেয়ালের মত রাগের আলাপ ও সুরের বৈচিত্র্য দীর্ঘবিলম্বিত হইত। আখড়াই নাম সেইজন্যই। বাজনা ও সঙ্গীতের বিশেষ পারিপাট্য ছিল। আখড়াই গানে বাজনার দ্রুততা (tempo) ছিল প্রধানতঃ চারি প্রকার: পিঁড়ে বা পিঁড়েবন্দী (overture), দোলন (swing), সবদৌড় (full tempo) এবং মোড়

১। হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস—শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্ত-বিদ্যাসাগর রচিত। কলিকাতা, সন ১৩২৬। সাঃ পঃ গ্রঃ সং ৩১২৭; পৃঃ ১।

২। গিরিশচন্দ্র—কুমুদবন্ধু সেন।

৩। "খেউর" বলিয়া মনোমোহন গীতাবলীর ভূমিকাতে লিখিত; পৃঃ ।/০।

(climax)। কবিগানের মত আখড়াই গাওনায় প্রতিদ্বন্দ্বীদলের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর হইত না, যে দল গান বাজনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইত তাহারই জয়।"[১]

গীতের সুর ও তাল, ভাব ও বিষয়বস্তু, বাজনা ও সঙ্গত, গাহনার ঢং ও ক্রম, গানের উৎকর্ষ ও বিচারের মান এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর দিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম নজরে আখড়াই গানকে কবি ও নূতন পদ্ধতির পাঁচালী হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই ইহাদের যোগসূত্র পরিষ্কার ধরা পড়ে।

পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে বৈষ্ণব, শাক্ত ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয় প্রেমের প্রধান ধারাগুলির মিশ্রণে নবসৃষ্ট এক সমন্বিত রূপ লইয়া এই জনসাহিত্য মুখ্যতঃ ইংরাজীপ্রভাবপুষ্ট সাহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কবিগানের মধ্যে এই ধারা তিনটির মিশ্র রূপ দেখিয়াছি। আখড়াই গীতের মধ্যেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। দেবীবিষয়ক মালসীতে শাক্ত ভাবধারা

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২য় সং, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৯৭৪।

এই সম্বন্ধে রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর গীতরত্ন গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের এই অংশটি উল্লেখযোগ্য: "আখড়াই গীতের মধ্যে এত কথা রচনা নাই।... তাহাতে সখীসংবাদ প্রভৃতি কিছুই নাই। অতি অল্প কথার রচনা। প্রথমে একটি ভবানীবিষয়, পরে খেউড় ও শেষে প্রভাতী। ইহাতে কেবল রাগের ও সুরের বাহুল্যতা, ধ্রুপদ খেয়ালের ন্যায় সুশ্রাব্য। ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তর নাই। তিনটি গীত এক এক দলে গাওয়া হয়। ভবানী বিষয়ের মোহড়ায় ২৬টি অক্ষরে একটি ত্রিপদী, চিতেনে ঐরূপ একটি ত্রিপদী, পড়েনে দুইটি ত্রিপদী। ইহাতে কেবল সুরের ও রাগের পাণ্ডিত্য ও বাদ্যের পারিপাট্য। বাদ্যের নাম পিঁড়েবন্দী, দোলন, সবদৌড় এবং গান সমাপনের সময় যে বাদ্য তাহার নাম মোড়।...আড়া, তেওট, এবং খেমটা এই সকল বাদ্য আখড়াইতে খাটে না।...আখড়াই গীত শিক্ষা করিতে হইলে ৬ মাস লাগে এবং ২২ খানা যন্ত্র মিলাইয়া গাইতে হয়, একরাত্রি গাহনা হয়।"—গীতরত্ন, ৩য় সং, ১২৭৫ সাল। সাঃ পঃ গ্রঃ সং ৮২৯২।

এবং প্রণয়গীতি ও প্রভাতী গানে ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক প্রেমের ভাবধারা স্পষ্টতঃ স্থান পাইয়াছে। সখীসংবাদ বা বৈষ্ণব ভাবধারা আখড়াই গানের মধ্যে স্পষ্টতঃ স্থান পায় নাই। বৈষ্ণব, শাক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয় প্রেম এই তিনটি ধারাই আখড়াইর তিনটি গানে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধারাকে অবলুপ্ত করিয়া নরনারীর প্রেম বিরহের কথা বিপুলতর ও তীব্রতর হইয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাবের দ্যোতক। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে আখড়াই গীতে প্রত্যক্ষতঃ স্থান না পাইলেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্যই প্রণয়গীতি ও প্রভাতীর মূল প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে, নরনারীর প্রেমবিরহের আর্তির আড়ালে রাধাকৃষ্ণের প্রেমপ্রবাহ প্রচ্ছন্ন ধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

এইখানে আখড়াই গানের কয়েকটি নিদর্শন দিলাম।

১ ভবানীবিষয়ক :

বাগেশ্বরী

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী, সদাশিবে শুভঙ্করি
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী। মা
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞানবোধ সাকারা
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিনী।
প্রণতে প্রসন্না ভব, ভীমতর ভবার্ণব
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানি।
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভববারি
পদতরী দেহ গো তারিণি॥ ১॥

২ প্রণয়গীতি :

বেহাগ

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল। (দেওরা ওরে)
তোমায় সাধনা করি সাধ না পূরিল॥
সাধিয়ে আপন কাজ, এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ, বিষাদ হইল॥ ২॥

৩ প্রভাতী :

ললিত

যামিনী কামিনীবশ হয় কি কখন। (দেওরা ওরে)
হলে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন ॥
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ ॥ ৩ ॥

আপনার আভিজাত্যের চাপে ও জনসাধারণের আনুকূল্যের অভাবে এবং সর্বোপরি কবিগান প্রভৃতির জনপ্রিয়তার প্রভাবে, আখড়াই গানের আদর যখন কমিয়া গিয়া অনেকটা লোপ পাইবার মত হইল, তখন নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু ইহার সহিত কবিগানের কতগুলি অঙ্গ জুড়িয়া দিয়া হাফ আখড়াই গঠন করেন।[১] "হাফআখড়াইর গানের সুরের ও রাগের

১। মনোমোহন গীতাবলীর ভূমিকাতে এবং গীতরত্ন গ্রন্থের (৩ সং, ১২৭৫ সাল) বিজ্ঞাপনে এই বিবরণ সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু হাফআখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস (১৩২৬ সাল) গ্রন্থে শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্ত-বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন মত দিয়াছেন। উক্ত পুস্তক হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করিতেছি। "তারপর ফুলদোলে পাথুরেঘাটার রামলোচনবাবু আসর বসাইলেন। জয়চন্দ্র প্রশ্নকর্তা, উত্তরী রামচাঁদ। জয়চন্দ্র বিরহের পর মিলন না গাহিয়া খেউড় গাহিতেই রামচাঁদ চটিয়া গেলেন। ইহা আখড়াই সঙ্গীতের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু জয়চন্দ্র ও রামলোচন তাঁহাকে ধরিয়া পড়ায় তিনি রাজী হইলেন এবং বলিলেন 'তবে ত হইল আফআখড়াই।' না ফুল আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম, না ফুল ওস্তাদি কবির সঙ্গীত সংগ্রাম। দুয়ের মাঝামাঝি হইল। পূর্বে আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের বারআনা রকম ছিল, ওস্তাদি কবিসংগ্রামের চারিআনা মিশিয়াছিল, আজ আর চারিআনা মিশাইয়া হাফআখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম করিয়া ফেলিল।" (পৃঃ ১৪)। "...গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিতু বড়াল, রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ক্রমে রামচাঁদের সর্বগুণে বিশারদ হইয়া আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামে নবযুগ আনয়ন করিলেন। ...আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের বাজনার পারিপাট্য ও প্রাচীন রীতি অনুসারে

পারিপাট্য কম ছিল। ইহাতে হালকা তাল ব্যবহৃত হইত, আর যন্ত্রের ব্যবহার কম ছিল। আখড়াইয়ে প্রায় বিশবাইশ রকম যন্ত্র বাজান হইত। হাফআখড়াইয়ে উত্তরপ্রত্যুত্তর বাদপ্রতিবাদ কখনও থাকিত তবে কবিগানের মত নয়।"[১]

আখড়াইতে সখীসংবাদ ছিল না, হাফআখড়াইতে মুখ্য বিষয় হইল সখীসংবাদ। কবিগানের ছন্দ ও গীতক্রম অর্থাৎ চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, ডবলফুকা[২], মেলতা, মহড়া ইত্যাদি হাফআখড়াইতেও অনুসৃত হইত। মনোমোহন গীতাবলী হইতে সম্পূর্ণ বিবরণীসহ হাফআখড়াই গীতের একটি নিদর্শন উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"কলিকাতাস্থ হোগলকুঁড়িয়া পল্লীতে ৺শিবচন্দ্র গুহমহাশয়ের ভবনে সন ১২৭৪ সালের শ্রীশ্রীপঞ্চমী পূজার রজনীতে হাফআখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম হয়। একপক্ষে কাঁসারী পাড়ার ও অপরপক্ষে শ্যামপুকুরের সৌখিন দল। মনোমোহনবাবু প্রথমোক্ত দলের জন্য নিম্নলিখিত গান কয়টি রচনা করিয়াছিলেন।

প্রচলিত ওস্তাদি কবির প্রশ্নোত্তর লইয়া কালোয়াতী ছাঁচে গানের তালমানলয়াদির পারিপাট্য দ্বারা যে সঙ্গীত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, হাফআখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম নামে তাহার প্রচলন হইয়া পড়িল।" (পৃঃ ১৫)

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৪১, ডঃ সুকুমার সেন। এই প্রসঙ্গে গীতরত্ন গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের এই অংশটি উল্লেখযোগ্য: "মোহনচাঁদ বসু আখড়াই গাহনা বাবুর নিকট শিক্ষা করেন, পরে তারি সুরসার লইয়া হাফআখড়াই করেন। ...আড়া, তেওট, খেমটা এ সকল বাদ্য আখড়াইতে খাটে না। ইহা একরকম হইয়াছিল না কবি, না আখড়াই। তাহাও এক্ষণে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন ও মোহনচাঁদ বসু মরা অবধি লোপ পাইয়াছে।"

২। "এই ডবলফুকা কবিগানের মধ্যে পূর্বে মোটেই ছিল না"—মনোমোহন গীতাবলী, পৃঃ ৷/০।

১ম সখীসংবাদ :

মহড়া দোহাই মহারাজ অবিচার ক'রো না

কেন পরের ধন হরে অক্রূর দিলে না।

শ্যাম রাজাধিরাজা নাম, শুনেছি গুণধাম

স্বচক্ষে দেখিব আজ,

তোমার এ রাজ্যে দস্যুভয়, উচিত তার দণ্ড হয়

কি দণ্ড দিবে হে তায় বল না।

খাদ আমরা এসেছি আশ্বাসে, পুরাও মনেরি বাসনা ॥

ফুকা সুরমনোলোভা এই রাজসভা চমৎকার

তুমি নরপতি ধর্ম অবতার, মহারাজ হে

দুষ্ট দুর্জন দমনে, শিষ্টের পালনে

নিলে মথুরার সিংহাসনে রাজ্যভার ॥

ডবলফুকা দেখিব মাধব আজ কেমন বিচার, ওহে মহারাজ,

মনোচোরে করে চুরি, যে এনেছে মধুপুরী,

শ্যাম হে, সে চোর রয়েছে হরি সভাতে তোমার।

মেলতা কলঙ্ক নামেতে যেন রেখো না।

চিতেন ব্রজেতে বসতি করি আমরা সঙ্গিনী শ্রীরাধার।

চিন্তে পার চিন্তামণি, শংকা করি এখন ভূপতি মথুরার ॥

ফুকা শুন গুণমনি রাজনন্দিনী ব্রজেতে,

তোমার আসার আশে আছে প্রাণেতে। শ্যামরায় হে

পড়ে বিরহ-বিপদে, শরণ্যে শ্রীপদে

দুখের কথা শ্যাম এলেম তোমায় জানাতে ॥

ডবলফুকা বিচ্ছেদতরঙ্গে রাই ভাসে অনিবার, বিনা কর্ণধার,

নাবিক দিয়েছে ভঙ্গ, কুটিল কাল ত্রিভঙ্গ, শ্যাম হে

তুফানে ফেলিয়ে এলো যমুনারি পার।

মেলতা কি হবে কে জুড়াবে যাতনা।

ঐ গানের উক্তিতে প্রতিপক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে যে গানটি পাওয়া হয় তাহার ভাবার্থ এই রূপ : "আমি ইহার কি বিচার করিব ব্রজেশ্বরী রাধা

আছেন, তিনি আমার তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের, সকলেরই বিশেষতঃ প্রেমরাজ্যেরও ঈশ্বরী, তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা জানাও, তিনি ইহার যে বিচার করিবেন তাহাই হইবে ইত্যাদি।" এই উড়ানো উত্তরে মনোমোহনবাবুর গান এই :

২য় সখীসংবাদ :

মহড়া ভাল সুবিচার করলে আজ ভূপতি
এমনি বিচার কি নিত্য কর শ্রীপতি।
শ্যাম ছিলে হে ব্রজেতে, গোধন চরাতে
নাম ছিল রাখাল-রাজ :
এখন ত্যজে সে রাখাল সাজ, হয়েছ মহারাজ,
পেয়েছ রাজত্বপদ সম্প্রতি।

খাদ এসে মথুরায় শ্যামরায় বড় রাখিলে সুখ্যাতি।

ফুকা বলবো কি আর হরি, এখন বলিতে করি ভয়,
তোমার সেই রাখালভাব আজো সমুদয়। (মহারাজ হে)
নৈলে ত্যজে রাই রূপসী, দাসী হয় মহিষী,
দেখে কাঁদি কি হাসি, নাহি স্থির হয়।

ডবলফুকা কি গুণে ভুলে হে শ্যাম হলে কুবুজার
মরি কি বিচার
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে, জানিত জগতজনে, শ্যাম হে
কুঁজী-কৃষ্ণ নাম এখন হবে কি প্রচার।

মেলতা সুখে রও আমরা মরি নাই ক্ষতি।

চিতেন ব্রজেতে ছিলে হে যখন, ছিল রাজত্ব রাই রাজার
কৃষ্ণ যে তত্ত্ব উদয় হতো বৃন্দাবনে, হতো তখনি সুবিচার।

ফুকা বিচ্ছেদ রাজা এসে ব্রজে করেছে অধিকার,
রাধার সে সম্পদ কিছু নাহি আর, মহারাজ হে,
হয়ে নিতান্ত নিরুপায়, এসে তাই মথুরায়,
তোমায় জানায়েছিলেন দুখের সমাচার।

ডবলফুকা বিচারে পণ্ডিত শ্যাম তুমি হে যেমন, বুঝেছি এখন
অন্তর বাহির তব সমভাব দেখি সব, শ্যাম হে

সকলি বিফল হল, অরণ্যে রোদন।

মেলতা বঞ্চনা নহে কৃষ্ণ, রাজনীতি।

ঐ আসরে ইলারাজার স্ত্রীর উক্তিতে নিম্নলিখিত খেউড় হইয়াছিল।

১ম খেউড় :

মহড়া ওহে মহারাজ, কাঁচুলিতে আঁটা কেন বুক ?
একি দেখি অসম্ভব, গর্ভেরি লক্ষণ তব
কৈতে লাজ, এ কি কাজ হোলো হে,
ছি ছি কি বলে আর দেখাও কালামুখ।

তেহরান লাজে মরে যাই ও প্রাণ তোমারে দেখিয়ে।

চিতেন ছ মাসে দিলে হে দেখা
ওহে মহারাজ, নব সাজে আজ কোনভাবে সখা।

ফুকা কেন আচম্বিত, অনুচিত বিপরীত ভাব এমন
মনোদুখে রৈলে অধোমুখে ঢেকে চাঁদবদন।
দেখে হাসি পায় ও প্রাণ,

মেলতা তোমার কোমরঘেরা ঘাগরা—কি কৌতুক ?

উত্তরে তাঁহারা কতকগুলি অশ্লীল ইতর কথা বলেন, তদুত্তরে মনোমোহনবাবুর দ্বিতীয় গান এই :

২য় খেউড় :

মহড়া কি হবে উপায় ছেলে হলে বাবা বলবে কায় ?
পুরুষ হয়ে নারী হলে, ছুদিগের ভাব জেনে নিলে,
সরমে মরমে মরি হায়,
দিলে কুলে কালী, ছি ছি ধিক তোমায়।

তেহরান লাজে মরে যাই ও প্রাণ তোমারে দেখিয়ে।

চিতেন হেসে আর বাঁচিনে শুনে
ইতর নারীর প্রায়, ইতর কথায়, হায় আর জ্বালাও কেনে ?

ফুকা মনের হরষে অনাসে ন মাসে খাবে সাধ।
রাজ্যপতি হবেন পুত্রবতী, প্রজাদের আহ্লাদ।
কাব্য মন্দ নয়, ও প্রাণ
মেলতা আমার পতি হল সতীন, একি দায়।

তৃতীয় খেউড় গাহিবার সময় হয় নাই। কিন্তু গান বাঁধা ছিল। তাহার চিতেন মনে নাই, কেবল মহড়াটি পাওয়া গেল। তাহা এই—

মহড়া বাঁচালে আমায়, আমার হয়ে পোয়াতি হলে
আঁতুর ঘরে থাকবে তুমি, তাপ দিব নাথ আপনি আমি,
ভাবনা কি, ঠাকুরঝি হব, ধাই—
ভেলা বংশ রাখলে ইন্দুরাজকুলে।[১]

জ

আলোচ্য ইংরাজী-প্রভাববর্জিত বা জনসাহিত্য শাখায় 'পাঁচালী' শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন: "বৈষ্ণব পদাবলীর কথা বাদ দিলে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সব রচনাই পাঁচালী কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত"।[২] কিন্তু আমাদের আলোচ্য পাঁচালী উক্ত ব্যাপকার্থক পাঁচালী হইতে স্বতন্ত্র একটি নূতন ধরণের বস্তু। ইহাকে বিশিষ্টতা দিবার জন্য অনেক সময় "নূতন পদ্ধতির পাঁচালী"—এই নাম দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য শত বৎসরের জনসাহিত্যের যে একটি বিশিষ্ট ধারা বিষয়বস্তুর বিন্যাসে ও গাহনার পদ্ধতিতে স্বাতন্ত্র্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পাঁচালীর অর্থে আমরা এইখানে সেই বিশিষ্ট নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর কথাই বুঝিতেছি, ব্যাপকার্থক পাঁচালী নহে।

সাধারণভাবে পাঁচালী ঠিক কোন সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা

১। মনোমোহন গীতাবলী (১৮৮৭) পৃঃ ৫—১১।
২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৮৪

ঠিক জানা না গেলেও উহা যে পদাবলীর বা গীতিপ্রধান ধারার পরে এবং পাঠ্য নিবন্ধের অনেক পূর্বে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

"পাঁচালী কাব্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, দেবমহিমামূলক ও ভক্তিরসাত্মক এবং প্রণয়কাহিনীমূলক ও আদিরসাত্মক। দেবকাহিনীমূলক ভক্তিরসাত্মক পাঁচালী কাব্যগুলি আবার দুই শ্রেণীতে পড়ে, (ক) পৌরাণিক অর্থাৎ সংস্কৃত পুরাণ ইতিহাস কাব্য কাহিনীর অনুবাদ, এবং (খ) লৌকিক অর্থাৎ দেশীয় কাহিনীর অনুসরণ। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে প্রধানতঃ রামলীলা পাঁচালী, কৃষ্ণলীলা পাঁচালী ও মহাভারত পাঁচালী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে মনসার পাঁচালী, ধর্মঠাকুরের পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী। প্রণয়কাহিনী-মূলক আদিরসাত্মক শ্রেণীতে পড়ে বিদ্যাসুন্দর পাঁচালী, দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রানী, আলাওলের পদ্মাবতী পাঁচালী ইত্যাদি।"[২]

পাঁচালী পদাবলীর মত গীতসর্বস্ব বা পাঠ্য নিবন্ধের মত পাঠসর্বস্ব নহে। ইহা মুখ্যতঃ আখ্যায়িকাপ্রধান। "পাঁচালীর কাব্য আগাগোড়াই গান করা হইত না। মধ্যে মধ্যে বর্ণনাময় অংশ গায়ন দ্রুততালে আবৃত্তি করিয়া যাইত, তাহার বাম হাতে থাকিত চামর, ডান হাতে মন্দিরা আর পায়ে নূপুর। পালি অর্থাৎ দোহার থাকিত অন্ততঃ দুই জন। আর কখনও কখনও থাকিত

১। এই সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—'পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য বহমান ছিল তিন ধারায়, পদাবলী বা গেয় গীতিকবিতা, পাঁচালী (পঞ্চালী, পঞ্চালিকা) বা গেয় গাথা কাব্য এবং সন্দর্ভ বা পাঠ্য নিবন্ধ। প্রথমে সূত্রপাত হইয়াছিল পদাবলী ধারার, চর্যাগীতি তাহার নিদর্শন। পাঁচালী কাব্য সুরু হয় কবে জানিনা তবে পঞ্চদশ শতকের পূর্বে লেখা কোন পাঁচালী কাব্যের উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। প্রথম পাঠ্য কাব্য চৈতন্যচরিতামৃত লেখা হয় ষোড়শ শতকের শেষে। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থের অনুবাদে এবং কড়চা নিবন্ধে পাঠ্য কাব্যের অনুবৃত্তি চলিয়াছিল।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৮৪।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৮৪।

মৃদঙ্গবাদক। কোন কোন পাঁচালী কাব্য রচয়িতা নিজেই গায়ন ছিলেন, যেমন রূপরাম চক্রবর্তী।"[১]

পাঁচালী শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থাদি সম্বন্ধে ঘোরতর মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটি প্রচলিত মত উল্লেখ করিতেছি।

[ক] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন যে পাঁচালী (পঞ্চালিকা) কথাটি পাঞ্চাল দেশের সহিত সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ পাঞ্চাল হইতে আমদানী করা হইয়াছে।[২] কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে পাঞ্চাল হইতে পাঞ্চালী এই ব্যাকরণগত নিয়ম ছাড়া আর কোন যুক্তি দেখান হয় নাই।

[খ] কেহ কেহ অনুমান করেন পাঁচমিশালী বলিয়া পাঁচালী;[৩] বিশ্বকোষের মতে পঁচজনে মিলিয়া গান করে বলিয়া পাঁচালী বলা হয়।[৪] অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মতে পাঁচ (পঞ্চ)+আলি=পাঁচালি, অর্থাৎ যাহা পঞ্চ সম্বন্ধীয় তাহাই পাঁচালী। ঠাকুরালি, ঘটকালি, ভাবকালি শব্দগুলির মত একই প্রণালীতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।[৫] ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও খগেনবাবুর সহিত একমত।—কিন্তু এক্ষেত্রে মুখ্য প্রশ্ন এই যে পাঁচজনের সম্বন্ধে বা পাঁচজনে মিলিয়া তো সবকিছুই হইয়া থাকে, সব রকমের আসর, বৈঠক, জমায়েৎ—সবকিছুই তবে পাঁচালী নামে অভিহিত হয় না কেন ?

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৮৪।

২। "The Old Bengali poems were known by the common name of Panchali. This word shews that we owe at least some forms of Old Bengali metres to Panchal or Kanauj."—History of Bengali Literature in the 19th Century, Dr. S. K. De, p. 835.

৩। কুমুদবন্ধু সেন রচিত গিরিশচন্দ্র গ্রন্থ।

৪। বিশ্বকোষ পৃঃ ১২০।

৫। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়, সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের (৯ই আশ্বিন, ১৩৩৩ : ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ খ্রীঃ) কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

[গ] শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী 'পাঁচালী' শব্দটির একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার উক্তি : "বাঙ্গালায় 'পাঁচালী' বানান করা হয়, কিন্তু কথাটা পাঁচালী নহে, পাঁচালি। পশ্চিম বঙ্গে রাঢ় দেশে এই কথার উৎপত্তি, পূর্ববঙ্গে উচ্চারণ-দোষে সংস্কৃত 'পঞ্চ' শব্দ 'পাশ' এবং পশ্চিমবঙ্গে 'পাঁচ' বলিয়া উচ্চারিত হয়। অলি শব্দ ভ্রমর। বাঙ্গালায় বরেয়ারী শব্দ বারোয়ারী বলিয়া উচ্চারিত হয়। বরেয়ারী হিন্দী শব্দ অর্থাৎ বারজন ইয়ার বা এয়ার (বন্ধু অথবা গ্রামবাসী) একত্র মিলিয়া যে উৎসব করে তাহাই। গ্রামের মাতব্বর প্রধান পঞ্চজন মনুষ্য মিলিয়া অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ মিলিয়া, যাহা করে তাহাই পাঁচালী কার্য বলিয়া গণ্য হয়। ...অতি পুরাকাল হইতে রাঢ় দেশে গ্রামের প্রধান প্রধান মণ্ডল, মাতব্বর লোক ও প্রধানেরা অলি, ভ্রমর, মক্ষিকা (The Bee of the Village) বলিয়া সম্বোধিত হইয়া আসিতেছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার অনেকের বংশগত উপাধি অলি, ভোমরা ইত্যাদি। কাশীদাসের পূর্বে ও তাঁহার সময়ে বারোয়ারী লোকেরা পাঁচালি বলিয়া গণ্য হইত। ইহারা ছড়া গাহিত, সং সাজিয়া নাচিত ও তামাসা করিত। তর্জা ও ঝুমুরের মত পয়ার ছন্দে গালাগালি করিত, কিন্তু পাঁচালী গ্রন্থ লিখে নাই, অথবা দাশু রায়ের মত পাঁচালীর প্রথাও তাহারা জানিত না। পাঁচালী বলিয়া কোন পুস্তক সেই সময়ে ছিল না, তাহাদের অধিকাংশ মুখে মুখে বিরচিত হইত এবং তাহাই গান করা হইত। তখন এইরূপ পাঁচালি ছিল। ক্রমে উহা পাঁচালী নামে আখ্যাত হইয়া পুস্তকাকারে আসিয়া পৌছিল। .. দাশরথি রায় ইহাদের ধরণ অনুকরণ করিয়া পাঁচালী নাম দিয়াছেন।"[১]

শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতীর মতে পাঁচালী, পঞ্চায়েৎ ও বারোয়ারী একার্থক শব্দ। "কাশীদাসের পূর্বে ও তাঁহার সময়ে বারোয়ারী লোকেরা পাঁচালি বলিয়া গণ্য হইত। ইহারা ছড়া গাহিত, সং সাজিয়া নাচিত ও তামাসা করিত।" আধুনিক পরিভাষায় সার্বজনীন কৌতুক উৎসবের মত একটা ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলে প্রতিটি সামাজিক উৎসবকেই 'পাঁচালি' না বলিয়া কেবল বিশেষ একধরণের সাহিত্যকে পাঁচালী বলা হইত

১। ভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৪৯ : "কাশীরাম দাসের সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞতা" প্রবন্ধ, পৃঃ ৩০০-৩০১।

কেন? অবশ্য এমনও হইতে পারে যে তখন হয়ত এই উৎসবের সহিত পাঁচালী নামটি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। পরে অন্যান্য সামাজিক উৎসবের প্রবর্তন হইলে তখন আর পাঁচালীর অর্থবিস্তৃতি সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক এই ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত ও শিথিল। তদ্ভিন্ন "দাশরথি রায় ইহাদের ধরণ অনুকরণ করিয়া পাঁচালী নাম দিয়াছেন"—এই মন্তব্যটিও যথার্থ নহে।

[ঘ] কাহারো মতে পাঁচালী শব্দ পা চালি বা পদচালন হইতে আসিয়াছে। অর্থাৎ মূল গায়েন পদ চালনা করিতে করিতে এই গান করিতেন বলিয়া ইহার নাম পাঁচালী। কিন্তু পাঁচালীর চন্দ্রবিন্দু আগমের কোন ব্যাখ্যা ইহার মধ্যে নাই।[১] ডঃ সুকুমার সেন এই অনুমানকে উচ্চাঙ্গের রসিকতার মর্যাদা দিয়াছেন[২]।

[ঙ] অপর মতে পাঁচটি অঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া অর্থাৎ গান, সাজ বাজানো, ছড়াকাটান, গানের লড়াই ও নাচ—এই পাঁচটি অঙ্গের জন্য ইহার নাম পাঁচালী।[৩] অবশ্য এই অঙ্গ পঞ্চকের সম্বন্ধে ভিন্ন মত আছে। যেমন, প্রথমতঃ পা চালি অর্থাৎ পাদচারণা করিয়া সম্প্রদায়ের অধিকারী আসরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ গান ও ব্যাখ্যা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ ভাবকালি ব্যাখ্যায় ও গানে হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ এবং কণ্ঠের সুরে অভিনয় ভঙ্গীতে ভাবের সংকলন করিয়া তাহার বিকাশ দেখাইতেন। তৃতীয়তঃ নাচাড়ি ছন্দবিশেষে রচিত পদ্য নৃত্য করিতে করিতে আবৃত্তি ও গান চলিত। চতুর্থতঃ বৈঠকী, কখনও কখনও বসিয়া ভাল রাগরাগিণীতে গানের আলাপ হইত।

১। "...but this interpretation fails to explain the presence of nasal m̤ in the word itself."—History of Bengali Literature in the 19th Century. Dr. S. K. De. P. 438

২। প্রাচ্যবাণী মন্দির প্রবন্ধাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পাঁচালীর উৎপত্তি প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১।

৩। History of Bengali Literature in the 19th Century, —Dr. S. K. De, p. 439 এবং গোপীচন্দ্রের পাঁচালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ব্যাখ্যাংশ, পৃঃ ৬৩।

পঞ্চমতঃ দাঁড়াকবি অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া সমস্বরে গান করিত।[১]

এই ব্যাখ্যা সুচিন্তিত। কিন্তু অঙ্গগুলির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, ইহাতে উনবিংশ শতকের, বিশেষ করিয়া উহার শেষার্ধের নূতন ভঙ্গীর পাঁচালীর কথা বলা হইয়াছে। ইহার পূর্বকার ব্যাপকার্থক পাঁচালীর সহিত ইহার কোন যোগাযোগ নাই।

[চ] অনেকে মনে করেন যে পঞ্চালী একটি বিশিষ্ট ছন্দের নাম। সংস্কৃত পঞ্চালী অর্থে অনেকে a system of singing বলিয়াছেন।[২] প্রাকৃতেও পঞ্চাল ছন্দ ছিল।[২] সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে পাঞ্চালী বলিয়া একটি রীতির নাম পাওয়া যায়। গৌড়ী ও বৈদর্ভী রীতিতে প্রযুক্ত বর্ণাদি ছাড়া অন্যান্য বর্ণযুক্ত ও পাঁচছয়টি পদের সমাসবদ্ধ রচনাকে পাঞ্চালী রীতি বলে।[৩] প্রাচীন যুগের ও মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে 'পাঁচালী প্রবন্ধে', 'পাঁচালীর ছন্দে', 'পাঁচালীর গাথা' প্রমুখ প্রয়োগ দেখিয়া পাঁচালী অর্থে একটি বিশেষ ধরণের বা ছাঁচের (pattern) কথাই মনে আসে। অর্থাৎ পাঁচালী গাহনার যে একটি বিশেষ রীতি ছিল, ইহা দ্বারা তাহাই মাত্র প্রমাণিত হয়, এবং মনে হয় এই অর্থেই "পাঁচালী প্রবন্ধে" প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু কি করিয়া শব্দটির উৎপত্তি হইল, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে গৃহীত হইল, উহার উৎপত্তি ও পরিণতির সাদৃশ্য কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের কোন উত্তর ইহার মধ্যে নাই।

[ছ] সম্প্রতি ১৩৬০ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা যুগান্তরে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় 'পাঁচালী' প্রবন্ধে পাঁচালীর উপর একটি নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।[৪] প্রাসঙ্গিক সমগ্র অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের লেখকগণ পাঁচালী বলিতে প্রায় পয়ার

১। কুমুদবন্ধু সেনের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থ।

২। পূর্বোক্ত গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর উক্ত ব্যাখ্যাংশ, পৃঃ ৬৩।

৩। "* * * বর্ণৈঃ শেষৈঃ পুনর্দ্বয়োঃ।
সমস্ত-পঞ্চষ-পদোবন্ধঃ পাঞ্চালিকা মতা॥"
—সাহিত্যদর্পণম্, নবম পরিচ্ছেদ।

৪। শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৬০, পৃঃ ৪৮।

ছন্দের গানকেই নির্দেশ করেন। যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আবার বাঙ্গালা কবিতায় লেখা অনেক ব্রতকথাও পাঁচালী নামে পরিচিত। যেমন সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদি; আবার অনেকে লাচারী, নাচারী, পাঁচালী একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গবেষণাও করিয়াছেন। পাঁচালীর লক্ষণ কিন্তু অন্যরূপ।

সঙ্গীত শাস্ত্রে অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ এই দুই প্রকারের গানের উল্লেখ আছে। রাগালাপ আ তা না রি এই অর্থহীন স্বরালাপ এবং সা রি গা মা পা ধা নি এই সপ্তস্বরালাপের নাম অনিবদ্ধ গান। ধাতু অঙ্গবদ্ধ গানের নাম নিবদ্ধ। শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র কিম্বা শুদ্ধ, শালগ ও সঙ্কীর্ণ অথবা প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক নিবন্ধের এই তিন ভেদ।

শুদ্ধ বা প্রবন্ধের অবয়বকে ধাতু বলে। উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ এইগুলির নাম ধাতু। প্রবন্ধের অন্য ছয়টি অঙ্গ স্বর, বিরুদ, পদ, তেন, পাঠ ও তাল। প্রবন্ধের পঞ্চ জাতির নাম মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী, ও তারাবলী।

ছায়ালগ বা শালগ বা বস্তুর মধ্য হইতে লোক সঙ্গীতের সুর ঝুমরীর উৎপত্তি হইয়াছে। আর ক্ষুদ্র বা সঙ্কীর্ণ বা রূপক হইতে পাঁচালীর উদ্ভব ঘটিয়াছে।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গে বলিয়াছেন:

তাল ধাতুযুক্ত বাক্য মাত্র ক্ষুদ্র গীত।
ধাতু পূর্বে উক্ত উদ্‌গ্রাহাদি যথোচিত॥
শুদ্ধ শালগের প্রায় ক্ষুদ্র গীত হয়।
ইথে অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রে কয়॥
ক্ষুদ্র গীত ভেদ চারি, চিত্রপদা আর।
চিত্রকলা, ধ্রুবপদা, পাঞ্চালী প্রচার॥

অকঠোর অনুপ্রাস ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন পদবৈচিত্র্যযুক্ত গান চিত্রপদা।

চিত্রকলা ধ্রুবে মাত্রা ন্যূন অন্ত সম।
পাদত্রয় অষ্টাবধি এ গীত নিয়ম॥

পাঁচালীর এরূপ কোন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট নাই। তবে নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন:

ধ্রুপদাদি লক্ষণ সর্বত্র বিদিত।
ভাষা সংস্কৃতে গায় নানাবিধ গীত ॥

এই গান দিব্য, মানুষ, দিব্য-মানুষ ভেদে তিন প্রকার। সংস্কৃত গান দিব্য, প্রাকৃত অর্থাৎ দেশীয় গান মানুষ, এবং সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষা মেশানো গানকে দিব্য-মানুষ বলিতে পারি।

কৃষ্ণমঙ্গল, শিবমঙ্গল, রামমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল-গানগুলি পাঁচালীর সুরে গীত হয়। পদাবলীর সঙ্গে ইহার সাধারণ পার্থক্য পদাবলী সমধ্রুবা, পাঁচালী বিষমধ্রুবা। মঙ্গলগানে দোহারগণ বার বার ধুয়া পদের আবৃত্তি করে। পদাবলীতে সেরূপ রীতি নাই। পদাবলীতে নানাবিধ সুর ও রাগরাগিণীর প্রয়োগ আছে। পাচালী প্রভৃতি গানে সম, অর্ধসম, বিষম এইরূপ ভেদও কথিত হয়।

পাঁচালীর কথা উঠিলেই দাশুরায়ের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। দাশুকে পাঁচালী গানের প্রবর্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দাশরথির পাঁচালী সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মে রচিত নহে। তাল এবং সুর থাকিলেও দাশরথির গানে উদগ্রাহক, মেলাপক-আদি ধাতুর কোন বালাই নাই। দাশুর পাঁচালীতে এক একটি ছড়া, তাহার পর গান আছে। ছড়া সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে হয়। গানগুলি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুর করিয়া গাহিতে হয়।

পূর্বে কবির গানে ছড়া আবৃত্তি করিবার গান এবং গাহিবার রীতি ছিল, এখনও আছে। মঙ্গলগানের মধ্যে রামায়ণে মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল না। মাত্র মন্দিরা ব্যবহৃত হইত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলে বাল্যকাল হইতেই মৃদঙ্গের ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি। মঙ্গলগানে ছড়া নাই, আছে গান, পয়ার এবং আবৃত্তি, আর মাঝে মাঝে কথা অর্থাৎ ছোটখাট বক্তৃতা। কবির ছড়া ত্রিপদীতে রচিত। কবিগানের পয়ারগুলি মঙ্গলগানের মত গানের সুরেই বাদ্যযন্ত্রসহযোগে গাওয়া হয়। দাশু কবির গান ও মঙ্গলগান মিশাইয়া পাঁচালী সৃষ্টি করেন। দাশুর ছড়া প্রায় ত্রিপদীতেই রচিত, মাঝে মাঝে পয়ারও আছে। কবির মত পাঁচালী গানেও ঢোলের বাজনার চলন রহিয়াছে।”

এই মত অনুসারে নিবদ্ধ গীতের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ বা রূপক শাখার চতুর্থ প্রশাখা

পাঁচালী। অর্থাৎ ধাতু (উদগ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ) ও তাল (প্রবন্ধের অঙ্গবিশেষ) সমন্বিত অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত নিবদ্ধ গীতের নাম ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ বা রূপক এবং ইহার প্রকারভেদ পাঁচালী। কিন্তু ইহার কোন বিশদ বিবরণ আলোচ্য প্রবন্ধে নাই। লেখক দাশরথির পাঁচালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "দাশুকে পাঁচালী গানের প্রবর্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দাশরথির পাঁচালী সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মে রচিত নহে। তাল এবং স্বর থাকিলেও দাশরথির গানে উদগ্রাহক, মেলাপক আদি ধাতুর কোন বালাই নাই।" সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত পাঁচালীগীতের ঠিক ঠিক দৃষ্টান্ত কি এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার স্থান কোথায় ও দান কতখানি তাহা অনুসন্ধানযোগ্য।

[জ] 'পঞ্চালিকা' হইতে যে পাঁচালী শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। তবে পঞ্চালিকা বা পুতুল নাচের সহিত পাঁচালীর সম্বন্ধ কি তাহা বিশেষ ভাবে আলোচ্য। পঞ্চালিকার অর্থাৎ পুতুলনাচের প্রথা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন প্রথা। পূর্বে গানের সঙ্গে পুত্তলিকা প্রদর্শন করা হইত। এখনও যমপট, গাজীরপট প্রভৃতি প্রদর্শনের মধ্যে এই বিস্মৃতপ্রায় ধারার অস্পষ্ট রেখা চোখে পড়ে। পরবর্তী কালে মন্দিরের প্রাঙ্গণে বা নাটমন্দিরে প্রতিমার সম্মুখে গীত হইত বলিয়া বোধহয় আর পুত্তলিকা প্রদর্শনের প্রয়োজন হইত না, এবং এই ভাবেই হয়ত ক্রমে এই প্রথা লোপ পাইয়াছে। পঞ্চালিকার ব্যবহার খুব সম্ভব আরও প্রাচীন। সংস্কৃত নাটকের সহিত ইহার যে যোগাযোগ ছিল তাহাও সূত্রধার প্রভৃতি কথাদ্বারা অনুমান করা চলে। পুতুলনাচে সূত্রধারের স্থান অপরিহার্য। ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার পাঁচালীর উৎপত্তি প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।[১] আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের পক্ষে অপরিহার্য মনে করিয়া প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"......কিছুকাল পূর্বে আমি অনুমান করিয়াছিলাম পাঁচালীর উৎপত্তি সংস্কৃত পঞ্চালিকা শব্দ হইতে। গানের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চালিকার অর্থাৎ পুতুলের বাজি হইত বলিয়া এই ধরণের গানের নাম হইয়াছে পাঁচালী। পরবর্তীকালে দেবতার সম্মুখে নাট মন্দিরে অথবা মণ্ডপে গান হইত বলিয়া গানের সঙ্গে

১। প্রাচ্যবাণী মন্দির প্রবন্ধাবলী, ২য় খণ্ড, 'পাঁচালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধ

পুত্তলিকা প্রদর্শন প্রথা উঠিয়া যায়। এখনো পশ্চিম বঙ্গে পুতুল নাচের সঙ্গে এবং যমপট দেখানোর সঙ্গে ছড়াকাটা কাহিনীর আবৃত্তি অনেকটা পূর্বের ধারা বজায় রাখিয়াছে। সম্প্রতি আমার অনুমানের সমর্থন পাইয়াছি বাঙ্গালাদেশে রচিত বা সংকলিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্য খণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়)। এখানে গঙ্গার উৎপত্তি কাহিনীর মধ্যে দেবসভায় শিবের গানের বর্ণনায় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রচলিত পাঁচালী গানের নিখুঁত ছবি পাইতেছি। জয়দেবের সময় গীতগোবিন্দ কেমন করিয়া পাঁচালী প্রথায় গাওয়া হইত তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি এই বর্ণনা হইতে। এইখানে বৃহদ্ধর্মপুরাণের আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি।

বিষ্ণুর সভায় দেবঋষিরা সমবেত হইলে বিষ্ণুর অনুরোধে গানশাস্ত্রবিশারদ শম্ভু গান আরম্ভ করিলেন। দোহার হইলেন নারদ। (তেন চানুজগে গায়ন্ নারদোঽপি মহামুনিঃ)। প্রথমে গান্ধার রাগ আলাপ করিতেই সভায় গান্ধার রাগের রূপধারী মূর্তির আবির্ভাব হইল।

লসৎসু হেমাভরণঃ সমুজ্জ্বলন্
নবাম্বুদাভাসমপূর্বসুন্দরম্।
গৃহীত পীতাম্বরপঙ্কজদ্বয়ং
দদর্শ গান্ধারমিমং সভা চ সা॥

কৃষ্ণ-মূর্তিধারী গান্ধার রাগ সিংহাসনে স্থাপিত হইলে শিব গান ধরিলেন, দূতী কৃষ্ণের কাছে রাধার বার্তা আনিয়াছে।

কেশব কমলমুখীমুখকমলম্
কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্॥
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্॥ ধ্রুবঃ॥
সুরচিরহেমলতামবলম্বা তরুণতরুং ভগবন্তম্।
জগদবলম্বনমবলম্বিতমনুকলয়তি সা তু ভবন্তম্॥

গান ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই সভায় দূতীর মূর্তি দেখা দিল, বিষ্ণু অনিমেষ লোচনে সেই মূর্তি দেখিতে লাগিলেন, সকলে চিত্রার্পিত হইয়া রহিল, ব্রহ্মার চারি মাথাই ঘুরিয়া গেল।

ইহীহ সংগায়তি গানপণ্ডিতে
মহেশ্বরে চারুতরস্বরে হরে।
দদর্শ দূতীং সমুপস্থিতামিব
শ্রিয়ঃ পতিঃ স্তব্ধবিলোচনদ্বয়ঃ ॥
সভা চ সানন্তরবোধবর্জিতা
শিবেঽর্পিতাক্ষা অচলা ইব স্থিতা।
সরস্বতী শ্রীরপি তাদৃশে তদা
ব্রহ্মা বিঘূর্ণচ্চতুরাননোঽভবৎ ॥

তাহার পর তান ধরিলেন শ্রীরাগিণীর, অমনি সভায় দূতিকার মূর্তি রাধাবেশ ধরিয়া সাক্ষাৎ শ্রীরাগিণীরূপে আবির্ভূত হইল।

জ্বলৎসুবর্ণামলচারুকায়িকা করদ্বয়ে পদ্মযুগঞ্চ বিভ্রতী।
বিচিত্রভূষাভরণোজ্জ্বলাংশুকা শ্রীরাগিণী রাজতি সস্মিতাননা ॥
যা দূতিকাহূতবতী হরিংপুরঃ সৈবান্যথাকারগতেব সা প্রিয়া।
হরিং প্রলভ্যেব রহঃ স্থিতাশ্লিষৎ তদেতি সাক্ষাদিব বীক্ষতে হরিঃ ॥

শিব তখন ধুয়া ধরিলেন রাধার উক্তি :

রসিকেশ কেশব হে।
রসসরসীমিব মামুপযোজয়
রসময় রসনিবহে ॥ ধ্রুব ॥

বিষ্ণু ভাবগাঢ়তায় শিবকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দ্রবীভূত হইয়া গেলেন।

ইহা হইতে আরও জানা যায় যে, সাধারণতঃ নাটগীত গাহিত পুরুষ গায়নে আর নাচ নাচিত স্ত্রীলোক নর্তকীতে। এই জন্যই চর্যাগীতিকায় (১৭) পাই

নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেঈ[১]
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥

অর্থাৎ নাচিতেছেন হেবজ্র আর গাহিতেছেন দেবী, বুদ্ধ নাটক হইতেছে বিপরীত।

১। প্রাপ্ত পাঠ 'দেবী'।

পঞ্চালিকা বা পুত্তলিকা খেলার জন্য তৈয়ারী হইত। প্রতিমা নির্মিত হইত পূজার জন্য অথবা মন্দিরের ভিত্তি অলংকরণের জন্য। প্রতিমা এখানে ওখানে লইয়া যাওয়া চলিত না, কিন্তু পঞ্চালিকা ছিল জঙ্গম (অবশ্য স্বয়ংক্রিয় নয়)। অমরকোষের মতে পঞ্চালিকার উপাদান ছিল বস্ত্র, হস্তিদন্ত ইত্যাদি। প্রাচীন বাঙ্গালী টীকাকার বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের মতে কাঠ অথবা জন্তুর শিং-ও ব্যবহৃত হইত এই কার্যে

পঞ্চাল দেশ এই ধরণের পুতুল তৈয়ারীর শিল্পকলার উৎপত্তি স্থান ছিল বলিয়াই পঞ্চালিকা নামের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ অনুমান করি।"[১]

উল্লিখিত আটটি মতকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কেহ কেহ মুখ্যতঃ পাঁচালী শব্দটির ব্যুৎপত্তিমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রচলিত পাঁচালীর গঠন ও গাহনারীতির প্রতি নজর রাখিয়া শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেহ কেহ শব্দ ও বিষয়বস্তু দুইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন।

শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থমাত্র গ্রহণ ও বিচার করিয়া পঞ্চাল দেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পঞ্চালিকা হইতে পাঁচালী ('ক' মত); পাঁচ+আলি ('খ' মত); পাঁচ+অলি ('গ' মত)। এই মতগুলি সম্বন্ধে পূর্বে মন্তব্য করিয়াছি। শব্দের দিক হইতে আরও একটি কথা এই যে আলি ('খ' মত) সংস্কৃত প্রত্যয় নহে, কাজেই এই ব্যুৎপত্তিতে পঞ্চালিকা শব্দের সহিত পাঁচালীর কোন সম্বন্ধ বর্তায় না। অলি ('গ' মত) যুক্ত হইলেও পঞ্চালিকা পদের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই দুইটি মতের প্রধান বক্তব্য এই যে পাঁচালী পাঁচজনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন সমবেত প্রয়াস।

গঠন ও গহনার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া পাঁচ অঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া পাঁচালী ('ঙ' মত) এবং পাঁচালীর ছন্দ প্রভৃতি ('চ' মত) বিষয়েও পূর্বে মন্তব্য করিয়াছি। পাঁচালী নামে একটি বিশিষ্ট সুর বা সঙ্গীতাঙ্গ ছিল বলিয়া ('ছ' মত) সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি সূত্র অনুসন্ধান

১। 'পাঁচালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধ, প্রাচ্যবাণী মন্দির প্রবন্ধাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৫, পৃঃ ১-৪।

করিয়াছেন, কিন্তু পাঁচালী ধারার সহিত কি ভাবে উহা অনুস্যূত হইয়াছে তাহা বিশদ করেন নাই। বস্তুতঃ দাশরথির পাঁচালীর সঙ্গে যে নিবদ্ধ সঙ্গীতের পাঞ্চালির যোগসূত্র শিথিল তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। দাশরথির পূর্ববর্তী পাঁচালীর বা প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালীর সহিত ইহা কি ভাবে মিশিয়াছিল, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। ইহা অনুসন্ধানযোগ্য। তবে এটা ঠিক যে নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর সহিত ইহার তেমন যোগাযোগ নাই।

ডঃ সুকুমার সেন কেবল 'পঞ্চালিকা' শব্দের সহিত নহে, পুতুলনাচ প্রথার সহিত পাঁচালী গানের সম্বন্ধের কথা নির্দেশ করিয়াছেন ('ভ' মত)। ইহার সপক্ষে যে আরও যুক্তিপ্রমাণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যতটুকুই সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে রামপাঁচালী বা রামায়ণ, ও ভারতপাঁচালী বা মহাভারত প্রমুখ গ্রন্থের পাঠ বা প্রয়োগের সহিত পুতুলনাচের যে যোগাযোগ ছিল এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ কোথায়? বৃহদ্ধর্মপুরাণের যে বিষয় ডঃ সেন উল্লেখ করিয়াছেন, সে অনুমান যথার্থ হইলেও তাহা পূর্ববর্তী। প্রচলিত রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যাদির প্রয়োগের সহিত পুতুল নাচের যোগাযোগ চোখে পড়ে না। তবে এই সম্বন্ধে কতগুলি সম্ভাব্য অনুমান করা সম্ভব। এমন হইতে পারে যে পুতুলনাচের প্রথা ক্রমে রহিত হইয়াছিল, বা রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যাদি পাঁচালী চণ্ডীমণ্ডপে বা দেবমন্দিরে গীত হইত বলিয়া পুতুল-নাচের কোন দরকার হইত না। অথবা ক্রমে হয়ত পুতুল ছাড়িয়া পাঁচালীর গায়ক নিজেই আসরে নামিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবেন, এবং পঞ্চালিকা বা পুতুল বিদায় নিলেও পাঁচালী নামটি বিদায় নিল না, স্থায়ী হইয়া রহিয়া গেল। গানের বা পাঠের আসরে এখনও নিয়মিত ভাবে উদ্দিষ্ট দেবতার আসন, ঘট, পটাদি বসান হয়। ঘটে পুত্তলিকাও অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই পুত্তলিকাই লুপ্ত পঞ্চালিকা বা পুতুলের স্মারক কি? যাহা হউক কালক্রমে পুতুলনাচ প্রথার অবলোপ ও পাঁচালী গীতের সঙ্গে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সংযোজন হইয়া থাকিতে পারে এবং আরও পরে অন্যান্য গীতশাখার উদ্ভবে পাঁচালী, বিশেষতঃ নূতন পদ্ধতির পাঁচালী একটি নির্দিষ্ট রূপ

পাইয়া থাকিবে। পরিবর্জন ও সংযোজন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতির ফলে পাঁচালীর নানা রূপান্তর হওয়া সম্ভব। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে দাশরথির পর মনোমোহনের সমকালেই পাঁচালীর প্রয়োগ পদ্ধতিতে একেবারে কবিগানের অনুকরণে প্রতিযোগিতা সংযোজিত হইয়াছিল। একপাদ শতকের মধ্যেই যদি এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, তবে শত শত বৎসরে যে কত পরিবর্তন হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। পঞ্চালিকা বা পাঞ্চালী নামের মূলে পঞ্চাল দেশ-ও থাকিতে পারে। কারণ হয়ত পাঞ্চাল দেশে এই ধরণের পুতুল তৈয়ারী হইত বা উক্ত দেশ পুতুল নির্মাণে পারদর্শী ছিল বলিয়া স্থানের নামে—ফরাসডাঙ্গার মত—উক্ত পুতুলকে পঞ্চালিকা বলা হইত।

"বৈষ্ণব তত্ত্ব নিবন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের রচনামাত্রেই হয় পদ, নয় পাঁচালী। পদ হইতেছে গান, একটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ রচনা। ইহা অসংলগ্ন একটিমাত্র গান হইতে পারে, অথবা ধারাবাহিক গানের সমষ্টি হইতে পারে। পাঁচালীর মধ্যেও পদ থাকিতে পারে। আর পাঁচালী হইতেছে ধারাবাহিক আখ্যায়িকা কাব্য, যাহা আসর ফাঁদিয়া গাওয়া হইত একাধিক দিবস ধরিয়া। রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সবই পাঁচালী, এমন কি আলাওলের পদ্মাবতী এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত।"[১]

পদ ও পাঁচালী যেমন এক নহে, তেমনি মঙ্গলকাব্যের সহিতও পাঁচালীর সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। মুখ্যতঃ দেবমহিমাজ্ঞাপক কাব্যগুলিকেই মঙ্গলকাব্য বলা হয়। শ্রীচৈতন্যের মত দেবোপম চরিত্রমূলক কাব্যও মঙ্গলকাব্য। পাঁচালীর বিষয়বস্তু অধিকাংশই দেবমহিমাজ্ঞাপক হইলেও দেবমহিমানিরপেক্ষ পদ্মাবতী, লোরচন্দ্রানী, বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্যসমূহকে পাঁচালীর অঙ্গ হইতে বাদ দেওয়া যায় না। এই হিসাবে পাঁচালীর পরিমণ্ডল মঙ্গলকাব্য হইতে অনেক বড়। দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তু ছাড়াও মুখ্যতঃ নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর প্রয়োগ পদ্ধতি ও গাহনা রীতির সহিত মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে

১। 'পাঁচালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধ, ডঃ সুকুমার সেন, প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১।

মঙ্গলকাব্যে ছড়া নাই, আছে গান, পয়ার আবৃত্তি এবং ছোটখাট বক্তৃতা। অথচ নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ হইতেছে ছড়া। শুধু তাহাই নহে, গ্রামাঞ্চলে দাশুরায়ের পাঁচালী বলিতে জনসাধারণ এই ছড়াগুলিকেই বুঝিয়া থাকে। এই ছড়াগুলির উৎস কবিগান। বোধহয় এইদিকে দৃষ্টি দিয়াই সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন : "দাশু কবির গান আর মঙ্গল গান মিশাইয়া পাঁচালী সৃষ্টি করেন।" নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর সহিত সম্পর্ক বিচারে 'বিজয়' আখ্যাত কাব্য সম্বন্ধে-ও এই একই উক্তি প্রযোজ্য।

ঝ

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের চাপে ও নানা জনপ্রিয় সঙ্গীতের পরোক্ষ প্রভাব ও প্রত্যক্ষ সংমিশ্রণে পাঁচালীর রূপ ক্রমশ যে পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা চলে। বোধহয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যকাল হইতেই এই পরিবর্তনের লক্ষণসমূহ স্পষ্ট রূপে আকার গ্রহণ করিয়াছিল। জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার 'করুণানিধানবিলাস'-এ ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের বাঙ্গালা দৃশ্য কাব্যের একটি তালিকা দিয়াছেন। অন্যান্য শাখার সহিত তিনি উল্লেখ করিয়াছেন :

পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর।
কতকথা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর ॥

এইখানে 'অনেক ভাঁতি' কথাটি বিচার্য। ইহাদ্বারা মনে হয় যে তখন রামচরিত্র, কৃষ্ণচরিত্র, শিবদুর্গাবিষয়ক গান, অর্থাৎ রামায়ণ বা রামপাঁচালী, কৃষ্ণপাঁচালী, শিবায়ন ইত্যাদি ভাবে অনেকটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল। জয়নারায়ণ উনিশ শতকের প্রথমে প্রচলিত পাঁচালী-যাত্রার যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

॥ গীত পাঁচালী ॥

॥ তাল খেমটা ॥

এখন আর কেমন কয়্যা বিলিবে তোরা রাধাকলঙ্কিণী ॥ ধুয়া ॥
জটিলা কুটিলা মান হইয়া গেল হত
তাহা মুখে কব কত

অবিরত বলিতে লজ্জা পায়
পরখে সতীর গুণ হইল বিদিত
নারীর চরিত্র যত
অভিভূত শুনিয়া সবাই
ঘরে ঘরে করে কানাকানি ॥

॥ দোসরা গীত ॥

॥ নারদ বাসুদেবের উক্তি ॥

॥ রাগিণী ঝুমুর ॥

॥ তাল খেমটা ॥

এই কলঙ্কভঞ্জনের কথা শুনি নারদ মুনি ॥ ধুয়া ॥
বাসুদেব সঙ্গে করিয়া আসিল অমনি ॥ পর ধুয়া ॥
অগ্রবনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান
কোথায় আছেন কৃষ্ণ আনহ সন্ধান
দেখা হইলে মোর কথা কবা তুমি এই করি যোড়পাণি ॥
বাসু কহে কোন কৃষ্ণ কিবা রূপ ধরে
জাতিকুল কহ তার থাকে কোন ঘরে
জনমিয়া দেখি নাই তারে বল কেমন কর‍্যা চিনি ॥
মুনি কহে নীলকান্ত জিনি রূপ তার
আভীর জাতির মধ্যে আছেন এবার
বৃন্দাবনে বাস তার নন্দঘরে যার মাতা নন্দরাণী।
বাসু কহে কোনমুখে যাব মহাশয়
মুনি কহে নন্দগ্রাম ঐ দেখা যায়
পাথেয় পয়সা দিলেন তাহারে বসু চলিল তখনি ॥
বৃন্দাবন পথ ভুলি যায় দীল্লিপানে
পথ দেখাইল মুনি জ্ঞান অজ্ঞজনে
নাচিতে নাচিতে আসি বৃন্দাবনে আসিয়া হেরিল সে নীলমণি ॥

॥ বসুদেবের গীত আরম্ভ ॥

॥ রাগিণী সুহিনি ॥

॥ তাল পশতো ॥

রূপ দেখিয়া অবাক হইল নারদের বাসু ॥ ধুয়া ॥
চরণতলে দেখে কত ফুটিয়াছে টেসু ॥ পর ধুয়া ॥
ঘুঙ্গুর বাজে নূপুর বাজে অভয় দিয়ে আশু
চরণকমল হেরি হইল উল্লাসু ॥
করিতে স্তুতি নাহি জানি আমি অতি পশু
তোমার তত্ত্ব লইতে মুনি পাঠাইলা বাসু ॥
পিতামহের তাত তুমি এবে হইলা শিশু
না দেখি বিমলপদ মুনিবর ত্রাসু ॥
আজ্ঞা হৈলে মুনিবরে আনে গিয়া বাসু
অজ্ঞান পাপীর পাপে মার জ্ঞান ইষু ॥

॥ গীত মুনি উক্তি ॥

॥ রাগ ভৈরব ॥

॥ তাল চলতা ॥

কখন সে হরি পদ দেখিবে এ দীন ॥ ধুয়া ॥
পাইয়া চরণ সুধা
শান্ত হবে আশাক্ষুধা
নয়ন চকোর তাহে হইয়া রবে লীন ॥
হরি পদ মহাতরি
হেরিলে যাইব তরি
পার হব ভববারি আমি দীনহীন ॥
সে পদ সুচারু ভানু
পাপ নাশে মম তনু
জাগিবে তাহার মানু ত্যজি পরাধীন ॥

সে পদ নির্মল জল
তাহে রব অবিকল
প্রাণ মম দুই দল হবে তাহে মীন ॥
সে পদ অচল তলে
বান্ধি মন সুচঞ্চলে
তনু তরি নাহি টলে হইব প্রবীণ ॥
দেখিয়া চরণখানি
ধরে পদ দিয়া পাণি
পূর্ণ ব্রহ্ম জান্যা মুনি বাজাইল বীণ ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে
মুখে বলে হরে হরে
বার বার নতশিরে করে প্রদক্ষিণ ॥
নারদের নিবেদন
শুন প্রভু নারায়ণ
তোমার অধীন হন সদা গুণ তিন ॥ গীত সাঙ্গ ॥

এই উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি জিনিসের প্রতি সহজেই চক্ষু আকৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ গানের তাল হালকা এবং সুরেও কীর্তনের বিশুদ্ধি নাই; অথচ পালার বিন্যাস অনেকটা কীর্তনের ছাঁচে ঢালা। অবশ্য বাসুদেব ও নারদের এইরূপ উপস্থিতি কীর্তনে বোধহয় কদাচ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বর্ণনা অংশ কম, এবং প্রকাশভঙ্গীতে গীতি কবিতার সুর ও নাটকীয়তা সুস্পষ্ট। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। নূতন পদ্ধতির পাঁচালীতে গীত ও আবৃত্তি ছাড়াও কতগুলি ছড়ার প্রাধান্য ছিল। এই ছড়াগুলির মধ্যে ছিল কবির তর্জার সুস্পষ্ট ঝোঁক। কিন্তু এই ছড়াগুলি বোধ হয় করুণানিধানবিলাস রচনার কালেও পাঁচালীতে অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে সংযোজিত হয় নাই। কারণ তাহা হইলে জয়নারায়ণ অবশ্য উহা উল্লেখ করিতেন। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে তখন ছড়াগুলি মুখে মুখে বানাইয়া বলিবার রীতি ছিল। যাহা হউক দাশরথির পাঁচালীতে এই জাতীয় প্রচুর ছড়া পাওয়া যায়। দাশরথির পূর্বেকার কোন নূতন পদ্ধতির

পাঁচালীর নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বলিয়া ছড়া কখন পাঁচালীতে সংযোজিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে দাশরথি কবির দলের সরকারী ছাড়িয়া পাঁচালী রচনাতে হাত দিয়াছিলেন বলিয়া, কবিগানের এই জনপ্রিয় অংশটি তিনিই পাঁচালীতে যুক্ত করিয়াছিলেন—অন্য প্রমাণাভাবে এই অনুমান করা অসঙ্গত নহে। দাশরথি যে পাঁচালীকে এক প্রকার ঢালিয়া সাজাইয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও স্মরণীয়। কবির গান ও মঙ্গল গান মিশাইয়া দাশরথি পাঁচালী সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে অনুমানটি করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য।[১]

করুণানিধানবিলাস রচনা ১২২০ সালে (১৮১৩ খ্রীঃ) আরম্ভ হইয়া ১২২১ সালে (১৮১৪ খ্রীঃ) শেষ হয়।[২] আর দাশরথি পাঁচালীর দল আরম্ভ করেন ১২৪২ সালের শেষে অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই কুড়ি একুশ বৎসরের মধ্যে বা অন্তে ছড়া সংযোজন ও পাঁচালীর এই প্রকার রূপান্তর সম্ভব হইয়াছিল।

জয়নারায়ণধৃত উপরের উদাহরণে 'পাঁচালী-যাত্রা' কথাটি বিচার্য। পাঁচালী ও যাত্রা দুইটি কথাই বিশেষ ও স্বতন্ত্র অর্থে বাঙ্গালা সাহিত্যে দীর্ঘ দিন হইতে প্রচলিত আছে।

যাত্রা কথাটি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ভবভূতি মালতীমাধবে যাত্রা শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।[৩] 'যাত্রা' এই শব্দ এবং 'উৎসব' এই অর্থ ছাড়া বাঙ্গালা যাত্রাগানের সঙ্গে ঐ যাত্রার অন্য কোন সম্বন্ধ আবিষ্কার করা শক্ত। ললিতবিস্তরে বুদ্ধদেবের অভিনয়-প্রীতির কথা আছে। কেহ কেহ এই অভিনয়কে যাত্রা বলিয়া থাকেন। এমন কি অনেকে মনে করেন যে বৈদিক স্তোত্রাদির এবং কথোপকথনের মধ্যেই যাত্রার বীজ নিহিত।

১। আলোচ্য অধ্যায়ে পাঁচালীর আলোচনার 'ছ' মতটি দ্রষ্টব্য।

২। "বারশত বিস সাল মাস অগ্রহায়ণ। রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈলা আয়োজন॥ ইতি শ্রীকরুণানিধানবিলাস গান। বার শত একুইশ সালে হইল পূরণ॥

৩। "কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রাপ্রসঙ্গেণ"—প্রথম অঙ্ক।

"Even the Vedic age knew Jatra, as a venerable heir-loom of Aryan antiquity. The gods of the Rig Veda were hymned in choral procession. Some of the Sama Veda hymns reechoed the rude mirth of the primitive Jatra-dances."[১] কিন্তু বাঙ্গালা যাত্রাভিনয়ের সহিত উহার যোগসূত্র কোথায় ?

শ্রীচৈতন্যদেব একবার সন্ন্যাসের পূর্বে পার্ষদদিগের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। উহাই যাত্রার মূল কিনা বলা দুষ্কর। যাত্রার ইতিবৃত্ত প্রবন্ধে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন: "প্রাচীন বাঙ্গালায় যাত্রা শক্তিপূজার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। শুম্ভ নিশুম্ভ বধ বা অন্য কোন অসুর বধের উপাখ্যান লইয়া যাত্রাগানের পালা রচিত হইত। এক হিসাবে আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীকে যাত্রার মূল নাট্য সাহিত্য হিসাবেও গণ্য করিতে পারি। চণ্ডীতে মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আরম্ভের পর হইতে।"[২] কিন্তু এই মতবাদের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ কি ?

কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন প্রমুখ যেসব যাত্রা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল, তাহাদের সহিত কবি, পাঁচালী প্রভৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।[৩] তাছাড়া যে কোন একটি শাখার জনপ্রিয় কথা, ঢং, উপকরণ যে অন্যান্য শাখায়ও গৃহীত হইত সে সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন: "পাঁচালী হইতে যাত্রার উদ্ভব। যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে পাঁচালীতে মূল গায়ন বা পাত্রও একটি মাত্র; যাত্রায় একাধিক, সাধারণতঃ তিনটি। যাত্রার একটি বড়

১। The Indian Theatre—I. E. P. Herbetz, p, 178, Foot-note.

২। সাহিত্যের কথা, ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ২১৫।

৩। "...Jatra, a species of popular ammusement which was closely allied to Kavi and Panchali."—History of Bengali Literature in the 19th century—Dr. S. K. De. p. 442.

বিশেষত্ব ছিল নারদ মুনিকে কাচ কাচিয়া হাস্যরসের যোগান দেওয়া। যাত্রা শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও অন্তবিধ উৎসব। আধুনিক কালে নদীর যাত ও মানাদের যাত এইসব স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীতি এবং তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অর্থাৎ অন্য কাহিনীময় নাট গীতি।[১]

পাঁচালী বলিতে এইখানে প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালী ধরা হইয়াছে। পাঁচালীর সঙ্গে যাত্রার যে মাতাপুত্রী কি সোদর সম্বন্ধ ছিল, তাহা জয়নারায়ণ-ধৃত পাঁচালী যাত্রা কথাটি হইতেও অনুমান করা যায়। হয়ত না-পাঁচালী না-যাত্রা এমন একটা মিশ্ররূপ প্রচলিত ছিল, যাহাকে পাঁচালীযাত্রা বলা হইত। হয়ত দাশরথির পূর্বকার উনিশ শতকে প্রথম দিককার পাঁচালীর রূপই ছিল এমনি মিশ্র রূপ। নারদের ও তৎশিষ্য বাসুদেবের কাচ কাচা যাত্রার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জয়নারায়ণের উদ্ধৃতিতে তাহার উল্লেখ আছে। অথচ যাত্রা ধরণের কথোপকথন জাতীয় আঙ্গিক নাই, গানের সঙ্গে পাঁচালী ধরণের বর্ণনা ও কথোপকথন এক হইয়া আছে। দাশরথির হাতে পরিমার্জিত হইয়াই হয়ত পাঁচালী-যাত্রা উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকে নূতন পদ্ধতির পাঁচালীতে রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে। "পরিশিষ্ট ক" অংশে পাঁচালীর নমুনা উল্লিখিত হইয়াছে।

এও

কবি, আখড়াই ও পাঁচালী এইগুলির সাধারণ পরিচয় ও ইতিহাস যথাসম্ভব বিবৃত করা হইল। এইবার ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক—ঐক্য-অনৈক্য, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলি—যতটা সম্ভব পুনরুক্তি বাঁচাইয়া আর একবার স্মরণ করিতেছি। ইহাতে বক্তব্যটি অধিকতর স্পষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

দেখা যাইতেছে যে কবি, পাঁচালী, আখড়াই সবগুলিরই আসর বসিত। কিন্তু বিষয়বস্তু, গাহনার রীতি, গায়কদল ও বাদ্যযন্ত্রাদি সরঞ্জাম, অনেক সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর দিক হইতেও ইহাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। আলোচ্য শতবৎসরে, বিশেষতঃ পাঁচালী ও আখড়াইর ক্ষেত্রে উহার শেষার্ধে, এইগুলির

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৯৫৯।

স্বরূপ কি প্রকার ছিল, তাহার সাধারণ আলোচনা করিয়াছি, এইবার পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করা যাউক।

প্রথমতঃ বিষয়বস্তু ও তাহার বিন্যাস লইয়া এই তিনটি শাখার মধ্যে পার্থক্যাদি বিচার করিতেছি। পাঁচালীতে আখ্যায়িকা ও সঙ্গীত একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহাকে গীতপ্রধান আখ্যায়িকা বা আখ্যায়িকা-প্রধান গীত এই দুই নামই দেওয়া চলে। এ সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা হইয়াছে। দাশরথির জীবনীকার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন: "পাঁচালী কথাপ্রধান সঙ্গীত।"[1] পাঁচালীর মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা বা কাহিনী বিবৃত হয়। এই কাহিনীটি দেবমহিমামূলক অর্থাৎ ভক্তিরসাত্মক হইতে পারে; আবার একেবারে দেবমহিমাসংশ্রবশূন্য খাঁটি প্রণয়কাহিনীমূলক-ও অর্থাৎ আদিরসাত্মকও হইতে পারে। বিষয়বস্তু বিচারে মঙ্গলকাব্যের সহিত পাঁচালীর প্রধান পার্থক্য এই যে মঙ্গলকাব্যে মূলতঃ দেবমহিমাই মুখ্যভাবে বর্ণিত হয়। বিদ্যাসুন্দরের মত প্রণয়-কাহিনী এবং আদিরসাত্মক বিষয়ও দেবমহিমা প্রচারের পটভূমিকা ব্যতীত মঙ্গলকাব্যে স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে পাঁচালীতে নলিনীভ্রমর-কাহিনী, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি একেবারে দেবসংশ্রবশূন্য পালার অভাব নাই।

কবিগানের বিষয়বস্তুর সহিত পাঁচালীর বিষয়বস্তুর বিশেষ পার্থক্য আছে। কবিগানের বিষয়বস্তু মূলতঃ কতগুলি ভাব ও তাহাদের নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র, ইহাতে কোন একটি মূল বা ধারাবাহিক আখ্যায়িকা থাকে না। অর্থাৎ অংশবিশেষ থাকে ধর্মমত বা সমাজগত কোন বিতর্কমূলক আলোচনা। ইহার মধ্যে আখ্যায়িকা যদি থাকে, তাহা বাদানুবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়। সখীসংবাদের মধ্যে একটি পূর্বপরিজ্ঞাত কাহিনীর পটভূমিকা মানিয়া লওয়া হয় বটে, কিন্তু একটু নজর করিলেই দেখা যায় যে তাহা আসলে ধারাবাহিক কোন আখ্যায়িকা নহে, উত্তর-প্রত্যুত্তরে গঠিত বাক্‌চাতুর্যপূর্ণ কতগুলি খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গীত মাত্র। কাহিনীর বেগ, আবর্ত, ধারাবাহিকতা ও পরিণতি ইহার মধ্যে নাই। বিরহ গীতের মধ্যেও কয়েকটি ভাবের অনুসরণ করা হয়। দেবীবিষয়ক গীত, আগমনী বাদ দিলে,

[1] মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনী, পৃঃ ৬৩

মুখ্যতঃ গাঢ় ভক্তির প্রকাশ মাত্র। কাজেই বলা যায় যে কবিগানের তিনটি অঙ্গেই দেবীবিষয়ক গীতে, সখীসংবাদে ও বিরহে বিচ্ছিন্ন বহু আখ্যায়িকা আভাসিত হইলেও, উহাতে কোন ধারাবাহিক আখ্যায়িকা নাই।

আখড়াই গানও এক প্রকার আখ্যায়িকা-বর্জিত বিশিষ্ট ভাবমূলক সঙ্গীত। পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

এইবার গাহনার রীতি ও প্রয়োগ-পদ্ধতি লইয়া আলোচনা করা যাউক। "পাঁচালী কাব্য আগাগোড়াই গান করা হইত না। মধ্যে মধ্যে বর্ণনাময় অংশ গায়ন দ্রুত তালে আবৃত্তি করিয়া যাইত, তাহার বাম হাতে থাকিত চামর, ডান হাতে মন্দিরা, পায়ে নূপুর। পালি অর্থাৎ দোহার থাকিত অন্ততঃ দুইজন। আর কখনো কখনো থাকিত মৃদঙ্গবাদক।"[১] ইহা প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালীর প্রয়োগকলা। মঙ্গলগানও খুব সম্ভব একই ঢঙ্গে গাওয়া হইত, অন্ততঃ বিশেষ পার্থক্য ছিল মনে হয় না। তবে মঙ্গলগানে এক দ্বিজ মাধব ছাড়া গীতোচ্ছ্বাসের পরিমাণ খুব কম ছিল। সময় সময় পয়ারবিবৃত ভাবাবেগকেই সুরে গাওয়া হইত, যেমন লক্ষীন্দরের মৃত্যু বা বেহুলার ভাসান। মঙ্গলকাব্যে গান, পয়ার, আবৃত্তি ও ছুট কথার ব্যবহার থাকিলেও ছড়ার কোন ব্যবহার দেখা যায় না।

নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর প্রয়োগরীতিতে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়াছিল। মূল গায়ন ভাঙ্গা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে আখ্যান ভাগটি আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, এবং মুখ্যতঃ ইহা হইত নাটকীয় ভঙ্গীতে উত্তর-প্রত্যুত্তর জাতীয়। গায়ন একাই বিভিন্ন পাত্রের মুখপাত্র হইতেন। কখনো টিকাটিপ্পনী করিতেন, মূল আখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে উপাখ্যান বা রসাল প্রসঙ্গ বিস্তার করিয়া রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেন। কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতেন কৌশলে কাকু, শ্লেষ ও অর্থবহ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা। ছড়াকাটা হইল ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। গদ্যে ছুট কথারও ব্যবহার হইত। তারপর বিবৃতি বা কথোপকথন যখন ভাবের দিক দিয়া চরমে উপনীত হইত, তখনই তাহা গানের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। মূল গায়নই সর্বদা গান গাহিতেন না, বরং গানের জন্যই অন্য সুগায়ক নির্দিষ্ট থাকিত। মূল গায়ন আবৃত্তি করিয়া, ছড়া কাটিয়া,

---

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৮৪।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া আসল কাহিনীটিকে নিশ্চিত পরিণতিতে পৌছাইয়া দিতেন।

কবির গানের গাহনা রীতির সহিত ইহার পার্থক্য অনেক। কোন মূল আখ্যানবস্তু না থাকায় এবং কবিগান মূলতঃ প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় প্রতিপক্ষকে উপযুক্ত উত্তর দেওয়া বা চাপান দেওয়াই হইল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে কবিয়ালকে আসরে বসিয়া তৎপরতার সহিত প্রশ্ন ও উত্তর রচনা করিতে হইত। কবির হাটে দেনাপাওনা একেবারে হাতে হাতে মিটাইয়া দিতে হইত। প্রশ্ন-উত্তর বা উত্তর-প্রত্যুত্তরের মুখ্য ভাগের পরিবেশন হইত সুরের স্পর্শ লাগা দ্রুত বিবৃতির মাধ্যমে। গানের সময় মূল কবিয়াল পেছনে থাকিয়া গায়কদের কানে কানে কথার যোগান দিতেন। একমাত্র ছড়া কাটিবার সময়ে কবিয়াল নেপথ্য ছাড়িয়া আসরের পুরোভাগে দাঁড়াইতেন। পাঁচালীর মূল গায়কের মত কবিয়াল সর্বদাই আসরের পুরোভাগে থাকিতেন না। প্রায় পনেরো আনা কবির গান ও ছড়া আসরে বসিয়াই রচনা করা হইত। পক্ষান্তরে পাঁচালীতে থাকিত বাঁধা বিষয় অর্থাৎ পূর্বরচিত গন্থ, গান ও ছড়া। মূল কাহিনীকে অনুসরণ করিতে হইত বলিয়া পাঁচালীতে বিষয়গৌরব লঘু বা উপেক্ষা করা যাইত না, কবির মত নিছক হালকা কথার যথেচ্ছ ভ্রমণ সম্ভব হইত না। কবিগানে ছুটকথার বাহার, বাক্যের ঝাঁঝ ও অর্থের শ্লেষ, উপস্থিত ঘটনার উপর রসাল মন্তব্য, বাক্‌চাতুর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতিই বিশেষভাবে গণ্য হইত। কিন্তু পাঁচালীর আসল বিচার্য বস্তু ছিল মূল কাহিনীর বিস্তার এবং ব্যাখ্যানের ভাবগাম্ভীর্য ও কাব্যসৌন্দর্য, প্রসঙ্গত বিষয়ের আলোকে সমসাময়িক ঘটনা ও কার্যাবলীর উপর রসাল মন্তব্য, সরস ছড়ার ব্যঞ্জনাপূর্ণ আবৃত্তি এবং সর্বোপরি গূঢ়ার্থপূর্ণ ভক্তিরসব্যঞ্জক গীত। কবিগান মাত্রেই হইল প্রতিযোগিতামূলক, কিন্তু নূতন পদ্ধতির পাঁচালী প্রথমদিকে প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। অর্থাৎ এক আসরে একদলই শুধু গান গাহিত। পরে উনবিংশ শতকের উত্তরভাগে পাঁচালী প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। কিন্তু কবির লড়াইর সহিত পাঁচালীর এই প্রতিযোগিতার পার্থক্যও কম ছিল না। পাঁচালীতে সাঁজবাজানো, ঠাকরুণবিষয়ক ইত্যাদি ক্রমে বাঁধারীতিতে এক এক দল আসর করিয়া যাইত অর্থাৎ মূলতঃ উত্তর-

প্রত্যুত্তরমূলক না হওয়ায় এক দলের মূল কাহিনীটির বর্ণনা ও বিস্তার অন্য দলের গীতাদি দ্বারা ব্যাহত হইত না। কথা কাটাকাটি বা চাপান উতোর নহে, "যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপ ছড়া কাটাইতে ও গান গাহিতে পারিতেন, সেই দলের ভাগ্যেই জয়শ্রী দীপ্তিমতী হইয়া নিশানলাভ ঘটিত।"[১] গীতরচনার দিক দিয়াও কবিগান এবং পাঁচালীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। কবিতে গান রচনার একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। মহড়া, চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলা, অন্তরা ইত্যাদি এই ধরণের সুনির্দিষ্ট ছন্দের বাঁধা পদ্ধতিতে কবিগান রচিত হইত। হাফ আখড়াইতেও এই একই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। আখড়াইতে অবশ্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। সে ক্ষেত্রে অনেকটা টপ্পার মত সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়বদ্ধ রচনাকে কেন্দ্র করিয়া সুরবিচিত্রা প্রকট করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। পাঁচালীতে কিন্তু গীতরচনার এমন ধরাবাঁধা কোন পদ্ধতি ছিল না। প্রয়োজনানুযায়ী গীত ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের হইত এবং যে কোন সুরতালসহযোগে তাহা গীত হইতে পারিত। বিভিন্ন চরিত্রের জবানীতেই হউক বা এমনিই হউক আখ্যায়িকাকে একটি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌছাইয়া দিবার কোন অনুকূল অবস্থা আসিলেই উপযুক্ত ভাবানুযায়ী ও সুরতাল অনুযায়ী গীত রচিত হইত। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে পাঁচালীতে প্রধানতঃ মার্গ সঙ্গীতের ধারাই অনুসৃত হইত। লঘু ও হালকা চালের গান ব্যবহৃত হইত বিশেষ ক্ষেত্রে এবং ইহা অনেকটা বৈচিত্র্য সাধনের উপায়স্বরূপ বিরল ব্যতিক্রমরূপে প্রযুক্ত হইত।

আখড়াই গীত একেবারে বৈঠকী ধরণের। অর্থাৎ ইহা একেবারে আখ্যায়িকাসংস্রবহীন ও গদ্য টীকাটিপ্পনীবর্জিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে গাওয়া হইত। ইহার মালসী, প্রণয়গীতি, প্রভাতী এই তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তর ছিল। আখড়াই গীতের বিচার্য বিষয় ছিল সুর, তাল, বিষয়বস্তু ও ভাব, বাজনা, সঙ্গত ইত্যাদি। সুতরাং কবি ও পাঁচালীর প্রয়োগরীতির সহিত ইহার কোন মিল নাই। পরে কবির প্রশ্নোত্তর ভঙ্গী ও গীতক্রম যুক্ত হইয়া হাফ আখড়াই রচিত হইয়াছিল।

এইবার ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদির দিক হইতে বিচার করা যাউক। সর্বাগ্রে বোধহয় কবির মুখ্য বাদ্যাদি ছিল টিকেরা, পরে কাড়া হয়। হরুঠাকুর

১। মনোমোহন গীতাবলী, পৃঃ ১৬১

প্রভৃতির সময় ঘোরখাই, তৎপর ঢোলের সঙ্গত আরম্ভ হয়।[১] কবিগানে শেষ পর্যন্ত ঢোল, কাঁসি, মন্দিরা, বেহালাদি ব্যবহৃত হইত। মঙ্গল গানে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার ব্যবহার চালু ছিল। রামায়ণে প্রথমদিকে মৃদঙ্গ ব্যবহার হইত না, কেবল মন্দিরা বাজিত।[২] নূতন পদ্ধতির পাঁচালীতে কিন্তু প্রথম হইতেই কবির মত ঢোল প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। পরে বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং উনবিংশ শতকের উত্তরার্ধে পাঁচালীতে হাফ-আখড়াইর ন্যায় তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ইদানীং ঐক্যতান বাদ্যের ফ্লুটাদি উপকরণও তৎসঙ্গে থাকিত।"[৩] অর্থাৎ কবিগানের মত সরল বাদ্যযন্ত্র লইয়া আরম্ভ হইয়া নূতন পদ্ধতির পাঁচালীতে পরবর্তীকালে আখড়াই গানের মত বিচিত্র ও বহুসংখ্যক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। সাজ-বাজানো নামে একটি নূতন অঙ্গই পরে পাঁচালীতে যুক্ত হইয়াছিল। কবিগান কিন্তু এই বাদ্যযন্ত্রবাহুল্য হইতে সর্বদাই মুক্ত ছিল।

এখন শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে তাকান যাউক। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের দিকে কবিগান অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তদানীন্তন ভদ্রলোক, মুখ্যতঃ শেঠ, বণিক প্রমুখ ধনিশ্রেণীর নিকট কবিগান অতি আদরের বস্তু ছিল। কিন্তু কবিগানেরও রকমফের ছিল। সকলে এক ধরণের গীতে সন্তুষ্ট হইত না। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন: "বিশিষ্টজনেরা ভদ্রগানে, এবং ইতরজনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত।"[৪] এই প্রসঙ্গে গুপ্ত কবি নিতাই বৈরাগীর কবি-গানের আসরের যে এক বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এই অধ্যায়ে পূর্বেই উদ্ধার করিয়া দিয়াছি।[৫]

পক্ষান্তরে আখড়াই গীতের ছিল একটি বিশিষ্ট রূপ ও পরিমার্জিত পরিবেশ। উচ্চ সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ ও মার্জিতরুচি ভদ্রগণ ছাড়া অশিক্ষিত জনসাধারণ কদাচ আখড়াই গীতে আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইত না। আখড়াই ভাঙ্গিয়া কবি-

---

১। সংবাদপ্রভাকর, ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১, পৃঃ ৪।

২। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'পাঁচালী' প্রবন্ধ, শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৬০।

৩। মনোমোহন গীতাবলী, পৃঃ ৬২।

৪। সংবাদপ্রভাকর, ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১, পৃঃ ৬।

৫। পূর্ণ উদ্ধৃতির জন্য ২১ পৃঃ ৩নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

গানের ঢং অনুসারে এই কারণেই হাফ-আখড়াইর সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহাতেও উহার শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিধি বেশি দূর প্রসারিত হয় নাই।

কিন্তু নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর একটি সাধারণ ও সর্বজনীন রূপ ছিল। একটি মূল কাহিনী অনুসরণ করিবার ফলে এবং ভক্তিরসের আধিক্য থাকায় পাঁচালী শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিত। পাঁচালীর ছড়ার মধ্যে কবিগানের ছড়া ও টপ্পার বাক্‌চাতুর্যের আমেজ ছিল। খেউড়ের পরিবর্তে বিরহ, নলিনী-ভ্রমর জাতীয় পাঁচালীর মধ্যে লৌকিক নানা রসালোচনার সুযোগ থাকায় মোটামুটিভাবে পাঁচালী সকলেরই ভাল লাগিত। নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে জয়নগরের চাষীগণ পর্যন্ত সকলেই সংস্কার, রুচি ও ক্ষমতানুযায়ী রস ও আনন্দ আহরণ করিতে পারিত।

এইবার সংক্ষিপ্ত সূত্রের নকসা দিয়া বক্তব্যটির উপসংহার করিতেছি।

পাঁচালী	কবিগান	আখড়াই
ক বিষয়বস্তুর দিক হইতে পার্থক্য :		
১। সুস্পষ্ট আখ্যান আছে	১। স্পষ্ট আখ্যান নাই	১। আখ্যানই নাই
২। স্বয়ংসম্পূর্ণ পালা	২। দেবীবিষয়ক, সখী-সংবাদ, বিরহ খেউড় এইক্রমে চাপান উতোরমূলক রচনা	২। বিশেষ ভাবমূলক গাঢ়বন্ধ ও সুরসমৃদ্ধ রচনা
৩। পৌরাণিক, লৌকিক যে কোন বিষয়বস্তু	৩। দেবীবিষয়কাদি ভাব লইয়া রচিত	
খ প্রয়োগপদ্ধতির দিক হইতে পার্থক্য :		
১। মূল গায়ন আবৃত্তি ছড়া গীতাদি দ্বারা মূল কাহিনী নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিত	১। কবিয়াল মুখ্যতঃ পিছনে থাকিয়া গায়কদের কানে কানে কথা যোগাইত	১। আসরে বসিয়া বেশী সময়ে সকলে মিলিয়া গাহিত
২। মূল গায়ন সর্বদা পুরোভাগে থাকিত	২। শুধু টপ্পা ও ছড়ার কালে পুরোভাগে আসিত	২। সকলেই একত্র বসিয়া গাহিত

পাঁচালী	কবিগান	আখড়াই
৩। গানের জন্য ভিন্ন লোক থাকিতে পারিত	৩। ভিন্ন লোক থাকিতই	৩। সকলেই গাহিত
৪। গীত ও পালা পূর্বরচিত	৪। আসরে রচিত	৪। পূর্ব-রচিত
৫। প্রতিযোগিতা-মূলক ছিল না : এক দলই গাহিত : বিচার্য গান আবৃত্তি ইত্যাদি : পরে প্রতিযোগিতা আসে	৫। সর্বদা প্রতিযোগিতা : দুই দলে প্রশ্নোত্তর : বাক্-চাতুর্যাদি বিচার্য	৫। বাঁধা নিয়মে প্রতিযোগিতা : বিচার্য সুরতালাদি
৬। গান রচনার বাঁধা পদ্ধতি নাই : যে কোন আকার ও সুরতাল	৬। মহড়া, চিতেন ইত্যাদি ক্রমে বাঁধা পদ্ধতি	৬। মালসী, প্রণয় গীতি, প্রভাতী এই নির্দিষ্ট স্তর ও ক্রম

গ বাদ্যযন্ত্রের দিক হইতে পার্থক্য :

পাঁচালী	কবিগান	আখড়াই
১। ঢোল, কাঁসি : পরে আখড়াইর মত সাজ বাজানো	১। প্রথম ঢাক : পরে ঢোল, কাঁসি, মন্দিরা	১। তানপুরা, বেহালা, ফ্লুট ইত্যাদি বহু বাদ্য

ঘ শ্রোতৃমণ্ডলীর দিক হইতে পার্থক্য :

পাঁচালী	কবিগান	আখড়াই
১। শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বসাধারণ	১। শিক্ষিতগণ বিরহ ও সখীসংবাদ ; অশিক্ষিতরা খেউড় ভালবাসিত	১। সঙ্গীতজ্ঞ মার্জিতরুচি ভদ্রগণ

ট

দাশরথির পাঁচালীর মুদ্রিত রূপ পাওয়া যায় এবং ইহা গাহনার ক্রমানুযায়ী অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে, এই অনুমান করা যায়। পরে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। যাহা হউক ইহা দেখিয়া বুঝা যায় যে দাশরথির সময়ে পাঁচালী গাহনার রীতির যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছিল। প্রথম উল্লেখযোগ্য

বিষয় এই যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু লইয়া এক একটি পালা রচিত হইত এবং একই দল একই আসরে বসিয়া একটানা পালা সম্পূর্ণ গাহিত। গীতের প্রাধান্ত ছিল সর্বাধিক, কিন্তু মূল বিষয়বস্তু বর্ণিত হইত মুখ্যতঃ পয়ার ও ভাঙ্গা ত্রিপদী ছন্দে রচিত শ্লোকে। মূল গায়ন এই শ্লোকগুলি আসরের চারিদিকে মুখ করিয়া বার বার আবৃত্তি করিতেন এবং উচ্চারণ বৈচিত্র্যে ও অঙ্গভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে উহার তাৎপর্যগুলি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন। ইহা ছাড়া কতগুলি ছড়াও ছিল। পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে এই ছড়াগুলি ছিল কবির অঙ্গ এবং কবিগান হইতেই ইহা পাঁচালীতে সংযোজিত হইয়াছে। অনুমান দাশরথিই এই সংযোজনা করিয়াছেন। রাম, কৃষ্ণ, শিবদুর্গা ও অন্যান্য দেবমহিমামূলক বিষয় ছাড়াও লৌকিক ঘটনা এবং নানা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় বিষয়বস্তুও পাঁচালীর উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত। দাশরথির পর ব্রজ রায়, রসিক রায় প্রমুখ পাঁচালীকারগণ দাশরথির ধারাই মুখ্যতঃ অনুসরণ করিয়াছেন।

ইহার পর উনবিংশ শতকের শেষের দিকে পাঁচালী গাহনা পদ্ধতির আরও পরিবর্তন হইয়াছিল। তখন আর এক দলের পাঁচালী হইত না, কবিগান ও হাফআখড়াইর মত পাঁচালী সঙ্গীত সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মনোমোহন গীতাবলীর বিবৃতিটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতেছি।

"নব্য সম্প্রদায়ের গোচরার্থ পাঁচালী বস্তুটা কি একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। যদিও হাফআখড়াই ও দাঁড়াকবির ন্যায় পাঁচালীতেও দুই দলে সঙ্গীত সংগ্রাম হইত, কিন্তু উহাদের ন্যায় ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত না। অর্থাৎ কবিতে যেমন একদল পূর্বপক্ষ রূপে আসরী গান গাহিলে, অপর দল উত্তরপক্ষ রূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন, পাঁচালীতে তৎপরিবর্তে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানের লড়াই হইত, যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে ছড়া কাটাইতে ও গান গাহিতে পারিতেন, সেই দলের ভাগ্যেই জয়শ্রী দীপ্তিমতী হইয়া নিশান লাভ ঘটিত।

পাঁচালীর প্রণালী এইরূপ: হাফআখড়াইর ন্যায় তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি ইহার বাদ্যযন্ত্র ইদানীং ঐক্যতান বাদ্যের ফ্লুটাদি উপকরণও তৎসঙ্গে থাকিত। হাফআখড়াইয়ের ন্যায় বাদ্যেরও লড়াই হইত,

সে বাদ্যের নাম সাজবাজানো। সাজবাজানোর পর ঠাকরুণ বিষয় বা শ্যামাবিষয়। প্রথমেই শ্যামাবিষয়ক একটি গান সকলে মিলিয়া গাহিবার পর কাটানদার উক্ত বিষয়ের ছড়া কাটাইতেন, অর্থাৎ ঐ কার্যের উপযুক্ত কোন এক ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত কখনো বা সহজ গলায় কখনো বা একপ্রকার সুরের সাহায্যে কখনো বা পদ্যে, কখনো বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চ সুরে ছড়া বিন্যাস করিতেন, কাটাইতে জানিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের রোমাঞ্চ হইত। ফলতঃ সুকবির রচনা ও সুকাটনদার কর্তৃক যোজনা হইলে নানা রস উদ্দীপনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ছড়া কাটানো হইলে সকলে মিলিয়া আবার গান। কোন কোন দলে এই গান এমন মিলশুদ্ধ ও তানলয়বিশুদ্ধভাবে গাওয়া হইত যে শ্রোতাগণ মোহিত হইয়া অজ্ঞাতসারে আহা আহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গোঁড়াদল যোগ্যাযোগ্য সকল অবস্থায়ই বার বার চীৎকারে আসর ফাটাইয়া দিত। তাহাতে কখনো বা জ্বালাতন করিত, কখনো বা হাসাইত।

শ্যামাবিষয় প্রায় এক ছড়াতেই সমাপ্ত হইত। কিন্তু অনেক দলে দুই তিনটি ছড়া, সুতরাং তিন চারটি গানও হইত। সে যাহা হউক, ঐ দল শ্যামাবিষয় গাহিয়া আপনাদের যন্ত্রাদি সহিত উঠিয়া যাইতেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নামিতেন। তাঁহারাও ঐরূপে শ্যামাবিষয় শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে পুনর্বার পূর্ব দল আসিয়া সাজ বাজাইয়া সখীসংবাদের মহড়া গানটি গাহিয়া ছড়া কাটাইতেন। প্রথম ছড়ার পর গান, আবার দ্বিতীয় ছড়া ও তৃতীয় গান, আবার তৃতীয় ছড়া ও চতুর্থ গান, এইরূপে কয়েকটি ছড়া ও কয়েকটি গানের পর তাহাদের প্রস্থান ও অপর দলের প্রবেশ এবং ঐরূপে ছড়া গান হইয়া সখীসংবাদ মিটিয়া যাইত। পরে বিরহের বেলায়ও ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইত।

একটি কথা বলিতে অবশিষ্ট: যখন যে দল যে প্রসঙ্গের বিন্যাসহেতু আসরে নামিতেন, তখন তাঁহারা যে কয়টা ছড়া ও গান করিতেন, সমুদয়েতেই সেই এক বিষয়ের আনুপূর্বিক বর্ণনা থাকিত, বিভিন্ন ছড়ার যে বিভিন্ন বিষয় তাহা নয়। অর্থাৎ একদল সখীসংবাদের সময় প্রথম ছড়ায় মাথুর, দ্বিতীয় ছড়ায় মান, তৃতীয় ছড়ায় দান গাহিবেন, তাহার যো নাই, সব ছড়াতে সেই একই প্রসঙ্গ বিবৃত করিতেন।"[১]

১। মনোমোহন গীতাবলী, পৃঃ ১৬১-৬৩।

৫

মনে রাখিতে হইবে যে নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর রচনা ও গাহনার ক্রমিক পরিবর্তন হইলেও প্রাচীন পদ্ধতির মত উহার বিশিষ্ট ধর্মের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে নাই। অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতাদি পূর্বে শ্রীরাম-পাঁচালী ও ভারত পাঁচালী রূপে মন্দিরা-মৃদঙ্গাদি সহযোগে আসরে বসিয়া গীত হইত। ইহাদিগকে অলংকার শাস্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী তখন বলা যাইত "দৃশ্য কাব্য"। কিন্তু কালক্রমে ইহারা "দৃশ্য" কাব্যরূপ ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুসারে "শ্রব্য" (যথার্থতঃ পাঠ্য) কাব্যরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ কি কাশীদাসী মহাভারত ঘরে বসিয়া একাকী পাঠ করিলেও উহাদের কাব্য মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় মনে করিবার হেতু নাই। কিন্তু নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর পরিণতি এইভাবে হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দাশরথির পাঁচালী ঘরে বসিয়া পাঠ করিবার আর আসরে বসিয়া গায়নের মুখে শ্রবণ করিবার মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। রচনার সঙ্গে গাহনার যোগ হইলেই প্রযোজিত দৃশ্যকাব্যের মত উহার যথার্থ রূপ প্রকাশিত হয়। এই কারণে পাঠ্য কাব্য হিসাবে নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর পরিচয় অনেকটা অসম্পূর্ণ।

কবি, হাফআখড়াই প্রমুখ শাখার মত নূতন পদ্ধতির পাঁচালীতে কোন সুনির্দিষ্ট রচনাভঙ্গীতে নির্দিষ্ট বস্তু বর্ণনার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। জনপ্রিয় যে কোন বিষয়কে পাঁচালীর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা চলিত। রাম, কৃষ্ণ প্রমুখ অবতার-চরিত্র বর্ণনা, শিবদুর্গার কাহিনী, লৌকিক কোন ঘটনা এমন কি সমসাময়িক নানা বিষয়ও পাঁচালীর প্লট বা উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করা। এই কারণে তৎকালীন যাবতীয় জনপ্রিয় বিষয়গুলিই পাঁচালীতে গীত হইত। আগমনী, মাথুর, বিরহ পালাগুলি ইহার অন্যতম প্রমাণ। তখনকার মানুষ সাধারণভাবে ছিল ঈশ্বরভক্ত, কাজেই ভক্তিবাদই পাঁচালীর সর্বপ্রধান উপজীব্য হইয়াছিল। পাঁচালীতে ব্যবহৃত প্রধান ভাব ও মুখ্য রস বিচার করিলেও ইহার সাক্ষ্য মেলে। করুণ ও হাস্যরস জনমনকে যত বিমোহিত করিতে পারে, তত আর কোন রসেই পারে না। "কান্না হাসির গঙ্গাযমুনায়" দোল

খাওয়া জীবনের এক বিচিত্র লীলা। কিন্তু ভক্তিবাদের মধ্যে খাঁটি করুণ রস পরিবেশনের অবকাশ কম বলিয়া বিপ্রলম্ভ করুণই মুখ্য স্থান অধিকার করে। আর এই কারণেই পাঁচালীর করুণ রসও প্রধানতঃ বিপ্রলম্ভ করুণ। যাহাহউক পাঁচালীতে হাস্য ও বিপ্রলম্ভ করুণ রসের প্রয়োগাধিক্য লক্ষণীয়। কাজেই বলা যাইতে পারে যে পাঁচালীর মনোরম উদ্যান ভক্তিবাদের প্রশস্ত ভূমির উপর বিপ্রলম্ভ করুণ ও হাস্য রসের বৃষ্টিপাত ও রৌদ্রতাপে অপরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বিচার্য যে কীর্তন গানে ভগবদ্ভক্তির প্রাবল্য ও বিপ্রলম্ভ করুণাদি রস থাকিলেও পাঁচালীর সহিত তাহার পার্থক্যও যথেষ্ট। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কীর্তনের সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার সঙ্গে কথকতার ঢং যুক্ত করিয়া ঢপকীর্তনের সৃষ্টি হয়। তখন ইহার বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পরে অবশ্য ইহা সহরাঞ্চলের মেয়ে-কীর্তনীয়াদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। ভাব বিন্যাস ও আবেদনের দিক দিয়া ঢপকীর্তনের প্রভাব নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর উপর সুস্পষ্ট। কিন্তু ঢপে যেখানে কথকতা হইত পাঁচালীতে সে স্থলে হইত পদ্যে ছড়া কাটা। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই ছড়া কবি তর্জার প্রভাবজাত। পাঁচালীর গায়ন কোন বিশেষ চরিত্র চিত্রণ করিতে বা হাস্যরসের অবতারণা করিতে অঙ্গভঙ্গী করিতেন, কিন্তু কীর্তন গানে এ জাতীয় কিছু ছিল না। তদ্ভিন্ন কীর্তন গানের সুর-তালের বিশুদ্ধতা পাঁচালীতে ছিল না। এইখানেই পাঁচালীর সহিত কীর্তনগানের প্রধান পার্থক্য এবং কবি, তর্জা, খেমটা প্রভৃতির সহিত পাঁচালীর যোগসূত্র।

ভ

কবিগান প্রভৃতির আঙ্গিকের সহিত তুলনায় পাঁচালীর ভাষা, রীতি, ছন্দ, অলংকারাদির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। ইহার মূল কারণ এই যে কবিগানের চমৎকারিত্ব মুখে মুখে বানাইয়া অর্থাৎ খানিকটা প্রত্যুৎপন্ন কবিত্ব দ্বারা সৃষ্টি করা হয়, ভাবনা চিন্তার অবকাশ থাকে না বলিয়া শিল্পী মন অনেকটা যান্ত্রিক ছন্দ ও শব্দের আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পাঁচালী রচনার মধ্যে কবির শিল্প-চেতনা অধিকতর সজাগ থাকে বলিয়া পাঁচালীতে শুধু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ছাড়াও একটা ভাবকে গভীর ও গাঢ়তররূপে প্রকাশ করিবার সচেতন প্রয়াস দেখা যায়।

"পাঁচালী কথা-প্রধান সঙ্গীত"।[১] কাজেই ভাষা ব্যবহারের দিকে পাঁচালীকারকে ষোল আনা নজর রাখিতে হয়। শব্দ-সকল এমন ভাবে সংগ্রহ ও সংযোজনা করা দরকার যে, যাহাতে উহা একাধারে শ্রুতিসুখকর ও গভীর ভাবব্যঞ্জক হইতে পারে অথচ অর্থকৃচ্ছ্রতাদি দোষে দুষ্ট না হয়। এই কারণে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উপমা, রূপকাদি সহজবোধ্য ও শ্রুতিমধুর অলংকার পাঁচালীতে অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দীর্ঘ বক্তৃতার মত আবৃত্তির ধরণের বলিয়া পাঁচালীতে বিবিধ ও বিচিত্র ছন্দ ব্যবহারের সুযোগ কম এবং লঘু, দীর্ঘ বা ভঙ্গ ত্রিপদী ও পয়ারই অধিক ব্যবহৃত হয়। চৌপদীও কচিৎ দেখা যায়। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে আছে ছড়া।

কথকতার ঢংএ গদ্য ব্যাখ্যাও পাঁচালীতে আছে। কিন্তু খুব কম। ইহাতে ঢপের প্রভাব থাকিতে পারে। সাধারণতঃ পাঁচালীকার কথার স্থলে ছড়া কাটেন। এই ছড়ার উপরই পাঁচালীকারের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, ভূয়োদর্শন এবং কবিকীর্তি অনেকখানি নির্ভর করে। এই ছড়াকেই অনেকে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত গ্রামের লোকেরা—পাঁচালী বলে।

পাঁচালীর প্রধান আকর্ষণ বা প্রাণবস্তু সঙ্গীত। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে—"পাঁচালী কথাপ্রধান সঙ্গীত"। পাঁচালীতে প্রতিটি ভাব যেখানেই পরিণতি লাভ করে, সেখানেই সঙ্গীত যোজনা করিয়া সেই ভাবের স্বরূপ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করিতে হয়। কথাসূত্রে সঙ্গীতগুলি অনেকটা যেন—"সূত্রে মণিগণা ইব" গ্রথিত থাকে। কাজেই পাঁচালীর শিল্প-কৌশল মূলতঃ নির্ভর করে আবৃত্তি ও গীতের উপর।

পাঁচালী মুখ্যতঃ প্রচার-প্রধান সাহিত্য। অন্যান্য যে কোন জনসাহিত্য শাখা হইতে ইহা অধিকতর ও প্রবলতর লোকশিক্ষার বাহন। এই হেতু পাঁচালীতে যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বর্তমানের বিবিধ ও বিচিত্র সমস্যার অবতারণা করিয়া উহার সরস ও তীব্র শ্লেষযুক্ত সমালোচনা করা হইয়া থাকে। আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, হালচাল, সামাজিক

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত—চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বাধা-নিষেধ কিছুই এই আলোচনার সীমার বাহিরে পড়ে না। ইহা দ্বারা যে বহুক্ষেত্রে আলোচ্য কাহিনীর গুরুত্ব নষ্ট হয়, গাম্ভীর্য হ্রাস হয়, এবং অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক—খানিকটা গায়ে পড়িয়া কটূক্তি প্রয়োগের মধ্যে যে রসভঙ্গ হয়, পাঁচালীকার তাহা ভ্রূক্ষেপ করেন না। ইহাই হয়ত পাঁচালীর পাঁচালীত্ব।

পাঁচালীর বর্ণনা-কৌশলের মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গীর স্থান ও গুরুত্ব অধিক। নাটকের মত পাত্রপাত্রী না থাকিলেও পাঁচালীর প্রায় চৌদ্দ আনা অংশই উত্তর-প্রত্যুত্তর। এই কথা কাটাকাটি পয়ারাদি ও ছড়ার মধ্য দিয়া বিস্তারিত হইয়া শেষে চরমে সঙ্গীতরূপ পরিগ্রহ করে। আরও লক্ষণীয় এই যে পাঁচালীতে ঋতু কি নিসর্গাদির কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পাঁচালী দৃশ্য কাব্য, কাজেই নাটকীয় ভঙ্গী অর্থাৎ কথোপকথনই স্বাভাবিকভাবে প্রাধান্য পাইয়াছে এবং বর্ণনার ভাগ কম হইয়াছে।

পাঁচালীর পালার গঠন ব্যাপারেও একটা বিশেষত্ব সর্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়। পালার অঙ্গরূপে প্রারম্ভিক গীত বিরল হইলেও পালার অন্ত্যগীত একেবারে অপরিহার্য। আর প্রতিটি পালাই, এমন কি লৌকিক পালাও মিলনান্ত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারটি স্পষ্টতঃ সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের প্রভাবজাত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাশরথি রায়ের জীবনকথা

ক

দাশরথি রায় ছিলেন উনবিংশ শতকের নূতন পাঁচালী শাখায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকজন পাঁচালীকারের নাম পাওয়া গেলেও পাঁচালীর কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই।[১] কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার অবকাশ কম।

দাশরথির জীবন-কাহিনী জানিবার সূত্র অধিক না থাকিলেও কিছু কিছু স্বরচনা, সমসাময়িক ব্যক্তিদের রচনা, এবং পরবর্তী রচনা এই তিন শ্রেণীর উপাদানই পাওয়া যায়। স্বীয় পাঁচালী গ্রন্থে উল্লিখিত আত্মপরিচয়-সূচক পদগুলিকে দাশরথির জীবনী রচনার প্রথম শ্রেণীর উপাদান বলিয়া ধরা চলে। পাঁচালীতে আত্মপরিচয়সূচক এইরূপ তিনটি পদ্য পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি দাশরথির প্রাচীনতম প্রাপ্ত সংস্করণ ১ নম্বর পাঁচালীতে[২] তথা শ্রীঅরুণোদয় রায় প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়,[৩] দ্বিতীয়টি বিশ্বম্ভর লাহা প্রকাশিত দাশরথির পাঁচালী পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায়[৪], এবং তৃতীয়টি শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পাঁচালীর মঙ্গলাচরণসূচক পদে।[৫]

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাদানের মধ্যে প্রথম হইতেছে কাটোয়ার কালিকাপুর গ্রাম নিবাসী দাশরথির অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত "মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত"। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল সন ১২৮০

১। অন্যান্য পাঁচালীকার সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২। প্রকাশকাল ১২৫৫ সাল (১৮৪৮ খ্রীঃ): জাতীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থসংখ্যা 182. Nc. 84-2

৩। সাঃ পঃ গ্রন্থ সংখ্যা ২০৮৬।

৪। প্রকাশকাল বঙ্গাব্দ ১৩০৪।

৫। সংস্করণ, ১৩৩১ সাল, পৃঃ ১।

সাল, অর্থাৎ দাশরথির মৃত্যুর ষোল বৎসর পর। লেখক গ্রন্থমধ্যে জানাইয়াছেন যে দাশরথির সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এমন কি দাশরথির কবির দল ত্যাগ বিষয়েও তাঁহার প্রত্যক্ষ হাত ছিল।[১] ১২৬২ সালে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার তিনি দারোগা ছিলেন।[২] দাশরথির জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় এই গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান দলিল।

প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ"।[৩] দাশরথির মৃত্যুকালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বয়স ছিল ২৬ বৎসর। সুতরাং তাঁহার প্রথম সংস্করণে উদ্ধৃত সামান্য বিবরণকেও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাদান বলিয়া ধরা যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর উপাদানের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থ।[৪] ইহার মধ্যে দাশরথির জীবনকথা কিছুটা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণ দাশরথির পাঁচালীর সম্পাদক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছেন। দাশরথির উক্ত সংস্করণ পাঁচালী গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনি যে জীবনী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহার পাদটীকায় উহার উৎস ও সংগ্রহ সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি দিয়াছেন :" ইহা বর্ধমান শ্রীবাটী রোণ্ডা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্মা মণ্ডল মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত। তিনি লিখিয়াছেন এই জীবনী কোন সালে কাহার কর্তৃক লিখিত, কোথায় মুদ্রিত, তাহার অনুসন্ধান বিশেষ ভাবে করিয়াছি ও করিলাম, তাহা পাইলাম না। আরও দুইখানি পুস্তক পাইলাম তাহাও কীটদষ্ট, ছিন্নভিন্ন, নাম তারিখাদির চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন যে তিনি ১২৬২ সালে বর্ধমান জিলার মঙ্গলকোট থানার দারোগা ছিলেন। তিনি দাশরথির অত্যন্ত অনুগত ও ভক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার লিখিত দাশরথির জীবনী যে প্রামাণ্য গ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেইজন্যই আমরা এই প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশসমূহ বাছিয়া বাছিয়া দাশরথির

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৪৭।

২। উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১২-১১৩।

৩। প্রকাশকাল ১৭৯৫ শকাব্দ, ইং ১৮৭৩ সাল।

৪। প্রকাশকাল ১৩১১ সাল।

জীবনী আকারে প্রকাশ করিলাম।"[১] সন্দেহ নাই যে ইহা চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত "মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত"এর উপর ভিত্তি করিয়া লেখা। অবশ্য ইহাতে কিছু কিছু নূতন তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্ধমান কাটোয়া আলমপুর নিবাসী সঙ্গীতাচার্য শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২১ সালের আর্যাবর্ত পত্রিকায় শ্রাবণ, ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তিনটি প্রবন্ধে কিছু নূতন তথ্য সহ দাশরথির জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের উপাদান সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন: "আমি তাঁহার (দাশরথির) জন্মস্থান বান্ধমুড়া গ্রামের অতি নিকটে বাস করি এবং বান্ধমুড়ায় জমিদারি সংক্রান্ত কার্যাদিও কিছুদিন করিয়াছি।......দাশরথি রায় মহাশয়ের ভাদ্রবধূ শ্রীযুক্তা হরসুন্দরী দেবী মহাশয়ার নিকট গিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছি, নিম্নে সেই সকলের বিবরণ বিবৃত করিতে ব্রতী হইলাম।"[২] অতঃপর স্থানান্তরে লিখিয়াছেন: "কাটোয়ার নিকট কালিকাপুর গ্রামনিবাসী ৺চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন ভাবুক বঙ্গভাষাবিদ সুলেখক ছিলেন। বিশেষতঃ দাশরথির সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাশরথির একখানি জীবনচরিত লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে আজ ৩০।৩৫ বৎসরের কথা। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিলাম......কোথাও একখানিও পাওয়া যাইতেছে না। তবে উক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে আমরা দাশরথির অনেক কথা শুনিয়াছি এবং উক্ত জীবনচরিতও পাঠ করিয়াছি। এখন যতদূর স্মরণ আছে, তাহাই লিখিলাম।"[৩] এইখানেও চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কিছু তথ্য ও তৎসহ অনেক নূতন কথা আছে। ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর উপাদান বলা চলে। ইহা ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে দাশরথির জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চোখে পড়ে নাই।

দাশরথির পাঁচালীর মধ্যে নানা আলোচনা ও রচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের রুচি, নীতি ও অন্যান্য বোধের যে পরোক্ষ পরিচয় পাওয়া

১। দাশরথির পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭১৭।

২। আর্যাবর্ত, ১৩২১, শ্রাবণ, পৃঃ ২৮৪।

৩। আর্যাবর্ত, ১৩২১, শ্রাবণ, পৃঃ ২৮৯।

যায় তাহাকেও জীবনী আলোচনার অন্যতম উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলে[১] এবং ক্ষেত্রবিশেষে আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি।

খ

দাশরথির ঊর্ধ্বতন পাঁচ পুরুষের নামযুক্ত দুইটি বংশলতা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটি 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে ৩৪৯ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয়টি শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাশরথির পাঁচালী' ৪র্থ সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে। প্রথমটির সংগ্রাহকের নাম ও তারিখ নাই, দ্বিতীয়টি দাশরথি রায়ের বংশসম্ভূত বর্ধমানের মোক্তার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট হইতে বর্ধমান কাটোয়া আলমপুর নিবাসী পরলোকগত রমানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য মহাশয় কর্তৃক ১৩২৫ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ সংগৃহীত।[২] এই দুইটির মধ্যে নামে ও ক্রমে বহু অনৈক্য বর্তমান। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আনন্দ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত তালিকাটি অধিকতর প্রামাণ্য ও মূল্যবান বোধে মূলতঃ তাহাই অনুসরণ করা গেল। প্রথম বন্ধনী ( )-চিহ্নের মধ্যে প্রথম তালিকাতে উদ্ধৃত পাঠান্তর যোগ করা হইল।

গ

দাশরথি জন্মগ্রহণ করেন ১২১২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে।[৩] জন্ম সাল লইয়া কিছু কিছু মতান্তর দেখা যায়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন, ১৭৬২ শকে (খ্রীঃ ১৮০৪) দাশরথির জন্ম হয়।[৪] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের

১। "পাঁচালীতে দাশরথির জীবনীর উপাদান"—প্রবন্ধ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, দীপায়ন, (মাসিক পত্রিকা), আশ্বিন, ১৩৫৩, পৃঃ ১৮০-১১৮।

২। দাশরথির পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭৩৮।

৩। "সন ১২১২ সালের মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করেন।"—শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়, আর্যাবর্ত, শ্রাবণ, ১৩২১ সাল, পৃঃ ২৮৫।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২৩০।

দাশরথির বংশলতা

কাশীনাথ রায়
(কালীনাথ রায়)

- জনার্দন
  - শ্রীমন্ত (শ্রীকান্ত)১
    - জগন্নাথ
      - দেবীপ্রসাদ
        - ভগবান
          - ৺রামতারণ
          - ভবতারণ
        - দাশরথি + প্রসন্নময়ী (পত্নী)
          - কালিকাসুন্দরী (কালিকাদাসী) + দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন
            - কন্যা (মৃত)৫
        - তিনকড়ি
        - রামধন৩
  - গোপাল২
    - রামশঙ্কর
      - ধরণী ধর
        - দিগম্বর
          - অক্ষয়
            - জানকীনাথ
              - যামিনী (পোষ্যপুত্র)
- অনন্ত
  - রামজীবন
    - বাবুরাম
      - ঠাকুরদাস
        - ঈশান
          - শ্রীপতি
            - আনন্দ রায়
              - দুর্গাদাস (জলাট) (পোষ্যপুত্র)
          - অখিল
- রামশরণ
  - বাণেশ্বর
    - রামকিঙ্কর
      - বৈদ্যনাথ
        - শিবু
          - হারাধন
          - মাণিক
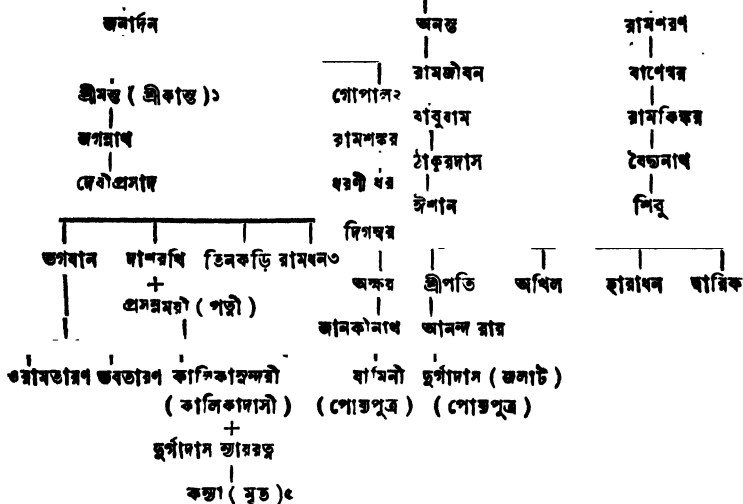
১। "ইনি একদিন আহারান্তে আচমন করিতে ছিলেন এমন সময়ে তৎকালীন নবাবের কোন অশ্বারোহী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিতে বলেন। শ্রীকান্ত অস্বীকার করিলে তখনই সেই অশ্বারোহী তাঁহাকে খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করে।"—বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৩৮৪।

২। "ইনি নিজ নামে গোপালপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করাইয়া তথায় অনেক কুলীন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া বাস করান। একদিন ইনি আহারান্তে আচমন করিতে ছিলেন, এমন সময় শত্রুপক্ষের চক্রান্তে কোন অশ্বারোহী পশ্চিমা কর্তৃক তরবারির আঘাতে ছিন্নমুণ্ড হন।"—হরিমোহন সম্পাদিত দাশরথির পাঁচালী ৪র্থ সংস্করণ, বংশলতা, পৃঃ ৭৮। "ইনি বন কাটিয়া গোপালপুর গ্রাম স্থাপন করেন। চরিত্র দোষে নিহত হন।"—বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৩৪৯। (টীকা—দুইটি পাঠ করিলে মনে হয় যে শ্রীকান্ত নহে, গোপালই নিহত হইয়াছিলেন।)

৩। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের তালিকায় ইহার পর গয়ামনি নামে কন্যা আছে।

৪। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রামতারণের পূর্বে গিরিবালা নামে এক কন্যার নাম আছে। তিনকড়ি গিরিবালার পরিবর্তে বিবাহ করেন। ঐ পৃঃ ৩৪৭। এবং শেষে নফরী নামে আর একটি কন্যার নাম আছে।

৫। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের তালিকায় কন্যার পর একটি পুত্র আছে।

মতে দাশরথি জন্মগ্রহণ করেন ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে।[১] ডঃ সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন দাশরথির জন্মকাল ১৮০৪ বা ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে।[২] ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন ১২১২ সাল[৩] বা ১৮০৬ খ্রীঃ[৪]। বঙ্গভাষার লেখক, বাঙ্গালার গান, সঙ্গীতসার সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে ১২১২ বঙ্গাব্দ বলা হইয়াছে। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত গ্রন্থে সন ১২১২ সালের মাঘ মাসে লেখা হইয়াছে।[৫] মাঘ মাস ধরিয়া হিসাব করিলে ১৮০৬ খ্রীঃ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাস হয়। আমাদের মনে হয় এই সময় ধরাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে দাশরথি হরু ঠাকুর হইতে ৬৮ বৎসরের, নিধুবাবু হইতে ৬৫ বৎসরের, নিতাই বৈরাগী হইতে ৫৫ বৎসরের, রাজা রামমোহন রায় হইতে ৩২ বৎসরের, রাম বসু হইতে ২০ বৎসরের ছোট, এবং ঈশ্বর গুপ্ত হইতে ৬ বৎসরের, বিদ্যাসাগর হইতে ১৫ বৎসরের, মাইকেল হইতে ১৮ বৎসরের এবং বঙ্কিমচন্দ্র হইতে ৩২ বৎসরের বড়।

দাশরথির পৈতৃক বাস্তু ও জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ বাঁদমুড়া গ্রাম। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়।[৬] মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। দাশরথি তাঁহার আত্মপরিচয়সূচক পদে বলিয়াছেন :

ধনে ধনেশ সমান মানপক্ষে অপ্রমান
কে মানী তদ্বিত্তমান, বর্ধমানপতি।

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৬০৩ এবং History of Bengali Lit. and Lang.—D. C. Sen, p. 743.

২। "Dasu Roy himself was born in 1804 or 1805."—History of Bengali Literature in the 19th Century—Dr. S. K. De, p. 441.

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৪১।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৯৮৪।

৫। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ২।

৬। "তাঁহার পিতার নাম দেবীদাস রায়···দেবীদাস ও দেবীপ্রসাদ এই দুই নামেই তাঁহার পিতা অভিহিত ছিলেন।" দাশরথি রায় প্রবন্ধ, আর্যাবর্ত, ১৩২১ সাল, শ্রাবণ, পৃঃ ২৮৫।

তস্য অধিকারে ধাম, বাঁধমুড়া নাম গ্রাম
গণ্য দ্বিজের বিশ্রাম, ধন্য সে বসতি ॥
দেবতুল্য দেবদ্বিজভক্ত দেবীপ্রসাদ দ্বিজ
অহং দীন তদঙ্গজ দ্বিজপদে মন।[১]

অন্যত্র :

"তুল্য দিতে অপ্রমান, মান্ধাতার তুল্য মান, শ্রীমান নিবাসী বর্ধমান।
ভূপতি ভূপের চূড়া, গ্রাম নাম বাঁধমুড়া, উক্ত ভূপের অধিকার স্থান ॥
কুলীনগণ বসতি গ্রামের গৌরব অতি অল্প পথে ত্রিপথগামিনী।
তথায় করেন ধাম দেবীপ্রসাদ শর্মা নাম, দ্বিজরাজ নানা শাস্ত্রজ্ঞানী ॥
অস্যাত্মজ অহং দীন, দ্বিজের অনুজ্ঞাধীন, দ্বিজপদবলে এ সঞ্চয়।[২]

দাশরথি পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবানচন্দ্র। দাশরথির পর তিনকড়ি ও রামধন নামে দেবীপ্রসাদের দুইটি পুত্রসন্তান হয়। রামধনের অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যে, দাশরথির একটি ভগ্নীও ছিল।[৩]

দাশরথি বাল্যকাল হইতেই মাতুলালয়ে থাকিতেন। উত্তরকালে মাতুলের গ্রাম পীলাতেই নিজ বসতবাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন :

"তদন্তরে নিবেদন শ্রুত হউন সর্বজন দীনের দ্বিতীয় পরিচয় ॥
ধরামধ্যে ধরি ধন্য অগ্রদ্বীপ অগ্রগণ্য যথায় শ্রীগোপীনাথের লীলা।
তৎ সন্নিকট ষাম্য গ্রাম অতি জনরম্য পাটুলী সমাজ পার্শ্বে পীলা ॥
কত দেব দেবালয় তথায় মাতুলালয় মাতুল অতুল গুণযুত।

১। শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা প্রকাশিত দাশরথির পাঁচালী, ২য় খণ্ড, ১৩০৫ সাল, পৃঃ ২।

২। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১।

৩। "দেবী দাসের চারি পুত্র এক কন্যা।···ভগিনী গয়ামনির বিবাহান্তেই দেহান্ত ঘটে।"—দাশরথি রায় প্রবন্ধ, আর্যাবর্ত, ১৩২১, শ্রাবণ পৃঃ ২৮৪-২৮৫। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে দাশুরায়ের বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য।

রামতুল্য গুণধাম শ্রীরামজীবন নাম চক্রবর্ত্তী খ্যাত জীবন্মুক্ত॥
তাঁহার ধন্য কৃপায় শিক্ষাদির সদুপায় প্রাপ্ত হৈয়ে তস্য গৃহে স্থিতি।"[১]

অন্যত্র:

"দ্বিতীয়াংশ পরিচয় পিত্রালয় মাতুলালয় মাতুল সদ্গুণালয় শ্রীরামজীবন।
উপাধিতে চক্রবর্ত্তী কীর্তিমন্ত মধ্যবর্ত্তী রামতুল্য গুণকীর্তি সাধুদলস্থল।
অতুল্য যাহার তুল্য তৎগৃহে অবধি বাল্য বাস তাঁর আনুকূল্য বলে মম বল।"[২]

ঠিক কোন সময় হইতে দাশরথি মাতুলালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাহা ঠিক করা না গেলেও বাল্যকাল হইতেই যে তিনি পীলাতে থাকিতে সুরু করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরের উদ্ধৃতি দুইটির মধ্যে, বিশেষতঃ "শিক্ষাদির সদুপায়" ও "তৎগৃহে অবধি বাল্য বাস" এই দুই অংশে ইহা সুস্পষ্ট। সুতরাং "দাশরথি যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বাঁদমুড়াতেই বাস করিয়াছিলেন"—শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায় প্রচারিত এই মতের কোন ভিত্তি নাই।[৩]

দাশরথির বাল্যকালের বিবরণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। "যথা-বয়সে তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় লিখিতে, ঘুষিতে ও মৃত্তিকায় অঙ্ক সংকেত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাহেতু অনতিবিলম্বে তিনি পাঠশালায় সর্দার পড়ুয়া বলিয়া গণ্য হইলেন।"[৪]

১। শ্রীহরিমোহন সম্পাদিত পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১।

২। শ্রীঅরুণোদয় রায় প্রকাশিত দাশরথির পাঁচালী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩০৫, পৃঃ ২।

৩। "শিশুকাল হইতে দাশরথি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইয়াছেন একথাও কেহ লিখিয়াছেন। তাহা প্রকৃত নহে। দাশরথি বান্ধমুড়া নামক জন্মভূমিতেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং তদানীন্তন গুরুমহাশয়ের নিকট ঐ স্থানেই বাঙ্গালা লিখাপড়া সামান্য আকারে শিক্ষা করেন। তবে যৌবন-প্রাপ্তির পূর্বেই দাশরথির পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়…এই সময়ে পীলা নিবাসী রামজীবন চক্রবর্ত্তী ভাগিনেয় দাশরথি ও তিনকড়ির তত্ত্বাবধান করিতে বাধ্য হইলেন।"—দাশরথি রায় প্রবন্ধ, আর্য্যাবর্ত, ১৩২১, শ্রাবণ, পৃঃ ২৮৫।

৪। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত।

দাশরথির স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির বিকাশও পাঠশালাতেই প্রথম হয়। গুরু মহাশয়ের প্রহারের প্রতিবাদে দাশু নিম্নলিখিত ছড়া বানাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

"দয়া কর গুরু মহাশয় মোর পানে
অত প্রহারে বুঝি বাঁচিব না প্রাণে ॥"[১]

কোন সহপাঠীর প্রতি অনুরূপ আর একটি ছড়াও দাশরথির বলিয়া প্রচলিত।

"আমার কলম কেন তোমার পরোতে[২]।
দাও ভাই দেব না যুগদানে[৩] ভরিতে ॥"

পাঠশালার কেতাবতি বিদ্যা ছাড়াও দাশরথি কিছুটা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পীলা গ্রামে তখন সরকারী রেশম কুঠী ছিল। এই কুঠীর ইংরাজীবিদ কেরাণী ও কর্মচারীদের নিকট দাশরথি ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। পীলার নিকটবর্তী বহরা গ্রামের হরকিশোর ভট্টাচার্য ইংরাজী জানিতেন। দাশরথি তাঁহার নিকট গিয়াও ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে এই প্রকার সামান্য ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা মোটামুটি রকমের অর্থ উপার্জন করা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায় ভিন্নপ্রকার ছিল বলিয়াই হয়ত দাশরথি অর্থোপায়ের নিশ্চিত সুযোগ, আত্মীয়স্বজনের আগ্রহ, মাতুলের প্রচেষ্টা সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কবিগানের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর নিশ্চিত, সুশৃঙ্খল একটানা সুখের গৃহাঙ্গন হইতে সুর-ভারতীর অনিশ্চিত বিশৃঙ্খল কোলাহলের পথ তাঁহাকে হাতছানি দিয়া সংসার, সমাজ, পরিচিত পরিবেশ হইতে দূরে টানিয়া আনিল। দাশরথি যৌবন-প্রারম্ভে কবির দলে যোগ দিলেন।

১। দাশরথি রায় প্রবন্ধ, আর্যাবর্ত, ১৩২১, শ্রাবণ, পৃঃ ২৮৬।

২। পাঠশালার ছাত্রদের কলম রাখিবার জন্য কাগজের লেফাফার নাম পরো।

৩। ন্যাকড়ার ছোট থলের নাম যুগদান।

ঘ

কবিগানের তখন স্বর্ণযুগ। হরু ঠাকুর তখন অতি বৃদ্ধ হইলেও জীবিত, রাম বসু, ভবানী বণিক, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি বিখ্যাত কবিওয়ালাগণ তখনও দেহরক্ষা করেন নাই, এমতাবস্থায় কবিগানের প্রতি যশোপ্রার্থী তরুণ মন যে সহজেই আকৃষ্ট হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। বিশেষতঃ দাশরথি কিছুটা কবিত্বশক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহার চর্চারও খানিকটা সুযোগ পাইয়াছিলেন। হয়ত ইহা কবির দলে যোগদান করিবার ঠিক প্রাক্কালে কি অব্যবহিত পরে সংঘটিত হইয়াছিল।

পীলা গ্রামে নীলকণ্ঠ হালদার নামে এক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যৎসামান্য অনুপ্রাস যোগ করিয়া অশ্লীল ভাবে ও শব্দে নহর নামক দীর্ঘচ্ছন্দ গান ও ছড়া রচনা করিয়া বয়স্যদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। দাশরথি নীলকণ্ঠ হালদারের প্রতিভাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অনুরূপ রচনা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অচিরকালের মধ্যে প্রচুর অনুপ্রাসযুক্ত কুৎসিত নহর, টপ্পা, কবির ছড়া রচনা করিয়া হালদার মহাশয়ের প্রতিযোগী ও প্রতিষ্ঠার অংশী হইয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। তাঁহার আত্মবিশ্বাস আর এক ধাপ উপরে উঠিল, এবং প্রতিভা প্রকাশের একটি চমৎকার সুযোগও জুটিয়া গেল।

পীলা গ্রামে তখন একটি সরকারী রেশম কুঠী ছিল। এই কুঠীতে কাটানী কার্যের জন্য অনেক নিম্নশ্রেণীর ভ্রষ্টা ও কুলটা কামিনী পীলাতে ও সন্নিহিত অঞ্চলে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে অক্ষয়া বায়তিনী[১] নামে এক সধবা পতিপরিত্যক্তা বেশ্যা কুৎসিত কবিসঙ্গীতের একটি দল করিয়াছিল। দাশরথি অক্ষয়ার দলে যোগদান করিলেন।

অক্ষয়া দাশরথির জীবননাট্যের প্রথম নটী। আকা বা অকাবাঈ নামে তখনকার দিনে তাহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। আজও দাশরথির নামের সঙ্গে

১। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে "অক্ষয়া পাটিনী" লেখা আছে, পৃঃ ৩২৮।—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে "অক্ষয়া কাটানী" লেখা, ৩য় সং, পৃঃ ২৩০।

আকা বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। আকা দাশরথি হইতে তিন চার বৎসরের বড় ছিল। দেখিতে আকা খুব খারাপ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার গায়ের রং ছিল কালো, "কিন্তু কৃষ্ণ কলেবরে চাকচিক্যের অভাব ছিল না।……অক্ষয়ার অক্ষি দুটি বড় ক্ষুদ্র ছিল না, বড় বড়ও ছিল না, স্বাভাবিক অথচ ভাসমান ভাবাপন্ন, চক্ষের তারকা কৃষ্ণবর্ণা ছিল"।[১] "নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলদাম লম্বিত ছিল বটে কিন্তু নিতম্বভার আচ্ছাদন করিত না। ……অক্ষয়া তন্বী ছিল না, তুন্দিলাও ছিল না; স্বাভাবিক পীবর কলেবরা ছিল, কিন্তু মধ্যদেশের পরিদৃশ্য নির্দিষ্ট না থাকায় পূর্বকালের প্রথামতে লক্ষণাক্রান্ত নাম রাখিলে অক্ষয়ার নাম কাণ্ডকটিই হইত। অক্ষয়া আবার স্বপতিসত্তা বিজ্ঞাপন জন্য দুই হস্তে শঙ্খ ধারণ ও শঙ্খ সম্মুখে কৃত্রিম প্রবাল শ্রেণী অবষ্টব্ধ করিত।"[২]

দাশরথি প্রথমতঃ গোপনে অক্ষয়ার গৃহে যাইতেন। ক্রমশঃ লজ্জা ত্যাগ করিলেন। সমবয়স্ক বন্ধুরা ইহা লইয়া দাশরথিকে প্রচুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। অক্ষয়া জাতিতে বাইতি অর্থাৎ বাদ্যকর ছিল। সেই সূত্রে বন্ধুরা দাশরথিকে "এ মাসে কয়টা বিবাহ বাজাইলে", "এ মাসে বড় অপ্রতুল পৌষ মাসে বিবাহ নাই"—প্রভৃতি নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। দাশরথি লজ্জিত হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অক্ষয়ার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু ধীরে ধীরে প্রকাশ্য আসরে বসিতে আরম্ভ করিলেন এবং দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে নানা স্থানে আকা-র দলের সহিত যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

দাশরথি পদ গ্রহণ করিলেন গাঁথনদারের। অর্থাৎ "অগ্রে দুই তিনটি বেশ্যা ও তিন চারিজন পুরুষ পশ্চাতে ১০।১২ জন চোয়ার জাতি এই দলবদ্ধ কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে তন্তুবায়ের তন্তু চালনার ন্যায় একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে যাতায়াত করতঃ গায়কগণের কর্ণে কর্ণে কথার উপদেশ দেওয়ার কার্যে নিযুক্ত হইলেন"।[৩] তখনও দাশরথি ছড়া বলিতে পারিতেন না, টাকা

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৯-১০।

২। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ১০-১১।

৩। উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬।

দিয়া লোক আনিতে হইত। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দাশু ছড়া বলার কৌশল আয়ত্ত করিলেন।

দাশরথির কবির দলে যোগদানের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। গ্রামের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিলেন। দাশরথির মাতুল রামজীবন চক্রবর্তী মহাশয় অনন্তপুর কুঠুরিয়া নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি একদা বাড়ীতে আসিয়া ইহা লইয়া দাশুকে যৎপরোনাস্তি ভৎ র্সনা করিলেন এবং নিজে সঙ্গে লইয়া গিয়া উক্ত অনন্তপুর কুঠীতে একটি চাকুরী করিয়া দিলেন।[১] উভয়সংকটে দাশরথির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। চিরদিনের বাধ্য, নিরীহ, শান্তস্বভাব দাশরথি মাতুলের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আকা-র আশ্রয়ে যাইতে পারেন না, অন্যদিকে নীলকুঠীর কেরাণী কার্যেও কিছুমাত্র তৃপ্তি পান না। সর্বদা অন্যমনস্ক থাকেন, লেখাতে ভুল হয়, অঙ্ক কষিতে ভুল হয়, সামান্য ব্যাপারে অসামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় দীর্ঘদিন থাকিলে কি হইত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু দাশরথি একটা পথ খুঁজিয়া পাইলেন। শুধু দাশরথির নহে, আকা-রও দাশরথি ছাড়া চলে না। কবির দলের বায়না লইয়া আকা নিজে অনন্তপুর আসিয়া হাজির হইল। তারপর কথাবার্তা সব পাকা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর নানা ছলে দাশরথি বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন এবং কবির দলের কাজ করিয়া সকালে নীলকুঠীতে হাজিরা দিতেন। এইভাবে কিছু দিন চলিল।

এই খবর গোপন থাকিবার কথা নহে। রামজীবন ভাগিনেয়ের উপর

১। রমানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "রামজীবন কাটোয়ার উত্তরে এক ক্রোশ দূরে তৎকালিক শাঁকাই নীলকুঠীতে মাসিক তিন টাকা বেতনে মুহুরিগিরি কার্যে দাশুকে নিয়োজিত করিলেন।"—আর্যাবর্ত, ভাদ্র, ১৩২১, পৃঃ ৪২৫। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে অনন্তপুর নীলকুঠীর বদলে অন্য একটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই বিবরণের উৎস কি তাহা বলা হয় নাই। বিবরণটি এই প্রকার: "রামজীবন দাশরথিকে কাষ্ঠশালী কুঠীতে সামান্য কর্মে মাসিক তিন টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন।"—বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৩২৯। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে শাঁকাই নীলকুঠীর কথা আছে। ৩য় সং, পৃঃ ২৩০ দ্রষ্টব্য।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করিলেন। দাশরথির নিকট ইহা শাপে বর হইল। তিনি সানন্দে পীলা গ্রামে অক্ষয়ার কবির আখড়ায় পীঠভৈরব হইয়া বসিলেন। মাতুলালয়ের সংশ্রবও প্রায় ত্যাগ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনকড়ি মধ্যাহ্ন কালে তাঁহাকে ডাকিয়া নিত। গুপ্তদ্বার দিয়া মাতুলালয়ে গিয়া মাথা নীচু করিয়া কোন রকমে কিছু নাকেমুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িতেন। রাত্রে আর ভাত খাইতেন না। দুধ চিঁড়া গুড় খাইয়া কাটাইয়া দিতেন। প্রথম দিক্‌কার লজ্জা সংকোচ এইভাবে একেবারে কাটিয়া গেল, দাশরথি কবির দলের পুরোভাগে আসিলেন। পূর্বে কবির দলের সঙ্গে যাইবার কথা না বলিয়া—"বাঁধমুড়া যাইতেছি"—এই মিথ্যা কথা বলিয়া মাতুলালয় ত্যাগ করিতেন; এখন আর তাহার প্রয়োজন হইল না, অক্ষয়ার কবির আখড়ায়ই রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

কিন্তু আত্মীয়স্বজন সহজে দাশরথিকে ছাড়িয়া দিল না। মাতুল প্রচুর চেষ্টা করিলেন দাশরথিকে গৃহে আনিতে, দাশরথি আসিলেন না। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। দাশরথির প্রাচীনা মাতামহী একদা অক্ষয়ার আখড়ায় গিয়া দাশরথির কেশাকর্ষণ করিয়া বাড়ী নিয়া আসিলেন, এবং যথেষ্ট গালমন্দ ও প্রচুর উপদেশ দিয়া অবশেষে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। পীলা গ্রামে তখন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন ভৈরব চক্রবর্তী। তিনি নিজে ডাকিয়া দাশরথিকে কবির সংশ্রব ত্যাগ করিতে বলিলেন, কিন্তু দাশরথি মুখে একটা কথাও বলিলেন না, নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষিপ্ত চক্রবর্তী মহাশয় "তোমার মুখ দর্শন করিব না"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন। খবর বাঁধমুড়াতেও পৌঁছিয়াছিল। দেবীপ্রসাদ জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবানচন্দ্রের সহিত বাঁধমুড়াতে থাকিতেন। দাশরথির গর্ভধারিণী শ্রীমতী দেবী ইতঃপূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, দেবীপ্রসাদ নিজে পীলাতে আসিয়া কবির দল ত্যাগ করিবার জন্য দাশরথিকে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু "দেবীপ্রসাদের অশ্রুবারি, জঘন্য কবি সঙ্গীতাসক্ত দাশরথির প্রকৃতি-প্রস্তরকে ভেদ করিতে পারিল না।"[১] দাশরথি আপন সংকল্পে অটল রহিলেন।

[১] মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ২৫

দাশরথি অতি নিষ্ঠার সহিত কবিচর্চায় আত্মনিয়োগ করিলেন, এবং "ক্রমশঃ কবির টপ্পা, ছড়া রচনার বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। পূর্বে কবি সম্প্রদায়ে টপ্পা গানের পর চোপ্ বলিয়া ছড়া বলার রীতি ছিল, দাশরথি তাহাতে অতিরিক্ত এক নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করিলেন, এই যে কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অনুপ্রাসযুক্ত কতকগুলিন অশ্লীল কথায় রচিত পয়ার ত্রিপদী স্বয়ং বক্তৃতা করিতেন, পশ্চাতে কয়েক জন ধুয়া গাইত, কেবল কাল চামর গ্রহণ করিতেন না"।[১] দাশরথির কবির টপ্পা আরম্ভ হইলে কৃষকদিগের আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না, চতুর্দিক হইতে 'বাহবা' 'বাহবা' 'সাবাস' 'সাবাস' ধ্বনি উঠিত। কিন্তু কেবল অশ্লীল টপ্পাতেই দাশরথি বিখ্যাত ছিলেন না, "তাঁহার সখীসংবাদের টপ্পা ও ছড়া শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধেরা ও প্রায়বৃদ্ধেরা কেহ 'আহা', কেহ 'আমরি', কেহ বা 'বেঁচে থাক দাশরথি' ইহাই বলিতে থাকিতেন"।[২]

ইতোমধ্যে দাশরথির পদোন্নতিও হইয়াছিল। কবির পুস্তক লইয়া গায়কদিগের কানে কানে বলিয়া দিবার পূর্বকার্যটি গুরুদাস ঘটক নামক একজন ব্রাহ্মণ যুবকের উপর ন্যস্ত করিয়া "তখন দাশরথি আসর মধ্যে গুণচটে অথবা কেঁচকেচিয়া আসনে ক্ষুদ্র দীপ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া প্রশ্ন ও সমস্যা গীতের উত্তর রচনা ও তাহা লেখা এবং গায়কগণে উপদেশ দেওয়া এই উচ্চপদে অভিষিক্ত হইলেন"।[৩] এই পদেও দাশরথির প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "দাশরথি কোন টোলে, চতুষ্পাঠীতে অথবা কলেজে স্কুলে অধ্যয়ন করেন নাই, কেবল চিন্তা ও আলোচনাই তাঁহার রচনা শিক্ষার অধ্যাপক হইয়াছিল, তদ্ধেতু দাশরথির রচনাশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"[৪]

কবিগানের জনপ্রিয়তা তখন অসাধারণ ছিল। গ্রামে গ্রামে বারোয়ারী পূজার ব্যবস্থা হইত কেবল কবির লড়াই করিবার উপলক্ষ হিসাবে। প্রতি

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ২৫-২৬।

২। উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০-৩১।

৩। উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৭।

৪। উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩২-৩৩।

অঞ্চলেই কতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী দল থাকিত এবং বারোয়ারী উপলক্ষে তাহাদের লড়াইর ব্যবস্থা হইত। দাশরথির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কালিকাপুর নিবাসী পুরুষোত্তম বৈরাগ্য এবং জামড়া নিবাসী নিধিরাম শুঁড়ি। ইহাদের দুই জনেরই স্বতন্ত্র কবির দল ছিল।[1] দাশু, পুরুষোত্তম ও নিধিরাম সর্বদা পরস্পরকে লড়াইতে ঘায়েল করিতে চেষ্টা করিত। এই যুদ্ধের পরিণামেই একদিন দাশরথিকে কবির সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

"একদিবস কবিগীত রঙ্গভূমিতে উক্ত পুরুষোত্তম দাস বৈরাগ্যর পক্ষ হইতে তাহার দলভুক্ত রাধামোহন দাস বৈরাগ্য নামক এক ব্যক্তি উক্ত পুরুষোত্তমের রচিত ছড়া রঙ্গভূমির চতুর্দিকোপবিষ্ট শ্রোতাদিগের সম্মুখে উভয় হস্ত লম্বিত ও নানা ভঙ্গী করিয়া মহাপ্রাগলভ্যের সহিত বক্তৃতা করিলেক। ছড়ার শিরোনামটি এই ছিল যে—

আমার গানের গুরু কল্পতরু হরুর তুল্য গণি।
হা রে পাগল হয়েছিস ছাগল বধ্যে আসরে নামবেন তিনি
আজ মোষ কাটবো বলে আমি খাঁড়ায় দিলাম বালি
আসরে এসে দেখি দেশো পুড় কুমড়ার জালি॥"[2]

দাশরথিও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কম ছিলেন না। যথাসময়ে তিনি উত্তর দিতে দণ্ডায়মান হইলেন। "শ্রোতাসকল ব্যগ্র ও উন্মুখ হইল, কর্ণাচ্ছাদিত বস্ত্র অপসারিত করিল ও প্রমীলাসক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে করতলঘর্ষিতোত্তাপ প্রদান করিতে লাগিল। কেহ কেহ 'মহাশয় কিঞ্চিৎ সরিয়া বসুন', কেহ কহেন 'ছোঁড়া চুপ কর', কেহ বা কলিকা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, অন্ত্যজ স্পর্শ ভয়ে হুঁকা টানিবার উপায় নাই। দাশরথি এমত সময়ে কহিলেন, 'মহাশয়েরা গোল করিবেন না, শ্রবণ করুন'—

তিন পোণের বেণ্য খেটে পুরো কল্পতরু।
তিন কড়া যার মূল্য তার তুল্য করিস হরু।

১। রমানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "প্রধান প্রতিযোগী সহচরীর দল আর মুহুরী বা ছড়াদার নদে শুঁড়ি—নদেরচাঁদ সাহা।" —আর্যাবর্ত, ভাদ্র ১৩২১, পৃঃ ৪২৭।—এই নদে শুঁড়ি আর নিধে শুঁড়ি এক ব্যক্তি কি ?

২। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৩৪।

তুই ওকে সিংহ দেখিস আমি দেখি গরু ॥
পুরোর নিজের মুরোদ তিন কড়া, শিষ্য দিয়ে বলান ছড়া,
যেমন কানার একজন ঠেঙ্গা ধরা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে।
বড় কষ্ট মহাশয়, ঢাকীর এক জন ঢাক বয়,
নাঙ্গুলের যেমন জোড়ালে যায় মাঠে ॥
বুনাকুলিতে হাউজ গাঁজে, তার একজন তামাক সাজে,
শুনে লজ্জা পাই।
পুরো হয়েছে পুরো ঘাগী, ঘরের গিন্নি বুড়ো মাগী
যা বলুক তায় রাগারাগি নাই ॥
ও কুড়ানীর বেটা নিড়ানী হাতে ভূঞে ঝাড়ছে হুড়ো
ওর জন্ম গিয়েছে ঘাস করে পোড়ো জমিতে পড়ে পড়ে
আজ হয়েছে পুরো বৈরাগীর পড়ো।
ভাত রান্নার আখা জ্বালানী তায় আবার ফেন গালানী
ওর কথা কি সাজে
বাজে মরে ওর জন্ম হয়, বাজে লোক আর কারে কয়
ওর কথা গায়ে বড় বাজে ॥"[১]

এই ছড়া শুনিয়া চারিদিক হইতে 'সাবাস্,' 'সাবাস্' 'বাহবা' 'বাহবা' ধ্বনি উঠিল। সে রাত্রে পুরুষোত্তম আর সুবিধা করিতে পারিল না। দাশরথির জয় হইল। বলা বাহুল্য যে সব আসরেই এইরূপ হইত না। কোন কোন আসরে দাশরথি ঠকিয়া আসিতেন, এবং পরের আসরে তাহার শোধ তুলিতে চেষ্টা করিতেন। তখন চাপান দেওয়া ও চাপান খাওয়া দুই-ই খানিকটা বরদাস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সব জিনিসেরই মাত্রা থাকে, এবং সহ্যসীমা লঙ্ঘন করিলেই অন্তরবিদ্ধ ধূমায়িত জ্বালা-স্ফুলিঙ্গ আগুন হইয়া জ্বলিয়া উঠে।

দাশরথির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিধিরাম শুঁড়ির সঙ্গে কবির যুদ্ধে দাশরথি একদিন বিষম ভাবে মর্মাহত হইলেন। কোন এক বারোয়ারী পূজার আসরে নিধিরাম দাশরথির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তীব্র ভাবে সরাসরি আক্রমণ করিল।

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৩৫-৩৬।

নিধিরামের বিশেষত্ব ছিল এই যে কবির ছড়া বলিবার কালে সে কতগুলি মিল ছাড়া গদ্যকথা অনর্গল বলিয়া যাইত এবং তাহাতে শ্রোতৃবর্গ প্রচুর হাসিত ও বাহবা দিত। সে আসরে যথারীতি দাশরথির সহকারী গুরুদাস ঘটক সম্মুখে ছিল এবং দাশরথি আসনে বসিয়া উত্তর রচনা করিতেছিলেন। নিধিরামের দলের কবির টপ্পা শেষ হইতেই নিধিরাম সকলকে বসাইয়া দিয়া স্বয়ং আসরে দাঁড়াইল এবং বলিতে লাগিল :

"হাঁ হে গুরুদাস ঘটক, তুমি ত ব্রাহ্মণের ঘটক কখনই নহ। তাহা লক্ষণেই দেখছি। শুনিতে পাই বরং দেখতেও পারা যায়, ব্রাহ্মণের ঘটক মহাশয়েরা

শূদ্রের বাড়ি যান না, শূদ্রের ছোঁয়া জল খান না,
তাদের কেবল কুলীন ব্রাহ্মণের কাছে জারি।
শূদ্রের বিয়ের ঘটকালি করিতে তুমি আজিকালি
যাওয়া আসা অক্ষয়া বাইতীর বাড়ী ॥

যা হোক তোমার পইতাটাও তো আছে—

ওহে গুরুদাস ঘটক এদানি তোমার ভারি চটক
অতএব ভাই প্রাতঃপ্রণাম হই।
তুমি এসেছ, দলের জাস্থ তোমার দাশু দাদা কই ?

নিধিরাম আসরের পশ্চাৎ দিকে যাইয়া পুনরায় বলিল, 'ওহো, এই যে কবির দলের মহারথী, মহামান্য দাশরথি বসে রয়েছেন, অক্ষয়া একটু সরে দাঁড়া, যেন নীলে চাঁদরের আড়াল দিয়ে রেখেছিস কেন ? একবার চাঁদমুখখানি দেখি। ওহে দাশু, একটা কথা কই আশু, পইতাগাছটা তো অক্ষয়ার গায়ের রং করে তুলেছ। ছি ছি ছি ছি,—

হইয়া ব্রাহ্মণের ছেলে শুদ্ধ কুলে কালি দিলে
কবির মুহুরি মাথায় বাঁধা ফোতা।
গায়ত্রী শিবপূজা সন্ধ্যা তোমার কাছে জন্মবন্ধ্যা
ভারি চাকরি হাতে কবির চোতা ॥
কিবা মুখ কিবা পাগড়ি কবি গাহিতে রাঢ় বাগড়ী
যাও অক্ষয়ার পাছে পাছে।

আমি বটি জেতে শুঁড়ি খাই ভিজে চাল মুড়ি
বিদ্যা ছড়াও আমারই কাছে ॥
হাঁ হে দাশু আমরাই বটি তুল্য পশু, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে
সন্ধ্যা আহ্নিক করবে ভাগবত পড়বে,
নিমন্ত্রণে যাবা লুচি মোণ্ডা খাবা
ঘড়া ঘড়ি বিদায় পাবে, অথবা চাকরি করবে।
তা ছেড়ে চালভাজা কবির দলে বড় মজা
লেগেছে, শেষে মনোদুঃখে মরবে ॥[১]

এই আক্রমণে দাশরথি ভয়ানক বিব্রত বোধ করিলেন। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে তিনি ভদ্রসন্তান বলিয়া কবির আসরে কেহ তাঁহার নাম, কুল ইত্যাদি উল্লেখ করিবে না, আক্রমণ করিবে অক্ষয়াকে এবং তিনি পিছন হইতে জবাব তৈয়ারী করিয়া দিবেন। ইহা যে একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তি তাহাতে সংশয় নাই। কাজেই এই সরাসরি আক্রমণে দাশরথির মুখে উত্তর জোগাইল না। এই আসর হইতে তিনি খুব মর্মযাতনা লইয়া ফিরিলেন। অবশ্য ইহাতে কবির দল ত্যাগ করিবার কোন প্রশ্ন তাঁহার মনে উঠিল না। কিন্তু এই আহত মানসিক অবস্থার মধ্যেই এক চরম আঘাত নামিয়া আসিল।

পুরুষোত্তম দাস বৈরাগ্য যে দাশরথির একজন অন্যতম প্রতিযোগী ছিলেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। জাতিতে বৈরাগ্য এই কারণে দাশরথি তাহাকে জব্দ করিতে একটি ছড়া বানাইলেন—

"ধন্য রে গৌরাঙ্গ ভাই শচী পিসির ছেলে।
তুমি হাঁড়ি মুচি বৈদ্য বামুন একত্রে মিশালে ॥
তুমি দিলে হরিনাম জীবের হয় মোক্ষধাম
অনায়াসে তরে ভবনদী।

এক্ষণকার বরিগিদের
হরিনামের সঙ্গে কোমড়া কুমড়ি সার হয়েছে ধোমড়াধুমড়ি
ছত্রিশ জেতে মালসা ভোগে খায় চিঁড়াদধি ॥

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৪১-৪২

বৈরাগ্যের পিতৃকুল অতিক্ষুদ্র, মাতৃকুল নমঃশূদ্র দুই কুল এক খুঁটে
শ্বশুর কুলের কসুর নাই বাগ্দী কুশ মেটে।
মাসতুতো ভাই মুর্দাফরাস, পিসতুতো ভাই বেদে
মাতামহ ভুঁঞীমালী বরিগীদের এদে।" ইত্যাদি[১]

দাশরথির কবিওয়ালা জীবনের শেষ আসর বসিল।[২] পুরুষোত্তম দাস দাশরথির গালাগালির উত্তর দিতে দাঁড়াইল। দাশরথির চাপান শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রচুর বাহবা দিয়াছিল, এবার উতোর শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইল। পুরুষোত্তম দাশরথিকে চরম আঘাত করিতে এই ছড়াটি কহিল :

উনি কুলের গরব করেন নিত্তি, শুনে জলে যায় পিত্তি,
মামা যার চক্রবর্তী, পিতা যার রায়।
তিনি আবার দিয়ে বেড়ান নৈকষ্যের দায়॥
কার মাসতুতো ভাই দৈবজ্ঞ, পিসতুতো ভাই ভাট।
কন্যা বিয়ে করে পণে মারেন মালসাট॥ ইত্যাদি[৩]

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৪৫—৪৬

২। "বান্ধমুড়ার উত্তরে ও পীলা গ্রামের তিন চার ক্রোশ পশ্চিমে বিচনাগরা গ্রাম, এইখানে এই দলের প্রতিযোগিতা হইল। শিবতলায় আসর বসিল।" —শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, আর্যাবর্ত, ভাদ্র, পৃঃ ৪২৮।

৩। 'আর্যাবর্তে' রমানাথ মুখোপাধ্যায় এই শেষ আসরের অন্য রকম বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল সহচরীর দলের সঙ্গে। সহচরীর দলের মুহুরী নদে শুঁড়ি বা নদেরচাঁদ সাহা দাশরথিকে নিম্নলিখিত ছড়া বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিল :

শুন ওহে দাশু রায়, তোমার এমন কাজ কি শোভা পায়।
তোমার বিদ্যা বুদ্ধি দেখে শুনে দিচ্ছি আমি আশু রায়॥
... ...
তুমি বামুন কিসের, খেতাবটি তো রায়
মুকুজ্যে, চাটুয্যে, বাঁড়ুজ্যে ব্রাহ্মণের উপাধি রয়,
তবে প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়,
তোমার বামুন হয়ে হয় না কি ঘেন্না, ও মরি হায় হায় বর

বলা বাহুল্য যে এই ধরণের চাপানের মধ্যে কদাচ কখনো মাত্র সত্য ভাষণের বিবৃতি থাকে। কিন্তু বিকৃত সত্য ও নির্জলা মিথ্যারও একটা কটু ঝাঁঝ আছে, যাহা কেবল শ্রোতৃবর্গেরই শ্রুতিসুখকর হয় না, সম্পর্কিত ব্যক্তিকেও অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলে। এই ভাবে পিতৃকুল ও মাতৃকুল সম্বন্ধে আক্রান্ত হইয়া দাশরথিও বেসামাল হইয়া পড়িলেন। "আসরাভ্যন্তরিত ক্ষুদ্র দীপ সন্নিধানোপবিষ্ট দাশরথির সকণ্ঠ শির বলিস্তম্ভোপমের উভজঙ্ঘাবকাশে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল"।[১] দাশরথির আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া তাঁহাকে কবির সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কেহ তীব্র ভৎ‍র্সনা করিলেন, কেহ বা তাঁহার সঙ্গে আহার-বিহারাদি সামাজিক সংশ্রব ছিন্ন করিবার ভয় দেখাইতে লাগিলেন, কেহ পরামর্শ দিলেন ভদ্র পাঁচালীর দল গঠন করিয়া তাঁহার রচনা-ক্ষমতা ও সঙ্গীত-সাধনা চরিতার্থ করিতে। এই আঘাত, গঞ্জনা, ভৎ‍র্সনা, অনুরোধ, ভীতি-প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ চাপে কাজ করিল। দাশরথি জীবনে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

"দাশরথি সে রাত্রে আর গাহিলেন না। আকা দাশুর দুঃখে দুঃখিত হইল। সকলে—'আকার জন্য এই সব হইল'—বলিয়া নিন্দা করিল। তখন আকা কান্দিতে কান্দিতে বলিল, 'দেখ রায়, আমার জন্যই তোমার এই সব অপমান, নাজেহাল। আমি ভেক লইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব। তুমি তোমার ঘর-গৃহস্থালী আত্মীয়-স্বজন লইয়া থাক। আমাকে আশীর্বাদ কর।' এই বলিয়া আকা নিজের রৌপ্য-নির্মিত দুই চারিখানি যাহা অলঙ্কার তাহার গাত্রে ছিল, তৎসমুদয় দাশরথির পাদোপরে স্থাপিত করিয়া প্রণাম করিল ও নীরবে কান্দিল। দাশরথির অনেকক্ষণ হইতেই বাগনিষ্পত্তি হয় নাই। এখন তাঁহার নয়নে অশ্রু দেখা দিল। তিনি বলিলেন 'আকা বাড়ী যাইবি না বান্ধমুড়ায় যাইবি?' আকা বলিল—'এ মুখ আবার তোমার বাড়ীর সবাইকে

কেবল আকার পানে চেয়ে থাকা কি বিড়ম্বনা।
তোমার আপনার লোক সব লজ্জা পেয়ে, ঐ গোপন পথে পা বাড়ায়
শুন ওহে দাশু রায়। ইত্যাদি

—দাশরথি রায় প্রবন্ধ, আর্যাবর্ত, ভাদ্র, ১৩২১, পৃঃ ৪২৮

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৪৭।

দেখাইব ? পাতাই হাটের ঘাটে জাহ্নবী নাইতে চলিলাম, এস রায় তুমিও এস। জাহ্নবী স্নানের পর বাড়ী আসিবে, আমিও বাড়ী যাইব।' শেষে এইরূপই হইয়াছিল। আকার শ্বশুরের নাম গঙ্গা সর্দার ছিল, এইজন্য আকা স্বমুখে গঙ্গা কথা উচ্চারণ করিত না।······দাশরথি রায় কবির দল ত্যাগ করিলেন।"[১]

৬

বাঙ্গালা ১২৪২ সালের শেষে (১৮৩৬ খ্রীঃ) দাশরথি পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করিলেন। দাশরথির বয়স তখন মাত্র তিরিশ। কবির দলে তাঁহার যে রচনা-শক্তি ছিল পাঁচালীতে তাহা সম্পূর্ণ নূতন ভাবে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কারণ কবির চাল ও পাঁচালীর চাল এক প্রকার নহে। দাশরথি প্রথমতঃ পাঁচালীর জন্য পয়ার ও ত্রিপদীযুক্ত পদ ও তদুপযুক্ত সঙ্গীত রচনা করিলেন। প্রথম রচনা মনোমত হওয়া কঠিন। দাশরথির হাতেও পাঁচালী সঙ্গীতগুলি ভাল হয় নাই। পরবর্তীকালে এই সময়কার পাঁচালীর উল্লেখ করিলে তিনি লজ্জিত হইতেন। এই সময়কার একটু নমুনা দেওয়া হইল।

১ গণেশের মা কেমনে কৈলাসে মুখ দেখালি।
তুই পতির বুকে পদ দিয়া পতিত হলি ॥

২ ভজ মন নন্দলালা খোদায় তালা দিন ত যেছে।
পান কর গঙ্গাপানি, ভজ শূলপাণি, আর ইমাম হোছে ॥[২]

প্রথমদিককার অধিকাংশ গানেই তিনি যত তাল ব্যবহার করিতেন বলিয়া তদঞ্চলে "যতো দাশু" নামে পরিচিত ছিলেন।

১। শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত দাশরথি রায় প্রবন্ধ, আর্যাবর্ত, ভাদ্র, ১৩২১, পৃঃ ৪৩০।

২। বঙ্গবাসী প্রকাশিত 'দাশু রায়ের পাঁচালী', চতুর্থ সংস্করণে উদ্ধৃত দাশরথি রায়ের জীবনী, পৃঃ ৭২৪।

যাহা হউক অনন্যমনা হইয়া দাশরথি পাঁচালী সরস্বতীর অর্চনা করিতে লাগিলেন। কবির ছড়া রচনায় যেমন তেমন অন্ত্যমিল, কিছুটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আর অর্থহীন অনুপ্রাস বাহুল্য হইলেই চলিত, মোটা চালের শ্লেষযুক্ত শব্দ ও শ্রুতিসুখকর ধ্বনি ইহা ছাড়া আর কোন বিশেষ কবিত্ব শক্তির প্রয়োজন সেখানে ছিল না। প্রথমদিককার পাঁচালী রচনাতে দাশরথির উপর কবি সঙ্গীত ও কবির ছড়ার প্রভাব অধিক ছিল।[১] তিনি অত্যন্ত অলংকারপ্রিয় ছিলেন। আর তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় অলংকার ছিল অনুপ্রাস। ভাববিস্তার, রচনার পারম্পর্য রক্ষণ বা অন্যান্য রচনাচাতুর্যের দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া সুযোগ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তিনি অনুপ্রাস যোগ করিয়া দিতেন। ইহাতে ভাবের হানি হইল কিনা, বক্তব্য বিষয় অস্পষ্ট রহিল কিনা, অলংকরণ দোষযুক্ত হইল কিনা তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেন না। "বোধ হয় তিনি অনুপ্রাসের পুলিন্দা সহযোগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২] বস্তুত অনুপ্রাসপ্রিয়তা দাশরথির পাঁচালীর বিশেষত্ব মাত্র ছিল না, ইহা ছিল তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের বিলাস। প্রতিদিন আলাপে আলোচনায় তিনি অকৃপণ ভাবে অজস্র অনুপ্রাস ব্যবহার করিতেন। দাশরথির আলাপ হইতে উদ্ধার করিয়া এই বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।[৩]

কবির দলের গাঁথনদার হিসাবে দাশরথি কেবল সুপরিচিত ছিলেন না, যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করিয়াছিলেন। কাজেই কাছাকাছি গ্রামে তাঁহার পাঁচালীর ডাক আসিতে লাগিল। প্রথম প্রথম চার পাঁচ টাকা পর্যন্ত পাঁচালীর মূল্য ছিল। এই সময়ে গায়ক বাদক ও অন্যান্য সাকরেদদের অংশ দিয়া মাসে পনরো হইতে কুড়ি টাকা পর্যন্ত তাঁহার আয় হইত। কবির দলের আয় আর পাঁচালীর দলের আয়ের তফাৎ আছে। অক্ষয়া কবির দলের কর্ত্রী

১। তৃতীয় অধ্যায়ের 'গ' অংশ দ্রষ্টব্য।

২। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৫১।

৩। এই অধ্যায়ের 'ছ' অংশ দ্রষ্টব্য। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪০। এবং হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত দাশরথি রায়ের পাঁচালী, চতুর্থ সংস্করণ, দাশরথি রায়ের জীবনী অংশ, পৃঃ ৭৩০ দ্রষ্টব্য।

থাকায় সমস্ত অর্থই সে গ্রহণ করিত এবং খোরাক-পোষাক বাবদ সামান্য অর্থ মাত্র দাশরথিকে দান করিত। দাশরথির তখন ইহার বেশি দরকারও হইত না, কারণ কোন বৈষয়িক স্বার্থবোধ তখনও তাঁহার জন্মায় নাই। কবির দলে যে তাঁহার খ্যাতি বাড়িতেছিল এবং অক্ষয়া যে তাঁহাকে সেই কীর্তি অর্জনে সুযোগ দিতেছিল, তাহাকেই তিনি যথেষ্ট পারিশ্রমিক বলিয়া মনে করিতেন। এখন পাঁচালীর দলের টাকা তাঁহার নিজের হাতে আসায় খ্যাতির সঙ্গে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও মনে জাগিল। দাশরথির জীবনে ইহা নূতন অবস্থা। দাশরথি এই সময়ে মাতুলের গ্রামে পীলাতে নূতন এক নিজস্ব মাটির বাড়ী নির্মাণ করিলেন।

পাঁচালীর দল গঠনের দেড় বৎসর কালের মধ্যেই দাশরথির এই অবস্থান্তর সাধিত হইল। দাশরথি আশ্রমী হইয়াছেন দেখিয়া পরিবার ও আত্মীয়বর্গ তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন। মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত সিঙ্গত গ্রামের হরিপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত দাশরথির বিবাহ হইল। তখন ১২৪৪ সাল, দাশরথির বয়স বত্রিশ বৎসর। বিবাহের রাত্রে বরযাত্রীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরদিন ভোর পর্যন্ত কবির লড়াই করিয়াছিল। শুনা যায় যে বিবাহের রাত্রে কন্যাপক্ষীয় লোকদের অনুরোধে দাশরথি একটি নূতন ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ এইরূপ :

অতি ছাড় রাঢ়দেশ, কি কহিব সবিশেষ, বলতে লজ্জা মানসে উদয়।
কর্মহীন কদাচার, যে সব দেখিনু তার, বর্ণনে বিবর্ণ বর্ণ হয়॥
গ্রাম মধ্যে যত যেবা, বাড়ী পিছু তত ডোবা, কঞ্চি পোতা কলমির বন।
গ্রামেতে মণ্ডপ ঘর, ছটুনি কেবল সর, নাড়া ছাওয়া গেয়ালী বন্ধন॥
ফলাহারের কিছু কই, জলবৎ তরল দই, ওখড়া আর বোখড়া ধানের চিড়ে।
খেয়ে বলে বেশ বেশ, দিয়েছিলে সন্দেশ, পানের খিলি কলার পাতায় মুড়ে॥
রোহিত মৎস্য পেলে পরে, তেঁতুলের অম্বলে ছাড়ে, উপকরণ হয় সোঁদা ভাতে।
তৈল করে অনুপান, করেন মুড়ি জলপান, কুলবধূ হলুদ মাখেন গাতে॥[১]

বিবাহের পর দাশরথির অর্থ ও খ্যাতি যুগপৎ বাড়িতে লাগিল।

১। 'বঙ্গভাষার লেখক', পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪।

পাঁচালীর নির্ধারিত মূল্য ছাড়াও তৈজস, বস্ত্র, বনাত ও নগদ মুদ্রা পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। জীবনে এবার স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস নামিয়া আসিল। মাটির বাড়ী করিবার প্রায় অ্যবহিত পরেই তিনি ইটের পাকা বাড়ী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বেশভূষায়ও প্রচুর পরিবর্তন আসিল। কবির দলে দাশরথি মোটা ও খাট হেঁটো কাপড় পরিতেন। কিন্তু পাঁচালীর দল আরম্ভ করিবার কিছু পরই নদে শান্তিপুরের ধুতি চাদর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পর তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদে আরও পরিবর্তন আসিয়াছিল। কলিকাতার সিমুলিয়া ধুতি নিত্য নিয়মিত ভাবে তিনি ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার দীর্ঘ কুঞ্চিত কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা পথের ধূলাবালি মার্জনা করিতেন।

এই পরিচ্ছদ দাশরথির চেহারার সহিত বেশ মানাইয়াছিল। দাশরথি দেখিতে দীর্ঘাকৃতি ও কৃশ ছিলেন। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। চুল কোঁকড়া, নাক একটু লম্বা এবং চোখ দুইটি বিশাল ও বিস্ফারিত ছিল। মুখে সর্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত, কখনও কাহারো উপর তাঁহাকে রাগিতে দেখা যায় নাই। একা থাকিবার কালে সর্বদাই তাঁহাকে কোন বিষয়ে চিন্তামগ্ন মনে হইত এবং মাঝে মাঝে তিনি ঘাড় নাড়িতেন।

দাশরথির দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল। সমৃদ্ধি সুখের অন্যতম উপাদান সন্দেহ নাই, কিন্তু হৃদয় যদি প্রীতির স্নিগ্ধ রসে পূর্ণ না থাকে, তবে কেবল ধনরত্ন শুষ্ক হৃদয়মরুতে সুখ শান্তির কোন মরূদ্যান সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই সুখ, ততোধিক শান্তি পাইবার জন্য অধিকারী হইতে হয়। দাশরথি জীবনের বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এই অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। কুরুচিপূর্ণ কবিগানের অন্ধকার অশিষ্ট পরিবেশ ত্যাগ করিয়া যেদিন তিনি পাঁচালীর ভক্তিরসগম্ভীর, শিষ্টজন সমাবৃত, আলোকোজ্জ্বল উদার অঙ্গণে পদার্পণ করিলেন, সেইদিন কেবল গাঁথনদার পাঁচালীকারে পরিণত হইল না, অবজ্ঞাত, অপাংক্তেয় 'দেশো' একেবারে দাশরথি রায়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিলেন। এই ভাবে দাশরথি কুখ্যাতির সুগভীর অধস্তল হইতে নিজের ক্ষমতায় ও নিষ্ঠায় শিষ্টজন সমাদৃত সুখ্যাতি-শৈলের সুউচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন ; সমাজ, সংসার, নারী, প্রেম, দারিদ্র্য, ধিক্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে

তাঁহার প্রচুর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, কাজেই বত্রিশ বৎসরে বিবাহ করিবার পর তাঁহার নিজের দিক হইতে সংসারাশ্রম ও দাম্পত্য জীবনের প্রতি যে সহযোগিতাপূর্ণ ঐকান্তিক আগ্রহ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! আর স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম হইতে নারীর আর কি প্রিয়তর কামনা থাকিতে পারে?

দাশরথির দাম্পত্য জীবনের বিশেষ চিত্র পাওয়া যায় নাই। স্থান-কাল-পাত্র-বিচারে প্রকাশ্য ভাবে তাহা পাওয়া সম্ভবও নয়। চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে একটি মাত্র চিত্র দিয়াছেন, তাহা নবপরিণীত দম্পতির কলগুঞ্জনের মত।[১] ইহা ছাড়া আর কোন ঘটনা বা চিত্র পাওয়া যায় নাই।

দাশরথির পাঁচালীকারের জীবন মাত্র বাইশ বৎসর কাল। পূর্বেকার পাঁচালী ঠিক কি রকম ছিল, তাহার নিদর্শন ভাল মত পাই নাই। 'করুণানিধান বিলাস' গ্রন্থে পাঁচালী যাত্রার যে সামান্য নিদর্শন আছে তাহা দ্বারা পাঁচালীর অবস্থা পরিষ্কার বুঝা যায় না।[২] তবে ইহা যে কবির বিচিত্র প্রাণবত্তার ও জনপ্রিয়তার তুলনায় গতানুগতিক ও নিষ্প্রাণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাশরথির বিচিত্র প্রতিভার স্পর্শেই যে ইহা প্রাণবান ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। পাঁচালীর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, দাশরথিই যে পাঁচালীর শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ

১। "তৎকালে দাশরথি রায়ের অর্থস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিয়াছিল। তিনি আপন বনিতা চার্বাঙ্গিণী প্রসন্নময়ীর অচিরশৈশবোত্তীর্ণা তরুণাবস্থায় নির্জনে বহু বাগবৈদগ্ধ্যে তাঁহার মৃদু মধুর হাসি মুখের মধুর বচন শ্রবণে অক্ষম হইয়া বলিয়াছিলেন যে, অয়ি প্রসন্নময়ি, তুমি আমাকে যতটা কথা কহিবা, আমি তোমাকে ততটি টাকা দিব। প্রসন্নময়ী তৎকালে বাগ্বিদগ্ধা হন নাই, নতুবা দাশরথি সময়োচিত সম্মান পাইতেন।" মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবন-চরিত, পৃঃ ৫৭-৫৮।

২। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়, 'ঝ' অংশ দ্রষ্টব্য।

শিল্পী তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মাত্র বাইশ বৎসর কালের মধ্যে তাঁহার হাতে পাঁচালী চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, কলিকাতা, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ করিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহর, বরিশাল, ফরিদপুর, মালদহ ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য সকল স্থানেই দাশরথির পাঁচালী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এক কথায় দাশরথি সমগ্র বঙ্গদেশকেই আসর করিয়া বসিয়াছিলেন। একবার নাম করিতে পারিলে তাহার পসার হওয়া কঠিন নহে, কিন্তু কঠিন হইতেছে বহু শ্রম ও সৌভাগ্য দিয়া প্রথম খ্যাতিটি অর্জন করা। দাশরথির পাঁচালী গানের অন্যান্য বিবরণ দিবার পূর্বে কি করিয়া তাঁহার পাঁচালীর খ্যাতি দাবানলের মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহা বলিয়া লওয়া উচিত।

তখনও নবদ্বীপ বঙ্গদেশের তো বটেই, ভারতবর্ষেও অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্র ও বিদ্যাপীঠ বলিয়া খ্যাত ছিল। শ্রীচৈতন্যের পুণ্য আবির্ভাব দ্বারা নবদ্বীপ যে শাশ্বত মহাতীর্থের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা তো ছিলই, অধিকন্তু নব্য ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিপুল আলোচনার উজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুণ্য-পীঠের মহাগৌরব হইতে তখনও সে বিচ্যুত হয় নাই। দাশরথির বাসভূমি পীলা হইতে ইহার দূরত্ব অধিক নহে। কাজেই পাঁচালীর খ্যাতি নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কানে অতি সহজেই পৌঁছিল। নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমা ও অন্যান্য পূজা পার্বণ উপলক্ষে কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি গীত ও উৎসব হইত। এমনই এক আসরে ১২৪৬ সালে রাসপূর্ণিমার রাত্রে দাশরথি পাঁচালী গাহিবার জন্য নবদ্বীপে আহূত হইলেন।

বায়না গ্রহণ করিয়া দাশরথি খানিকটা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নবদ্বীপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, অধ্যাপক ও বহু বিজ্ঞ, বিচক্ষণ লোকের বাসভূমি। দাশরথি বুঝিলেন যে, যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। "একারণ দাশরথি নবদ্বীপের বায়না পাইয়া সাতিশয় সাবধানে সম্প্রদায় সজ্জা করিলেন, ও কনিষ্ঠ সহোদর উক্ত তিনকড়ি রায় ও অপর যাদু দৈবজ্ঞ, নীলমণি বিশ্বাস ইহারা সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক ছিলেন; তাঁহাদিগকে সঙ্গীতের ভাব, অর্থ বুঝাইয়া শিক্ষা ও অভ্যাস

করাইলেন, কেননা পাঁচালী কথাপ্রধান সঙ্গীত, কথা অশুদ্ধ হইলে নিন্দনীয় হইতে হয়, এবং বাদ্যের সহিত সঙ্গীতের সুসঙ্গত করিয়া লইলেন, ও নিজেও পূর্ব শিক্ষিত ও অভ্যস্ত পাঁচালীর পয়ার ত্রিপদী পুনরায় আবৃত্তি করিয়া বাক্সারল্য করিলেন।"[১]

এই সতর্কতার অন্য কারণও ছিল। পাঁচালী তখন অপরিচিত অপ্রচলিত বস্তু ছিল না। দাশরথির সমকালেই কলিকাতার গঙ্গানারায়ণ লস্কর, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, শান্তিপুরের রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, বর্ধমানের কৃষ্ণমোহন গাঙ্গুলী প্রভৃতি পাঁচালী গাহিয়া নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু গান হিসাবে পাঁচালীর মধ্যে তাঁহারা কোন নূতন আবেগ বা আগ্রহ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের পাঁচালীর কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই। তাই নিশ্চিত করিয়া না বলিতে পারা গেলেও এই ধরণের অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে দাশরথির পূর্বেকার পাঁচালী, হয়ত একঘেয়েমির জন্য ও বৈচিত্র্যের অভাবেই, কবিগানের মত অতটা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। গতানুগতিক পাঁচালীর সুগায়ক হিসাবেই বোধ হয় উক্ত গঙ্গানারায়ণ লস্কর প্রভৃতি খ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু দাশরথি শুধু গায়ন নহেন, তিনি পাঁচালীর স্রষ্টা-শিল্পী। তাঁহার পাঁচালী যেমন রচনার দিক দিয়া অভিনব ও বিচিত্র, প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক দিয়াও যে তেমনি অনুপম ও মনোরম, তাহা প্রমাণ করা দরকার। কাজেই রচনার সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং পরিবেশনের সৌকুমার্য ও চমৎকারিত্ব এই উভয় দিক হইতেই যাহাতে তাঁহার পাঁচালী শ্রেষ্ঠ হয় এই জন্য দাশরথি প্রস্তুত হইলেন।

বৈষয়িক বুদ্ধিতেও দাশরথি অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভিতরের গুণপনা প্রকাশের ব্যাপারে বাহিরের সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যের দামও কম নহে। সুতরাং তিনি এবার শিবিকারোহণ করিয়া নবদ্বীপ রওনা হইলেন। এই হইতে দলের সহিত তাঁহার পদব্রজে গমনাগমন বন্ধ হইল।

প্রথম রজনীতেই বক্তৃতায়, সঙ্গীতে, বিষয়-বস্তুর অভিনব সংস্থাপনে

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৬৩

দাশরথি নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্ত জয় করিলেন। পালা শেষে পণ্ডিতগণ দাশরথিকে প্রচুর আশীর্বাদ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন যে প্রতি বৎসর দাশরথি রাসপূর্ণিমায় নবদ্বীপে আসিয়া পাঁচালী গান করিবেন। দাশরথিও শারীরিক অসুস্থতার বাধা ছাড়া প্রতি বৎসরই এই সময়ে আসিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ দাশরথির পাঁচালীর এতটা অনুরক্ত ছিলেন যে, শুনা যায় প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমার পূর্বে দাশরথির স্বাস্থ্য কামনা করিয়া তাঁহারা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিতেন। দাশরথিও আমরণ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে শুধু আশীর্বাদ নহে প্রচুর অর্থ-সম্পদও দাশরথির লাভ হইত। নগদ টাকা ছাড়া বড় বড় বহু পিতলের ঘড়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ দাশরথিকে পুরস্কার দিতেন। শ্রাদ্ধাদিতে দানস্বরূপ পিতলের যত কলসী তাঁহারা সংবৎসর ধরিয়া লাভ করিতেন, বোধ হয় দাশরথিকে পুরস্কৃত করিবার জন্যই সেগুলি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। দাশরথির দলের সকলেরই অন্ততঃ পিতলের ঘড়া সম্বন্ধে আর কোন অনটন ছিল না।

শুধু রাসপূর্ণিমায় নহে, অন্যান্য সময়েও দাশরথি নবদ্বীপে পাঁচালী গাহিতে যাইতেন। বস্তুতঃ নবদ্বীপের আসরে তাঁহার একটি স্থায়ী আসন ছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ দাশরথির কি প্রকার অনুরক্ত ছিলেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

নবদ্বীপের এক আসরে পাঁচালী গাহিবার সময়ে দাশরথি এই শ্যামাসঙ্গীতটি গাহেন :

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড় রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ,
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,—ইত্যাদি।[১]

"কোদণ্ড" কথাটির অর্থ ধনু, কিন্তু দাশরথি 'কোদালি' অর্থে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন দেখিয়া কোন এক অধ্যাপকের ছাত্র দাশরথির বিজ্ঞানহীনতার বিষয়ে নিন্দা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠেন। ইহাতে উক্ত ছাত্রের

১। পরিশিষ্ট ক, দ্রষ্টব্য।

অধ্যাপক[১] ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহারা বলেন যে কোদণ্ড অর্থ ধনু হইলেও যখন দাশরথির মুখ হইতে কোদালি অর্থে বাহির হইয়াছে, তখন এই শব্দের কোদালি অর্থও গৃহীত হইল। পণ্ডিতমহলে দাশরথির সমাদর ও প্রতিভা স্বীকৃতি ব্যাপারে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই; কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি বিষয়ে ইহাই স্বাভাবিক ঘটনা। সর্ব যুগে এবং সর্ব কালেই প্রতিভাশালী কবির হাতে নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়, পুরাতন শব্দ নূতন অর্থ-দ্যোতনা লাভ করে।

এইবার নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজে দাশরথির প্রতিষ্ঠা কিরূপ হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ভট্টপল্লী-নিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্যের একখানি পত্রের প্রতিলিপি দান করিতেছি। পত্রখানি কাশীধাম হইতে দাশরথির পাঁচালী সম্পাদক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

"দাশরথি রায়ের কবিত্বে আমি চিরদিন মুগ্ধ। আমি তো সামান্য ব্যক্তি, নবদ্বীপের তৎকালীন সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক ৺শ্রীরাম শিরোমণি, মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ভাটপাড়ার বৃহস্পতিতুল্য ৺হলধর তর্কচূড়ামণি, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নৈয়ায়িকপ্রবর ৺যদুরাম সার্বভৌম, কাব্যালঙ্কার-পুরাণাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ কবিকুলতিলক ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, অলঙ্কার-সাহিত্যে অদ্বিতীয় ৺জয়রাম ন্যায়ভূষণ, ত্রিবেণীর পণ্ডিতপ্রধান ৺রামদাস তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি জগন্মান্য প্রাচীন যত অধ্যাপক তৎকালে ছিলেন, সকলেই দাশরথির গুণে তদ্গত ও মুগ্ধ ছিলেন। তৎপরবর্তী আমাদের কথা ধরিলে, আমি সভাক্ষেত্রে মুগ্ধ হইয়া বহুবার ৺দাশরথির সহিত কোলাকুলি করিয়াছি। নবদ্বীপের ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন বহুবার ঐ ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক লোকের ভাষা রচনা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি, কাহারও ভাষা রচনায় শরীর রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত এক সময়েও হয় না। কিন্তু দাশরথির রচনায় বারম্বার লোমহর্ষণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে। ভাষা রচনা সম্বন্ধে মহাকবি বলিয়া গণ্য হইলে, পশ্চিম দেশীয়

১। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের মতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়। 'বঙ্গভাষার লেখক', পৃঃ ৩৩৪।

তুলসীদাস, বঙ্গদেশীয় রামপ্রসাদ সেন ও দাশরথি রায় এই তিন জন মাত্র হইতে পারেন। দাশরথির রচনাবিষয়ে যে লোকাতীত শক্তি ছিল, কাব্যরসে রসিক সহৃদয় পুরুষগণই তাহা অনুভব করিতে পারেন। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে অনেক ব্যক্তিই সামান্য মানবের ন্যায় নায়কনায়িকা ভাবের বর্ণনা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রতি রচনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ব্রহ্মভাব মিশ্রিত নায়কনায়িকা ভাবের অপূর্ব বর্ণনা দ্বারা দাশরথি রায় ভক্তিপ্রীতিরসে ভাবুকমাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মভাব মিশ্রিত মানব লীলা বর্ণনা যেরূপ দেখা যায়, দাশরথি রচিত কি রামচন্দ্র কি শ্রীকৃষ্ণ, ভবগৎবিষয়ক সকল লীলাই সেইরূপ দেখা যায়। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ৺শ্রীরাম শিরোমণি ও দাশরথি এই উভয়ে এক সময়ে কথোপকথন হয়। ৺শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, 'দাশরথি, রামপ্রসাদ সেন একান্ত কালীভক্ত ও সাধক। সাধনা দ্বারাই তাঁহার কণ্ঠ হইতে অশ্রুতপূর্ব ভক্তিপূর্ণ শক্তি বর্ণনা বাহির হইয়াছে, ইহা আমার বোধ ছিল। এই বিশ্বাসটি অদ্য ভ্রম বলিয়া স্থির করিলাম। তাহার কারণ দাশরথি তুমি তো সিদ্ধ নহ। তুমি শক্তি শিব বিষ্ণু বিষয়ে যে বর্ণনা করিয়াছ, তাহাতে যখন জগৎ মুগ্ধ হইতেছে, তখন ইহাই স্থির, অনুপম কাব্য রচনা অসীম শক্তি দ্বারাই হয়, তাহাতে তপোবলের উপযোগিতা নাই।' শিরোমণি মহাশয় আরো কহিলেন,—'তন্ত্র শাস্ত্রে শ্রীশ্রী৺মহাদেবোক্ত যেরূপ স্তব আছে, তোমার ভক্তিভাবপূর্ণ রচনা তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তবে শিবোক্ত স্তবগুলি মধুর সংস্কৃত বাক্যে রচিত, তোমার স্তবগুলি মধুর লৌকিক ভাষায়, এইমাত্র প্রভেদ।' ৺শিরোমণি মহাশয়ের কথার পর দাশরথি বলিলেন,—'আপনার সিদ্ধ বাক্য মিথ্যা নহে, যথার্থই আমি ত্রিলোচন হইয়াছি। শিরোদেশে একটি অতিরিক্ত নয়ন না জন্মিলে, কাহার সাধ্য শিরোমণি দর্শন পায়।' এই সকল জগৎপূজ্য অদ্বিতীয় বিদ্বদ্গণ যে দাশরথিকে এত আদর করিতেন, এ সময়ের কোন কোন যুবকদল তাঁহার রচনাকে যে নিন্দা করেন, তাহা দাশরথির কবিত্বের সম্যক রূপ আলোচনা না করিয়া অথবা না বুঝিয়', জানি না। একটি প্রাচীন কবির আক্ষেপ উক্তি মনে পড়ে,

যন্নাদৃতস্ত্বমলিনা মলিনাশয়েন
কিন্তেন চম্পক বিষাদমুরীকরোষি।
বিশ্বভিরাম নব নীরদ নীলবেশাঃ
কেশাঃ কুশেশয়দৃশাং কুশলীভবন্তু॥

অর্থাৎ হে চম্পক, মলিনাশয় পতঙ্গ অলি তোমায় আদর করে না। তাহাতে কি তোমার দুঃখ হয়? নলিননয়নাসমূহের নিরুপম কেশকলাপ কুশলে থাক, তোমার আদরের অভাব কি?—ইতি।[১]

দাশরথি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কত প্রীতিভাজন ছিলেন, তাহার আর দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির জ্যেষ্ঠতাত ৺কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবাগীশ ছিলেন সেকালের সর্বপ্রধান কবি। তিনি একবার উলা গ্রামে তাঁহার ভগিনীপতি তিতু চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছেন, শুনিলেন দাশরথি দল লইয়া সেই পথে অন্যত্র গান গাহিতে যাইতেছেন। ডাকাইয়া আনিয়া বাচস্পতি মহাশয় দাশরথিকে গান শুনাইয়া যাইতে বলিলেন; এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারিবেন না বলিয়া পূর্বেই ভূমিকা করিলেন, ভগিনীপতি তিতু চাটুয্যে কুলীন ব্রাহ্মণ; কাজেই নিঃস্ব। যাহা হউক পাঁচালী শেষ হইলে বাচস্পতি মহাশয় নিজের গায়ের কাপড়, একখানি বনাত ও সঙ্গের সম্বল দুইটি টাকাই দাশরথিকে দিয়াছিলেন। দাশরথি ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহা তোমাকে দেওয়া নহে, তোমার গানের মূল্য টাকায় হয় না। দলের লোকদের দুখানি করে বাতাসা জল খেতে দিও।"[২]

গোপীগণের বস্ত্রহরণ পালায় শ্রীরাধিকার একটি গান এই,—
"ননদিনী বল নগরে সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে"॥[৩]

১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', চতুর্থ সংস্করণ, প্রস্তাবনা, পৃঃ ২।

২। পরিশিষ্ট ক, পৃঃ ৩৮৭।

৩। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাশরথির পাঁচালী', চতুর্থ সংস্করণ, অভিমত সংগ্রহ, পৃঃ ৬।

এই গানটি এককালে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। "মাধব তর্কসিদ্ধান্ত প্রমুখ নবদ্বীপের সঙ্গতিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই গান শুনিয়া দাশরথিকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গতিহীন নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও কিরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বর্ণিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। ব্যাদড়াপাড়ার পণ্ডিত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য ছিলেন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। দাশরথির গীতে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মণীর একমাত্র স্বর্ণ অলঙ্কার কানের ঢেঁড়ী দুইখানি আনিয়া দাশরথির আসরে ফেলিয়া দিলেন। ইহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং লোকপরম্পরায় কথাটি দাশরথির কানেও উঠিল। দাশরথি ঢেঁড়ী দুইখানি ও নগদ পাঁচটি টাকা লইয়া গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। বিষ্ণুচরণ উহা লইতে অস্বীকার করায় দাশরথি কহিলেন,—"আপনি নদের পণ্ডিত, আপনি আমার গানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।" বিষ্ণুচরণ উত্তর করিলেন,—"তোমার গান শুনিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, বাড়ীঘর সব বিক্রয় করিয়া দিলেও তোমার উপযুক্ত মূল্য হয় না।"'[১]

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের ঋণ দাশরথি আমরণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়াছেন। 'রাবণ বধ পাঁচালী পালায় কৌশলে তিনি নবদ্বীপের' কয়েক জন পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন।

আমার নাম জানে বিশ্ব, শ্রীরাম শিরোমণির শিষ্য
লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের ছাত্র।

দাশরথির পাঁচালীর আসর বসিয়াছিল গোটা বঙ্গদেশ জুড়িয়া। বর্ধমানের রাজাধিরাজ তাঁহার গান শুনিয়া খুসি হইয়াছিলেন, কাসিমবাজারে রাজবাড়ীতে ৺শারদীয়া দুর্গাপূজায় প্রায় প্রতি বৎসরই দাশরথি গান করিতেন। কলিকাতার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দাশরথির প্রচুর সমাদর করিয়াছেন।

কলিকাতায় দাশরথির গানের কোন বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা যায় নাই। তাহা হইলেও ইহা অনুমান করা চলে যে নবদ্বীপাদি স্থানে এবং অপেক্ষাকৃত

১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাশরথির পাঁচালী', চতুর্থ সংস্করণ অভিমত সংগ্রহ, ৬।

ইংরাজী প্রভাবমুক্ত নগরে ও গ্রামাঞ্চলে দাশরথির ভক্তিরসপ্রধান পাঁচালী যে জাতীয় ভাব-প্লাবন তুলিয়াছিল, কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব-পরিমণ্ডলে নবশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে সেইপ্রকার বন্যা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধানযোগ্য। মনে হয় কলিকাতার ইংরাজী-প্রভাববর্জিত শাখার গীতগুলির মধ্যে পাঁচালী গানই খুব মুখ্যস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। কবি, হাফআখড়াই ও টপ্পা গানে তখন কলিকাতা সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। আর ইহার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র। কবিগানে যাহা সূক্ষ্মভাবে বিরহ ও স্থূলভাবে খেউড় লহর নামে খ্যাত ছিল, তাহাই হাফআখড়াইতে শিষ্ট রুচিসম্মত হইয়া বিরহ গানে মার্জিত রূপ ধারণ করে। টপ্পা গান একেবারে প্রতীক-নিরপেক্ষ সরাসরি প্রণয়সঙ্গীত।[১] এইসব গীতের জনপ্রিয়তা আর পাঁচালীর জনপ্রিয়তা একই স্থানে, একই পরিবেশে সমান তালে হওয়া কঠিন। পাঁচালী গানের তথা দাশরথির কলিকাতায় যে বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা লাভ হয় নাই, তাহার কারণও এই যে কলিকাতার শ্রোতৃমণ্ডলী তখন অন্য বস্তুর রসে একান্ত ভাবে মশগুল হইয়া ছিলেন, পাঁচালীর ভক্তিরসপ্রধান সুর তাঁহাদের কানে প্রবেশ করিলেও হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। পাঁচালাকার দাশরথি প্রচলিত সমাজের বিরোধী প্রায় যাবতীয় আচার ব্যবহারের প্রবল শত্রু ছিলেন। তাঁহার পাঁচালীতে তদানীন্তন আধুনিক পুরুষ, নবীনা নারী, চাকুরিয়া, বাবু প্রভৃতির বহু নক্সা ও ব্যঙ্গচিত্র আছে। কলিকাতার নিধুর টপ্পা ও টপ্পা গীতের ধারক বিভিন্ন পরিবেশের উপর দাশরথি যে কতটা খড়্গহস্ত ছিলেন পাঁচালী পালায় তাহার অজস্র প্রমাণ আছে।[২] কলিকাতার পরিবেশের উপর এরূপ বিরূপ মনোভাব যে কলিকাতাতে অভীপ্সিত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে না পারার ক্ষোভজনিত আক্রোশ নহে, তাহাই বা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে?

দাশরথি যে কোন আসরেই প্রত্যাখ্যাত হন নাই এমন নহে। কিন্তু ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ বৈরাগী সম্প্রদায়ের প্রতি অতি

১। এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। কলি রাজার উপাখ্যান, নবীনচাঁদ ও সোনামনি প্রভৃতি পালা দ্রষ্টব্য।

বিরূপতা, দ্বিতীয়তঃ কবিগান শ্রবণে অভ্যস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর পাঁচালীর রস আস্বাদনে অক্ষমতা। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দাশরথি কোন এক সময়ে বৈষ্ণব প্রধান জেমুয়া কাঁদি অঞ্চলে পাঁচালী গাহিতে গিয়াছিলেন। এইখানে "গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া, অকালকুষ্মাণ্ড নেড়া" ইত্যাদি পদ বলিতেই বৈষ্ণবেরা পাঁচালী বন্ধ করিয়া দেন এবং দাশরথি আসর তুলিয়া ফিরিয়া আসেন। আসলে দাশরথি যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ তাঁহার পাঁচালীর মধ্যে এবং তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রে এই উদাহরণের অভাব নাই।[১] কিন্তু বৈরাগীদের তিনি আমরণ দেখিতে পারেন নাই। সেই যে পুরুষোত্তমদাস বৈরাগ্যের কবির আসরে অপমানিত হইয়াছিলেন, সেই জ্বালা, বোধ হয় তিনি কোনদিনই ভুলিতে পারেন নাই। তাই সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে বৈষ্ণব বৈরাগীর বিষয় পাইলেই তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিতেন। "গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া" ছড়ার প্রতিবাদে পুরুষোত্তমদাস দাশরথিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-বিরোধী আখ্যা দিয়া এক ছড়া প্রকাশ করেন। তাহার উত্তরে দাশরথি নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া এই ত্রিপদী রচনা করিয়াছিলেন।

আমি নই অচৈতন্য, ধরামান্য শ্রীচৈতন্য সদা তাঁর পদ অভিলাষী।
বৃক্ষবাসী হনুমান গণে করে অনুমান দাশরথি গৌরাঙ্গদ্বেষী॥
সদাশিব গুণমণি বৈষ্ণবের শিরোমণি, বৈষ্ণবী ভবানী তাঁর ঘরে।
বৈষ্ণব নারদ শুক শুনে শুনে জন্মে সুখ বৈষ্ণবের নিন্দা কেবা করে॥
পাঠাইয়া একে ফর্দ একি জারি ভারি মর্দ ভাগবত আধকাঠা খুদে।
পাঁদাড়ে বসিয়া দাড়ি মিছে কেন নাড়ানাড়ি ক্ষিপ্ত বুঝি ভাদ্রমাসের রোদে॥
পুস্তক রচিয়া যদি হতে পারে প্রতিবাদী তবে জানি বীরের নন্দন।
অঙ্গে বঙ্গে পরিচয় দিতে নারে দুরাশয় করে যেন মোর সঙ্গে রণ॥

১। সেই রাধার ভাবে হয়ে ঋণী শ্রীগৌরাঙ্গ চিন্তামণি
নবদ্বীপে অবতীর্ণ সঙ্গে পরিবার।
কতেক বর্ণিব আর নিত্যানন্দ শঙ্করা আর
যত ভক্ত খ্যাত ত্রিসংসার॥ —কর্তাভজা, পৃঃ ৬২৬

এক জন আছে দেখ হাঁড়ি মুচি নিয়ে ভেক প্রণাম করে না দ্বিজগণে।
বৈষ্ণব ধ্রুব প্রহ্লাদ স্মরণে হয় আহ্লাদ, মান্য করি রূপ সনাতনে ॥[১]

দ্বিতীয় কারণের উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। ইহার মধ্যে দাশরথির ঝাঁঝালো রসিকতার স্বাদও পাওয়া যাইবে। একদা দাশরথি হুড়কডাঙ্গায় গান গাহিতে গিয়াছিলেন। গ্রামের লোক গানের মর্ম বুঝিতে পারে নাই। সেই জন্য তাঁহার গান বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারা অনেকে গানে অনভিমত প্রকাশ করে। ইহাতে দাশরথি তৎক্ষণাৎ একটি কথা বলেন, উহার অংশ মাত্র পাইয়াছি,

যে ভগীরথ গঙ্গা আনলেন ত্রিভুবন ধন্যে
তার আবার খেদ রইলো পুকুর প্রতিষ্ঠার জন্যে।
যার বিয়েতে কুলো ধরলেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসি।
তার বিয়েতে এয়ো এল না আকালে হাড়ীর মাসি ॥
নদে শান্তিপুরে যার জয় জয় রব।
হুড়কডাঙ্গায় হার হল তার হরির ইচ্ছা সব ॥[২]

নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে সমাদর লাভ করিয়াও দাশরথির মনের খেদ রহিয়াছিল। পীলার সর্বজনমান্য ভৈরব চক্রবর্তী মহাশয় একদা দাশরথিকে কবির দল ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তোমার মুখ দর্শন করিব না। দাশরথি পরে কবির দল ত্যাগ করিয়া পাঁচালীকার হিসাবে দেশের দশের এমন কি নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গের কাছে প্রচুর সমাদর পাইয়াছেন, কিন্তু ভৈরব চক্রবর্তী তাঁহার সমাদর দূরে থাকুক, মুখদর্শন ও বাক্যালাপ করেন নাই। আত্মমর্যাদাতে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত দাশরথির হৃদয়ে ইহা কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। এক বৎসর নবদ্বীপ হইতে রাসপূর্ণিমার পরদিন দাশরথি বাড়ি ফিরিলেই ভৈরববাবুর বাড়ির যুবকগণ গৃহের রাসাঙ্গনে পাঁচালীর ব্যবস্থা করেন। বহুবারই এইরকম পাঁচালী হইয়াছে কিন্তু ভৈরববাবু ইহার ছায়াও মাড়ান নাই। এবার তিনি কি মনে করিয়া অন্তরাল হইতে পাঁচালীর সঙ্গীত ও

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৮১—৮২।
২। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪৩।

বক্তৃতা শুনিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া আসরে আসিয়া দাশরথিকে এক জোড়া শাল পুরস্কার দিয়া কহিলেন, "দাশরথি তোমার ব্যবসাকে আমি হেয়জ্ঞান করিতাম। এখন দেখিতেছি চাকুরী অপেক্ষা ইহা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ তুমি মানুষের মন মোহিত করিয়া উপার্জন কর।" দাশরথি শাল মাথায় করিয়া বলিলেন, "আজ আমার জীবন ও ব্যবসায় সার্থক হইল, আমিও কৃতার্থম্মন্য হইলাম।"

দাশরথির প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তিনি এবার বসতবাটীর জন্য দোতালা দালান নির্মাণ করিলেন। বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ, বৈঠকখানা, ও অন্যান্য গৃহ নির্মাণ করাইয়া চারিদিকে ইটের প্রাচীর তুলিলেন। বাটীতে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া, যাহাতে পূজা নির্বিঘ্নে চলিতে পারে, তাহার জন্য নিষ্কর জমি সংগ্রহ করিলেন। মধ্যে মধ্যে শারদীয়া দুর্গা পূজা, শ্যামা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজাও করিতেন। যেবার পূজা করিতেন সেবার আর নিজে বাহির হইতেন না, তিনকড়িকে দিয়া দল পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে বোধহয় সবদিক দিয়া পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে দেন না। দাশরথির কোন পুত্র সন্তান হইল না। একমাত্র কন্যা হইয়াছিল তাহার নাম রাখিয়াছিলেন কালিকাসুন্দরী। দাশরথি নিজের কন্যাকে কুলীন পাত্রে সম্প্রদান না করিয়া বংশজে দিয়াছিলেন। টাকার জন্য নিশ্চয় দাশরথি এমন কাজ করেন নাই; খুব সম্ভব কুলীন পাত্র সম্বন্ধে দাশরথির ধারণা খুব ভাল ছিল না। নিজেরা ও মাতুল বংশ কেহই কুলীন ছিলেন না বলিয়াও ইহা হইতে পারে। তাঁহার পাঁচালীতে কুলীন মেয়েদের দুঃখের অনেক কথাই লিখিয়াছেন।[১] কালিকার বিবাহ হইয়াছিল নবদ্বীপের ৺মাধবচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র ৺দুর্গাদাস ন্যায়রত্নের সহিত। কালিকারও একটি কন্যা হইয়াছিল, বাঁচে নাই। দাশরথির মৃত্যুর এক বৎসর পর ১২৬৫ সালের কার্ত্তিক মাসে কালিকার মৃত্যু হয়।

১। মানভঞ্জন (২), পৃঃ ১৫১। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ক এবং বিধবা বিবাহ, বিরহ (১) প্রভৃতি পাঁচালী দ্রষ্টব্য।

পুত্র সন্তান হইবার আশা না থাকায় দাশরথি স্বীয় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছিলেন। কন্যা জামাতা যদি সব লইয়া যান, তবে তাঁহার কর্মক্ষেত্র পীলাতে তাঁহার কোন চিহ্নই থাকিবে না, এমন কথা ভাবিতেও তাঁহার কষ্ট হইত। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজ গৃহে তিনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। "শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ"—বলিয়া কন্যা জামাতা ইচ্ছা করিলেও পীলা হইতে তাঁহার চিহ্ন লোপ করিতে পারিবেন না, এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। শিব সেবার সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি নিষ্কর জমিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

দাশরথি রসিক ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। মানুষের সহিত কোন কারণেই তিনি মনোমালিন্য করিতে চাহিতেন না। তখনকার দিনে মামলা মোকদ্দমা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল, এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইহা আভিজাত্য, ধনগর্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়কও ছিল। কিন্তু দাশরথি জীবনে একটিও মোকদ্দমা করেন নাই। প্রচুর আয় করিয়াছেন, সম্পত্তিও কম সংগ্রহ করেন নাই, কিন্তু মামলা মোকদ্দমার পথ সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার গর্ব, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা ছিল না। অর্থব্যয় সম্বন্ধে একটু বেশি হিসাবী ছিলেন। কনিষ্ঠ তিনকড়ির দরাজ হাতের সহিত তুলনা করিলে তাঁহাকে কৃপণও বলা যায়। কিন্তু মিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য এক নহে। এই কারণে সময়ে সময়ে তিনকড়ির সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইত। ইহা এতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছিল যে এক সময়ে তিনকড়ি আলাদা বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন, এবং পৃথক পাঁচালীর দল গঠন করিয়া গান করিতে থাকেন। অবশ্য ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

পূজাপার্বণ উপলক্ষে ও অতিথি সেবায় দাশরথি সর্বদাই উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইতেন। বাড়ীতে অন্ধ, আতুর, ভিখারী আসিলে তিনি মুষ্টিভিক্ষা না দিয়া আহারোপযোগী চাউল ও পয়সা দিতেন, বস্ত্রহীনকে পুরাতন কাপড় দিতেন। অতিথিকে নিজে বসাইয়া আহার করাইয়া রাত্রি হইলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া অতিথির অনুমতি লইয়া অন্দরে যাইতেন। বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ব্যাপারে তিনি সকলকেই পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন, নিজে পরিবেশন করিতেন না, তদারক করিতেন এবং সকলকে পান দিতেন।

দাশরথির আর একটি বিশেষ গুণ ছিল। নিজে একবার জরবিকারে ভুগিয়াছিলেন বলিয়া এই অসুখের কষ্ট তিনি জানিতেন। বস্তুতঃ অন্যান্য রোগের তুলনায় জরবিকার তখন কঠিন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ছিল। দরিদ্র লোকে কবিরাজ ডাক্তার ডাকিয়া ইহার চিকিৎসা করিতে পারিত না, আর বিনা চিকিৎসায় ইহা ভালও হইত না। সুতরাং দরিদ্রের পক্ষে জরবিকার আর মৃত্যু একার্থক ছিল। দাশরথি কবিরাজের নিকট হইতে জরবিকারের একটি পাঁচন শিখিয়াছিলেন। বাড়ীতে ইহার উপাদান তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং দরিদ্রদিগকে অন্যান্য ছোটখাট ওষুধের সহিত ইহাও বিনা পয়সায় দান করিতেন।

কিন্তু নিজের রচনা শক্তির সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে তিনি ততটা সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারিতেন না। নিজের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁহার একটি দৃঢ়বদ্ধ অহংকার ছিল। "কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র এবং গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনার কথা উত্থাপন হইলে তাঁহাদের রচনা বিষয়ে অবজ্ঞা করিতেন। উক্ত পীলা গ্রামের গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে করিতে তাহার পয়ারের প্রশংসা করাতে দাশরথি তাঁহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করতঃ দুই দণ্ডকাল মধ্যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক কতগুলিন পরিপাটী পয়ার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, গুরু মহাশয় তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন"।[১] দাশরথির পূর্বে কোন পাঁচালীকার নিজের পাঁচালী মুদ্রাঙ্কিত করেন নাই। দাশরথি নিজে পীলা গ্রামের নিকটবর্তী বহরা গ্রামে হরিহর মিত্রের মুদ্রাযন্ত্রে পাঁচ খণ্ড পাঁচালী ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা যে তাঁহার নিজের রচনা শক্তির বিষয়ে বিশেষ আস্থার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

দাশরথি যে কি পরিমাণে রসিক ছিলেন তাহা কেবল পাঁচালী পাঠ বা শ্রবণ করিলেই পরিষ্কার বুঝা যায় না। প্রতিদিনকার জীবনের অজস্র ও বিচিত্র টুকরা টুকরা ঘটনার বিবরণ জানিলে তবেই রসিক দাশরথির কিছুটা

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৭৯।

পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ইহা সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গবাসী সংস্করণ দাশরথি রায়ের পাঁচালী প্রভৃতি গ্রন্থে দাশরথির রসিকতা ও বাক্‌পটুতার কতগুলি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে মাত্র দুই একটি উল্লেখ করিব।

একদা কোন স্থানে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথা হইতেছিল। আলোচ্য বিষয়ে প্রস্তাব ছিল বানর সম্বন্ধে। এমন সময় দাশরথি কয়েকজন বন্ধুর সহিত সেখানে প্রবেশ করিলেন। কথক তাহা দেখিয়া কৌতুক সৃষ্টির জন্য বলিলেন, "এই যে সব বানর।" দাশরথিও সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন "সব বানর নয়, কতক বানর।" কতক শব্দ মুখে বলিলে কতক, কথক দুইই বুঝায়।[১]

এক সময়ে দাশরথি জয়দিয়া নামক গ্রামের কাছে অন্য গ্রামে গান করিতে গিয়াছিলেন। গান শেষ হইলে একব্যক্তি বলিল, "জয়দিয়ার মহাশয়েরা কোথায় গেলেন?" দাশরথি উত্তর দিলেন, "তাঁহারা অনেকক্ষণ জয় দিয়া গিয়াছেন।" এক অর্থ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; অন্য অর্থ গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছেন।[২]

ইহা ছাড়া দাশরথির অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনার সময়েও তাঁহার রহস্য-প্রিয়তার ও বাক্‌পটুতার অনেক দৃষ্টান্ত পরে মিলিবে।

দাশরথি সমসাময়িক কবি, পাঁচালীকার, যাত্রাওয়ালা এবং সাহিত্য ব্যবসায়ীদের সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিতেন। পাঁচালীকার রসিক রায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় এক সময় পীড়িতাবস্থায় জলপথে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে পীলায় উপস্থিত হন, তথায় তিনি দাশরথির সহিত রহস্যালাপে একদিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গুপ্ত মহাশয় দাশরথির সহিত কবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর করিয়া বলিয়াছিলেন, "রায় মহাশয়ের শক্তি আমার হিংসার বস্তু।" ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাটি দাশরথির হৃদয়ে চিরকাল গাঁথা ছিল।[৩]

১। বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৩৪০।

২। ঐ ঐ, পৃঃ ৩৪১।

৩। ঐ ঐ, পৃঃ ৩৪০।

সন্ন্যাসী চক্রবর্তী নামক একজন পাঁচালীকারের সহিত দাশরথির বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে রমানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "এই সময়ে সন্ন্যাসী চক্রবর্তী নামক এক বর্ণের এক ব্রাহ্মণের এক পাঁচালীর দল ছিল। দাশরথির রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া সন্ন্যাসী তাহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে পাঁচালী রচনায় প্রবোধিত করিলেন, দাশরথিও ছড়া বাঁধিলেন—

ভালবাসি সন্ন্যাসীরে তাই প্রণাম করি নত শিরে
সন্ন্যাসীর শিরোমণি যিনি।
আদর করে স্বশিরে স্থান দিয়েছেন শশীরে
প্রণাম গ্রহণ করিবেন কি তিনি ॥[১]

গোবিন্দ অধিকারী একদিন বর্ধমানে গান করিতেছিলেন, দাশরথি সে আসরে উপস্থিত। গান শেষ হইলে দাশরথি গানের প্রচুর প্রশংসা করিলেন। গোবিন্দ কহিলেন, "আজ গলাটা ভাঙ্গা, বড় সুবিধা হইল না।" দাশরথি জবাব দিলেন, "আপনার যা ভাঙ্গা, অপরের নৈকষ্য।"[২]

পৌরাণিক বিষয় ও সমসাময়িক ঘটনা এই দুইটিই দাশরথির পাঁচালী ও গানের উপাদান ও বিষয়বস্তু হইয়াছে। কিন্তু পাঁচালীর সংঘটনার পটভূমিটি ছিল সর্বত্রই, বিশেষতঃ পৌরাণিক বিষয়ে, বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ এবং দাশরথির অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচিত পরিবেশসাপেক্ষ। দক্ষের যজ্ঞক্ষেত্র, বলির যজ্ঞভূমি বা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস-যজ্ঞসভা বর্ণনা করিতে গিয়া দাশরথি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আসলে তাঁহার নিজ চোখে দেখা রাজরাজড়া বা জমিদার বাড়ীর বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বা অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা মাত্র। শুধু পরিবেশ রচনাতে নহে, বিবাহ, জন্মোৎসব প্রমুখ ঘটনার বিবৃতি দানের ব্যাপারে এমন কি চরিত্রসৃষ্টি বিষয়েও দাশরথি একান্ত ভাবে নিজের প্রত্যক্ষ

১। আর্যাবর্ত, অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল; দাশরথি রায় প্রবন্ধ। কিন্তু পাঁচালী সম্পাদক হরিমোহন—"দাশু রায় ছড়া কাটিয়ে আর সন্ন্যাসী চক্রবর্তী বাজিয়ে" এই প্রবাদের কথা বলিয়াছেন। বঙ্গবাসীর চতুর্থ সংস্করণ, দাশরথির পাঁচালী, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৫।

২। বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৩৪১।

অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াছেন।[১] কিন্তু পৌরাণিক পালার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই নিজের কথাটি সরাসরি বলিতে পারেন নাই, একটা পরোক্ষতার আড়াল টানিতে হইয়াছে। বিধবাবিবাহ, কর্তাভজা প্রমুখ সমসাময়িক বিষয়গুলির মধ্যে কিন্তু এই জাতীয় পরোক্ষতা নাই, সরাসরি ইহার মধ্যে তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। নিজের মত মানেও মুখ্যতঃ তাঁহার সমর্থিত তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজের মত। কিন্তু ক্ষেত্র-বিশেষে সমাজের মত ও তাঁহার নিজের মতের মধ্যে যে কিছুটা পার্থক্য হয় নাই, এমন নহে। দাশরথি যে সমাজের সমর্থক সে সমাজ বিধবাবিবাহের ঘোরতর বিরোধী, দাশরথিও বিরোধিতা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতি যে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, তাহাও মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। ফলে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে দাশরথির শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতির মধ্যেও বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁহার সত্যিকারের শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ কর্তাভজা সম্বন্ধে তিনি তেমন কোন সহৃদয়তা দেখান নাই, সমাজের সহিত ষোল আনা একমত হইয়া নির্মম ও কঠোর ভাবে উহার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমটিতে তাঁহার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, দ্বিতীয়টিতে তাহার লেশ মাত্র নাই।

সমসাময়িক কোন ঘটনা লইয়া সরস টিপ্পনী শুনিবার বাসনা বোধহয় চিরকালই জনসাধারণের মধ্যে প্রবল। জনকবি দাশরথি এইসব ব্যাপারে খুব তৎপর ও পটু ছিলেন। পালা ও পালার মধ্যকার ছোটখাট নক্সা ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে দাশরথির কয়েকটি গীত পাওয়া গিয়াছে। "দাশরথির মৃত্যুর কিছু পূর্বে নদীয়া ও হুগলী ইত্যাদি জেলায় এক অদ্ভুত গুজব উঠিয়াছিল যে নবদ্বীপে গোপাল অবতার হইয়াছেন। তিনি অনুমতি করিয়াছেন ১৫ই কার্তিক যত মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে। কিংবদন্তী যে রানাঘাট হইতে এ জনরবের উৎপত্তি। বিস্তর লোক ইহাতে বিশ্বাস করিয়া দিন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। অনেক বিধবা, ভদ্রলোকের বিধবারাও মৃত পতির পুনরাগমন প্রত্যাশায় পতির জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া

১। এই সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সেখানে এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

বসিয়াছিল।······কিন্তু ১৫ই কার্তিক কেহই ফিরিল না। এই সময় দাশরথি এই দুইটি গান রচনা করিয়াছিলেন।"[১]

(১)

দিদি দিন পাব, শুভদিন হবে—ভেব না।
মরা মানুষ আসবে ফিরে, গোল শুনে তাই বলছি তোরে
গোলহাতে আর কাল কাটাতে হবে না।
··· ··· ···
এ দুটো মাস যে দুর্গতি কার্তিক মাসে আসবে পতি,
গোপালের এই অনুমতি, ঘুচবে তোদের একাদশী গো॥

(২)

সই লো তোর মরা মানুষ ফিরেছে।
কিন্তু পচে নাই কিঞ্চিৎ রসেছে।
আমি দেখে এলাম রানাঘাটে ভাসতে ভাসতে আসতেছে।[২] ইত্যাদি।

এই ধরণের ঘটনা লইয়া বা কোন দেবতা কি তীর্থাদি দর্শন করিয়া কয়েকটি গীত রচনা করিয়াছিলেন।

দাশরথি সংস্কৃতজ্ঞ ও রীতিমত শিক্ষিত ছিলেন কিনা তাহা লইয়া পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। দাশরথির পাঁচালীর বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন: "কোন কোন পণ্ডিত লোকের মুখেও শুনিতে পাই যে দাশুরায়ের গ্রন্থাধ্যয়নলব্ধ বিদ্যা অতি অল্পই ছিল, অর্থাৎ তিনি কিতাবতী লেখাপড়া মাত্রই শিখিয়াছিলেন, উত্তমরূপ বিদ্যার্জনের অবসর পান নাই, সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি উত্তমোত্তম গ্রন্থসমূহ পাঠে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না।······কথকের

১। বঙ্গবাসীর দাশরথির পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, মূল ও পাদটীকা, পৃঃ ৭০২।

২। বঙ্গবাসীর দাশরথির পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৭।

মুখে শুনিয়াই এবং প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই, তাঁহার পাঁচালীর পালাসমূহ রচনা করিতেন। আমরা কিন্তু এ কথা মানিতে প্রস্তুত নহি।······পাঁচালীর পালাসমূহে পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃতি উপলক্ষে তিনি যেমন অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, কেবলমাত্র লোকপ্রমুখাৎ শ্রুত উপদেশে সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে না।[১]

কিন্তু দাশরথির জীবনীকার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[২], প্রসিদ্ধ সমালোচক দীননাথ সান্ন্যাল[৩] প্রভৃতি এই মতের বিরোধী। চন্দ্রশেখর কর কাব্যবিনোদ মহাশয় পাঁচালী সম্পাদক হরিমোহনের মতের বিরোধিতা করিয়া নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যবিনোদের ভাষায় বলিতেছি, "দাশরথির সময়ে নারায়ণপুর গ্রামে শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন নামে এক অধ্যাপক বাস করিতেন। এই গ্রাম পীলার অতি সন্নিহিত। দাশরথি তাঁহার রচিত পাঁচালী শতঞ্জীবের কাছে লইয়া যাইতেন এবং কহিতেন, 'আপনি ইহার অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিন।' এইস্থানে একটু বিস্তৃত ভাবে বলি, দাশরথি কিতাবতী লেখাপড়াই শিখিয়াছেন, বিদ্যালয়ে কখনও রীতিমত লেখাপড়া শেখেন নাই। বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, দাশরথি রীতিমত লেখাপড়া ও সংস্কৃত জানিতেন বলিয়া ভুল করিয়াছেন। দাশরথি নিজে সর্বদাই স্বীকার করিতেন যে, তিনি লেখাপড়া কিছুই শেখেন নাই। ·········যাহা হউক, শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন মহাশয় দাশরথির রচিত দুই একখানি পাঁচালী পড়িয়াই বুঝিলেন যে ইনি একজন অসামান্য কবি। দাশরথি পুনরায় তাঁহার নিকট নূতন একখানি পাঁচালীর পাণ্ডুলিপি লইয়া গেলে তিনি কহিলেন, 'দাশু, তুমি সিদ্ধ পুরুষ। তুমি যাহা লিখিয়াছ, উহাই শুদ্ধ, আমি আর উহাতে কলম চালাইব না।'

১। বঙ্গবাসীর দাশরথির পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৭।

২। "দাশরথি কোন টোলে, চতুষ্পাঠীতে, অথবা কোন কলেজে, স্কুলে অধ্যয়ন করেন নাই।" ইত্যাদি, মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৩২।

৩। "দাশরথি বিদ্বান ছিলেন না। সামান্য লেখাপড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সংস্কৃত ভাষা অল্পমাত্রও জানিতেন না, সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন।"—বঙ্গবাসীর দাশরথির পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, সমালোচনা, পৃঃ ২৬।

দাশরথি বিনীতভাবে কহিলেন, 'আজ্ঞে আমি তো সিদ্ধ বটেই, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন পাঁচালীর দল করিয়াছি, তখন সিদ্ধ বই আর কি? আপনারা আতপ আমি আর এজন্মে আতপ হইতে পারিলাম না'।"[১] যাহা হউক, দাশরথি যে অধিক লেখাপড়া করেন নাই, এবং চিন্তা, পুরাণাদি শ্রবণ ও প্রতিভাবলে পাঁচালী রচনা করিয়াছেন, এই মতই সমীচীন ও প্রমাণসহ।

দাশরথির প্রখর বাস্তব বুদ্ধির কথা পূর্বে নানা ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার পাঁচালী গাহিবার রীতির মধ্যেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। হাজার হাজার লোকের কানে তাঁহার পাঁচালীর কথাগুলি খুব স্পষ্ট করিয়া পৌছাইয়া দিবার কৌশলটি তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। চারি পাঁচ সহস্র কি দশ সহস্র লোক দাশুরায়কে বেষ্টন করিয়া সোৎসুক চিত্তে অবস্থিত, মধ্যস্থলে গায়ক দাশুরায় দণ্ডায়মান। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিতেন, তাঁহার সম্মুখস্থিত শ্রোতৃগণের দিকে চাহিয়া একবার, এবং দুইপাশে কোণাকুণি চাহিয়া দুইবার। ইহাতে সকল দিকের সকল লোকই উত্তমরূপে শুনিতে পাইতেন। আসরে গাহিতে বসিয়া দাশুরায় সময় বিশেষে পাঁচালীর পরিবর্তন করিয়া লইতেন। একই বিষয়ের পালাও তিনি ছোট, বড়, মাঝারি একাধিক তৈয়ার করিয়া রাখিতেন।[২] দাশরথির রচিত একই বিষয়ে যে একাধিক পালা পাওয়া যায়, তাহার একটি কারণ এই। শ্রোতা দেখিয়া পালার আয়তন, আকৃতি এবং কখন কখন প্রকৃতিরও যথাযোগ্য পরিবর্তন না করিতে পারিলে সকলের চিত্ত মোহিত করা সম্ভব নহে। ইহাতে বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সুক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন।

যেস্থানে গান করিতেন তথাকার বস্তু, ব্যক্তি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আসরে বসিয়াই সরস ছড়া ও সঙ্গীত রচনা করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সন্দেহ নাই যে এই গুণটি তিনি কবির দল হইতেই পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, "পালার শেষে এইরূপ দুই একটি কবিতার আবৃত্তি করিয়া তিনি

১। বঙ্গবাসীর দাশরথি রায়ের পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ অভিমত সংগ্রহ, পৃঃ ৭।

২। বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৩৪৫।

শ্রোতৃবর্গকে হাস্যরসে ভাসাইয়া দিতেন।...দাশরথি নদীয়া জিলায় ধর্মদা গ্রামে গান করিতে আসিয়াছিলেন। দেখিলেন, পূজার পুরোহিত উপযুক্ত লোক নহেন, গ্রামের নাপিত ভাল কামাইতে পারে না, আর ময়রা যে মুড়কি মাখে, তাহার সহিত গুড়ের সম্পর্ক অতি অল্প, উহা কার্পাসের ন্যায় সাদা। দাশরথির কবিতা হইল,—

দীনু পুরুৎ মন্ত্র পড়ান, অর্ধেক তার ভুল।
গুরো নাপিত দাঁড়ি কামায় অর্ধেক তার চুল॥
রতন ময়রা মুড়কি মাখে কাপাস কাপাস
ঠাকুররা সব খেয়ে বলে সাবাস সাবাস॥"[১]

কোন কোন জমিদার বাড়ীতে দাশরথির পাঁচালীর বাৎসরিক বরাদ্দ থাকিত। এই প্রসঙ্গে একটি সরস ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। নদীয়া নাকাশীপাড়া বাবুদের বাড়ী দাশরথির পাঁচালী গানের বাৎসরিক বন্দোবস্ত ছিল। কখনও তাঁহারা ডাকিলে যাইতে হইত, কখনও বা না ডাকিলেও ঐ পথে আর কোথাও গিয়াছেন, ফিরিবার সময় নাকাশীপাড়া গিয়া গাহনা করিয়া আসিতেন। এক শত টাকা করিয়া বরাদ্দ ছিল। একবার গিয়া গাওনা করার পর দাশরথি শুনিলেন যে বরাদ্দ কুড়ি টাকা কমিয়া আশী টাকা হইয়াছে। যাহা হউক, টাকা লইয়া দাশরথি বাবুদের কাছে বিদায় লইতে গিয়া বলিলেন, "গ্রামের নাম নাকাশী, ডাকলেও আসি, না ডাকলেও আসি, ছিল এক শ হল আশী, আসছে বারে আসি কি না আসি।"[২]

দাশরথির স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। কি যৌবনে কি প্রৌঢ়ত্বে কোন কালেই তিনি স্বাস্থ্যের নিয়ম পুরাপুরি মানিয়া চলিতে পারেন নাই। তাঁহার বৃত্তিই উহার অন্তরায় ছিল। রাত্রি জাগিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করা এবং অধিক রাত্রে লুচি, মিষ্টি কী ঠাণ্ডা দুধ খাওয়া, কোনটাই যে স্বাস্থ্যকর নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সব কারণেই হয়ত দাশরথির হাঁপানি হইয়াছিল। মাঝে মাঝে টান উঠিয়া কষ্ট পাইতেন। ইহার জন্য নিমন্ত্রণাদি ত্যাগ এবং

১। বঙ্গবাসীর দাশরথির পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, অভিমত সংগ্রহ, পৃঃ ৮।
২। ঐ ঐ সমালোচনা, পৃঃ ২৫।

অতিভোজন ও কুপথ্যাদি বর্জন করিয়াছিলেন। একবার পূজার পর কার্তিক মাসে দাশরথি জ্বরবিকারে মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দাদুপুরনিবাসী বিখ্যাত অন্ধ কবিরাজ কালিদাস গুপ্ত মহাশয় চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করেন। অসুখাবস্থায় দাশরথি মনে মনে একটি গীত ভাবিয়াছিলেন, আরোগ্য হইলে তাহা রচনা করেন।

"এ কি বিকার শংকরি, তরি পেলে কৃপা ধন্বন্তরি।
অনিত্য গৌরবে সদা অঙ্গে দাহ, আমার কি কটিল মোহ,
ধন জন তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি।"[১]

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে প্রতি বৎসর দাশরথি কাসিমবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীতে দুর্গোৎসবে গান করিতে যাইতেন। কাসিমবাজারের জলবায়ু তখন খুব খারাপ ছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাশরথির দলের দুই একজন করিয়া রোগে ভুগিয়া মারা পড়িতে লাগিল। কিন্তু তবু দাশরথি, কি তাঁহার দলের লোক কাসিমবাজারের বায়না ত্যাগ করিতে পারিলেন না। প্রচুর টাকা পয়সা ও উপঢৌকন ছাড়াও "কাসিমবাজারের বিখ্যাত রাধাবল্লভী, কচুরী ও পেঁড়া এবং বণিকের গোলার বাটখারার ন্যায় ছ্যানাবড়ার লোভানুগ পাপানুগ মৃত্যুর আকর্ষিত হইয়া দাশরথির সমভিব্যাহারী গায়ক, বাদক এবং ভারী চাকরেরা কাসিমবাজার যাইবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুলিত হইত।"[২]

১২৬৪ সালে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, কাসিমবাজারে দুর্গাপূজাতে পাঁচালী গান করিয়া, কোজাগরী পূর্ণিমার পরে বাড়ী আসিয়া দাশরথি জ্বরবিকারে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পূর্বদিবস চতুর্দশী তিথির প্রভাতে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। পীড়া বৃদ্ধির অবস্থায় আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়া দাশরথি নিজেই গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। দাশরথির মৃত্যুসময় গঙ্গাতীরে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একজন গায়ক তাঁহারই রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন। দাশরথি গান শুনিতে শুনিতে গঙ্গা দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার কণ্ঠ জড়তাপ্রাপ্ত হইল, মৃত্যুর শেষ লক্ষণ দেখা দিল, ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী নাড়ী

১। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট সঙ্গীতসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

২। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ১১০।

পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিল।" দাশরথি ১২৬৪ সালে ২রা কার্তিক কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।[১] মৃত্যুকালে দাশরথির বয়স ৫১ বৎসর ৯ মাস হইয়াছিল।

একটি প্রবাদ চালু আছে যে দাশরথি মৃত্যুক্ষণে "ও ভাই তিমুরে ফিরে যারে ঘরে" ইত্যাদি একটি গান গাহিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে। এই কথার প্রতিবাদ করিয়া জীবনীকার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "দাশরথির কথা উপস্থিত হইলে, অনেকে অনেক স্থানে গল্প করিয়া থাকেন, যে দাশরথি মৃত্যুকালে কয়েকটি গীত রচনা করিয়াছিলেন, সেটি দাশরথির রচনাশক্তির গৌরবার্থে লোকজল্পনা মাত্র, বাস্তবিক সে ভয়াবহ সময়ের প্রাক্কালে তিনি কোন রচনা করিতে পারেন নাই।"[২]

দাশরথির মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরই তিনকড়ির মৃত্যু হয়। ইহার পর দাশরথির জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগবানচন্দ্রের পুত্র ভবতারণ পাঁচালীর দল পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনিও অচিরকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। তারপর কৃষ্ণনগর নিবাসী বাণীকণ্ঠ বসু দল পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই দাশরথির বংশ হইতে পাঁচালী সরস্বতী বিদায় গ্রহণ করেন।

দাশরথির পত্নী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী বহু দিন বাঁচিয়া ছিলেন। দাশরথির বিপুল স্থাবর সম্পত্তির আয় ছাড়াও পাঁচালীর স্বত্ব বিক্রয় করিয়া দিয়া তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৩০৬ সালে ৫ই অগ্রহায়ণ প্রসন্নময়ী পরলোক গমন করেন।

১। বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৩৩৩।
২। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ১১৮।

তৃতীয় অধ্যায়

দাশরথির পাঁচালী

ক

দাশরথি নিজেই তাঁহার কয়েকটি পালা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া গিয়াছিলেন। পীলার নিকটবর্তী বহরা গ্রামে হরিহর মিত্রের মুদ্রাযন্ত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পালাগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। কোন্ সালে, কোন্ কোন্ খণ্ডে, কি কি পালা যে দাশরথি নিজে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন, বহরার পালাগুলির অভাবে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লোপ পাইয়াছে।

১৩০৪ সালে (১৮৯৭ খ্রীঃ) একখণ্ড এবং ১৩০৫ সালে (১৮৯৮ খ্রীঃ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড দাশরথির পাঁচালী বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন যন্ত্রে শ্রীঅরুণোদয় রায় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল।[১] প্রথমখানার (১৮৯৭ খ্রীঃ) মুখবন্ধের অংশ-বিশেষ এই প্রকার: "দাশরথি রায়ের পাঁচালীর কয়েকটি পালামাত্র এবার মুদ্রিত হইল। বটতলার যে পাঁচালী ছাপা হইয়াছে, এ পাঁচালীর সহিত তাহার অনেক পার্থক্য দেখিবেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী বহড়া গ্রামে ১২৬০ সালের পূর্বে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বয়ং দাশরথি রায় সেই ছাপাখানায় আপন পাঁচালী ছাপাইয়া ছিলেন। নিজে প্রুফ দেখিতেন, সেই পাঁচালীর সম্পাদন ভার নিজেই সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাশরথি রায়ের প্রকাশিত সেই পাঁচালী হইতেই কয়েকটা পালা মুদ্রিত করিলাম।

"বঙ্গবাসী কার্যালয়ের সহকারী কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামগতি মুখোপাধ্যায় স্বয়ং কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বহু গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বহড়ার মুদ্রিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটের বাবু উপেন্দ্রনাথ

১। ১৩০৪ সালে মুদ্রিত খণ্ডখানি জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। উহার একখণ্ড ও উক্ত তৃতীয় খণ্ডখানি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সংগ্রহে দেখিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডটি আমাদের সংগ্রহে আছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদিগকে বহড়ার পুঁথির কয়েক পালা দিয়া উপকৃত করিয়াছেন।”[১]

কিন্তু ইহাদ্বারা দাশরথির সম্পাদিত পাঁচালীর কাল, খণ্ড ও পালার পূর্ণ বিবরণাদি কিছুই জানা যায় না। তারপর বঙ্গবাসী সংস্করণ দাশরথির পাঁচালীর প্রস্তাবনাতে সম্পাদক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: “দাশরথি রায় মহাশয় বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বহরান গ্রামের ছাপাখানায় কতকগুলি পালা নিজে প্রুফ দেখিয়া ছাপাইয়াছিলেন। বহু চেষ্টায় আমরা সেই ছাপা পালা কতকগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। বর্ধমান জেলার একাধিক গ্রাম হইতেও হস্তলিখিত তাঁহার অনেকগুলি পালা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পালা একত্র মিলাইয়া, অবিকল পালাই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। দাশরথি রায় মহাশয় যে কথাটি যেভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে ব্যাকরণদুষ্ট হইলেও সেইভাবে সেই কথাটি রাখা হইয়াছে।”[২] পাঁচালীর পাঠ সম্বন্ধে ইহাদ্বারা খানিকটা বুঝা গেলেও, প্রকাশকাল ইত্যাদির উপর ইহা কোন আলোকপাত করে না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে অনুমানের সহায়তা লইতে হয়। দাশরথি পাঁচালীর দল গঠন করেন ১২৪২ সালে (১৮৩৬ খ্রীঃ) এবং ইহলোক ত্যাগ করেন ১২৬৪ সালে (১৮৫৭ খ্রীঃ)। ১২৪৬ সালে (১৮৪০ খ্রীঃ) নবদ্বীপে প্রথম তাঁহার নাম ও খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ইহার পর উত্তরোত্তর তাঁহার নাম, সুখ্যাতি ও তৎসহ আর্থিক উপার্জন বাড়িতে থাকে। অতঃপর তিনি বাসের জন্য দোতলা দালান নির্মাণ, শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার সেবার জন্য নিষ্কর জমি সংগ্রহ করেন। তারপর যখন পুত্রসন্তান জন্মিবার আশা আর রহিল না, তখন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করেন। ইহা নিশ্চয় মৃত্যুর বেশ কয়েক বৎসর পূর্বের কথা হইবে। এই সময়ে, যখন অর্থাগম প্রচুর হইতেছে, সঞ্চয় ও সম্পত্তির পরিমাণও কম হয় নাই, অথচ পুত্রসন্তান না

১। ১৩০৪ সালের প্রকাশিত পাঁচালী, জাতীয় গ্রন্থাগার, গ্রঃ সং 182. N. 897. 9.

২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৯।

হওয়ায় বংশলোপের আশংকায় মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন পাঁচালী মুদ্রিত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া নিজের খ্যাতি অর্জন ও নাম অক্ষয় করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সুতরাং পাঁচালীর দল গঠন করিবার অন্ততঃ বৎসর দশেক পরে এবং মৃত্যুর অন্ততঃ চার পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি পাঁচালী মুদ্রিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অর্থাৎ অনুমান ১৮৪৬ খ্রীঃ হইতে ১৮৫৩ খ্রীঃ মধ্যে বহড়া হইতে দাশরথির পাঁচালী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

কোন্ কোন্ পালা কোন্ কোন্ খণ্ডে কি ভাবে দাশরথি ছাপাইয়াছিলেন, তাহাও এখন অনুমান সাপেক্ষ। দাশরথি কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রুফ-সংশোধিত গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত অরুণোদয় রায় প্রকাশিত যে প্রথম খণ্ড (খণ্ডের নাম উল্লেখ থাকিলেও ১৩০৪ সালের খণ্ডখানি যে প্রথম খণ্ড তাহাতে সংশয় নাই), দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড পাঁচালীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে যথাক্রমে কৃষ্ণকালী, অক্রূরসংবাদ, রুক্মিণীহরণ ও রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন এই চারিটি পালা: কুরুক্ষেত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, শিববিবাহ, আগমনী এই চারিটি পালা: রামায়ণ, কমলেকামিনী, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা, ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এই ছয়টি পালা মোট চৌদ্দটি পালা দেওয়া হইয়াছে।[১] ইহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, এই পালা চৌদ্দটি দাশরথি নিজে ছাপাইয়াছিলেন; কিন্তু কোন খণ্ডে, বিভিন্ন খণ্ডে কিনা এবং কি পারম্পর্যে বা ক্রমানুসারে ছাপাইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। হরিমোহনও তাঁহার বঙ্গবাসী সংস্করণে দাশরথির খণ্ডবিন্যাস ও পালার ক্রম অনুসরণ করেন নাই কিংবা সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অথচ খণ্ডে খণ্ডে যে দাশরথির পালা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দ্বারা একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দাশরথির প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পাঁচালীতে[২] শ্রীরাজকিশোর দে মহাশয়ের যে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী বলিয়া উল্লিখিত

১। লক্ষণীয় যে এই সংগ্রহে দাশরথির কোন মৌলিক পালা নাই।

২। পঞ্চম বারের প্রকাশ কাল, ১২৯৬ সাল, অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীঃ।

আছে।[১] আমাদের দেখা দাশরথির পাঁচালীর মুদ্রিত একটি প্রাচীন সংস্করণে (১৮৬০ খ্রীঃ) বিজ্ঞাপন এই প্রকার: "সর্বসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে, এই পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী পুস্তক আমি রীতিমত গভর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে রেজেস্টারী করিয়া লইয়াছি। অতএব কোন ব্যক্তি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলে সমুচিত দণ্ড পাইবেন। মাহ ২৭ কার্তিক, ১২৬৭। শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা"[২]। সুতরাং দাশরথি নিজে যে তাঁহার পালাগুলি খণ্ডে খণ্ডে নির্দিষ্ট ক্রমে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু মোট কয় খণ্ডে তিনি নিজে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কি কি পালা কোন্ কোন্ খণ্ডে ছিল তাহা বুঝিবার উপায় কি?

দাশরথির মুদ্রিত পাঁচালীর প্রাচীনতম জীর্ণ যে সংস্করণখানা[৩] দেখিয়াছি, তাহার প্রকাশকাল ১২৫৫ সাল (১৮৪৮ খ্রীঃ)। অর্থাৎ দাশরথির মৃত্যুর নয় বৎসর পূর্বে। ইহার আখ্যাপত্রের অনুলিপি এই প্রকার:

১। বিজ্ঞাপনটি এই প্রকার: "সর্বসাধারণ জনগণ সন্নিধানে জ্ঞাতকরণ বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আমি দাশরথি রায় মহোদয়ের প্রণীত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী যাহা জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় পুস্তকের স্বত্ব উক্ত মহাশয়ের স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেব্যার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া উক্ত স্বত্বে স্বত্ববান হইয়াছি। বিশেষরূপে সংশোধন-পূর্বক একত্রে প্রকাশ করিলাম। অতএব এই পুস্তক এক্ষণে আমার কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণের বিনানুমতিতে যিনি মুদ্রিত করিবেন, তিনি আইনানুসারে আমাদিগের দাবীর দায়ী হইবেন। ইতি, ১৮৭৪ সাল। শ্রীরাজকিশোর দে।"

২। "দাশরথির পাঁচালী, ৫ম খণ্ড, ভবতারণ রায় মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা কর্তৃক কলিকাতা ৯৭।২ চিৎপুর রোড, কবিতা রত্নাকর যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। শকঃ ১৭৮২, মাহ ২৭ কার্তিক, সন ১২৬৭।"

৩। জাতীয় গ্রন্থাগার, গ্রন্থসংখ্যা: 182, Nc. 84.2

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

চরণভরসা

১ নম্বর পাঁচালী

শ্রীশ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র

যাত্রায় মিলন।

এবং প্রহ্লাদচরিত্র ও রামায়ণ শিববিবাহ

আগমনি প্রভৃতি শ্রীশ্রীপ্রসঙ্গ উত্তমোত্তম গীত

সংযুক্ত তদনন্তর নানা রস বর্ণনযুক্ত বিরহ

এবং নায়ক নায়িকা উপাখ্যান।

শ্রীযুত দাশরথী রায়ের

বিরচিত ও শ্রীমাধবচন্দ্রশীল কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ

পাঁচালী বিরচিত হইয়া

কলিকাতা যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইল।

সন ১২৫৫ সাল, তারিখ ১৪ আশ্বিন।

এইখানিতে একটি ভূমিকা আছে আটটি চৌপদী শ্লোকে। "প্রণমামি বিঘ্নহরে" বলিয়া আরম্ভ করিয়া হর, হরি, অভয়া, দিনকর, সারদা, কমলা বন্দনা করিয়াছেন কবি। তারপর

"গ্রন্থ করি বিরচন আছে দুষ্য অগণন
স্বগুণে সুধীরগণ করিবেন সহ্য।
না করি বিরাগে রাগ রাখি নিজ অনুরাগ
গ্রন্থের বিরাগ ভাগ করিবেন ত্যজ্য॥

ইত্যাদি বিনয়াবেদনান্তে আত্মপরিচয়সূচক তিনটি চতুষ্পদী শ্লোক সর্বশেষ চৌপদীটি এই প্রকার :

"সারতত্ত্ব সুরচন হেতু সাধু প্রয়োজন
জন্য রসিকরঞ্জন অপর পদ্ধতি।
অন্তরে ভাবি একান্ত পার্বতীর প্রাণকান্ত
বিরচিল এই গ্রন্থ দ্বিজ দাশরথি॥"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই ভূমিকাটি শ্রীঅরুণোদয় রায় প্রকাশিত

পূর্বোক্ত দাশরথি রায়ের পাঁচালী দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। অথচ হরিমোহন প্রকাশিত দাশরথির সম্পূর্ণ পাঁচালীতে ইহা উল্লিখিত হয় নাই।

এই ১ নম্বর পাঁচালীতে শ্রীশ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহান্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, প্রহ্লাদচরিত্র, রামায়ণ, শিববিবাহ, আগমনী, নানা রাগযুক্ত গীত, বিরহ, নায়ক-নায়িকা উপাখ্যান, দক্ষযজ্ঞ মোট গীত সহ নয়টি, গীত বাদে আটটি পালা আছে। পূর্বোক্ত রাজকিশোর দে-র বিজ্ঞাপন সম্বলিত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত একত্রে যে দাশরথির পাঁচালী পাঁচখণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম খণ্ডের, তথা প্রচলিত গৌরলাল প্রভৃতি প্রকাশিত বটতলার প্রথম খণ্ড পাঁচালীর সূচীর সঙ্গে ১ নম্বর পাঁচালীর পালাগুলির নামে ও ক্রমে মিল আছে। কেবল বিরহ ও নায়ক-নায়িকা উপাখ্যান এই দুইটি পালা নাই। এই বিরহ ও নায়ক-নায়িকা উপাখ্যান অত্যন্ত অশ্লীল বলিয়া পরবর্তী সকল সংস্করণেই এগুলি বর্জিত হইয়াছে। কাজেই এই ১ নম্বরই যে প্রচলিত দাশরথির পাঁচালী প্রথম খণ্ডের পূর্ব রূপ তাহাতে সংশয় নাই।

কিন্তু আখ্যাপত্রে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কমূলক বিষয় আছে সে সম্বন্ধে স্থিরভাবে আলোচনার প্রয়োজন। লেখা আছে: "শ্রীশ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন……নায়ক-নায়িকা উপাখ্যান শ্রীযুত দাশরথি রায়ের বিরচিত ও শ্রীমাধবচন্দ্র শীল কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিরচিত হইয়া" ইত্যাদি। ইহাতে সংশয় ও প্রশ্ন এই যে এই দক্ষযজ্ঞের রচয়িতা কে? দাশরথির পাঁচালীর পরবর্তী সকল সংস্করণেই দক্ষযজ্ঞ সংযোজিত হইয়াছে এবং ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে কদাচ কোন সংশয় ও প্রশ্ন উঠে নাই। যখন উঠিয়াছে তখন বিভিন্ন সম্ভাবনার দিক হইতে এই প্রশ্নটি আলোচনার যোগ্য মনে করি।

প্রথমতঃ, এই ১ নম্বর পাঁচালীটি দাশরথির জীবৎকালে প্রকাশিত হইয়াছে এবং খুব সম্ভব তাঁহার অনুমতি ও সহযোগিতায়ই ছাপা হইয়াছে। কাজেই দক্ষযজ্ঞ যদি দাশরথির রচনা হইত তবে অবশ্য মাধবচন্দ্রের নামে ছাপাইতে তিনি আপত্তি করিতেন। এমন আপত্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য দক্ষযজ্ঞ পালার মোট ১৩টি গানের মধ্যে একটিতেও দাশরথির ভনিতা নাই।

তৃতীয়তঃ, দাশরথির পাঁচালীর প্রতি খণ্ডে পালার বিন্যাসের মধ্যে একটি

সাধারণ রীতি লক্ষিত হয়। প্রথম পৌরাণিকাদি পালা ও নানা রাগযুক্ত গান অর্থাৎ "সারতত্ত্ব সুবচন" এবং পরে বিরহাদি অর্থাৎ "অপর পদ্ধতি"। এই নম্বর পাঁচালীতে দেখা যায় যে বিরহ ও নায়ক-নায়িকা উপাখ্যানের পর সর্বশেষে আলাদা ভাবে দক্ষযজ্ঞ পালা সংযুক্ত হইয়াছে। এবং প্রচলিত দাশরথির পাঁচালী প্রথম খণ্ডে সর্বত্র এইভাবে রাগরাগিণীযুক্ত গীতের পরে দক্ষযজ্ঞ পালাটি সংযোজিত আছে।

চতুর্থতঃ অরুণোদয় রায় পূর্বোল্লিখিত তিন খণ্ড দাশরথির পাঁচালীতে মোট ১৪টি অমৌলিক মুখ্যতঃ পৌরাণিক পালা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভূমিকাতে তিনি বলিয়াছেন যে বহরায় প্রকাশিত সংস্করণ দৃষ্টে তিনি উহা ছাপিয়াছেন। ইহার মধ্যে দক্ষযজ্ঞ নাই।

উল্লিখিত চারিটি যুক্তি বলে এই সিদ্ধান্তে আসা সহজ যে দক্ষযজ্ঞ দাশরথির রচিত পালা নহে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিষয়টিকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা উচিত।

প্রথমে চতুর্থ যুক্তিটির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। অরুণোদয় রায় মহাশয় মুখবন্ধে জানাইয়াছেন: "কয়েকটা পালা মুদ্রিত করিলাম।"[১] আমরা পরে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে দাশরথি নিজেই পাঁচখণ্ড পাঁচালী বহরা প্রেস হইতে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রচলিত প্রথম পাঁচখণ্ড পাঁচালীর পালার ক্রমবিন্যাস ও সংখ্যা মোটামুটি তাহাই আছে। [illegible] একত্রে প্রকাশিত পাঁচালী পালার সংখ্যা ২৯ খানা। এই পাঁচ-খণ্ডের মধ্যের চারিটি গানের সংগ্রহ বাদ দিলে পালার সংখ্যা হয় ২৫টি। এই সংস্করণে রজনীকান্ত "অপর পদ্ধতি"র অর্থাৎ বিরহ বা নলিনী ভ্রমর জাতীয় কোন পালা সঙ্কলন করেন নাই। প্রচলিত গৌরলাল দের সংস্করণে এই পাঁচ খণ্ডের পঞ্চম খণ্ডে নলিনীভ্রমর নামে একটি অধিক পালা সংযোজিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া আর কোন বিশেষ নাই। যাহাহউক এই "সারতত্ত্ব সুবচনের" ২৫ খানির মধ্যে অরুণোদয় মাত্র ১৪ খানি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ১৪ খানি আবার উক্ত রজনীকান্তের পাঁচখণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডে ৫ খানা, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫ খানা, তৃতীয় খণ্ডে ২ খানা, পঞ্চম খণ্ডে ২ খানা এই ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে।

১। আলোচ্য অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অরুণোদয় এই পাঁচখণ্ড হইতে লবকুশের যুদ্ধ, বামনভিক্ষা, রাবণবধ, মানভঞ্জন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি পালাগুলিও প্রকাশ করেন নাই। কাজেই দক্ষযজ্ঞ পালা অরুণোদয়ের সংগ্রহে না থাকিলেই উহা দাশরথির নহে, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। পক্ষান্তরে বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বহরার ছাপা পালাগুলি ও প্রাপ্ত হস্তলিখিত পালা "একত্র মিলাইয়া অবিকল পালাই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট" করিয়াছেন।[১] দক্ষযজ্ঞ পালাটি হরিমোহনের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই বহর্‌রার সংস্করণে যে উহা ছিল না তাহারই বা প্রমাণ কি?

এখানেও কিন্তু আর একটা গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। বহরার সংস্করণ কোন সময়ে মুদ্রিত হইয়াছিল? তাহা কি আলোচ্য ১ নম্বর সংস্করণের (১৮৪৮ খ্রীঃ) পূর্বে না পরে? এই ১ নম্বর সংস্করণের আখ্যাপত্র ও ভূমিকা হইতে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। ইহার পরবর্তী কালের ১২৫৭ সালের (১৮৫১ খ্রীঃ) প্রকাশিত একখানা পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী দেখিয়াছি।[২] তাহার আখ্যাপত্র এই প্রকার:

শ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

শ্রীচরণভরসা ॥

॥ পাঁচালী নামক গ্রন্থঃ ॥

॥ পঞ্চম খণ্ড ॥

যত্নঙ্গলোদ্ভবঃ যদগুণাশম্ভবঃ
যদ্‌ভক্তভবতারণভবঃ তদ্বিচিত্রগুণবর্তিতা
পূর্বকাব্যসভ্যভব্যদিব্যগণস্য শ্রাব্য
শ্রীদাসরথীবিপ্রেণবিরচিতমিদং

ইদানীং

শ্রীবনমালী প্রামাণিক ও শ্রীশ্যামাচরণ প্রামাণিকের
নিস্তারিণী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।

এই গ্রন্থঃ যাহার প্রয়োজন হইবেক, তাহারা মোকাম কলিকাতার

১। এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে হরিমোহনের উদ্ধৃতিটি দ্রষ্টব্য।

২। জাতীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থ সংখ্যা: 182. Nc. 851.3

আহিরীটোলার শ্রীযুত বাবু দুখিরাম দের ১।১২ নম্বর বাটীতে তত্ত্বঃ করিলেই পাইবেন। ইতি সন ১২৫৭ সাল, তারিখ ১৫ই চৈত্র ॥

এই আখ্যাপত্রাদ্দিতেও বহরার কোন ইঙ্গিত নাই।

শ্রীঅরুণোদয় রায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রথম খণ্ড পাঁচালীর (১৮৯৭ খ্রীঃ) মুখবন্ধের একটি অংশ এই প্রকার: "বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী বহড়া গ্রামে ১২৬০ সালের পূর্বে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বয়ং দাশরথি রায় সেই ছাপাখানায় আপন পাঁচালী ছাপাইয়াছিলেন।"[১] এই বিবরণ অনুসারে ১২৬০ সাল (১৮৫৩ খ্রীঃ) অর্থাৎ দাশরথির মৃত্যুর অন্ততঃ ৪ বৎসর পূর্বে এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই এই অনুমান অসঙ্গত নহে যে দাশরথি উক্ত ১২৫৫ সালের ১ নম্বর খণ্ড এবং ১২৫৭ সালের বনমালি ও শ্যামাচরণ প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর বহরা হইতে নিজেই পাঁচখণ্ড পাঁচালী সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহার সপক্ষে আরও একটি প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। ১২৫৭ সালের বনমালি ও শ্যামাচরণ মুদ্রিত উক্ত পঞ্চম খণ্ড পাঁচালীর নির্ঘণ্ট এই প্রকার: ১। নবনারী কুঞ্জর ও কলঙ্ক ভঞ্জন, ২। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, ৩। ভেক ও ভৃঙ্গের দ্বন্দ্ব, ৪। খেঁউড়। কিন্তু রজনীকান্ত সংস্করণ পঞ্চম খণ্ড পাঁচালীর সূচী এই প্রকার: ১। রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন, ২। শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা, ৩। রাবণবধ, ৪। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ৫ নানা রাগরাগিণীযুক্ত গান। গৌরলাল সংস্করণে ইহা ছাড়া নলিনীভ্রমর নামে একটি অতিরিক্ত পালা আছে। দাশরথি যে এই পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী নিজে মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পঞ্চম খণ্ডের পদ্যে রচিত ভূমিকার মধ্যে আছে। ভূমিকাটি উদ্ধার করিতেছি:

বিষ্ণুরব করি মুখে, প্রথমত করিমুখে করি স্তুতি করিয়া যতন।
সহদুর্গাশূলপাণি, চক্রপাণি, বীণাপাণি স্মরি কাব্য করি বিরচন ॥
হরচিত্তহর হরি, রাধার কলঙ্ক হরি, দেন তত্ত্ব শুন যথাবিধি।
কংসধ্বংসবিবরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, রাবণান্ত বৃত্তান্ত আদি ॥

১। পূর্ণ বিবরণের জন্য এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

থাকে গ্রন্থ দোষযুক্ত, ত্যজে দোষ দোষমুক্ত, স্বগুণে হবেন যতগুণী।
যে দুগ্ধেমিশ্রিত নীর, নীরাংশ ত্যজিয়া ক্ষীর, হংসবংশ পানকরে শুনি॥
গ্রাম নাম বাঁধমুড়া, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণচূড়া, দেবীপ্রসাদ দেবশর্মা নাম।
অহং দীন তনয়, পিলায় মাতুলালয়, ইদানী মাতুলালয়ে ধাম॥
সাধুর সন্তাপ দূর জন্য যত সুমধুর সারতত্ত্ব হইল যোজন।
শ্রবণে জীবমুক্ত, ভারতী ভারতউক্ত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতকীর্তন॥
অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ, পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ।
প্রেমচন্দ্র প্রেমমনি প্রেমবিচ্ছেদের বাণী, রসিকরঞ্জনরসরঙ্গ॥
তদন্তরে নানা গীত, নানারাগ সম্মিলিত সুললিত ললিতাদি প্রভৃতি।
রচিল পাঞ্চালী গ্রন্থ, পাঞ্চালীর পঞ্চকাণ্ড সখাচিন্তা[১] যোগে দাশরথি॥

এই ভূমিকার মধ্যে ১। শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন ("রাধার কলঙ্ক হরি"), ২। মথুরালীলা ("কংসধ্বংস বিবরণ"), ৩। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ৪। রাবণ বধ ("রাবণাদিবধ বৃত্তান্ত"), ৫। বিরহ ("প্রেমচন্দ্রপ্রেমমণি"), ৬। নানা গীতি ("নানারাগসম্মিলিত") এই পাঁচটি পালা ও গীতসংগ্রহ লইয়া মোট ছয়টি

১। বঙ্গবাসী সংস্করণে শেষ চরণের "পাঞ্চালীর পঞ্চকান্তসখা চিন্তা যোগে দাশরথি"—এই পাঠান্তর আছে (৪র্থ সং, পৃঃ ২)। পাঞ্চালীর "পঞ্চকান্তসখা" ইত্যাদি পাঠ ধরিয়া সম্পাদক হরিমোহন ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া দাশরথি পাঁচালী রচনা করিলেন"। কিন্তু মনে হয় "পঞ্চকাণ্ড" পাঠই ঠিক। কাণ্ড শব্দ ধরিলে ইহার অর্থ দাঁড়ায় পাঁচালীর পাঁচ খণ্ড রচনা করিলেন। লক্ষণীয় যে আলোচ্য খণ্ড পঞ্চম খণ্ড। পঞ্চ কাণ্ড সমগ্র পাঁচ খণ্ডের অর্থে বা শুধু পঞ্চম খণ্ডের অর্থে ধরা যায়। পালার সূচীপত্র ও পদ্য ভূমিকাটির সমগ্র পাঠ মিলাইয়া পঞ্চম খণ্ড ধরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সে স্থলে "সখা চিন্তাযোগে দাশরথি"—এই অংশের অর্থ দাঁড়ায়—চিন্তা নামক কোন বন্ধুর সহযোগে অথবা চিন্তা বা ভাবনাকেই একমাত্র বন্ধু বা আশ্রয় করিয়া। চিন্তা নামে যে দাশুর কোন বন্ধু ছিল জানা যায় না। কাজেই দ্বিতীয় অর্থই যুক্তিযুক্ত। এই প্রসঙ্গে দাশরথির বন্ধু ও জীবনীকার চন্দ্রনাথবাবুর এই মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য: "কেবল চিন্তা ও আলোচনাই তাঁহার অধ্যাপক হইয়াছিল।" দাশরথি রায়ের জীবনী; পৃঃ ৩২।

পালায় যে তালিকা পাওয়া যায় তাহাই প্রচলিত পঞ্চম খণ্ডের সূচীপত্র। তাহা হইলে দাশরথি নিজে যে এই পঞ্চম খণ্ড ছাপাইয়াছিলেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কোন পঞ্চম খণ্ড পূর্ববর্তী—বনমালি-শ্যামাচরণ প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ড, না পদ্যভূমিকাসম্বলিত পঞ্চম খণ্ড? এই দুই পঞ্চম খণ্ডের সূচীপত্রে একেবারেই মিল নাই। কলঙ্কভঞ্জন যে পালাটি নবনারী কুঞ্জরের সহিত যুক্ত হইয়া বনমালিশ্যামাচরণ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে[১] তাহা কিন্তু পদ্যভূমিকাসম্বলিত অনুমিত বহরা সংস্করণের কলঙ্কভঞ্জন নহে[২]; উহা একেবারেই স্বতন্ত্র পালা। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন এবং ভেক ও ভুজের দ্বন্দ্ব—এই পদ্যভূমিকাযুক্ত পঞ্চম খণ্ডে নাই। প্রচলিত দাশরথির সমগ্র পাঁচ খণ্ডের মধ্যেই এই পালা দুইটি পাওয়া যায় না। একটা আশ্চর্য বিষয় এই যে ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রকাশিত ১ নম্বর পাঁচালীর সহিত প্রচলিত প্রথম খণ্ডের যেমন ষোল আনা মিল আছে, তেমনি ১৮৫১ খ্রীঃ প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ডের সহিত প্রচলিত দাশরথির পঞ্চম খণ্ডের ষোল আনা অমিল। হয়ত এই ১৮৫১ খ্রীঃ পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের পর প্রকাশকদিগের সহিত দাশরথির মতানৈক্য হইয়া থাকিবে আর এই গোলমালটা হয়ত ঘোরতর হইয়াছিল বনমালিশ্যামাচরণাদি পঞ্চম খণ্ডের প্রকাশকদের সঙ্গেই। হয়ত এই কারণেই দাশরথি পঞ্চম খণ্ড খানি একেবারে আমূল পরিবর্তন করিয়া নূতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং পাছে কোন ভুল বুঝার অবকাশ থাকে সেইহেতু একটি পদ্যভূমিকা জুড়িয়া দিয়া পার্থক্য সুপরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ এই পঞ্চম খণ্ড ছাড়া অন্য কোন খণ্ডের কোন বিশেষ ভূমিকা পাওয়া যায় নাই। মজার ব্যাপার এই যে ইহার পরও বনমালিশ্যামাচরণের পঞ্চম খণ্ড বাজার হইতে উঠিয়া যায় নাই। আমরা ১২৭৬ সালে (১৮৬৯ খ্রীঃ) "যন্ত্রাধ্যক্ষ ক্ষেত্রমোহন ধর, গিরীশচন্দ্র দাসঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত" একখানি অনুরূপ পঞ্চম খণ্ড দেখিয়াছি।[৩] কাজেই এই পঞ্চম খণ্ড লইয়াই যে

১। ইহা হরিমোহনের নবনারী কুঞ্জর (২) ও কলঙ্কভঞ্জন (১) পালা।

২। হরিমোহনের কলঙ্কভঞ্জন (২) পালা।

৩। সাঃ পঃ গ্রঃ সং ৬৭১৬৭

বাড়াবাড়ি হইয়াছিল একথা সহজেই অনুমেয়। বনমালিশ্যামাচরণের আখ্যাপত্রে "যদ্ভক্তভবতারণভবঃ" এই কথাটি কি দাশরথির ভ্রাতুষ্পুত্র ভবতারণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য? প্রসন্নময়ী কর্তৃক স্বত্ববিক্রয়ের পূর্বে ১৮৬০ খ্রীঃ প্রকাশিত প্রচলিত পঞ্চম খণ্ডটির একটি সংস্করণও "ভবতারণ রায় মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে"—ইত্যাদি আছে। এই পঞ্চম খণ্ড পাঁচালীর সঙ্গে ভবতারণের সম্পর্কটি কোন শ্রেণীর ছিল কে জানে!

যাহা হউক এইসব যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে দাশরথি ১২৫৫ সালের (১৮৪৮ খ্রীঃ) ১নং পাঁচালী এবং ১২৫৭ সালের (১৮৫১ খ্রীঃ) পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী প্রকাশের পর বহরা হইতে নিজে পাঁচ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬০ সালের আগে বহরাতে হরিহর মিত্র মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীঃ-র পূর্বে বহরাতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বনমালিশ্যামাচরণের পঞ্চম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৫১ খ্রীঃ। কাজেই ধরা যায় যে ১৮৫২ খ্রীঃ দাশরথি বহরাতে নিজে পাঁচালী ছাপাইতে আরম্ভ করেন। বনমালিশ্যামাচরণদের সহিত মতানৈক্য ও স্বগ্রামের পার্শ্বেই মুদ্রণের সুযোগ—মনে হয় এই দুইটি কারণই নিজে ছাপাইবার দিকে দাশরথিকে উৎসাহিত করিয়াছিল।

এইখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। বনমালিশ্যামাচরণের পঞ্চম খণ্ড হইতে প্রমাণিত হয় যে বহরাতে প্রকাশনের পূর্বেই দাশরথির পাঁচ খণ্ড পাঁচালী বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বহরাপূর্ব ১ নম্বর ও পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই পঞ্চম খণ্ডের সঙ্গে একত্রে গ্রথিত একখানা ৩ পাঁচালী অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড পাঁচালী দেখিয়াছি আখ্যাপত্র নাই। সূচীপত্র এই রকম: ১। লবকুশের যুদ্ধ, ২। বলিরাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষা, ৩। শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন ও কারাগারে বদ্ধ ৪। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা,[১] ৫। শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা, ৬। নানা রাগরাগিণী সম্বলিত গীত, ৭। নলিনীভ্রমরের বিরহ বর্ণন। ইহার সহিত রজনীকান্ত সংস্করণের তথা প্রচলিত গৌরলাল

১। হরিমোহনের গোষ্ঠবর্ণন (১) পালা

২। হরিমোহনের মাথুর (৩) পালা।

সংস্করণের তৃতীয় খণ্ড পাঁচালীর পালার সূচী ও ক্রম অবিকল এক। কেবল নলিনীভ্রমর পালাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কাজেই অনুমান করা যায় যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ডও বাহির হইয়াছিল এবং খুব সম্ভব পালার সূচী ও ক্রম প্রচলিত পাঁচালীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মত এক প্রকারই ছিল। একমাত্র পঞ্চম খণ্ড ছাড়া বহরাপূর্ব পাঁচালীর সহিত বহরার অন্যান্য সংস্করণ একই রকম ছিল বলা চলে।

যাহাহউক আবার পূর্বানুসরণ করি। দাশরথির ভনিতাযুক্ত একটি গীতও দক্ষযজ্ঞ পালাতে নাই, অতএব ঐ পালা দাশরথির নহে—এই যুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে হরিমোহন প্রকাশিত দাশরথির মোট ৬৪টি পালার মধ্যে দক্ষযজ্ঞ ছাড়াও অন্যান্য ২২টি পালার গীতাবলী সম্পূর্ণভাবে দাশরথির ভনিতা বর্জিত। এমন কি উক্ত ১ নম্বর পাঁচালীতে সংকলিত আগমনী[১] ও প্রহ্লাদচরিত্রে মোট (১৩+১১=) ২৪টি গানের মধ্যে একটিতেও দাশরথির ভনিতা নাই। সুতরাং ভনিতা-যুক্তি দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না।

তৃতীয় যুক্তি পালার ক্রমবিন্যাস। বহরাতে মুদ্রণ করিবার কালে দাশরথি হয়ত ১ নম্বর পাঁচালীখানি, বিরহ ও নায়কনায়িকা উপাখ্যান এই দুইটি অশ্লীল পালা বাদ দিয়া অবিকল প্রেসে দিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই হয়ত দক্ষযজ্ঞ পালাটি পূর্বের মত নানারাগরাগিণীযুক্ত গীতের পর থাকিয়া গিয়াছে। সূক্ষ্ম সম্পাদন তাৎপর্য দাশরথির পক্ষে না বুঝাই স্বাভাবিক। কাজেই ইহাকেই একটা প্রবল যুক্তি বলিয়া ধরা যায় না।

এইবার প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। লক্ষণীয় যে এই ১ নম্বর পাঁচালীতে প্রকাশকের কোন নাম নাই। "…দাশরথী রায়ের বিরচিত ও মাধবচন্দ্র শীল কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিরচিত হইয়া কলিকাতা যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইল।"—মাত্র এই কথাই মুদ্রিত আছে। মনে হয় শ্রীমাধবচন্দ্র শীল নিজেই প্রকাশক। কারণ বটতলার প্রকাশকদিগের মধ্যে শীল মহাশয়দের প্রাধান্য অদ্যাপি অপ্রতিহতভাবে বিদ্যমান। তারপর মাধবচন্দ্রের নামে অন্য কোন পাঁচালী দেখি নাই বা পাঁচালীকার হিসাবেও তাঁহার নাম পরিচিত নহে। এমতাবস্থায় মাধবচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে বা অনুরূপ অন্য কোন কারণে দাশরথি

১। হরিমোহনের আগমনী (১) পালা।

স্বরচিত পালাটি মাধবচন্দ্রের নামে ছাপিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এমন অনুমান করিতে বাধা কি? তখনও এই ধরণের একখানি পাঁচালীও বাজারে বাহির হয় নাই, কাজেই উহা কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিবে, মুদ্রণের ব্যয়াদি সংকুলান হইবে কিনা এতজ্জাতীয় নানা সংশয়ের বশে মাধবচন্দ্র প্রথম দিকে হয়ত পাঁচালী মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইয়া থাকিবেন, পরে হয়ত বা দক্ষযজ্ঞের কবি হিসাবে নাম করিবার অতিরিক্ত প্রলোভনে মুদ্রণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইত্যাদি নানা অনুমান করা যায়। কবি অন্তরালেই রহিয়াছেন এবং প্রকাশক কবিখ্যাতির যশোমুকুট পরিধান করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত কি আমাদের দেশে, এমন কি এই যুগেও বিরল?

তারপর, প্রসন্নময়ীর নিকট হইতে রাজকিশোর দে দাশরথির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম খণ্ডের স্বত্ব ক্রয় করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।[১] অর্থাৎ দাশরথির মৃত্যুর ১৭ বৎসর পরে। এই ক্রীত সংস্করণের প্রথম খণ্ডে দক্ষযজ্ঞ পালাটি আছে। মাধবচন্দ্র তখন বাঁচিয়াছিলেন কিনা জানি না, বা তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ ছিলেন কিনা তাহাও জানা নাই। কিন্তু দক্ষযজ্ঞ পালার প্রণেতৃস্বত্ব লইয়া যে কোন মামলা হয় নাই, ইহা মনে করা যায় রাজকিশোর দের বিজ্ঞাপনসম্বলিত উক্ত রজনীকান্তের একত্র মুদ্রিত পাঁচ খণ্ডের পঞ্চম বার মুদ্রণ দেখিয়া। উহার মুদ্রণকাল ১২৯৬ সাল (১৮৮৯ খ্রীঃ) অর্থাৎ রাজকিশোরের স্বত্বক্রয়ের ১৫ বৎসর পর।

মোটকথা এই সব কারণে দক্ষযজ্ঞ পালার রচয়িতা হিসাবে দাশরথির দাবী একেবারে নাকচ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। সুতরাং দক্ষযজ্ঞ পালাকে দাশরথির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমরা আলোচনার মধ্যে ও পরিশিষ্টে অন্যান্য পালার মত দক্ষযজ্ঞ হইতেও প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করিয়াছি। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরাও যায় যে দক্ষযজ্ঞ দাশরথির রচিত নহে, তাহাতেও এই আলোচনা প্রচুর দোষদুষ্ট হইবে মনে করি না। কারণ একই ধরণের লেখার জন্য যখন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'চন্দ্রালোক' ও 'স্ত্রীলোকের রূপ' লেখা দুইটি বঙ্কিম

১। পূরা বিবৃতি ১২৬ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

নিজের কমলাকান্তের দপ্তরে স্থান দিয়াছিলেন, তখন পাঁচালীর ক্ষেত্রে অন্তর্বিধ না করিলে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

এইবার দাশরথির স্বয়ংসম্পাদিত মুদ্রিত খণ্ড ও পাঁচালী পালার সম্বন্ধে বাকি আলোচনাটুকু করা যাউক। শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা মুদ্রিত যে পঞ্চম খণ্ড পাঁচালীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মুদ্রণকাল ১২৬৭ সাল (১৮৬০ খ্রীঃ) অর্থাৎ দাশরথির মৃত্যুর তিন বৎসর পর। এই পঞ্চম খণ্ড "তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল" কথাদ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে পূর্বে ইহার আর দুইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু দাশরথির স্বপ্রকাশিত সংস্করণ হিসাবে ইহা তৃতীয় সংস্করণ, না তাহা বাদ দিয়া লাহা মহাশয়ের মুদ্রণ হিসাবে ইহা তৃতীয় সংস্করণ, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন।

যাহাহউক দাশরথি যে পঞ্চম খণ্ড পাঁচালীখানি বহরাতে ছাপাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে প্রমাণাদি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইলে প্রথম হইতে চতুর্থ খণ্ডও যে তিনি বহরাতে ছাপাইয়াছিলেন এই অনুমান করা খুবই সহজ। এই অনুমানের সপক্ষে পূর্বে রাজকিশোর দের বিজ্ঞাপনটি একটি নজির হিসাবে উল্লেখ করিয়াছি। এইবার উহার অংশবিশেষ অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করিব। উক্ত বিজ্ঞাপনে রাজকিশোর লিখিয়াছেন যে পাঁচখণ্ড পাঁচালীই তিনি "বিশেষরূপে সংশোধন করিয়া" একত্রে মুদ্রিত করিলেন। এই সংশোধন অর্থ যে পালাগুলির, বিশেষ করিয়া অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত বিরহ ও নলিনীভ্রমর পালাগুলির আংশিক পরিবর্তন বা সম্পূর্ণ পরিবর্জন মাত্র, খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত পালাগুলির প্রকাশক্রম ও পর্যায় ভঙ্গ নহে, সে সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করিব। আপাততঃ এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে দাশরথি নিজেই বহরা হইতে পাঁচ খণ্ড পাঁচালী মুদ্রিত করিয়া গিয়াছিলেন এবং রজনীকান্ত প্রকাশিত পাঁচালীর যে যে খণ্ডে যে যে পালা আছে, মোটামুটিভাবে দাশরথির খণ্ড ও পালাগুলি সেই সেই ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

"মোটামুটি" কথাটি ব্যবহার করিবার হেতু এই যে রাজকিশোর তাঁহার পূর্বোক্ত ঘোষণায় "বিশেষরূপে সংশোধনপূর্বক" কথাটি উল্লেখ করিয়া কিছুটা অসুবিধায় ফেলিয়াছেন। সুতরাং রাজকিশোরের ঘোষণাসম্বলিত রজনী-কান্তের একত্র মুদ্রিত পাঁচ খণ্ড অবিকল দাশরথির পাঁচখণ্ড কিনা, তাহা

বিচার্য। প্রথমে রজনীকান্ত-প্রকাশিত পাঁচ খণ্ড পাঁচালীতে মুদ্রিত পালাগুলির ক্রমিক তালিকা তুলিতেছি।

প্রথম খণ্ড : ১। শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, ২। প্রহ্লাদচরিত্র, ৩। রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রামের বনবাস ও সীতাহরণ, ৪। শিববিবাহ, ৫। আগমনী, ৬। নানা রাগরাগিণী যুক্ত সঙ্গীত, ৭। দক্ষযজ্ঞ।

দ্বিতীয় খণ্ড : ১। কালীকৃষ্ণ বর্ণন, ২। অক্রূরসংবাদ, ৩। রুক্মিণী হরণ, ৪। সত্যভামা, সুদর্শন চক্র ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ, ৫। সত্যভামার ব্রত, ৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী, ৭। গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল, ৮। মহীরাবণ বধ, ৯। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

তৃতীয় খণ্ড : ১। লবকুশের যুদ্ধ, ২। বলিরাজের নিকট বামনদেবের ভিক্ষা, ৩। শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন, ৪। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বর্ণন, ৫। শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা বর্ণন, ৬। নানা রাগরাগিণীসম্বলিত গীত।

চতুর্থ খণ্ড : ১। মানভঞ্জন, ২। নানা রাগরাগিণীযুক্ত গীত।

পঞ্চম খণ্ড : ১। শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, ২। শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা, ৩। রাবণবধ, ৪। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ৫। নানা রাগরাগিণীসংযুক্ত গান।

ইহাতে মোট ২৯টি পালা আছে, ২৫টি পাঁচালী পালা এবং ৪টি বিবিধসঙ্গীত-সংগ্রহ। এখন এই সংগ্রহের মধ্যে রাজকিশোর কোন পালা বর্জন করিয়াছেন কিনা, তাহা বিচার্য। রাজকিশোর দের পূর্বে প্রকাশিত কোন পাঁচালী না পাইলে এই বিচার সুকঠিন ও দুঃসাধ্য। রাজকিশোর স্বত্ব ক্রয় করিয়া ঘোষণা করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। সৌভাগ্যক্রমে উহার পূর্বকার পাঁচটি খণ্ডেরই কয়েকটি পাঁচালী আমাদের চোখে পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমখানা এবং তৃতীয় ও পঞ্চম খণ্ডের এক একখানা বহরাপূর্ব বলিয়া অনুমান করিয়াছি।

প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রকাশিত ১ নম্বর পাঁচালী সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশদ আলোচনা করিয়াছি। বিরহ ও নায়ক-নায়িকা উপাখ্যান এই দুইটি অশ্লীল পালা বাদ দিয়া একই ক্রম ও পারম্পর্য অনুসারে যে বাকি পালাগুলি বহরাতে ছাপা হইয়াছিল তাহাও পূর্বে আলোচিত ও অনুমিত হইয়াছে। রজনীকান্তের সংস্করণ উক্ত প্রথম খণ্ড বা ১ নম্বর পাঁচালীর সহিত অবিকল এক।

বনমালিশ্যামাচরণের ১৮৫১ খ্রীঃ প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ড যে বহরাপূর্ব এবং বহরাতে দাশরথি যে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করেন তাহা একেবারে নূতন সে সম্বন্ধেও পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। বিশ্বম্ভর লাহা মুদ্রিত একখানি পঞ্চম খণ্ড পাঁচালীর কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এইখানা দাশরথি রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র "ভবতারণ রায় মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে যন্ত্রাধ্যক্ষ বিশ্বম্ভর লাহা কর্তৃক তৃতীয় বার মুদ্রিত, সন ১২৬৭ (১৮৬০ খ্রীঃ)।" অর্থাৎ দাশরথির মৃত্যুর তিন বৎসর পর ও রাজকিশোরের স্বত্ব ক্রয়ের ১৪ বৎসর পূর্বে এইখানা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা দাশরথির স্বয়ং প্রকাশিত পাঁচালীর অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাতে বিরহ বর্ণনা "প্রেমচাঁদ প্রেমমণি" নামে একটি অধিক পালা আছে। এই পালাটি ধৃত হইয়াছে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পর এবং নানা রাগরাগিণীসংযুক্ত গানের পূর্বে। দাশরথি এই পঞ্চম খণ্ডের পদ্য রচিত ভূমিকাতে যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে এই পালাটির অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূমিকার প্রাসঙ্গিক অংশটি আবার উদ্ধার করি :

অপরে করিবে রাগ ঘুচাইতে সে বিরাগ, পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ।
প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি প্রেমবিচ্ছেদের বাণী, রসিকরঞ্জন রসরঙ্গ ॥

অতএব এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে রজনীকান্তের একত্র প্রকাশিত সংস্করণে পঞ্চম খণ্ডে "প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি" পালা বর্জিত হইয়াছে।

বনমালিশ্যামাচরণ প্রকাশিত উক্ত বহরাপূর্ব পঞ্চম খণ্ড পাঁচালীর সঙ্গে একত্র গ্রথিত আখ্যাপত্রহীন একখানা তৃতীয় খণ্ড পাঁচালীর কথা পূর্বে উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। উহার পালার নির্ঘণ্ট এইরূপ : ১। লবকুশের যুদ্ধ, ২। বলিরাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষা, ৩। শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন ও কারাগারে বদ্ধ, ৪। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ বর্ণন, ৫। শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা বর্ণন, ৬। নানা রাগরাগিণীসম্বলিত গান, ৭। নলিনীভ্রমরের বিরহ বর্ণন। এই খণ্ডই যে বহরাতে এইভাবেই মুদ্রিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি। এইখানি ছাড়া প্রকাশক ও খণ্ডের নামহীন একটি পাঁচালী আমরা দেখিয়াছি।[১] ইহার পালার তালিকা ও ক্রম অবিকল উক্ত বহরাপূর্ব

১। সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থ সংখ্যা : ৮১৯৪।

তৃতীয় খণ্ডের মত। কাজেই ইহা যে দাশরথির তৃতীয় খণ্ড পাঁচালী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আর এই বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে এই খণ্ডখানি রাজকিশোরের স্বত্বক্রয়ের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কারণ "বিশেষরূপে সংশোধন করিয়া" রাজকিশোর যে খণ্ডগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরে মুদ্রিত হইলে সেই পুস্তকই আদর্শ হওয়া উচিত ছিল। অধিকন্তু রাজকিশোর কর্তৃক স্বত্বক্রয়ের পর তাঁহার অনুমতি ছাড়া অন্যবিধ সংস্করণ প্রকাশ করাও সম্ভব ছিল না। এই দুইখানি তৃতীয় খণ্ডেই "নলিনীভ্রমরের বিরহ বর্ণন" নামে একটি পালা আছে। রাজকিশোর এই পালাটি বর্জন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড পাঁচালী যেখানা চোখে পড়িয়াছে, সেখানা ১২৭৫ সালে (১৮৬৯ খ্রীঃ) গৌরীপালের হরিহর যন্ত্রে মুদ্রিত।[১] ইহার শিরোনামায় "নানাবিধ ভক্তিরস ও আদিরস সংঘটিত ও রাগরাগিণীসংযুক্ত গীত ও বিবিধ ছন্দে বিরচিত"—এই বিজ্ঞাপন আছে। ইহার সূচীপত্র এই প্রকার: ১। কৃষ্ণকালী বর্ণন, ২। অক্রূরসংবাদ, ৩। রুক্মিণীহরণ, ৪। সত্যভামা সুদর্শন ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ, ৫। সত্যভামার ব্রত, ৬। নলিনীভ্রমরোক্তি, ৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী, ৮। গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল এবং দক্ষযজ্ঞ, ৯। মহীরাবণবধ, ১০। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব। রজনীকান্তের দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে কেবল নলিনীভ্রমরোক্তি বাদ দিলে আর সব অবিকল এক। গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল এবং দক্ষযজ্ঞ আসলে গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল পালারই নামান্তর মাত্র। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে রাজকিশোর বিশেষভাবে সংশোধন করিয়া "নলিনীভ্রমরোক্তি" পালাটি বর্জন করিয়াছেন।

আমাদের দেখা পূর্বোক্ত চতুর্থ খণ্ড পাঁচালীর আখ্যাপত্রটি এই প্রকার: "নানাবিধ ভক্তিরস ও আদিরস সংঘটিত ও রাগরাগিণীসংযুক্ত গীত ও বিবিধ ছন্দে রচিত ৺দাশরথি রায় প্রণীত পাঁচালী চতুর্থ খণ্ড। যন্ত্রাধ্যক্ষ ক্ষেত্রমোহন ধর। আহারীটোলা ষ্ট্রীটে ৩৪ নং ভবনে বেঙ্গলী প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত। সন ১২৭৮ সাল। শ্রীগিরীশচন্দ্র দাসঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।" এইখানা

১। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থ সংখ্যা: ৭৬১৫।

রাজকিশোর দের স্বত্বক্রয়ের তিন বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রীঃ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে উপরের তালিকায় প্রদত্ত রজনীকান্তের পালাগুলির অতিরিক্ত "নলিনীভ্রমরের বিরহ" বর্ণন নামে একটি পালা আছে। এই প্রসঙ্গে আখ্যাপত্রে "আদিরসসংঘটিত" কথাটিও লক্ষণীয়। কাজেই ধরা যায় যে রজনীকান্ত সংস্করণে এইটিও সংশোধন করিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে।

উপরের আলোচনার মধ্যে প্রথমতঃ একটি জিনিস লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি খণ্ডেই দাশরথি একটি করিয়া "রসিকরঞ্জন রসরঙ্গ"-রূপ "অপর পদ্ধতির" পালা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডে বিরহ ও নায়ক-নায়িকা উপাখ্যান ছিল। আমাদের ধারণা, অশ্লীল বলিয়া দাশরথি বহরা সংস্করণে তাহা বাদ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে নলিনীভ্রমরোক্তি, তৃতীয় খণ্ডে নলিনী-ভ্রমরের বিরহ বর্ণন, চতুর্থ খণ্ডে নলিনীভ্রমরের বিরহ বর্ণন এবং পঞ্চম খণ্ডে বিরহ বর্ণন বা প্রেমচন্দ্রপ্রেমমণি নামে একটি পালা ছিল। বহরার সংস্করণে এইগুলি ছিল বলিয়া আমরা অনুমান করি। রজনীকান্ত কিন্তু বিরহ জাতীয় একটি পালাও তাঁহার সংস্করণে দেন নাই। অতএব রাজকিশোরের ঘোষণার "বিশেষরূপে সংশোধনপূর্বক" কথাটির অর্থ হইল বিরহ জাতীয় পালাগুলির বর্জন। খুব সম্ভব তাৎকালিক রুচির অনুগত হইয়া পাঁচালীকে একেবারে ষোল আনা অশ্লীলতা দোষমুক্ত করিতেই রাজকিশোর এই সংশোধন কার্যটি করিয়াছিলেন।[১] এখন প্রশ্ন হইতেছে যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ডে

১। এই প্রসঙ্গে এই অভিযোগগুলি স্মরণযোগ্য : (ক) "খেউড় নামক উপাখ্যানসকল এত জঘন্য ও অশ্লীল যে তাহা দেখিলে দাশরথি রায়কে ভদ্র সভায় বসিতে দিতে ইচ্ছা করে না।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সং, পৃঃ ২৩২। (খ) "এই শ্রুতিসুখকর কুরুচিদুষ্ট গীতরচকদের মধ্যে দাশরথি রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম. সং, পৃঃ ৩৫৫। (গ) "...they (popular Bengali songs) are filthy and polluting ; of these most known are the Panchlis...Dasarathi Roy is the most famous composer of them, by which he has gained much money."—Long's Descriptive Catalogue of Bengali Works.

এক একটি করিয়া মোট তিনটি নলিনীভ্রমর বিরহ আছে, ইহারা একই পালা কিনা অর্থাৎ ইহাদের পাঠ এক কিনা। এই সম্বন্ধে বলা যায় যে, বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক হরিমোহন দাশরথি রায়ের বহরা প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণ ও অন্যান্য পুঁথি মিলাইয়া যে বিপুল কলেবর পাঁচালী সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে দুইটি পরিমার্জিত ও সংশোধিত নলিনীভ্রমরের পালা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।[১] পাঠ মিলাইয়া দেখিলেও উহাদের স্বাতন্ত্র্য অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের নলিনীভ্রমর পালাটি ("সূর্য গেল ত্যাজ্য করে, নলিনীর প্রেম সরোবরে, একেবারে দুখের অনল জ্বলে উঠিল" ইত্যাদি পালাটি) হরিমোহনও তাঁহার সংকলনে উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক আলোচিত যুক্তি বলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিবিধ সঙ্গীত ব্যতিরিক্ত মোট (২৫+৪=) ২৯টি পালা দাশরথির স্বপ্রকাশিত বহরা সংস্করণের পাঁচ খণ্ডে ছিল।

বহরা সংস্করণের ভবতারণ রায় মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে বিশ্বম্ভর লাহার মুদ্রিত পঞ্চম খণ্ড বাহির হইয়াছিল ১৯৬০ খ্রীঃ, অর্থাৎ দাশরথির মৃত্যুর তিন বৎসর পর। ইহার পদ্যরচিত ভূমিকা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থনামাটিও উল্লেখযোগ্য : "সুরবরবরণীয় বরদেশ দিগম্বররাধ্য গুণকর জগৎপ্রিয়বর পীতাম্বরচরণাম্বুজমধুকর তন্নখর সুধাকরস্য চকর কিঙ্করানুকিঙ্কর দাশরথিদ্বিজবরেণ বিরচিতমিদং রসঞ্চবৈরাগ্য বিজ্ঞাদি মধুকরমধুকুলবুধচিত্তচকরস্য বিধুসুধাধিক সুস্বাদু সাধুরঞ্জক পাঞ্চালিনামক পুস্তক।"

দাশরথির সমগ্র পাঁচালী পরে বটতলা হইতে মোট দশ খণ্ডে বাহির হইয়াছিল। ষষ্ঠ হইতে দশম, এই উত্তরার্ধ যে দাশরথির মৃত্যুর পর বাহির হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। ষষ্ঠ খণ্ডের যে প্রাচীনতম সংস্করণ আমাদের চোখে পড়িয়াছে, তাহা ১২৭৬ সালে (১৮৬৯ খ্রীঃ) শ্রীযুক্ত রামতারণ রায় মহাশয়ের দ্বারা প্রাপ্ত ও শ্রীবেহারীলাল শীল কর্তৃক প্রকাশিত। এই রামতারণ দাশরথির ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহা যে কোন্ সংস্করণ, তাহা উল্লেখ নাই। কিন্তু দাশরথির মৃত্যুর বার বৎসর পর প্রকাশিত সংস্করণ যদি প্রথম সংস্করণ হইয়া থাকে তবে বিস্মিত হইবার কথা বটে। ইহার তিন বৎসর পরে (১৮৭৪ খ্রীঃ) শ্রীমতী প্রসন্নময়ী ষষ্ঠ খণ্ডের স্বত্ব শ্রীবেহারীলাল শীলের নিকট

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, ৬০নং ও ৬১নং পালা।

বিক্রয় করেন। এই ক্ষেত্রেও হয়তো পাঁচালীর স্বত্ব লইয়া রামতারণের সহিত প্রসন্নময়ীর বিবাদ হইয়াছিল। ১২৮৩ সালের (১৮৭৬ খ্রীঃ) ষষ্ঠ খণ্ড পাঁচালীর ষষ্ঠ সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। ইহাতে বিহারীলালের এই বিজ্ঞাপন আছে: "তস্য পত্নী শ্রীপ্রসন্নময়ী দেব্যা, সাকিন পীলা, সন ১২৭৯ সাল, ১১ আষাঢ় তারিখ খরিদ করিলাম।" দাশরথির বন্ধু ও জীবনীকার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দাশরথির জীবনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "প্রসন্নময়ী···স্বপতির ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড পাঁচালীর স্বত্ব কলিকাতার রাজকিশোর দে ও হীরালাল শীলকে বিক্রয় করে।"[১] খুব সম্ভব বিহারীলালকে তিনি হীরালাল বলিয়া ভুল করিয়াছেন, অথবা ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে রাজকিশোর দে যে প্রথম পাঁচ খণ্ড পাঁচালীর স্বত্ব ক্রয় করেন, এই জীবনী গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কারণ বোধ হয় এই যে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে হয়তো এই খরিদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, আর জীবনীগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার পূর্বে ১২৮০ সালের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে। আরও লক্ষণীয় এই যে, কেবলমাত্র সপ্তম খণ্ড পাঁচালীই রাজকিশোর দে ক্রয় করিয়াছিলেন,[২] কারণ ষষ্ঠ খণ্ড পাঁচালীতে বরাবর বেহারীলাল শীলের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি। নবম, দশম খণ্ড পাঁচালীর স্বত্বও বেহারীলাল খরিদ করিয়াছিলেন।

বেহারীলালের ঘোষণাযুক্ত ষষ্ঠ খণ্ডের অনেক সংস্করণ হইয়াছিল। ১৩১৯ সালে (১৯১২ খ্রীঃ) প্রকাশিত এই খণ্ডের দ্বাবিংশতম সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। ইহা ছাড়া বেহারীলালের স্বত্ব ঘোষণাযুক্ত নবম ও দশম খণ্ড পাঁচালীও আমাদের চোখে পড়িয়াছে। দশম খণ্ডখানি ১২৯১ সালে (১৮৮৪খ্রীঃ) প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহার এক বৎসর পূর্বেও যদি দশম খণ্ডের প্রথম

১। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ১২০।

২। "আমি···শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেব্যার নিকট হইতে এই সপ্তম খণ্ড পাঁচালীর গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়াছি।···রাজকিশোর দে।" ঘোষণায় কোন তারিখ চোখে পড়ে নাই। বেহারীলালের কোন সপ্তম খণ্ডও দেখি নাই। বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানী দ্বারা ষষ্ঠ বার প্রকাশিত ১৩২৪ সাল (১৯১৭ খ্রীঃ) উক্ত সপ্তম খণ্ড দেখিয়াছি।

সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে দাশরথির মৃত্যুর ২৫।২৬ বৎসরের মধ্যে সমগ্র দশ খণ্ড পাঁচালী মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা চলে। পরে বটতলা হইতে দশ খণ্ড পাঁচালী দুইখানি গ্রন্থে ও একত্র সংকলিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩৪২ সালে (১৯৩৫ খ্রীঃ) মুদ্রিত গৌরলাল দে প্রকাশিত একত্রে দশ খণ্ড পাঁচালী আমরা দেখিয়াছি। পুরাতন পুস্তকের দোকানে তো বটেই, এখনও বটতলার ছাপা দাশরথির নূতন মুদ্রিত সংস্করণ বাজারে সুলভ।

শ্রীঅরুণোদয় রায় কর্তৃক ১৩০৪ সালে (১৮৯৭ খ্রীঃ) প্রকাশিত প্রথম খণ্ড এবং ১৩০৫ সালে (১৮৯৮ খ্রীঃ) প্রকাশিত দাশরথির পাঁচালী দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের উল্লেখ করিয়াছি। এই তিন খণ্ডে অরুণোদয় দাশরথির বহরা সংস্করণ প্রথম পাঁচখণ্ড হইতে মাত্র নির্বাচিত ১৪টি পালা প্রকাশ করিয়াছেন। অরুণোদয়ের আর কোন খণ্ড দেখি নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ বসুমতীর চতুর্থ বর্ষের উপহার (১৩০৬ সাল : ১৮৯৯ খ্রীঃ) রসভাণ্ডার গ্রন্থে দাশরথির ১১টি পালা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১। গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল, ২। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, ৩। নলিনী ও ভ্রমরের বিরহ বর্ণন, ৪। গোপীদিগের বস্ত্রহরণ, ৫। নবীনচাঁদ ও সোনামনির দ্বন্দ্ব, ৬। বিধবাবিবাহ, ৭। শ্রীরাধার মানভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন, ৮। কর্তাভজা, ৯। বিরহ, ১০। বসন্ত আগমনে বিরহিনীদের বিরহ, ১১। কলিরাজার উপাখ্যান ও চার ইয়ারী কথা। বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজে রসগ্রন্থাবলী চতুর্থ সংস্করণ এখন পাওয়া যায়। ইহাতে নলিনী-ভ্রমরোক্তি এবং বিরহ (প্রেমচাঁদ ও প্রেমমণি) নামে অতিরিক্ত দুইটি পালা আছে।

বঙ্গবাসীর সহসম্পাদক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যা অতি যত্নে দাশরথির সমগ্র পাঁচালী সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। ৬০টি পালা লইয়া তাঁহার প্রথম সংস্করণ বাহির হয় ১৩০৯ সালে (১৯০১ খ্রীঃ)। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচালীর ব্যাখ্যা বাহির করিবার একটা অসম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছিলেন হরিমোহন। তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৩২৫ সালে (১৯১৮ খ্রীঃ)। ইহাতে ৬৪টি পালা সংকলিত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণেরই উন্নত রূপ,

প্রকাশ-কাল ১৩৩১ সাল (১৯২৪ খ্রীঃ)। ইহাতে পাঁচালীর ব্যাখ্যা অংশ বর্জিত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণের বিষয়-বিন্যাস এই প্রকার: ১। চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা, ২। সম্পাদকলিখিত প্রস্তাবনা (১—১০ পৃঃ), ৩। দীননাথ সান্ন্যাল লিখিত সমালোচনা (১—১৮ পৃঃ), ৪। অভিমত সংগ্রহ (১—১০ পৃঃ), ৫। পালার ও প্রথম চরণ অনুসারে গানের সূচীপত্র, (⁄০—১৲ পৃঃ), ৬। পালা ও গান (১—১০২ পৃঃ), ৭। নূতন সংগ্রহ (১০৩—১১৬ পৃঃ), ৮। দাশরথি রায়ের জীবনী (১১৭—১৩৫ পৃঃ), ৯। পরিশিষ্ট (১৩৬—১৩৭ পৃঃ), ১০। বংশতালিকা। উল্লেখযোগ্য এই যে এই চতুর্থ সংস্করণের আকার ৮১/২ × ৫১/২ এবং পালা ও গান দুই সারিতে অর্থাৎ ডবল কলমে ছাপা। ইহাই দাশরথির সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ।

খ

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার History of Bengali Language and Literature গ্রন্থে দাশরথির ৫০টি পালার তালিকা দিয়াছেন।[১] কি ভাবে, কোন্ কোন্ উৎস হইতে এই তালিকা তিনি সংকলন ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টতঃ না বলিলেও বঙ্গবাসী সংস্করণ যে তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়াছেন।[২] তাহা ছাড়া তালিকার ক্রম দেখিয়া তিনি যে এই সংস্করণই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। তবু কেবলমাত্র বিষয় ও নাম দেখিয়া লেখায় এবং হয়ত অনুলিপি প্রমাদেও কিছুটা ভুল রহিয়া গিয়াছে। গোষ্ঠলীলা বঙ্গবাসী সংস্করণে মোট চারিটি, কিন্তু দীনেশচন্দ্র মাত্র একটি গোষ্ঠলীলা তালিকাবদ্ধ করিয়াছেন, পালাগুলির স্বাতন্ত্র্যের বিচার করেন নাই। এইভাবে নবনারীকুঞ্জর, মানভঞ্জন, অক্রূরসংবাদ, মাথুর, আগমনী, বামনভিক্ষা, বিরহ প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া পালা থাকিলেও দীনেশচন্দ্র একটি

১। পৃঃ ৭৫১—৭৫২।

২। 'In an exhaustive compilation of Dasarathi's works lately published by Vangavasi Office, Calcutta, we have altogether counted 50,000 lines"—Hist. of Bengali Lang. & Lit., D. C. Sen—p. 792

করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কৃষ্ণকালী বর্ণন, প্রভাস, মায়াসীতা বধ, মহীরাবণ বধ, বিধবাবিবাহ, নলিনীভ্রমর এই পালাগুলির উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরের সত্যভামার, সুদর্শনের ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ পালা[১] এবং নবীনচাঁদ ও সোনামনি বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব পালা[২] এই দুইটিকে দীনেশচন্দ্র চারিটি পালায় বিভক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ মোট ষোলটি পালা বাদ দিয়া দুইটি পালা বেশি দিয়াছেন। তাহা হইলে পালার সংখ্যা দাঁড়াইল (৫০+১৬−২=) ৬৪টি। অবশ্য ইহা হইতেও পাঁচালীর ব্যাখ্যা[৩] বাদ যাইবে।

গৌরলাল দে প্রকাশিত দশখণ্ড পাঁচালীতে মোট ৬১টি পালা আছে। প্রথম পাঁচখণ্ডে ৩০টি পালা, শেষের পাঁচখণ্ডে ৩১টি পালা। ইহাদের মধ্যে আবার যথাক্রমে চারিটি ও একটি অর্থাৎ মোট পাঁচটি পালা নানারাগরাগিণীযুক্ত সঙ্গীত সংগ্রহ। তাহা হইলে এই সংস্করণে পাঁচালীর সংখ্যা দাঁড়াইল মোট ৫৬টি

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দাশরথি রায়ের বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণ চৌষট্টিটি পালায় সম্পূর্ণ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ তালিকাটি উল্লেখ করিতেছি: ১। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ২। নন্দোৎসব, ৩। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা (১), ৪। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা (২), ৫। কালীয়দমন, ৬। ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ, ৭। কৃষ্ণকালী, ৮। গোপীগণের বস্ত্রহরণ, ৯। শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ, ১০। নবনারীকুঞ্জর (১), ১১। নবনারীকুঞ্জর (২), ১২। কলঙ্কভঞ্জন (১), ১৩। কলঙ্কভঞ্জন (২), ১৪। মানভঞ্জন (১), ১৫। মানভঞ্জন (২), ১৬। অক্রুরসংবাদ (১), ১৭। অক্রুরসংবাদ (২), ১৮। মাথুর (১), ১৯। মাথুর (২), ২০। মাথুর (৩), ২১। নন্দবিদায়, ২২। উদ্ধবসংবাদ, ২৩। রুক্মিণীহরণ, ২৪। সত্যভামার ব্রত, ২৫। সত্যভামা, সুদর্শন চক্র ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ, ২৬। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ২৭। দুর্বাসার পারণ, ২৮। শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহানন্তর

১। উক্ত তালিকার ১৬ ও ১৭ নং পালাদ্বয়।

২। ঐ ঐ ৪৫ ও ৪৬ নং পালাদ্বয়।

৩। ঐ ঐ ৫০ নং পালা।

কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, ২৯। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ, ৩০। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতাহরণ, ৩১। সীতা অন্বেষণ, ৩২। তরণীসেন বধ, ৩৩। মায়াসীতা বধ, ৩৪। লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ৩৫। মহীরাবণবধ, ৩৬। রাবণবধ, ৩৭। শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন, ৩৮। লবকুশের যুদ্ধ, ৩৯। দক্ষযজ্ঞ, ৪০। গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল, ৪১। শিববিবাহ, ৪২। আগমনী (১), ৪৩। আগমনী (২), ৪৪। কাশীখণ্ড, ৪৫। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন, ৪৬। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৪৭। মহিষাসুরের যুদ্ধ, ৪৮। প্রহ্লাদচরিত্র, ৪৯। কমলেকামিনী, ৫০। বামনভিক্ষা (১), ৫১। বামনভিক্ষা (২), ৫২। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, ৫৩। কর্তাভজা, ৫৪। বিধবার বিবাহ, ৫৫। বিরহ (১), ৫৬। বিরহ (২), ৫৭। কলিরাজার উপাখ্যান, ৫৮। নবীনচাঁদ ও সোনামণি, ৫৯। প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ, ৬০। নলিনীভ্রমর (১), ৬১। নলিনীভ্রমর (২), ৬২। ব্যাঙের বৈরাগ্য, ৬৩। বিবিধ সঙ্গীত, ৬৪। শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের দেশাগমন, ৬৫। দুর্গা ও গঙ্গায় কোন্দল (২), ৬৬। নবসংগৃহীত গীত।

এই তালিকার মোট ৬৬টি পালার মধ্যে সঙ্গীত সংগ্রহ দুইটি বাদ দিয়া পাঁচালী পালার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪টি। মনে রাখিতে হইবে যে বহরাপূর্ব প্রথম খণ্ড পাঁচালীতে প্রকাশিত বিরহ ও নায়কনায়িকা বর্ণন পালা দুইটি যোগ করিলে প্রকাশিত পাঁচালীর সংখ্যা ৬৬টি দাঁড়ায়। যাহা হউক গৌরলাল দের দশ খণ্ডে যে ৫৬টি পালার তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সবগুলি এই ৬৪ পালার মধ্যে আছে। সম্পাদক হরিমোহন প্রস্তাবনাতে কহিয়াছেন: "দাশুরায়ের অপ্রকাশিতপূর্ব কোন কোন নূতন পালাও পাঠক আমাদের এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।"[১] এই ৬৪ হইতে গৌরলালের ৫৬টি বাদ দিলে অবশিষ্ট আটটি পালাই কি নূতন ও অপ্রকাশিতপূর্ব? প্রশ্নটি বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আলোচ্য অধ্যায়ে রজনীকান্ত প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডের পালার সংখ্যা নির্ধারণকল্পে যে আলোচনা করিয়াছি, সেখানে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে দুইটি নলিনী ভ্রমরের বিরহ বর্ণন ও প্রেমচাঁদ প্রেমমণি, মোট এই

১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৯

তিনটি পালা রজনীকান্ত বর্জন করিয়াছিলেন। গৌরলাল "নলিনী ভ্রমরের বিরহবর্ণন" নামে যে পালাটি তাঁহার পঞ্চম খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাসী সংস্করণের তালিকার ৬১ সংখ্যক নলিনী ভ্রমর (২) পালাটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে গৌরলাল এতদ্দ্বারা পূর্বপ্রকাশিত পাঁচালী পালার ক্রম ভঙ্গ করিয়াছেন, কারণ আমাদের মতে পঞ্চম খণ্ডে প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ পালাটি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাহার বদলে গৌরলাল নলিনীভ্রমরের মাত্র চার পৃষ্ঠার একটি খণ্ডিত পালা দিয়াছেন। যাহা হউক বঙ্গবাসী তালিকার ৬০নং পালা নলিনীভ্রমর (১) গৌরলাল বাদ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে রজনীকান্তের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে তিনটি নলিনীভ্রমরের পালা ছিল দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে। বহরাপূর্ব প্রথম খণ্ডের বিরহ ও নায়কনায়িকা উপাখ্যান আগাগোড়াই বাদ দিয়া লইতেছি। প্রেমমণি প্রেমচাঁদ পালাটি ছিল পঞ্চম খণ্ডে। কাজেই এই তিনটি পালা নূতন বা অপ্রকাশিতপূর্ব নহে। অধিকন্তু একটি নলিনীভ্রমরবিরহ হরিমোহন সংকলন করেন নাই বা বাদ দিয়াছেন। আমরা বহরাপূর্ব বনমালি-শ্যামাচরণের যে পঞ্চম খণ্ড সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি তাহার সূচীপত্র : ১। নবনারীকুঞ্জর ও কলঙ্কভঞ্জন, ২। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, ৩। ভেক ও ভৃঙ্গের দ্বন্দ্ব, ৪। খেউড়। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত ক্ষেত্রমোহন ধরের পঞ্চম খণ্ডেরও তালিকা এইপ্রকার, কেবল খেউড়ের স্থলে নানা রাগরাগিণীযুক্ত গান। পাঠ মিলাইয়া দেখা যায় যে এই খণ্ডের ১নং পালা নবনারীকুঞ্জর ও কলঙ্কভঞ্জন হরিমোহনের ১১নং নবনারীকুঞ্জর (২) ও ১২নং কলঙ্কভঞ্জন (১) এই দুই পালায় বিভক্ত হইয়াছে। হরিমোহনের ৪৫নং গঙ্গা আনয়ন পালাও এই খণ্ডে প্রকাশিত। কাজেই এই তিনটি অপ্রকাশিতপূর্ব নহে। হরিমোহনের ৬২নং পালা ব্যাঙের বৈরাগ্য সম্ভবতঃ ভেক ও ভৃঙ্গের দ্বন্দ্বের পরিমার্জিত রূপ। সুতরাং ৬৪নং শ্রীমন্ত ও ধনপতির দেশাগমন, এবং ৬৫নং দুর্গা ও গঙ্গায় কোন্দল (২) —এই পালা দুইটি হরিমোহনের নূতন ও অপ্রকাশিত-পূর্ব মনে করি।

দাশরথির পালাগুলির প্রকাশের ক্রম ও পৌর্বাপর্য নির্ধারণ করা খুব কঠিন নহে। আমরা পূর্বে রজনীকান্ত প্রকাশিত পাঁচ খণ্ড পাঁচালীর যে তালিকা দিয়াছি, অশ্লীলতাদি দোষে বর্জিত পালাগুলি যথাযথ ভাবে তাহার সঙ্গে জুড়িয়া প্রকাশ করিলেই দাশরথি যে ক্রমে যে যে খণ্ডে পালাগুলি ছাপাইয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উত্তরার্ধের অর্থাৎ ষষ্ঠ হইতে দশম খণ্ড পর্যন্ত পাঁচালীর প্রকাশ-ক্রমও বটতলার ছাপা পাঁচালীতে অটুট আছে, মনে করি। গৌরলালের পাঁচালীতে মোটামুটি এই ক্রম অনুসৃত হইয়াছে। অবশ্য গৌরলালের মধ্যে যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহাও পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই ভাবে সমগ্র দশখণ্ড পাঁচালীর পালাগুলির বিন্যাসক্রমের একটা মোটমুটি পারম্পর্য নির্ধারণ করা বোধ হয় সম্ভব। হরিমোহনের নূতন ও অপ্রকাশিতপূর্ব পালা সম্বন্ধে অবশ্য কোন প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু পালাগুলি রচনার ক্রম ও পৌর্বাপর্য নির্ধারণ করা একটা দুরূহ ব্যাপার। যে ক্রমে পালাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ক্রমানুসারেই যে সেগুলি রচিত হইয়াছিল, ইহা মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দাশরথি যখন বহরা গ্রামে পালাগুলি ছাপাইতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন এবং নিশ্চয়ই অধিকাংশ পালা তখন রচিত হইয়াছে। সুতরাং দাশরথি যে প্রকাশ-কালে পালাগুলির রচনার ক্রম হইতে উহাদের জনপ্রিয়তার উপর বেশি লক্ষ্য রাখিবেন তাহাই স্বাভাবিক। কাজেই ধরা যায় যে যেসব পাঁচালী পূর্বে রচিত হইয়া বহুবার গীত হইয়াছিল ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, সেইগুলিই তিনি প্রথম পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পালাগুলির মধ্যেও কোন্‌গুলি পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও আভ্যন্তরীণ যুক্তির আলোকপাত করা যাউক।

এই রকম প্রসিদ্ধি আছে যে প্রথম প্রথম পালার গীতে দাশরথি যৎ তাল অধিক ব্যবহার করিতেন। ইহার জন্য তখন তাঁহাকে 'যতো দাশু' এই

আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।[১] পরে ধীরে ধীরে তিনি বিবিধ তাল ও সুর ব্যবহার করিয়া পাঁচালীর গানগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। সুতরাং পালার গীতে ষৎ তালের প্রয়োগাধিক্য বিচার পালাগুলি রচনার পৌর্বাপর্য নির্ধারণে কাজে আসিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ কবির দল ছাড়িয়াই দাশরথি পাঁচালী রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই প্রথম দিকের পাঁচালীর মধ্যে কবি-সঙ্গীতের অধিকতর প্রভাব ও কিছু কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ থাকা সম্ভব। চরিত্রগুলির পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণমূলক রচনার অর্থাৎ কবির লড়াইয়ের স্পষ্ট প্রভাবপুষ্ট রচনার সন্ধান এই ব্যাপারে কাজে আসিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বিবেচ্য এই যে উত্তর প্রত্যুত্তরের নাটকীয় ভঙ্গী আশ্রয় করিয়াই পাঁচালী বর্ণিত হয়। কিন্তু বাক্‌চাতুর্যের ঢং, ঝাঁজ বা তীব্রতা ও স্বাদ কবিগানে এবং পাঁচালীতে ঠিক এক রকমের নহে।

তৃতীয়তঃ, দাশরথির কবির দল ছাড়িবার অন্যতম কারণ পুরুষোত্তম বৈরাগ্যের আক্রমণ। বৈরাগী বোষ্টমদের প্রতি দাশরথির ক্রোধ বরাবর থাকিলেও প্রথম দিকে তাহার তীব্রতা স্বভাবতই খানিকটা বেশি থাকিবার কথা। ইহাও ক্ষেত্রবিশেষে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চতুর্থতঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের সম্বন্ধে দাশরথি যে সব কথা কহিয়াছেন বা মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা দ্বারাও কিছুটা অনুমান করা চলে। এইরূপ অন্যান্য কয়েকটি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণও লক্ষণীয়।

পালার আকার দেখিয়া কোন কিছু সঠিক অনুমান করা যায় না। কারণ একই পালা আসর-ভেদে কখনও ছোট, কখনও বা বড় করিয়া গাওয়া হইত। ইহার মধ্যেও যে আকারটি বেশি জনপ্রিয়, তাহার মুদ্রণই স্বাভাবিক। একই বিষয়ে একাধিক পালাও পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মুখ্যতঃ উপরের সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া পালা রচনার পৌর্বাপর্য নির্ধারণের চেষ্টা করা যাউক।

গোষ্ঠলীলা (১), মহীরাবণ বধ, শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতাহরণ,

১। আর্যাবর্ত, ১৩২১, অগ্রহায়ণ, রমানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের ৪০নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আগমনী (১), গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল, কৃষ্ণকালী, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, এই পালাগুলিতে[১] যৎ তাল অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রযুক্ত মোট তালের তুলনায় যৎ তালের অনুপাত এই প্রকার: গোষ্ঠলীলা (১) পালাতে ৫/৬, মহীরাবণ বধে ২/৯, রামের বনগমন ও সীতাহরণে ১০/১৪, রুক্মিণীহরণে, ৯/১৪, আগমনী (১) ৮/১৬, গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দলে ৯/১৮, কৃষ্ণকালীতে ৯/১৮, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বে ৯/১৭, কুরুক্ষেত্র মিলনে ২১/৩৬।[২] এই সব পালাই প্রথম পাঁচ খণ্ডের অন্তর্গত, অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে তিনটি পালা, দ্বিতীয় খণ্ডে পাঁচটি পালা, এবং তৃতীয় খণ্ডে একটি পালা। "যতো দাশু" এই জনশ্রুতির মানে বিচার করিলে অর্থাৎ আমাদের উল্লিখিত প্রথম সূত্রের প্রয়োগে এইগুলিকে দাশরথির প্রথম দিকের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা চলে।

দাশরথি পাঁচালী সঙ্গীতকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া সাজান। এই নূতনত্বের

১। গৌরলাল দের পাঁচালীতে পালাগুলি যথাক্রমে ৩য় খণ্ডে, ২য় খণ্ডে, ১ম খণ্ডে, ২য় খণ্ডে, ১ম খণ্ডে, ২য় খণ্ডে, ২য় খণ্ডে, ২য় খণ্ডে, ১ম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। এই হিসাবটি দাশরথির বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ হইতে গৃহীত। গৌরলাল দে সংস্করণের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। গৌরলালের অনুপাত: গোষ্ঠলীলা (১) ৪/৬, মহীরাবণ বধ ১/৯, রুক্মিণীহরণ ৯/১৪, আগমনী (১) ৮/১৬, গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল ৯/১৬, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ৯/১৬। অন্যান্য সংস্করণের সঙ্গেও এই প্রকার পার্থক্য থাকা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী সংস্করণের প্রস্তাবনায় হরিমোহনের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "দাশু রায়ের পাঁচালীর এক্ষণে যিনি প্রসিদ্ধ গায়ক (বর্ধমান জেলার সাতগেছে গ্রামনিবাসী শ্রীবক্রেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়), তাঁহাকে আনাইয়া ও তাঁহার নিকট হইতে বহু পালা মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে, আমাদের এই গ্রন্থের প্রায় সমুদয় সঙ্গীতই উপরি উক্ত অধুনাতন প্রসিদ্ধ প্রবীণ পাঁচালী গায়ক মহাশয় গাহিয়া সুরতাল ঠিক করিয়া দিয়াছেন। দাশরথি রায় মহাশয় যে গান যে রাগ-তালে গাহিতেন, সেই রাগ-তালই উপরি-উক্ত পাঁচালী গায়ক মহাশয় আমাদের গ্রন্থে বসাইয়া দিয়াছেন।"—৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৯। এইসঙ্গে ১৫৩ পৃষ্ঠায় ৩নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক বোধহয় পাঁচালীতে তৎকালীন কবিসঙ্গীতের জনপ্রিয় ঢং ও বৈশিষ্ট্যগুলি সংযোজন করা। কবিগানে সর্বাধিক উত্তেজনাপূর্ণ অংশ হইতেছে কবির লড়াই বা চাপান কাটান অর্থাৎ প্রতিপক্ষের প্রতি সরস ও ঝাঁঝালো বাক্যবাণ ক্ষেপণ। দাশরথির পূর্বেকার পাঁচালীর কোন নমুনা দেখি নাই। জয়নারায়ণ ঘোষাল কর্তৃক উদ্ধৃত অংশে[১] কয়েকটি গান মাত্র দেওয়া হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক রচনা-রীতি তখনকার প্রধান প্রধান জনপ্রিয় জনসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, যদিও সকল গানে ইহার প্রয়োগ-পদ্ধতি এক প্রকার ছিল না। কবি ও হাফআখড়াইতে সরাসরি দুই দলের লড়াই হইত বলিয়া চাপান কাটান চলিত দুই দলে। দাশরথির সময়ে পাঁচালীর অনুরূপ প্রতিযোগিতা প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং কাহিনীর চরিত্রগুলির জবানীতে এই ধরণের চাপান কাটান সংযোজনা রীতি ছিল। কেবল গানের মধ্য দিয়া প্রশ্নোত্তর নহে, ছড়ার ও পদ্য আবৃত্তির মধ্যে পরস্পরের প্রতি রসাল বাক্যবাণ ক্ষেপণ করিবার পদ্ধতি দাশরথির পাঁচালীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দাশরথির পূর্বেকার কোন পাঁচালী দেখি নাই বলিয়া ষোল আনা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না ইহা পূর্বে ছিল কিনা, কিন্তু মনে হয় রাধাকৃষ্ণের ও বৃন্দেকৃষ্ণের রসালাপের মধ্যে বা হরগৌরীর দ্বন্দ্বের মধ্যে যে ঢংটি পাওয়া যায় তাহা পাঁচালীতে দাশরথিরই দান। কৃষ্ণকালী, শ্রীমতীর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল, বিরহ প্রভৃতি পালাতে এই জাতীয় দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দাশরথির বহু পালার মধ্যে এই কবি গানের ঢং যুক্ত এই জাতীয় দ্বন্দ্ব আছে বটে, কিন্তু উক্ত পালাগুলির মত উহা অতখানি প্রাধান্য পায় নাই বা ততখানি স্থান জুড়িয়াও বসে নাই। কবির দলের সংস্কার ও অভ্যাস পাঁচালী রচনার প্রথম দিকে অধিক সজাগ ও সক্রিয় ছিল বলিয়াই হয়ত প্রথম যুগের পাঁচালীতে উহা এত অধিক প্রকট হইয়া থাকিবে।

পাঁচালীর অনেক স্থানে ভণ্ড বৈরাগীদের নিন্দাসূচক ছড়া আছে।[২] কিন্তু

১। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পৃঃ ৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীমতীর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, নবীনচাঁদ ও সোনামণি প্রমুখ পালা।

শ্রীমতীর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন পালাতে ভণ্ড বৈরাগীদের নিন্দা যেন অনেকটা গায়ে পড়িয়া করা হইয়াছে। "গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া" ইত্যাদি বহুল প্রচারিত নিন্দাসূচক পদটি এই পালার অন্তর্গত।[১]

এই সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিয়া মনে হইতেছে যে শ্রীমতীর কৃষ্ণ বিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, কৃষ্ণকালী, রাম বনবাস, কলঙ্কভঞ্জন, বামনভিক্ষা প্রমুখ পালাগুলি দাশরথির প্রথমদিকের রচনা। এই প্রসঙ্গে রমানাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "দাশরথির প্রথম পাঁচালী পালা প্রভাস যজ্ঞ বা কুরুক্ষেত্র মিলন রচিত হইল।"[২] প্রথম পাঁচখণ্ডের পালাগুলির রচনাকাল ও ক্রম সম্বন্ধে ইহাই কেবল অনুমান করা যায়।

উত্তর পাঁচ খণ্ডের অন্তর্গত বিধবাবিবাহ পালাটি যে দাশরথির একেবারে

১। পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।

২। আর্যাবর্ত, অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল। অতঃপর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন: "এই সময়ে প্রভাসযজ্ঞ, বামনভিক্ষা, কলঙ্কভঞ্জন, প্রভৃতি পালা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে রাগরাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ, তাল যৎ এই তানলয়ের গানই অত্যধিক থাকায় প্রথম প্রথম দাশু রায়ের নাম হইয়াছিল 'যতো দাশু রায়', অর্থাৎ যৎ নামক তালেরই বেশি ব্যবহারকর্তা। পরে এই সকল পালা ও আর আর পালা রচনা ও সংস্কারের কালে বিবিধ প্রকার সুরের সৃষ্টি হইতে লাগিল।" এইখানে উল্লেখযোগ্য যে কলঙ্কভঞ্জন ও বামনভিক্ষা পালা দুইটি করিয়া মোট চারিটি। বঙ্গবাসী সংস্করণে যথাক্রমে এই পালা চারিটির গীতে যৎ তালের সংখ্যানুপাত এই রকম: ১/১৫, ০/১৭, এবং ১/১৩, ০/১৮। এমনও হইতে পারে যে পরে দাশরথি সুর ও তালের সংস্কার করিয়াছেন। মনে হয় কলঙ্ক-ভঞ্জন (২) ও বামনভিক্ষা (২) এই দুইটি পালা প্রথমদিকের রচনা। এই অনুমানের প্রথম যুক্তি এই যে, উক্ত পালা দুইটি প্রথম পাঁচ খণ্ডের মধ্যে আছে। কলঙ্কভঞ্জন সম্বন্ধে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ১২৪৬ সালে দাশরথি নবদ্বীপে প্রথমবার পাঁচালী গান করেন। তাহার দুই তিন বৎসরের মধ্যেই কলঙ্কভঞ্জন (২) পালাটি রচনা ও গাহনা করিয়া পণ্ডিতসমাজকে মোহিত করেন। ১২৪৮-৪৯ সালের মধ্যে অর্থাৎ দল গঠনের ছয় সাত বৎসরের মধ্যে এই পালাটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি।

শেষ রচনা না হইলেও শেষের দিকের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৫৫ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় আবেদন করেন। আর ১৮৫৬ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। দাশরথি দেহ রক্ষা করেন ১৮৫৭ খ্রীঃ অক্টোবরের শেষাংশে। কাজেই মৃত্যুর পূর্বে বৎসর দেড়েক কালের মধ্যে উহা রচিত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নবীনচাঁদ ও সোনামণি বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব নামে যে পালাটি পাওয়া যায় তাহা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত। কারণ এই দ্বন্দ্বে পুরুষ ও নারী কোন পক্ষেই বিধবা বিবাহের কথা নাই। বিধবা বিবাহের পরে হইলে নিশ্চয় কলহের মধ্যে ইহার ব্যবহার হইত। অনুরূপ যুক্তিবলে বসন্ত আগমনে বিরহিণীদের বিলাপ ও অন্যান্য বিরহ পালাগুলিকেও উক্ত সনের পূর্বে রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়।[১]

কতগুলি ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া গীতের মধ্যে যেখানে ব্যক্তিগত জীবনের কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সেইসব ক্ষেত্রে ইঙ্গিত বিচার করিয়া সময় সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়। যেমন লবকুশের যুদ্ধ পালাতে "ও বীণে লবিনে" এই গীতের শেষাংশে—"রাখ দাশরথির শেষ, মিছেঁ রস আশে আর কেন রে, যা হল তা হল নবীনে।"[২] ইহাতে প্রবীণ বয়সের ইঙ্গিত আছে। মনে হয় ইহা অন্ততঃ ৪০ বৎসরের পরের অর্থাৎ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পরের রচনা।

১। এই প্রসঙ্গে মৌলিক পালাগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ দ্রষ্টব্য। নবীনচাঁদ ও সোনামণি পালায় নারীর জবানী একটি গান :

স্মার্ত্ত কেবল আপন মত, নারীর বিয়ের নাই দ্বিতীয় তত্ত্ব,
প্রাচীন স্মৃতির তত্ত্ব চালিয়ে গেছে পালিয়ে দূরে।
অধিক বিয়ে করলে নারী, পুরুষ হতো আজ্ঞাকারী
বসাতেম কানে ধরি, আপন কর্মে দিতাম জুড়ে॥
নিত্য নূতন শ্বশুর পেতাম, আদরেতে খেতাম দেতাম,
রাগ করলে মুখ বাঁকাতাম, পায়ে ধরলে ফেলতাম ছুঁড়ে॥

—বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৬০।

২। বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৬৭।

ঘ

বিষয়বস্তুর দিক দিয়া দাশরথির ৬৪টি পালাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মৌলিক ও অমৌলিক এই মোটা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, অমৌলিক পালাকে লৌকিক ও পৌরাণিক এই দুই ভাগে ভাগ করা চলে। পৌরাণিক অংশকে আবার বিষ্ণুমহিমামূলক, শিবশক্তিমহিমামূলক, গঙ্গা-মহিমামূলক এই তিনটি শাখায় বিভক্ত করা যায়। আবার আরও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বিষ্ণুমহিমামূলক শাখাকে কৃষ্ণায়ণ, রামায়ণ, ও বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের মহিমা কীর্তন এই তিনটি প্রশাখায় ভাগ করা যায়। পুনশ্চ কৃষ্ণায়ণ শাখাকে বৃন্দাবন-মথুরা-সম্পর্কিত এবং দ্বারকাসম্পর্কিত এই ভাবে দুইটি অংশে প্রবিভক্ত করা চলে। শিবশক্তিমহিমামূলক পালাগুলিকেও এইভাবে শিবশক্তির মহিমাসূচক ও চণ্ডীর আখ্যানমূলক এই দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। মৌলিক পালাগুলিকেও এইভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: এক সমসাময়িক ঘটনামূলক, দুই চলতি বা পরম্পরাগত ও তৎকালে প্রচলিত ভাবমূলক। একটি রেখাচিত্রের নকসা দিয়া পালার বিভাগটি স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করা যাউক।
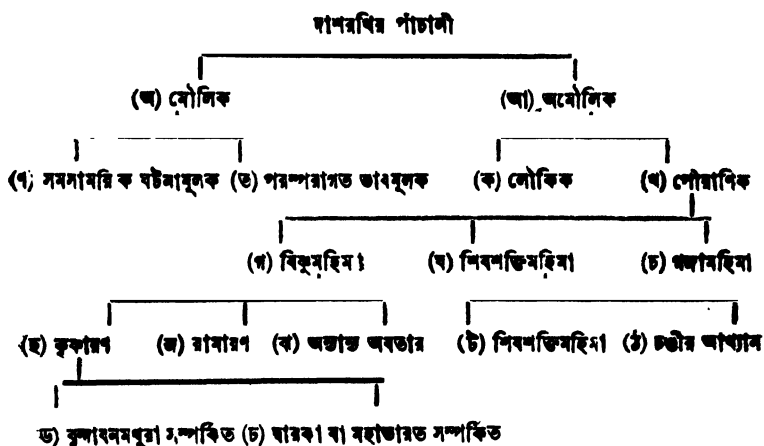
সমগ্র পাঁচালী পালাগুলির বিষয়ানুগ ভাগ এই প্রকার : (অ) মৌলিক পালা :

(ণ) সমসাময়িক ঘটনামূলক : ১। কর্তাভজা, ২। বিধবাবিবাহ।

(ত) পরম্পরাগত ভাবমূলক : ১। শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, ২। বসন্ত আগমনে বিরহিণীদের বিরহ বর্ণন, বা বিরহ (১), ৩। বিরহ (২), ৪। কলিরাজার উপাখ্যান বা চার ইয়ারী কথা, ৫। নবীনচাঁদ ও সোনামণির দ্বন্দ্ব, বা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, ৬। প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ, ৭। নলিনীভ্রমর বিরহ (১), ৮। নলিনীভ্রমরবিরহ (২), ৯। ব্যাঙের বিরহ।

(আ) অমৌলিক পালা :

(ক) লৌকিক : ১। কমলে কামিনী বা শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন ও কারাগারে বদ্ধ, ২। শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের দেশাগমন।

(খ) পৌরাণিক :

(গ) বিষ্ণুমহিমামূলক (ছ) কৃষ্ণায়ণ (ড) মথুরাবৃন্দাবনসম্পর্কিত : ১। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ২। নন্দোৎসব, ৩। গোষ্ঠলীলা (১), ৪। গোষ্ঠ-লীলা (২), ৫। গোষ্ঠলীলা ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ, ৬। গোষ্ঠলীলা কালীয়দমন, ৭। কৃষ্ণকালী, ৮। গোপীগণের বস্ত্রহরণ, ৯। শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ, ১০। নবনারীর-কুঞ্জর (১), ১১। নবনারীকুঞ্জর (২), ১২। কলঙ্কভঞ্জন (১), ১৩। কলঙ্কভঞ্জন (২), ১৪। মানভঞ্জন (১), ১৫। মানভঞ্জন (২), অথবা বিদেশিনী হইয়া মিলন, ১৬। অক্রূরসংবাদ(১), ১৭। অক্রূরসংবাদ (২), ১৮। মাথুর (১), ১৯। মাথুর(২), ২০। মাথুর (৩), ২১। নন্দবিদায়, ২২। উদ্ধবসংবাদ, ২৩। শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন।

(গ) বিষ্ণুমহিমামূলক, (ছ) কৃষ্ণায়ণ, (ঢ) দ্বারকাসম্পর্কিত :—১। রুক্মিণীহরণ, ২। সত্যভামার ব্রত, ৩। সত্যভামা, সুদর্শন ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ, ৪। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ৫। দুর্বাসার পারণ।

(গ) বিষ্ণুমহিমামূলক, (জ) রামায়ণ :—১। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ, ২। রামচন্দ্রের বনগমন ও সীতাহরণ, ৩। সীতা অন্বেষণ, ৪। তরণীসেন বধ, ৫। মায়াসীতাবধ, ৬। লক্ষ্মণশক্তিশেল, ৭। মহীরাবণবধ, ৮। রাবণবধ, ৯। রামচন্দ্রের দেশাগমন, ১০। লবকুশের যুদ্ধ।

(গ) বিষ্ণুমহিমামূলক, (ঝ) অন্যান্য অবতারসম্পর্কিত :—

১। প্রহ্লাদ চরিত্র, ২। বামনভিক্ষা (১), ৩। বামনভিক্ষা (২)।

(ঘ) শিবশক্তিমহিমা, (ট) শিব ও শক্তিমহিমাসম্পর্কিত :—

১। দক্ষযজ্ঞ, ২। শিব বিবাহ, ৩। আগমনী (১), ৪। আগমনী (২), ৫। কাশীখণ্ড, ৬। গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল, ৭। দুর্গা ও গঙ্গার কোন্দল।

(ঙ) শিবশক্তিমহিমা, (ঠ) চণ্ডীর আখ্যান :—

১। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ২। মহিষাসুরের যুদ্ধ।

(চ) গঙ্গামহিমামূলক : ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব (ত।১) পালাটি (অ) মৌলিক (ত) পরম্পরাগতভাবমূলক অংশে দেওয়া হইল। বিধবাবিবাহের মত ইহাকে সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ না করিবার পক্ষে যুক্তি এই যে এই জাতীয় দ্বন্দ্ব একেবারে শ্রীচৈতন্যের কাল হইতে সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান ছিল এবং বিশেষ স্থানে ও কালে নানা ভাবে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দাশরথি ইহাকে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া যেই কৃষ্ণ সেই কালী এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত নূতন ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। কাজেই গোকুল মিত্রের মদনমোহন ও কালীঘাটের পটভূমি থাকিলেও ইহাকে সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ না করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছি।

শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন (ভ।২৩) পালাটিও মূলতঃ রাধাসম্পর্কিত বলিয়া উহাকে বৃন্দাবন-মথুরাসম্পর্কিত অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল (ট।৬ ও ট।৭) পালা দুইটি শিবশক্তিমহিমা-মূলক (ঘ) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিবার কারণ এই যে, ইহার মূল কথা শিবের দাম্পত্যজীবনের বিড়ম্বনা। শিবের পটভূমিকাটি চলিয়া গেলে, ইহা অনেকটা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

এই গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল জাতীয় পালাকে মৌলিক বা লৌকিক পালার অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত কি না সেই প্রশ্ন-ও বিচার্য। এই জাতীয় কোন্দল কোন পুরাণে নাই, আর থাকিলেও নিঃসংশয়ে তাহা প্রক্ষিপ্ত বা অর্বাচীন। লৌকিক পাচালীতে বা মঙ্গল কাব্যাদিতে শিবের সংসার লইয়া অনেক সরস

রচনা আছে।[১] দাশরথিও সেই কাহিনীই যে মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই। এইদিক দিয়া দেখিলে ইহাকে লৌকিক (ক) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে শিবদুর্গা লৌকিক পৌরাণিক ভাবের মিশ্রিত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত এমন অপূর্ব সৃষ্টি যে কোন সুনির্দিষ্ট বিভাগের মধ্যে পূরাপূরি ইহাকে আবদ্ধ করা খুবই কঠিন। দুই সতীনের ঝগড়াই গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দলের মুখ্য ভাববস্তু হইলেও, গঙ্গা ও ভগবতী দুইটিই প্রখ্যাত পৌরাণিক চরিত্র বলিয়া এবং উহাদের সম্পর্ক এবং পরস্পরের প্রতি বিরূপতা অনেকাংশে পুরাণানুগ বলিয়া এই পালা দুইটিকে শিবশক্তিমহিমামূলক (ট) অংশের মধ্যে গণনা করিলাম।

উৎসের দিক হইতে বিচার করিলে অমৌলিক পালাগুলিকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি বিষয়ানুগ ভাগে বিভক্ত করা যায়। উৎস সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

পাঁচালীকে বলা হয় কথাপ্রধান সঙ্গীত, কাজেই দাশরথির গানগুলি স্বতন্ত্র-ভাবে আলোচনার যোগ্য। যথাস্থানে গীতগুলির মূল্য বিচার করিব, এইখানে কেবল গীতের সংখ্যা, সুর, তাল এবং অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

গৌরলাল দে প্রকাশিত দাশরথির দশ খণ্ড পাঁচালীতে মোট ৫৬টি পালার গীতসংখ্যা হইতেছে ৬৯২। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণে ৬৪টি পালার মোট গীত সংখ্যা হইল ৭৫৬। এই বাড়তি ৬৪টি গান সবই নূতন পালাগুলির অন্তর্ভুক্ত নয়। নূতন আটটি পালার মোট গীতসংখ্যা ৫৪; বাকি ১০টি গান গৌরলাল তাঁহার পালাগুলির মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। এই ১০টির একটিকে গৌরলাল বামনভিক্ষা (১) পালাতে গানের আকারে না দিয়া বাণীগুলি পাঁচালীর পদের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন।[২] কাজেই ইহাকে ধরিয়া লওয়া যায়। নলিনীভ্রমর (২) পালাটি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গৌরলাল

১। রামেশ্বরের শিবায়ন দ্রষ্টব্য।

২। গৌরলাল দে, ৭ম খণ্ড পাঁচালী, পৃঃ ১৫০, "কহিছে অদিতি" ইত্যাদি "দেখি স্বপন" ইত্যন্ত।

মাত্র ইহাতে দুইটি গান দিয়াছেন,[১] পক্ষান্তরে হরিমোহন উহাতে দিয়াছেন ৯টি গান।[২] অর্থাৎ ৭টি গান বেশি। কলঙ্কভঞ্জন (২)[৩] এবং বিরহ (২)[৪] পালা দুইটিতে হরিমোহন একটি করিয়া বেশি গান দিয়াছেন। মোট এই ১০টি গান ছাড়াও মানভঞ্জন (১)[৫] এবং রামচন্দ্রের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন[৬] পালাতে পাদটীকাতে হরিমোহন এক একটি করিয়া অতিরিক্ত দুইটি গানের উল্লেখ করিয়াছেন। গান দুইটি নূতন। এই দুইটিকে গণনার মধ্যে ধরা হয় নাই। যাহা হউক উল্লিখিত নূতন গানগুলির মধ্যে আবার পাদটীকা দিয়া হরিমোহন তিনটিকে একেবারে নূতন বলিয়া দাবী করিয়াছেন।[৭] ইহা ছাড়া সোনামণি ও নবীনচাঁদ পালাতে হরিমোহন একটি বিকল্প গীতের উল্লেখ করিয়াছেন।[৮] ইহাকে আর গণনা করি নাই।

অধিকন্তু আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে, পালাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি গীত পুনরুক্ত হইয়াছে। "ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ," গোষ্ঠলীলা (১), পৃঃ ৩৪ এবং অক্রুরসংবাদ (২), পৃঃ ১৮৩; "বিরাজ ব্রজে রাধাশ্যাম," অক্রুরসংবাদ (২), পৃঃ ১৮৫, এবং মাথুর (৩), পৃঃ ২১৫; "যাতে জীবের জন্মে জয়," দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পৃঃ ২৭১ ও ২৮৮; "কি শোভা রে রামরূপ," রাবণবধ, পৃঃ ৪৪৬ এবং "রামচন্দ্রের দেশাগমন," পৃঃ ৪৫৯; "কি রূপ বিহরে," ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল, পৃঃ ৪৪৬ এবং শিববিবাহ, পৃঃ ৫১৫; "মন ভাব রে গণপতি," শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৬১৫ ও ৬২১।[৯] তাহা হইলে পাঁচালী

১। গৌরলাল দে, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮।

২। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬৭৯।

৩। গৌরলাল দে, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮, গীত নং ছ।

৪। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬৪৫, গীত নং জ।

৫। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পাদটীকা, পৃঃ ১৪০।

৬। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পাদটীকা, পৃঃ ৪৫২।

৭। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৪০, ৪৫২ ও ৬৪৫।

৮। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬৫৯। এই গীতটি যোগ করিলে সমগ্র গীত সংখ্যায় একটি গীত বাড়িয়া যাইবে।

৯। এই গানগুলির পৃষ্ঠাঙ্ক হরিমোহন, ৪র্থ সংস্করণ হইতে গৃহীত।

পালাগুলির মোট গীতসংখ্যা দাঁড়াইতেছে (৭৫৬ − ৬ =) ৭৫০। গৌরলাল দের পাঁচালী পুস্তকের (একটানা ছাপা, সাইজ ৯"×৬") "বিবিধ গীতাংশ" বাদে ৬৪টি পালার মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৯৫ ; এবং হরিমোহন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণের (ডবল কলমে ছাপা, সাইজ ৯"×৬") 'বিবিধ গীতাংশ' বাদে ৬৪টি পালার মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৯৯। স্থূল বিচারে শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যার সহিত গীত-সংখ্যার একটা অনুপাত হিসাব করিলেই পাঁচালীতে গীতের প্রাধান্য সম্বন্ধে কিছুটা মোটামুটি ধারণা হইবে।

পালার মধ্যে ছাড়া দাশরথি স্বতন্ত্রভাবে বহু গীত রচনা করিয়াছেন। পাঁচালীর আসরে এই জাতীয় ছুট গীত অর্থাৎ মূল পালার সহিত সম্পর্কবর্জিত গীত গাহিবার প্রথাও চালু ছিল। পালার প্রারম্ভে বন্দনাদি করিতেও ছুট গীত হইত। গৌরলাল দে সংস্করণে দশ খণ্ড পাঁচালীতে নানা রাগরাগিণীযুক্ত গীত নামে পাঁচটি সংগ্রহ আছে।[১] ইহাতে একটি পুনরুক্তি[২] বাদ দিয়া মোট গীতসংখ্যা ৭২। হরিমোহন 'বিবিধ সঙ্গীত' নাম দিয়া বিষয়ানুগ ভাগ করিয়া মোট ৬৮টি গীত দিয়াছেন এবং নূতন সংগ্রহে ১৬টি গীত সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া চতুর্থ সংস্করণ পরিশিষ্টে (পৃঃ ৭৩৬) আরও ৪টি গীত সংযোজিত হইয়াছে। এই হিসাবে হরিমোহনের মোট গীতসংখ্যা দাঁড়ায় (৬৮ + ১৬ + ৪ =) ৮৮।

গৌরলাল দের উক্ত ৭২টি গীতের অন্তর্গত এই দুইটি হরিমোহনের সংগ্রহে নাই : "উমাপদে যারে ও মন ভ্রমরা," এবং "ভবাম্বুধে ভয় কি ও মন আমার"।[৩] গীত দুইটিতে সুর-তালের উল্লেখ নাই এবং "কালী অকূলে কূল দেখিনে" এই গীতের সঙ্গে উহারা যুক্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন রজনীকান্ত সংস্করণেও অবিকল এই ভাবে উল্লিখিত আছে।[৪] কাজেই দাশরথির প্রাচীন সংস্করণে

১। ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১২, গীতসংখ্যা ১২২ ; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪, গীতসংখ্যা ১৯ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯, গীতসংখ্যা ১১ ; ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮, গীতসংখ্যা ২০ ; ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩, গীতসংখ্যা ১১।

২। "গিরিশরাণী, পরমেশানী" ইত্যাদি। ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭ এবং ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩।

৩। গৌরলাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯। ৪। সাঃ পঃ গ্রন্থসংখ্যা ৭৭৫৮।

যে ইহা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, বোধ হয় মুদ্রাকর বা লিপিকর প্রমাদে সুর তাল উল্লিখিত হয় নাই। "অন্তে পদপ্রান্তে যোরে রেখো"[১] এবং "আমায় কি শোনালি রে"[২]—এই গান দুইটি হরিমোহন চতুর্থ সংস্করণ বিবিধ সঙ্গীতে উল্লেখ না করিয়া যথাক্রমে নব সংগৃহীত গীতের মধ্যে[৩] এবং শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন পালাতে অতিরিক্ত নূতন অংশে[৪] উল্লেখ করিয়াছেন। "চলরে মানসরস বৃন্দাবনে"—এই গীতটিও[৫] হরিমোহন বিবিধ সংগ্রহে দেন নাই, ইহা তাঁহার অক্রূরসংবাদ (১) পালাতে সংগৃহীত হইয়াছে।[৬] "দিদি দিন তো পাব"—এই গীতটি হরিমোহন সংগ্রহে নূতন।[৭]

হরিমোহনের নবসংগৃহীত ১৬টি গীতের মধ্যে[৮] একটি "অন্তে পদপ্রান্তে" ইত্যাদি[৯] গৌরলাল দের নানা রাগরাগিণীযুক্ত সঙ্গীতের মধ্যে আছে।[১০] আর "জয়তি জগদীশ জগবন্ধু" গীতটি[১১] সত্যভামার ব্রত পালাতে আছে।[১২] কাজেই পুনরুক্ত হইয়াছে। সুতরাং "জয়তি জগদীশ" গীতটিকে এবং গৌরলালের সংগ্রহের "চলরে মানসরস" ইত্যাদি গীতটিকে গণনা না করা উচিত। আর পূর্ব গণনায় ধরা হয় নাই বলিয়া "অন্তে পদপ্রান্তে" ইত্যাদি এবং "আমায় কি শুনালিরে" ইত্যাদি গীত দুইটিকে গণনা করা উচিত। অতএব

১। গৌরলাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।
২। গৌরলাল, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪।
৩। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭১১।
৪। ঐ ঐ পৃঃ ৪৫২।
৫। গৌরলাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭।
৬। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৫৯, গৌরলাল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১২৬।
৭। হরিমোহন, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭০২।
৮। ঐ ঐ পৃঃ ৭১১—৭১৬।
৯। ঐ ঐ পৃঃ ৭১১।
১০। গৌরলাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।
১১। হরিমোহন ৪র্থ সং, পৃঃ ৭১৩।
১২। ঐ ঐ পৃঃ ২৫৪, গীত নং ক

নূতন সংগ্রহে নূতন গীত পাওয়া গেল ১৪টি। ইহা ছাড়া পরিশিষ্টে[১] গীত সংখ্যা চার।

সুতরাং বিবিধ সঙ্গীতের মোট গীতসংখ্যা দাঁড়াইতেছে (দুইজনের সাধারণ ৬৭+গৌরলালের নূতন ২+হরিমোহনের নূতন ১+নূতন সংগ্রহ ১৪+পরিশিষ্ট ৪+"অন্তে পদপ্রান্তে" ইত্যাদি এবং "আমায় কি শুনালিরে" ইত্যাদি এই ২=) ৯০টি। পালা ও বিবিধ সঙ্গীতসংগ্রহ লইয়া এই দুইখানি সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত দাশরথির সম্পূর্ণ গীতসংখ্যা দাঁড়াইতেছে (৭৫০+৯০=) ৮৪০টি।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে গীতগুলির পাঠ একরকম নহে। পাঠান্তর ছাড়া সুরতালেও বিভিন্নতা প্রচুর।[২] পরিশিষ্টে নির্বাচিত গীতের একটি সংকলন দেওয়া হইল।

দাশরথির সকল গীতে ভণিতা পাওয়া যায় না। তবুও তাঁহার ভণিতাযুক্ত গীতের সংখ্যা সামান্ত নহে। গৌরলালের ৫৬টি পালার ৬৩২ সংখ্যক গীতের মধ্যে ভণিতাযুক্ত গীতের সংখ্যা ৯৮টি অর্থাৎ একসপ্তমাংশের কিছু বেশি। গৌরলালের নানা রাগরাগিণীযুক্ত মোট ৭২টি গীতের মধ্যে ৪২টিতে ভণিতা আছে, ৩০টিতে নাই। হরিমোহনের পালাতে সংগৃহীত ৭৫৬টি গীতের মধ্যে ভণিতাযুক্ত গীতের সংখ্যা ১০৫। তাঁহার বিবিধ সংগ্রহের ৬৮টির মধ্যে ৪৩টি, নবসংগৃহীত গীতের ১৬টির মধ্যে ১৪টি, এবং পরিশিষ্ট ৪টির মধ্যে ২টি গীত ভণিতাযুক্ত।

বিভিন্ন সঙ্গীতসংগ্রহ গ্রন্থে দাশরথির গীত সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সঙ্গীতসারসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে এই সংগ্রহ সর্বাধিক। এইখানে মোট ৩০৩টি গীত সংকলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর

১। হরিমোহন ৪র্থ সং, পৃঃ ৭৩৬।

২। হরিমোহনের ৪র্থ সংস্করণ পাঁচালীর প্রস্তাবনার এই অংশটি দ্রষ্টব্য: "আমাদের প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রায় সমুদায় সঙ্গীতই উপরিউক্ত অধুনাতন প্রসিদ্ধ প্রবীণ পাঁচালী গায়ক মহাশয় গাহিয়া সুরতাল ঠিক করিয়া দিয়াছেন। দাশরথি রায় মহাশয় যে গান যে রাগতালে গাহিতেন, সেই রাগতালই উপরিউক্ত পাঁচালী-গায়ক মহাশয় বলাইয়া দিয়াছেন।" অনেক বিকলাঙ্গ গানও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। প্রস্তাবনা, পৃঃ ৯

গানে গীত-সংগ্রহ-সংখ্যা ২৮২টি। ইহাছাড়া প্রীতিগীতি, শাক্তপদাবলী প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থেও দাশরথির কিছু কিছু গীত সংগৃহীত আছে।

দাশরথি পাঁচালী সঙ্গীতে মোট ৯১টি সুর ব্যবহার করিয়াছেন।[১] যথা : অহং, অহংসিন্ধু, অহংবিভাস, আড়ানা, আড়ানাবাহার, আড়ানাবাগেশ্রী, আলিয়া, আলিয়াবিভাস, আলিয়ামিশ্র, ইমন, ইমনকল্যাণ, কানাড়া, কামোদ, কালাংড়া, কানাড়াবাহার, কানাড়াবাগেশ্রী, কানাড়াবসন্ত, কালাংড়াবাহার, কালাংড়া-পরজ, খট, খাম্বাজ, খটভৈরবী, খাম্বাজজয়জয়ন্তী, গাড়াভৈরবী, ছায়ানট, জয়জয়ন্তী, জয়জয়ন্তীমিশ্র, জয়জয়ন্তীমল্লার, ঝিঁঝিট, ঝিঁঝিটঅহং, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, ঝিঁঝিটরামপ্রসাদী, টোরী, দেশসিন্ধু, পরজ, পীলু, পরজবাহার, পীলুখাম্বাজ, পীলুবারোঙ্গা, বসন্ত, বারোঙ্গা, বাহার, বিভাস, বেহাগ, বসন্তবাহার, বাহারাদিজংলা, বাহারবাগেশ্বরী, বেহাগজংলা, বিভাসমিশ্র, বিভাসরামপ্রসাদী, ভৈরবী, ভঁয়রো, ভূপালী, ভঁয়রোললিত, ভঁয়রোরামকেলি, মঙ্গল, মূলতান, মল্লার, মিশ্রটোরী, মিশ্রছায়ানট, মিশ্ররামকেলি, মঙ্গলবিভাস, মূলতানকানাড়া, যোগিয়াললিত, ঝিঁয়ামল্লার, রামকেলি, রামপ্রসাদী, ললিত, লুম, ললিতভৈরবী, ললিতবিভাস, ললিতঝিঁঝিট, ললিতবসন্ত, লুমঝিঁঝিট, শ্রীরাগ, সরফরদা, সারঙ্গ, সাহানা, সিন্ধু, সুরট, সুহিনী, সাহানাবাহার, সিন্ধুখাম্বাজ, সিন্ধুভৈরবী, সুরট-আড়ানা, সুরটখাম্বাজ, সুরটমল্লার, সুরটজয়জয়ন্তী, সুহিনীবাহার। "বিবিধ গানে" কল্যাণ ও পূরবী সুর আছে।

দাশরথির গানে তাল ব্যবহার হইয়াছে মোট ২৫টি।[১] আড়া, আড়া-কাওয়ালি, আড়াখেমটা, আড়াঠেকা, একতালা, জলদএকতালা, কাওয়ালি, খয়রা, খেমটা, চৌতাল, ঝাঁপতাল, ঠেকা, ঠুংরি, তেওট, বিলম্বিত তেওট, তেতালা, ঢিমেতেতালা, ধামার, পঞ্চমসোয়ারী, পোস্তা, মধ্যমান, মধ্যমানঠেকা, ত্রিতালীয়মান, যৎ, রূপক।

সুরের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের অনুপাত এইপ্রকার : খাম্বাজ—১১৮; আলিয়া—৭৭; সুরট—৬২; ঝিঁঝিট—৫৮; বিভাস—৫৪। আর একটি করিয়া গীত আছে এই ২১টি সুরে : কল্যাণ, পূরবী, বিভাসমিশ্র, বিভাস-

১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ অনুসারে গণনা করা হইল।

রামপ্রসাদী, ভূপালী, মঙ্গল, মিশ্রটোরী, মিশ্রছায়ানট, মিশ্ররামকেলি, মূলতান-কানাড়া, যোগিয়াললিত, লুম্, ললিতভৈরবী, ললিতবসন্ত, শ্রীরাগ, সারঙ্গ, সাহানা, সাহানাবাহার, সুরটআড়ানা, সুরটজয়জয়ন্তী, সুহিনীবাহার।

তালের মধ্যে অধিকসংখ্যক ব্যবহারের ক্রম: একতালা—২৭৮; কাওয়ালি—১৬৭; যৎ—১২০; ঝাঁপতাল—৭১; পোস্তা—৬২। একটি করিয়া গীত আছে জলদ একতালা, বিলম্বিত তেওট, পঞ্চমসোয়ারীতে।

হরিমোহন বিবিধ সঙ্গীতকে ভাবানুযায়ী নয়টি শিরোনামায় বিভক্ত করিয়াছেন এবং উহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগণেশবিষয়ক—১; শ্রীশ্রীগঙ্গাবিষয়ক—৪; শ্রীশ্রীশ্যামাবিষয়ক—১৩; শ্রীশ্রীদুর্গাবিষয়ক—৩; শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিষয়ক—১; শ্রীশ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক—১; ব্রহ্মবিষয়ক—১; আত্মতত্ত্ববিষয়ক—৪২; ব্যঙ্গরঙ্গ—২। নূতন সংগ্রহ ও পারিশিষ্টের মোট (১৪+৪=) ১৮টি অশ্রেণীবদ্ধ গীতকে উক্ত প্রকারে ভাগ করিলে এই রকম দাঁড়ায়: গঙ্গাবিষয়ক—১; শ্যামাবিষয়ক—৪; দুর্গাবিষয়ক—১; কৃষ্ণবিষয়ক—৩; হরগৌরীবিষয়ক—১; সরস্বতীবিষয়ক—১; আত্মতত্ত্ববিষয়ক—৫; ব্যঙ্গরঙ্গ—২। গৌরলালের সংগ্রহের মধ্যে যে চারিটি নূতন গান বাকি থাকে উহাদের একটি গঙ্গাবিষয়ক, একটি রামচন্দ্রবিষয়ক, দুইটি আত্মতত্ত্ববিষয়ক শ্রেণীতে পড়ে।

পালার মধ্যে যে সব গীত আছে, তাহাদের অনেকগুলি এই শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তাহাছাড়া কতগুলি গীত এমন পদলালিত্যে ও ভাবগাম্ভীর্যে মধুর যে সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য। পরিশিষ্টে সঙ্গীতসংগ্রহে এইগুলি সংকলিত হইয়াছে। গীত সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ যথাস্থানে করিব।

চ

এইবার পালাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। অধিকাংশ উদ্ধৃতি গৌরলাল হইতে দেওয়া হইয়াছে। নূতন ও খণ্ডিত পালার পরিচয় হরিমোহনের বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণ হইতে দেওয়া হইল। নূতন পালা বাদে পাদটীকায় যে গীতসংখ্যা দেওয়া হইল, তাহাও গৌরলাল সংস্করণের অনুসারে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পাঁচালীর খণ্ড বিন্যাস অনুসারে

পালাপরিচয় দেওয়া হয় নাই। এইখানে বিষয়ানুগ ভাগ করিয়া এবং যথাসাধ্য ঘটনার ক্রমানুসারে সাজাইয়া পরিচয় উপস্থাপিত করিয়াছি। ইহাতে অনেকস্থলে, যেমন রামায়ণে, একটি সমগ্র কাহিনীর আভাস ফুটিয়াছে। যেস্থানে একই বিষয়ের দুইটি পালা আছে এবং তাহাদের মধ্যে বিবরণের পার্থক্য ছাড়া ঘটনার ইতরবিশেষ নাই, যেমন বামনভিক্ষা, সেখানে মূল একটি আশ্রয় করিয়া, যথাসম্ভব অন্যটির পরিচয়চিহ্ন রাখিয়া বিবৃত করিয়াছি।

আলোচনার ক্রম এই : ১। শ্রীকৃষ্ণচরিত ; ২। রামায়ণ ; ৩। অন্যান্য অবতারচরিত ; ৪। শিবশক্তিচরিত ; ৫। লৌকিক পালা ; ৬। মৌলিক পালা। 'গঙ্গা আনয়ন' পালা রামায়ণের মধ্যে দিয়াছি।

পালা পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণ চরিত

১। জন্মাষ্টমী[১]

"ব্রাহ্মণ মন্যু আশীর্বাদ, কালে ফলে হয় না বাদ।" ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলিলেন, "জন্মমৃত্যুহর হরি, লবেন তোমার জন্ম হরি, আজি হরির জন্ম কথা শোন"। কংসের অত্যাচারে গোরূপধারিণী পৃথিবীর সহিত ব্রহ্মা নিজেও ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

কংসের অভাব কি কোন কালেই হয়? "এখন বাঙ্গালাটা করিলে অংশ, দশহাজার জুটেছে কংস, অন্যদেশ ঐক্য করলে লক্ষ হতে পারে।" শুনা যায় এবারও নাকি পৃথিবী নানা স্থানে নালিশ জানাইয়াছিলেন; কিন্তু কোন ফল পান নাই। শিব কহিয়াছেন যে "কাশীতে ভূমিকম্প" হইয়া গেল, তাঁহার আর কি করিবার আছে। জগন্নাথ জানাইলেন, "একে আমার নাইক হাত, তাতে আমি অনাথ, অকূল সমুদ্র তীরে আছি"। গঙ্গা বলিলেন, যে সারা গায়ে তাঁহার চড়, "একশ মণের তরণী" চলিতে পারে না; কে জানে হয়ত স্বামীর মাথায় থাকার পাপের ফল ইহা। "বুঝি সেই পাপেতে শূলপাণি, দলে মিশায়ে কোম্পানী, লজ্জা দেন আমাকে।" "নইলে কাটি গঙ্গা করে তারা, ফিরিয়ে দেয় আমার ধারা, এ লজ্জা মলে কি আর ঢাকে?"

যাহাহউক, দৈববাণী হইল ঠাকুর দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মিবেন। কারাকক্ষদ্বারে প্রহরীরা নিদ্রা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল। যথাকালে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইলেন চতুর্ভুজ হইয়া, এবং বসুদেবকে আদেশ করিলেন, "নন্দালয়ে আশু আমারে রাখ।" বসুদেব চলিলেন, কিন্তু যমুনা পার হইবার উপায় কি?

কৈলাসে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিবদুর্গার আলোচনা হইল; এবং দেবী "জম্বুকী রূপে আসিয়ে দিলেন দরশন।" অতঃপর বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২—১৭০; গৌরলাল দে সংস্করণ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১—২২।

যোগমায়াকে লইয়া আসিলেন। "মতান্তরে এই বাণী, যশোদার গর্ভে ভবানী, আর গোলকনাথ জন্মিল। বৈকুণ্ঠের নাথ কোলে, বসুদেব যান যেই কালে উভয় অঙ্গ একত্র হইল।"

এইবার কংস আসিয়া যোগমায়াকে মারিতে উদ্যত হইলে দেবী আকাশে উঠিয়া বলিলেন, "তোরে নাশিতে সকুলে, ছল করে গোকুলে, আছে গোপকুলে নন্দগোপসুত।" ওদিকে নন্দালয়ে উৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। দেবতারা আসিলেন। জটিলা বলিল, ছেলে তো নয় "পোড়া কাষ্ঠ", "মেয়ে হইলে কেউ ছুঁতো না বিকানো হত ভার।" গর্গপত্নী জটিলাকে নিন্দা করিলেন।[১]

২। নন্দোৎসব[২] :

"যশোমতীর মন ভার।" নন্দ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া এক প্রচণ্ড ধমক খাইলেন। যশোমতী বলিলেন, "উত্তরকালে পুত্র বিনে কি হইবে গতি?" নন্দ তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার মত, "ভাই বন্ধু সুত দারা, মিথ্যা বলেছেন তারা, চক্ষু মুদিলে কেহ কারো নয়।" ইহা লইয়া কিছুক্ষণ কলহ হইল; পরে নন্দ পুত্রার্থে সস্ত্রীক যজ্ঞ করিতে রাজি হইলেন।

পুরোহিত আসিল মাণিক শর্মা। তাহার আত্মপরিচয়: "মুখে মুখে করাই শ্রাদ্ধ, মিনিট পাঁচ ছয় লাগে হদ্দ, ভুজ্জির চাল আনিতে যতক্ষণ। দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা, তাতে যায় না পণ্ডিত বুঝা, চণ্ডীপাঠে আমি একজন।" যজ্ঞ হইল। রাণী বর চাহিলেন, "কর মা পুত্র ধনে ধনী।"

কংসের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে। ("কিন্তু আর এক কথা বলি আগে, কংস এখন কোথায় লাগে, মুলুক যুড়ে সকলেই হল কংস। ফলে গেল সকল হিন্দুয়ানি, বিচার নাই আর পান পানি।...") দেবগণের প্রার্থনায়, "শ্রীহরি মথুরাতে হইলেন দেবকীনন্দন॥" "নন্দালয়ে জন্মিলেন গোস্বামীদের মতে। তার কিছু আভাস ব্যাস লিখিল ভাগবতে॥" অতঃপর বসুদেবের সাহায্যে

১। এই পালাতে মোট ১৫টি গীত আছে। সাধারণতঃ যাবতীয় উদ্ধৃতি গৌরলাল দে সংস্করণ হইতে গৃহীত হইবে।

২। হরিসাধন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭-৩০ এবং গৌরলাল দে সংস্করণ ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২১৪-২৩২।

শ্রীকৃষ্ণ ও যোগমায়া স্থান বিনিময় করিলেন। নন্দালয়ে উৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া কুটিলা বলিল, "এমন ছেলে দেখি নাই রাঢ়ে বঙ্গে।" গণক আসিয়া বলিল "শত্রু আছে পায় পায়, বিঘ্ন বড় হবে না তায়, সুলক্ষণ দেখা যায় কপালেতে আছে রাজদণ্ড।"[১]

৩। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা (প্রথম)[২] :

"রজনী প্রভাতে উঠি ব্রজরাখালগণ। সজ্জা করে পরস্পরে চরাতে গোধন।" তারপর তাহারা নন্দালয়ে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিল। যশোমতী কিন্তু কানাইকে ছাড়িতে রাজি হইলেন না; কারণ তিনি এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। বলাই ও রাখালগণ ভরসা দিয়া বলিল ভয় নাই, "কানাই আগে প্রাণকে পাছে ধরি।" ইহাতে রাণী বহু সতর্ক করিয়া 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া কানাইকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ চলিয়া যাইতেই রাণী মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া মাতাকে "মায়ায় মুগ্ধ" করিয়া গোষ্ঠে চলিলেন। গোপবধূরা মধুর ভাবে কৃষ্ণকে দেখিয়া বলিল, "ও কে যায় কালো মেঘের বরণ।"[৩]

৪। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা (দ্বিতীয়) বিদ্যাশিক্ষা[৪] :

প্রভাতে ছিদাম নন্দালয়ে ডাকিতে গেল কৃষ্ণকে। কিন্তু রাত্রিতে কৃষ্ণের ভাল ঘুম হয় নাই বলিয়া যশোদা কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গাইতে দিলেন না। গোধন যাহাতে গোষ্ঠে যায় তাহার জন্য ছিদামকে কৃষ্ণের চূড়া বাঁশী দিয়া সাজাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এই ফাঁকি ধরা পড়িয়া গেল, "ধেনু তৃণ নাহি খায়, হাম্বা রবে ঊর্ধ্বে চায়।"

১। এই পালাতে মোট ১৪টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩০-৩৪ এবং গৌরলাল দে সংস্করণ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২১-৩২৬।

৩। এই পালাতে মোট ৬টি গীত আছে।

৪। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণে, পৃঃ ৩৪-৪০ এবং গৌরলাল দে সংস্করণ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩-১৭১।

কৃষ্ণ জাগিয়াছেন। যশোদা তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিয়া "কুলের যাজন" করিতে বলিলেন। গুরুমহাশয়কে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া হাতেখড়ি দিয়া মাটিতে "গণেশ আকুড়ি ষড়াক্ষর" দিলেন এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিতে বলিলেন। নিজের স্ত্রীকে কি করিয়া প্রণাম করেন? কাজেই কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। রাগিয়া গুরুমশাই চলিয়া গেলেন। এমন ছেলের কি লেখাপড়া হয়? "গরু চরাবে গরুর টৌলে, সুরু করে দাওগে জাতের পুঁথি।"

ওদিকে রাখালগণ গিয়া নন্দকে সব জানাইয়াছে। নন্দ আসিয়া কৃষ্ণকে কেন গোষ্ঠে পাঠান হয় নাই জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে যশোদা ক্ষিপ্ত হইয়া নন্দকে কৃপণ ও মূর্খ বলিয়া গাল দিলেন। সকলে নন্দকে ঠকায় অশিক্ষিত বলিয়া। নন্দ উত্তর করিলেন যে গোয়ালা কখনও ঠকে না। ঠকা? "হাঁড়ি পুরে পুষ্করণী তামাম জল, দইয়ে দুধ রাখি কোথা?" ইহার পর কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠান হইল। পথে কৃষ্ণের পায়ে কাঁটা বিঁধিল, এবং তাহা তুলিতে গিয়া ছিদামের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল।[১]

৫। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও কালীয়দমন[২] :

প্রত্যুষে রাখাল সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন। বাঁশী শুনিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণসন্দর্শনে যাইবেন, কুটিলা আসিয়া বাধা দিল। রাধা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ। কুটিলা বলিল বটেই তো, রাখালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া, নন্দের বোঝা বওয়া, গোপীদের সঙ্গে নানা অপকীর্তি করা, ইহাই ত ব্রহ্মের কাজ! আসল কথা "যার সঙ্গে যার মজে মন সেই তার ইষ্ট।" শ্রীরাধা বিদ্রোহ করিলেন এবং "কাজ কি আমার গো কুল, কাজ কি আমার গোকুল" বলিয়া সখীদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

ওদিকে কালীদহের বিষবারি পান করিয়া রাখালগণ অচেতন হইয়াছিল; কৃষ্ণ তাহাদিগকে চেতন করিয়া নিজে কালীদহের জলে লাফাইয়া পড়িলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। নন্দ, যশোদা, রাধা সকলেই খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। ক্রন্দনে, চীৎকারে, আর্তনাদে গোকুল একেবারে আকুল

১। এই পালাতে ৮টি গীত আছে।

২। হরিমোহন ৪র্থ সং, পৃঃ ৪০-৪৭; গৌরলাল ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬-৩৫৫।

হইয়া উঠিল। কেবল জটিলা কুটিলা খুব খুসি; তাহাদের "আহ্লাদে পেট ফেটে উঠলো, আহ্লাদ ধরে না আর অঙ্গে।"

তারপর বলাই আসিয়া 'ভাই কানাই' বলিয়া ডাক দিতেই "চরণ প্রদান করি শ্রীহরি কালীয়র শিরে" উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যশোদা তখন সানন্দে "দক্ষিণ কক্ষে বলরাম, বাম কক্ষে ঘনশ্যাম"কে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।[২]

৬। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ[৩] :

শ্রীকৃষ্ণ কংসের অনুচর "অঘা, বকা, আদি বৎসাসুর" নাশ করিয়া আনন্দে "কভু সঙ্গে গোপীকার, কভু রাখালের সনে" লীলা করিতেছেন। একদা তিনি গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা আসিলেন ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে। ব্রহ্মা রাখাল ও গোধন হরণ করিয়া গিরিগুহায় লুকাইয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ সব জানিয়া "অঙ্গ হতে উৎপত্তি করেন রাখাল ধেনু।" লীলা অব্যাহত চলিল। ব্রহ্মা রোজ রাখাল ও গরুর জন্য খাবার জোগাইতে জোগাইতে অস্থির হইয়া উঠিলেন। এইবার গিয়া শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাহিলেন, "যে কু-কর্ম করেছিলাম, রাখাল, গো-পাল হরেছিলাম, দিয়ে হরি শরণ নিলাম চরণে একান্ত।"[৪]

৭। কৃষ্ণকালী বর্ণন[৫] :

"দিবসে বিবশা রাধা শুনি বংশীধ্বনি।" কৃষ্ণ দর্শনের জন্য ব্যাকুলা হইলেন রাধা। বৃন্দা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিল কারণ কুটিলা জানিলে আর রক্ষা নাই। কুটিলাকে তাহারা ডরায় "যেমন বাঘকে ডরায় ছাগল, জলকে ডরায় পাগল।" রাধা বলিলেন যে হরি তাহার রক্ষক, কাজেই তাহার ভয় নাই।

১। মোট ১০টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৭-৫৪; গৌরলাল সংস্করণ ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০-৩১৯।

৩। এই পালাতে মোট ১০টি গীত আছে।

৪। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫৫-৬৯; গৌরলাল দে সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১-১৫০।

শ্রীরাধাকে সাজাইতে গিয়া সখীরা দেখিল যে "কি মুক্তা কি মরকত, কি চম্পক বক বকুল" সকলই তাহার রূপের কাছে মলিন হইয়া যায়। রাধা তখন নিজের ভূষণ কি তাহা বুঝাইতে সখীদিগকে বলিলেন "ভূষণের ভূষণ আমি, আমার ভূষণ কৃষ্ণ।" সকলে কৃষ্ণ দর্শনে চলিল।

সংবাদ পাইয়া "কোপেতে কুটিলা ধরে রাধার দুটি বাহু। যেমন ব্যাধেতে হরিণী ধরে, চাঁদকে ধরে রাহু।" পশরা মাথায় নাই, সঙ্গে দূতী, বিকির বেলাও নয়, "বেঁধে মাথায় খোঁপা, তাতে চাঁপা মুচকি মুচকি হাসি", কোথায় চলিয়াছে রাধা? কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়াছে বুঝি? রাধা বলিলেন—"ননদি ছাড়িয়া দেহ। আমার প্রাণ হয়েছে অগ্রগামী মিথ্যা ধরিবে দেহ।" কারণ আমার "কৃষ্ণগত প্রাণ", আর "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম কিনা ইহা লইয়া কুটিলা তর্ক করিল। রাধা বলিলেন, "হায় ননদি তোর একি কর্ম, ধিক ধিক তোর জন্ম, হাতে রত্ন পেয়ে হারাইলে।" এই কথায় অঘটন ঘটিয়া গেল। কুটিলার দেহে সাময়িক ভাবে প্রেমোৎপত্তি হইল; সে রাধাকে যাইতে অনুমতি করিল।

রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। তারপর আরম্ভ হইল প্রণয়-কলহ। কে বেশী আত্মবিস্মৃত, রাধা না, কৃষ্ণ? কে বেশি ভক্তাধীন? কেন কৃষ্ণকে লোকে পিতা ও রাধাকে লোকে মাতা বলে না? কাল রূপের বিষম গুণ কি কি বিচার হইল। কৃষ্ণ বলিলেন যে হাজার হোক রাধা পরাধীনা, "প্রকৃতি রূপেতে তুমি থাক মোর বামে।" ইহা কৃষ্ণের গৌরব। রাধা বলিলেন, "তোমারই গৌরব বটে শ্যাম। তাইতে বলে অগ্রে রাধা পরে কৃষ্ণ নাম॥" আর "দক্ষিণে থাকিতে পারি, বামে রই কি সাধে। বাম হয়ে না থাকলে পরে কেবা কারে সাধে॥"

এদিকে কুটিলার আবেশ ছুটিয়া গিয়াছে। সে আয়ানকে-গিয়া বলিল, "শুনগো দাদা, শুনগো দাদা, তোমার কলঙ্কিনী রাধা" এই এই করিয়াছে। আর হইবে না কেন? "মেয়েমুখো যার পতি, মাগ হয় তার আত্মমতি।" শুনিয়া আয়ান রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া "কাট কাট শব্দে যায় বনে।"

রাধা আয়ানকে দেখিয়া বলেন "হরি, রক্ষা কর মোরে।" কৃষ্ণ অভয় দিয়া, "ত্যজিয়ে মোহন বাঁশী, হইলেন দক্ষিণে কালী মহাকাল পতিত পদতলে "

আয়ান ইহা দেখিয়া কালীস্তব করিয়া ধন্য ধন্য বলিয়া চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে রাখালগণ আসিয়া রাধাকুঞ্জে উপস্থিত হইল। শ্রীমতী বলিলেন, "সাধ পুরাতে সাধের বঁধু শ্যাম আমার আজি শ্যামা হল।"[১]

৮। গোপীগণের বস্ত্রহরণ[২] :

একদা রাধার কৃষ্ণ দর্শনের ইচ্ছা হইল। তিনি স্নান করিবার ছলে কৃষ্ণকে দেখিলেন এবং দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বলিলেন—"সই গো ডুবিলাম ঐ রূপ সাগরে। এই গোকুল নগরে কে আছে হেন সুহৃদ আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে॥" সখীদেরও এই অবস্থা। সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে চলিল। পথে বড়াই সকলকে "ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী ও ত্রিদিব আরাধ্যা" রাধার তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নবীনারা ইহা বুঝিবে না। তাহারা "সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপা, পুড়িয়ে খেয়ে সে সব দফা, নিধুর টপ্পা গেয়ে বেড়ায় পথে।" যাহা হোক বড়াই বুদ্ধি দিল কৃষ্ণ পতি পাইবার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করিতে।

"হেমন্তের প্রথম মাসে" কাত্যায়নী ব্রত করিয়া সকলে দেবীকে কালীকৃষ্ণ অভেদ বলিয়া স্তব করিল। কিন্তু "ভেড়াকান্ত নেড়াগুলো" এই তত্ত্ব বোঝে না। কি গুণ তাহাদের! "গৌরাঙ্গের কিবা দোহাই, ভাতার মলে বিধবা নাই, এক মেয়ে কত জামাই, বাবা মলে অশৌচ নাই, খোল বাজালেই শুচি।" যাহা হোক দেবী তাহাদিগকে মনোমত বর দিলেন। আনন্দে গোপীগণ তীরে বস্ত্র রাখিয়া দিগ্‌বসনী হইয়া যমুনায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইত্যবসরে কৃষ্ণ আসিয়া বস্ত্র হরণ করিয়া কদম্ব বৃক্ষে উঠিলেন।

স্নানান্তে গোপীরা তীরে শাড়ি না পাইয়া শোক করিতে আরম্ভ করিল। জামদানি, নাল্‌কে শাড়ি, মল্‌মল্ প্রভৃতি কত শাড়ি হারাইয়াছে। এমন সময় জলে প্রতিবিম্বিত কদম্ব বৃক্ষের উপর চোরের সন্ধান মিলিল। তখন সুরু হইল সাধ্যসাধনার পালা। কেহ ধর্মের দোহাই দিল, কেহ মধুর করিয়া ডাকিল

১। এই পালাতে মোট ১৮টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, প্রঃ ৬৯-৮২; গৌরলাল দে সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৯-৭৮।

বঁধু বলিয়া, কেহ শাসাইল কংসের কাছে নালিস করিবে, কেহ ভয় দেখাইল "পরনারীর পরনের বাস হরণের দায়ে সম্রমের দাবী" দিবে। কিন্তু কৃষ্ণ বধির ; তাঁহার বাঁশী বাজিতেছে, রাধা রাধা। গোপীরা বলিল যে তাহারা কৃষ্ণকে ধন, মন, জীবন, যৌবন সর্বস্ব দিয়াছে ; অথচ একি ব্যবহার তাঁহার ? কৃষ্ণ বলিলেন যে ইহা সত্য হইলে শাড়িগুলির জন্য তাহারা ব্যস্ত হইত না। "মনপ্রাণ যার আমার উপরে, সে কি কখনো বস্ত্র পরে, সে কি ধনি ঘরেতে করে ঘর ?" দৃষ্টান্ত যেমন "মম ভক্ত কৃত্তিবাস।"

বস্ত্র হরণের কথা গোপন থাকিল না। "মন্দ কথার গন্ধ পেলে অতি শীঘ্র ছোটে।" কুটিলা বলিল, "কুল ডুবালি অকূলে, শীলের গলায় বাঁধি শিলে, কুলেশীলে একত্র দিলি জলে।" আর কৃষ্ণ এমন কি একটা পাত্র যাহার জন্য কুলত্যাগ করা যায় ? "জ্ঞানবান, ধনবান, গুণবান, বলবান কোন বান আছে কানাইর ?"

রাধা জবাব দিলেন। বিশ্বের রাখাল শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছেন। "আমাদের চিত্তসকল, নির্মল গঙ্গাজল", "কূলের সৌরভ ছিল, সুগন্ধি চন্দন হইল", "ষোড়শদল হৃদিপদ্ম" প্রভৃতি পূজার উপচার হইয়াছে। এবং "বস্ত্র কি হরিলেন হরি, আমরাই বস্ত্র প্রদান করি ষোড়শ উপচারে বস্ত্র লাগে।" আর কৃষ্ণ জ্ঞানবান, গুণবান কিছুই নহেন যদি, "তবেত পেলেম নির্বাণ।" ডুবিয়া মরিতে বলিয়াছে কুটিলা ; না ডুবিলে কি মাণিক পাওয়া যায় ? রাধা ডুবিবে। "ননদিনি বল নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।"[১]

৯। শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ[২] ঃ

"দর্প ঘটে যার চিত্তে, সেই দর্প হরণ করতে দর্পহারী ব্রহ্ম সনাতন।" রাধার দর্প হরণ করিতে মনস্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন একটি মুক্তা চাহিয়া আনিতে। গোধন সজ্জার জন্য মুক্তা গাছ করিতে হইবে। শুনিয়া রাধা হাসিয়াই অস্থির। মুক্তার গাছ, রাখালের

১। ইহাতে ১৪টি গান আছে।

২। এই পালাতে মোট ১২টি গান আছে।

তো বুদ্ধি, হইবে না কেন ? শূন্যহস্তে ফিরিয়া গেল সুবল। তখন কৃষ্ণ মায়ের কাছ হইতে একটি মুক্তা চাহিয়া লইয়া রোপণ করিলেন ; এবং দেখিতে দেখিতে "যোজন পরিসর" মুক্তাগাছ জন্মিল। দেবতারা আসিলেন মুক্তাবৃক্ষ দেখিতে। এই আসা লইয়া কৈলাসে শিবদুর্গার এক পশলা ঝগড়া হইয়া গেল।

কৃষ্ণ চারদিন কুঞ্জে আসেন না। রাধা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সখীগণ সঙ্গে লইয়া গিয়া মুক্তা চয়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়া গোলক নির্মাণ করিয়া লক্ষ্মীসহ বসিয়া আছেন। পুরীর দ্বারে প্রহরা দিতেছে অষ্ট সখী সহ সপ্ত মায়ারাধা। মুক্তাবনের প্রহরীরা সখীগণের সহিত রাধাকে গ্রেপ্তার করিয়া "বেটিদের চুলে চুলে বেঁধে নে চলে রাই রাজার দরবারে।" এর চেয়ে অপমান হয় ? রাধা কাঁদিয়া কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। দ্বারে সপ্ত রাধা দেখিয়া তাঁহার অহংকার ঘুচিল। তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করিলেন। তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গেই মায়াগোলক শূন্যে মিলাইল এবং "কদম্ব তরুতলে" রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।[১]

১০। নব নারী কুঞ্জর (প্রথম):[২]

মুক্তার জন্য রাধার অপমানের কথাটা সকলেই শুনিয়াছে। ইহার বিহিত করিবার জন্য রাধা অষ্ট সখী লইয়া পরামর্শ করিলেন। "হব নব নারী এক দেহ।" নবনারী কুঞ্জর হইল। দেবতারাও দেখিতে আসিলেন।

এক প্রহর রাত্রে কৃষ্ণ কুঞ্জে আসিয়া একটি হস্তী মাত্র দেখিলেন, আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনি দৈববাণী শুনিলেন "কুঞ্জরী হও আরোহণ।" কৃষ্ণ আরোহণ করিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সখীরা চতুর্দিকে সরিয়া গেল এবং "হরি পড়েন ধরা পরে।" তারপর সামান্য রসালাপ ও মিলন। "কি শোভা হইল কুঞ্জে রাধা শ্যামে।"[৩]

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণের পৃঃ ৯০-৯৬, গৌরলাল দে সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭-৪০৬।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৮৩-৯০ ; গৌরলাল সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪২১-৪৩১।

৩। এই পালাতে মোট ১০টি গান আছে।

১১। নব নারী কুঞ্জর (দ্বিতীয়) :[১]

একদা শ্রীমতী স্থির করিলেন যে কুঞ্জর রূপ ধারণ করিবেন। উদ্দেশ্য "দেখি কৃষ্ণ কি করেন কুঞ্জায় আসিয়া।" নব নারী কুঞ্জর হইল। যথাকালে কৃষ্ণ আসিয়া দেখেন কেহই নাই, কেবল একটি হস্তী দাঁড়াইয়া আছে। কৃষ্ণ সন্দেহ করিলেন "এই বেটা দুষ্ট করী খাইয়াছে কমলিনী মোর।" তিনি হস্তীকে মারিতে উদ্যত হইলে সখীরা টিট্‌কারি দিয়া হাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণ লজ্জা পাইলেন। সখীদের অনুরোধে হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে খুঁজিতে লাগিলেন। দুইজনের চোখাচোখি হইল। তখন নামিয়া আসিয়া "ধরিল হরি শ্রীমতীর কর।" "মুহূর্তে ঘুচিল কুঞ্জর রূপ হইল নব নারী।"[২]

১২। রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন (প্রথম) :[৩]

"একদিন বৃন্দাবনে শ্যামকে পেয়ে সঙ্গোপনে" রাধা দুঃখ করিয়া বলিলেন যে কপাল গুণে "কৃষ্ণ ভজে কলঙ্কিনী রাধা।" কৃষ্ণ তখন প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "যাহোক সত্য করিলাম আজ কলঙ্কিনী নাম ঘুচাব তোমার ব্রজবালা।"

কৃষ্ণ বাড়ী গিয়া কপট মূর্ছায় শয্যা লইলেন। একেবারে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। অন্দরে স্ত্রীলোকের হাট বসিয়া গেল। একমাত্র জটিলা কুটিলা ছাড়া সকলেই গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই সময় নারদ আসিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব প্রচার করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্য রূপ ধারণ করিয়া চলিয়াছেন, বৃন্দা পথে তাঁহার সহিত নানা রসিকতা করিল।

কৃষ্ণ বলিয়া ভুল করিলেন বৈদ্যকে যশোদা। বৈদ্যহরি তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া রোগের ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন। সহস্রছিদ্র একটি মাটির ঘট আনিয়া বৈদ্য কোন সতী নারীকে দিয়া জল আনাইতে বলিলেন। সেই জল দিয়া অনুপান করিতে হইবে। কোন অসতী জল আনিতে পারিবে না, জল পড়িয়া

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৯৭-১০০।

২। পালাতে মোট ৪টি গান আছে।

৩। হরিমোহন সংস্করণ পৃঃ ১১১-১২৭ (কলঙ্কভঞ্জন (২)), গৌরলাল সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০- ৩৮০।

যাইবে। কুটিলা জল আনিতে গেল প্রথম। "যতবার কক্ষে তোলা রক্ষে হয় না এক তোলা, দুঃখে বক্ষে ধারা বেয়ে চলে।" তখন জটিলা আসিয়া মেয়ের মুণ্ডপাত করিয়া স্বয়ং গেল জল আনিতে। না পারিয়া বুড়ী বৈদ্যকে লইয়া পড়িল। "ছিদ্র ঘটে জল ভরা যেন আঁচল পেতে রৌদ্র ধরা, পাষাণের সত্ব করা, বসনে আগুন বেঁধে রাখা।" "মাতৃহস্তে ঔষধ বারণ," কাজেই যশোদা পারিবেন না। তবে আর কে আনিবে? বৈদ্য খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া দেখিলেন, "ব্রজে সতী আছে একজন ডাকে সকলে রাধা।" কুটিলা মাকে জানাইল, "পোড়াকপালে বৈদ্য কি বলছে!"

রাধা কৃষ্ণ স্তব করিয়া জল নিয়া আসিলেন। 'জয়রাধা' ধ্বনি উঠিল। কৃষ্ণ চেতনা পাইলেন। তখন রাণী "দক্ষিণ কোলেতে হরি, বাম কোলে লয়ে কিশোরী" উঠিয়া দাঁড়াইলেন।[১]

১৩। শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন (দ্বিতীয়)[২]:

শ্রীরাধা বলিলেন, "কৃষ্ণ কলঙ্কিনী সবে রহিয়াছে নাম। ইহার বিহিত যদি কর ঘনশ্যাম।" শ্যাম রাজি হইলেন। সেই রাত্রেই বাড়ীতে "কৃষ্ণের কপটেতে মূর্ছা হইল শয্যার উপরে।" ব্রজধামে ক্রন্দনের রোল উঠিল। রাধা কাঁদিতেছিলেন; এমন সময় দৈববাণী হইল "তোমার কলঙ্ক আজি করিব ভঞ্জন।"

বৈদ্যবেশে আসিয়া কৃষ্ণ নন্দগৃহে ঘোষণা করিলেন, "যে হও পরমা সতী এ ব্রজ মণ্ডলে। সহস্র ছিদ্র কুম্ভে বারি আন কুতূহলে!" কেহ জল আনিতে ভরসা পায় না। যশোদা জটিলার কাছে গেলেন। জটিলা কুটিলা খুব খুসিতে ছিল; "কৃষ্ণ মরেছে খুব হয়েছে, ঘুচে গেছে সব ব্যথা।" তবু "এই কর্ম করিলে সতী হব ব্রজপুরে।" এই লোভে দুই জনে জল তুলিতে আসিল। কিন্তু ফল হইল "কুম্ভ তুলিবা মাত্র বারি সব পড়ে চারিধারে!"

বৈদ্য তখন গণনা করিলেন। ছকে রাধার নাম উঠিল। কুটিলা বলিয়া উঠিল, "রাহুকে গ্রাস যদি করে দিবাকর। তবে রাধা সতী হবে শুন বৈদ্যবর॥"

১। ১৬টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ (কলঙ্কভঞ্জন (১)), পৃঃ ১০০-১১১।

তখন রাধা জল আনিতে গেলেন। "এক বিন্দু বারি নাহি পড়ে ধরণীতে।" কৃষ্ণ চেতনা পাইলেন। ব্রজে ধ্বনি উঠিল "রাধাসম সতী নাই।" রাত্রে আবার রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।[১]

১৪। মানভঞ্জন (প্রথম)[২] :

"বাসর সুসজ্জা করে না হেরিয়া বংশীধরে" শ্রীমতী অধৈর্য হইয়া কাঁদিতেছেন। বৃন্দে কৃষ্ণকে খুঁজিতে গেলেন। ওদিকে কৃষ্ণ পথে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আটকা পড়িয়াছেন। অন্ততঃ কিছুকাল আশা পূর্ণ করিবার প্রার্থনা কিছুতেই তিনি এড়াইতে পারেন নাই।

রাত্রি প্রভাত হইলে "শ্রীমতী বসিলেন মানে।" কালোর সংশ্রব রাধা ত্যাগ করিয়াছেন। "যতনে ঘুচাও যত কালো আভরণ। মুছাইয়া দাও বৃন্দে নয়নের অঞ্জন॥" কৃষ্ণ তখন অপরাধীর মত আসিতেছিলেন, দেখিয়া বৃন্দে বিদ্রূপ শর হানিল। বাঃ, চমৎকার চেহারা তো হইয়াছে কৃষ্ণের? "কে এমন দরিদ্র নারী ছিল ক্ষুধা ভরে। নিশুরে রেখেছে সুধা শ্যামসুধাকরে॥" নিরুপায় কৃষ্ণ বৃন্দেকে উপায় করিয়া দিতে বলিলেন। বৃন্দে প্রথমটা কৃষ্ণকে নির্গুণ, অমানুষ, অযোগ্য ইত্যাদি বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া শেষে তাঁহাকে রাধার কাছে লইয়া গেলেন। রাধার চরণ ধরিলেন কৃষ্ণ, কিন্তু রাধা তবু "না দেন ভঙ্গ মানে, না চান ত্রিভঙ্গ পানে।" ইহাতে বৃন্দে চটিয়া বলিল, "কিছুরই অতি ভাল নয়, অতিশয় মানে তোমার হবে মান শূন্য।"

কৃষ্ণ বৃন্দেকে বলিলেন তাঁহাকে যোগী সাজাইয়া দিতে, তিনি শ্রীমতীর মান ভিক্ষা করিয়া লইবেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দে কৃষ্ণকে যোগীবেশে সাজাইলেন; যোগী কৃষ্ণ গিয়া রাধা-কুঞ্জে হাঁকিলেন 'রাম রাম'। শ্রীমতী তণ্ডুল লইয়া আসিলেন কিন্তু যোগী ভিক্ষা না নিয়া বলিলেন, "এসেছি হে যে ভিক্ষার তরে। প্রতিজ্ঞা করেন রাই তবে আমি ভিক্ষা চাই, না দেন তো যাই অন্য দ্বারে॥" এ কেমন যোগী যে আগে প্রতিজ্ঞা করাইতে চায়?

১। এই পালাতে মোট ১৩টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১২৮-১৪০ এবং গৌরলাল দে সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯-৩৫৬।

কৃষ্ণকে ডাকিতে হয়। তখন রাই "মাধবের অন্বেষণে বসিলেন সিংহাসনে" এবং দেখিলেন "যোগীবেশে হরি দ্বারে।" অমনি "রাধা কাঁদেন মান পরিহরি, শ্রীমান কৃষ্ণেরে হেরি, বিমন ঘুচিল মনোমাঝে।" রাধা কৃষ্ণের মিলন হইল।[১]

১৫। মানভঞ্জন (দ্বিতীয়)[২] :

পায়ে ধরিয়াও যখন শ্রীমতীর মান ভাঙ্গাইতে পারা গেল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ বিপদ গণিলেন। বৃন্দে বলিল যে শ্রীমতীর কাছে গেলে এখন মান তো দূরের কথা, প্রাণই থাকিবে না। এমন সময় শ্যামা সখী আসিল কাঁদিতে কাঁদিতে; কালো বলিয়া রাধা শ্যামাকেও তাড়াইয়া দিয়াছেন। কালো মেয়ের দুর্গতি পদে পদে। "এদের বাপমায়ে মরে ভাবিয়ে, কালো মেয়ে কেউ করে না বিয়ে, ঘুষ দিলে পর ভাগ্যবন্ত লোকে।" "কেবল যারা জেতে হীন, হীনগোত্র, অথবা প্রাচীন পাত্র এরাই মাত্র কালো মেয়ে নেয়।"

বৃন্দে কৃষ্ণের পক্ষে ওকালতি করিতে গিয়া রাধার রাগ আরো বাড়াইয়া দিল। সে ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে বলিল, "রাধা হয়েছেন কালীমূর্তি।" বর্ণনা,—"যদি বল ওহে হরি, কালী যে তিনি দিগম্বরী, সেরূপ কি রূপ ধরেন কিশোরী। শুন ওহে পীতাম্বর, ত্যাজ্য করি পীতাম্বর, দাঁড়ায়ে আছেন হয়ে দিগম্বরী।" কৃষ্ণ বৈরাগী হইতে চাহিলেন। বৃন্দে মানতত্ত্ব বুঝাইয়া, তাঁহাকে আর একবার যোগী বেশে সাজাইল। কিন্তু সখীরা কৃষ্ণকে ঢুকিতে দিল না কুঞ্জে। কারণ একে "যোগী মাত্রেই অবিশ্বাসী", তদুপরি "এ যোগীর নারী-গন্ধ-গায়।"

কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া বৃন্দেকে কহিলেন, তাঁহাকে নারী বেশে সাজাইয়া দিতে। ইহা লইয়া অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে কে সুখী, কে দুঃখী এই প্রশ্নে কৃষ্ণ ও বৃন্দায় এক পশলা ঝগড়া হইয়া গেল। তারপর কৃষ্ণকে নারী বেশে সাজান হইল। বিদেশিনী বেশে কৃষ্ণ রাধাকুঞ্জে চলিলেন। ওদিকে রাধার মান ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শ্যামাঙ্গিনী

১। এই পালাতে মোট ১৫টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৪০-১৫৮, এবং গৌরলাল দে সম্পাদিত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০১-১২৪।

বিদেশিনীকে রাধার নিকটে লইয়া আসা হইল। রাই দেখিয়াই চিনিলেন, বলিলেন, "এমন কাল রূপ আর সংসারমাঝে নাই অন্য। নাই আর এমন বাঁকা নয়ন, আমার বাঁকা সখা ভিন্ন।" তারপর নানা কৌতুক আলাপ ও মিলন।[১]

১৬। অক্রূর সংবাদ (প্রথম)[২] ঃ

নারদ আসিয়া কংসকে বুদ্ধি দিলেন, "কর ধনুর্ময় যজ্ঞ নিমন্ত্রিয়ে এনে বধ হরি।" এই উদ্দেশ্যে পত্র দিয়া অক্রূরকে নন্দালয়ে পাঠান হইল। পত্র পাইয়া নন্দ উপানন্দকে দিলেন ; উপানন্দ দিল আত্মারাম ঘোষকে। সবাই নিরক্ষর। গর্গ মুনি আসিয়া পত্র পড়িয়া দিলেন। আনন্দে নন্দ তখনই পুত্রদ্বয়কে বলিলেন, "পর ধুতি কর কোঁচা, ধড়া চূড়া ছাড় বাছা," রাজদর্শনে যাইতে হইবে। কিন্তু যশোদা বাধা দিলেন। "বলে নিমন্ত্রণ পেয়েছ, তুমি যাও কর্তা আছ," গোপালকে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইবেন এই সংবাদ রটিয়া গেল। জটিলা-কুটিলা খুব খুসি হইল। রাধা এই খবর শুনিয়া চেতনা হারাইলেন, পরে জ্ঞান লাভ করিয়া সকলে মিলিয়া গিয়া অক্রূরের রথচক্র ধরিয়া দাঁড়াইলেন। অক্রূরকে তিরস্কার করিয়া গোপীগণ কৃষ্ণকে কহিল, "যদি সাঙ্গ কর ব্রজের লীলা শ্রীরাধারমণ। তবে কেন বাঁশীতে রাধার হরে নিলে মন॥" রাধাকে প্রবোধ দিয়া কৃষ্ণ যমুনাতীরে গেলেন। সেখানে জলমধ্যে অক্রূরের কৃষ্ণদর্শন হইল।

মথুরা। পোষাক বদলের জন্য কৃষ্ণ কংসের রজকের কাছে কিছু বসন চাহিলেন। রজক উত্তর করিল, "ওরে নন্দের অঙ্গজ, ব্যাং হয়ে চাও ধরতে গজ, ষাট টাকা সাটিনের গজ সাধ করেছ পরতে।" ইহাতে কোপে কৃষ্ণ তখনি "করে কাটিলেন তার মাথা।" তারপর ভক্তিমান তাঁতীর নিকট হইতে বস্ত্র পরিধান করিয়া দুই ভাই মালাচন্দন পরিতে অভিলাষী হইলেন। হেনকালে রাজসভায় "চন্দন লয়ে দিতে যায় কুবুজা কুরূপা কংসের দাসী।" কৃষ্ণ তাহাকে

১। মোট ১৭টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৮-১৭২, এবং গৌরলাল দে ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫-১৪৪।

সুন্দরী বলিতেই কুব্জা রাগিয়া গেল, "আমার বয়স তের চৌদ্দ, তা নইলে পনর হদ্দ, বিধির বিপাকে যৌবনেতে বুড়ী।" কৃষ্ণ কমলহস্তের স্পর্শে তাহাকে সুরূপা করিয়া কংসপুরে প্রবেশ করিলেন; এবং চাণুরাদিকে বধ করিয়া "কংসেরে পাঠান যমপুরে।" অতঃপর বসুদেব ও দেবকীর বন্ধন মোচন করিলেন।[১]

১৭। অক্রুর সংবাদ (দ্বিতীয়)[২]:

অক্রূর বৃন্দাবনে আসিয়া কৃষ্ণকে বসুদেব ও দেবকীর দুঃখের কথা বলিলেন। কৃষ্ণের "শুনে দুঃখ পিতামাতার বহে চক্ষে শত ধার।" নিমন্ত্রণের কথায় যশোদা আপত্তি করিলেন, "নন্দরে কি কব হায়, বৃদ্ধদশায় বুদ্ধি যায়, আজন্ম কি আমারে কাঁদাবি?"

"হেথায় মদন কুঞ্জে প্রভাত যামিনী।" রাধা কৃষ্ণকে শয্যায় না দেখিয়া নিদ্রাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। "সোহাগের তরণী মাঝে, রেখে প্রাণ ব্রজরাজে, আনন্দ সাগরে করি খেলা। ওরে নিদ্রা তুই আসিয়ে, দুর্যোগ পবন হইয়ে, ডুবাইয়া দিলি রসের ভেলা॥" কৃষ্ণ যাইবেন শুনিয়া জটিলা-কুটিলা খুব আনন্দ করিল; এবং পাছে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে যায় এই আশঙ্কায় কুটিলা রাধার কাছে গিয়া "দুটো আলগা প্রবোধ" দিতে "চক্ষে আঙ্গুল দিয়া কাঁদিয়া" বলিল "কান্দিস নে আর ঘরে আয়, ঘরকন্না কর বজায়, পরকে যতন করা কেবল বৃথা।" শ্রীমতী ছুটিয়া চলিতেছিলেন, দৈবে কৃষ্ণের পদচিহ্ন পথের মধ্যে দেখিয়া বিলাপ করিলেন। পরে সকলে রথচক্র ধরিয়া কৃষ্ণের যাত্রায় বাধা দিল। কৃষ্ণ বলিলেন, "অচিরাতে আসিব সই, কি ধন কিশোরী বই, অমঙ্গল রোদন কি জন্য।"

যাহা হোক মথুরা গিয়া কৃষ্ণ নিশিযোগে দেবকীর বন্ধন মুক্ত করিলেন। পরদিন সকালে রজকের "হাতে মাথা কাটিলেন।" "হাতে-মাথাকাটা-ছেলে" আসিয়াছে শুনিয়া প্রজারা গিয়া রাজার কাছে নালিশ করিল। কৃষ্ণ ও

১। এই পালাতে মোট ১৬টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭২-১৮৫ এবং গৌরলাল দে সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১-১৬৮।

বলরাম তাঁতীর কাছ হইতে বসন পরিয়া মালাকার ভবনে গেল। পথে কুব্জার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। "আষ্টে পিষ্টে ঢিপি ঢাপা আট দিকে আট বেঁক। পেটটি ডোঙ্গা, শতেক ভাঙ্গা যেন গাঙ্গের টেক ॥" কৃষ্ণ তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী করিয়া দিলেন। অতঃপর সভাস্থলে গিয়া "কংসের কেশে ধরি বসি বক্ষঃস্থলে তাঁহাকে নিপাত" করিলেন। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গোকুল ত্যাগ করিয়া "পাদমেকং ন গচ্ছতি," কাজেই "বিরাজে ব্রজে রাধা শ্যামে। রাধে কোটি চন্দ্র সাজে কালো জলদের বামে ॥"[১]

১৮। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলা (প্রথম)[২]

"রাধার মানে হারায়ে মান, বিরহানলে ভগবান, বৃন্দাবন পরিহরি মধুপুরী করেন গমন।" "মথুরাতে পেয়ে রাজত্ব, ভুলিয়ে সকল তত্ত্ব, প্রবর্ত হয়েছেন কুব্জা প্রেমে।" ওদিকে মানভঙ্গে রাধা কৃষ্ণকে না দেখিয়া "বনদগ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায়" বিলাপ করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে চেতন করাইয়া "প্রবোধ বাক্যে কহে বৃন্দে মধুপুরে শ্রীগোবিন্দে আনতে আমি চলিলাম তবে।"

যমুনাতে তুফান উঠিয়াছে, তাহাতে হাতে কড়ি নাই, তবু বৃন্দে নাবিকের সঙ্গে কলহ করিয়াই পার হইয়া গেল। তারপর মথুরার সভায় গিয়া প্রথমে বৃন্দাবনের দুরবস্থা ও রাধার দুর্দশার বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিল। "শয়নে ভাল নূতন শয্যা, মন খুসি হয় নূতন ভার্যা, নূতন দ্রব্য খেতে লাগে মিষ্ট। তাইতে এখন নূতন প্রেমে মজেছ হে কৃষ্ণ ॥" কিন্তু নূতন জিনিসে দোষও অনেক "যোগ জানে না নূতন যোগী, আহার পায় না নূতন রোগী, নূতন শোক প্রাণনাশক হয়। মান রাখে না নূতন ধনী, দায়মাল হয় নূতন খুনী, গুণমণি নিত্য নূতন কীর্তি ভাল নয় ॥" পক্ষান্তরে, পুরাতনের গুণ অনেক। "পুরাতন লোকের কথা মান্য, পুরাতন চালে বাড়ে অন্ন, পুরাতন কুষ্মাণ্ড-খণ্ড অমৃত সমান ॥" কাজেই "পিরীত আছে কি পুরাতনের বাড়া ?"

১। এই পালাতে ১৪টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৮৫-১৯৮, এবং গৌরলাল দে সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩-২৫০।

'রাধা' নাম শুনিয়াই কৃষ্ণ আকুল হইয়া উঠিলেন। "কৃষ্ণ কন হল ভার জীবন ধারণ। জলে স্থলে রাধা রূপ করি দরশন॥" কিন্তু ব্রজে যাইতে তাঁর আর সাধ নাই। কারণ ব্রজে গোচারণ করিতে হয়, উচ্ছিষ্ট খাইতে হয়, রাধার মান ভাঙ্গাইতে হয়। ইহা লইয়া বৃন্দের সঙ্গে ঝগড়া হইয়া গেল। তার পর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গেলেন। রাধা কৃষ্ণের কিছু রসালাপের পর রাধা বলিলেন "বিশেষ প্রেমের শেষ আমি না চাই। রেখো শেষ হৃষীকেশ, শেষ যেন তোমায় পাই॥" তার পর "শ্যাম বিনোদিনী বিরাজেন সিংহাসনে।"[১]

১৯। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলা (দ্বিতীয়)[২]:

বৃন্দে গিয়া মথুরায় কৃষ্ণকে বলিল যে মথুরা ও গোকুল একই প্রকার হইয়াছে। "মথুরায় কাল রাজা হয়েছে গুণমণি। গোকুলে কাল রাজা হয়েছে এদানি॥" গোকুল অন্ধকার "সূর্যের সুত শমন, গোকুল এখন তারি অধিকারে।" কৃষ্ণ বলিলেন, অন্ধকার কেন? রাইচাঁদ তো ব্রজে আছে, "যে চাঁদ চাঁদের দর্প নাশে।" বৃন্দে জবাব দিল রাইচাঁদ এখন "বিচ্ছেদরাহুগ্রস্ত।" ইহার পর বৃন্দে নূতনের নিন্দা ও নানা শ্লেষবাক্য বলিয়া কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে যাইতে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ নানা ওজর আপত্তি তুলিলেন। "রাধা তিলে তিলে করেন মান, ঘুচায়ে আমার মান, ধরতে হয় পদ পদে পদে।" বৃন্দে চটিয়া গিয়া দাসখৎ দেখাইয়া বলিল, "এই দেখ মোর হাতে খত, তোমারই হাতের দস্তখত, ঢেরা সই বটে কি না বটে।" কৃষ্ণ বলিলেন যে উহা জাল খত। বৃন্দে তখন নানা প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিল, "ও কথা রবে না সখা, আর কারো নয় তোমার লেখা, যা লিখেছ খণ্ডিবার নয়।" যদি কৃষ্ণ বলেন, যে লেখার ভোগে নিজে আমি ভুগিনে, তাহাও অবিশ্বাস্য, কারণ অদৃষ্ট না হইলে কুব্জার মত নারী তাঁহার ভাগ্যে জুটিবে কেন? আহা মরি, কি রূপ! "নাক দেখে লুকায় পেঁচা, নয়নের দেখে ধাঁচা বিড়াল বিরলে কাঁদে বসে। ধনীর ধ্বনি শ্রবণ করি, গাধা হল দেশান্তরী, মেঘের সঙ্গেতে ধনী মেশে॥"

১। এই পালাতে মোট ১৫টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৯৮-২২১, এবং গৌরলাল দে সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১-৩৯৬।

এবার বৃন্দে আসল কথা পাড়িল। "শ্রীমতী বসে আছেন চিতা সজ্জা করি।" সব কিছু বিলাইয়া দিয়াছেন। "বিদ্যা নিলেন সরস্বতী, বুদ্ধি নিলেন বৃহস্পতি," সব দিয়া কেবল "জীবন রেখেছেন তোমার জন্য"। কৃষ্ণ অসুবিধার কথা বলিলেন, "পারি না দুই নারী স্বীকার করতে।" বৃন্দে নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিল যে কোন অসুবিধা হইবে না; কারণ "তোমার এই যে দুই নারী, যেমন কুব্জা, তেমন প্যারী, এরা মাটির মেয়ে, খাঁটি সোনাতে তৌলি।" কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে তিনি মথুরায় অংশ রূপে আসিয়াছেন, আসলে বৃন্দাবনেই আছেন। বৃন্দে দেশে ফিরিয়া দেখিল, "কি শোভা কমলিনী শ্যাম সনে।"[১]

২০। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলা (তৃতীয়) বা দূতী সংবাদ ঃ[২]

কৃষ্ণ "গোকুলবাসীরে ফেলে, বিরহ সমুদ্র জলে," মথুরায় গেলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে খেদে, অষ্ট সখী মধ্যে রাধে, অষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত ভূমিতলে।" বৃন্দে বুদ্ধি দিল, "বিনা দৈব আরাধন, না হয় কার্য সাধন" অতএব কৈলাসবাসিনী কালীকে আরাধনা করা দরকার। তাহাই করা হইল। দেবী বর দিলেন, "পীতাম্বর আসিবে গোকুলে।" বৃন্দে মথুরা গিয়া কৃষ্ণকে খোঁজ করিতে লাগিল। শেষে "হৃষিকেশে রাজবেশে দেখে ব্রজাঙ্গনা। নির্ভয় নির্দয় বলি করিছে ভৎর্সনা॥" অতঃপর "দূতীবাক্যে দুঃখিত হইয়া দয়াময়। নিদয় শরীরে হইল প্রেমের উদয়।" এবং "গোকুলে উদয় হরি গোকুলের চন্দ্র।"[৩]

২১। নন্দ বিদায় ঃ[৪]

কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ কারাগারে পিতামাতাকে উদ্ধার করিতে গেলেন। একটি বৃদ্ধ কারারক্ষী ভাল কার্য প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ তাহাকে

১। এই পালাতে মোট ১৫টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২১১-২১৫, গৌরলাল দে সংস্করণ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭-৩৩৩।

৩। এই পালাতে মোট ৮টি গান আছে।

৪। হরিমোহন ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২১৫-২২৬, গৌরলাল দে সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০-৩৩৪।

অন্য কারা খুঁজিতে বলিলেন। দ্বারী বলিল, "কারাগার থেকে আবার কারাগারে বললে যেতে, গেলে সেই কারাগারে, কারাগারে হবে যেতে॥" বসুদেব দেবকী কৃষ্ণকে স্তব করিলেন। কৃষ্ণ মা বলিয়া দেবকীকে মায়ায় বদ্ধ করিয়া বসুদেবকে বলিলেন—নন্দকে বিদায় করিতে। বসুদেব নন্দকে বলিলেন "পিতা সত্য বটে মানি, আমি তো কেবল উপলক্ষ মাত্র। তোমার স্নেহে প্রতিপালন, তোমার গৃহেতে রন, তোমারি এখন প্রিয়পাত্র॥" এই সকল কথা শুনিয়া নন্দ প্রথম অচেতন হইয়া পড়িলেন, পরে চেতনা পাইয়া 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাখালরা কাঁদিতে লাগিল।

কৃষ্ণ আসিলেন এবং "বসিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায়া।" পুত্র কোলে করিয়া নন্দ গৃহে চলিলেন। "সকল ব্রজবাসীদের হৃদয় নিত্যানন্দ-ময়" হইল। কৃষ্ণ নন্দকে নানা উপহার ও প্রবোধ বাক্য দিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের মায়াতে মায়াও যেন পরাস্ত হইল। নন্দ ও সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিলেন। যশোদা দ্বারে অপেক্ষা করিতে ছিলেন। নন্দ তাঁহাকে সব কথা বলিয়া জানাইলেন যে কৃষ্ণ তাঁহার পুত্র নহে, আর যদি হয়ও, তবু সে "কিঞ্চিৎ ননী তরে" আসিবে না কারণ, "মথুরায় অতুল সম্পদ হল তার।" রাণী শোক করিতে লাগিলেন।[১]

২২। উদ্ধব সংবাদ ঃ[২]

বিরহ তাপে শ্রীমতীর সঙ্কটজনক অবস্থা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠাইলেন। উদ্ধব আসিয়া দেখেন, "বিনা সে কেশব সবে যেন শব হয়ে আছে ব্রজপুরে।" কে আসিল ব্রজে? "উদ্ধব মাধবে প্রভেদ অবয়ব নাই ভেদাভেদ।" সকলে গিয়া রাধাকে জানাইল কৃষ্ণ আসিয়াছেন। শ্রীমতী আসিয়া বলিলেন "সেই অবয়ব, এ তো নয় মাধব।" তাঁহার চক্ষে ফাঁকি ধরা পড়িল। বৃন্দার প্রশ্নে তখন উদ্ধব আত্মপরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য বলিল। বৃন্দে উদ্ধবকে রাধার অবস্থা দেখাইল। উদ্ধব বলিল, "মাধব

১। এই পালাতে মোট ১২টি গান আছে।

২। হরিমোহন, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২২৬-২৩৪ ; গৌরলাল দে, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫-৩৪৫।

কাতর ঐ ধারাই, রাই রাই বিনা নাহি মুখে।" বৃন্দে তখন কৃষ্ণের বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, এবং ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে কটূক্তি ও সন্দেহ প্রকাশ করিল। তাহাদিগকে ধৈর্য ধারণ করিতে বলিয়া উদ্ধব নন্দপুরে প্রবেশ করিল। যশোদাও তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করিলেন। উদ্ধব আসিয়া কৃষ্ণকে বলিল, "ব্রজে সকলের প্রাণ মাত্র আছে।" কৃষ্ণের উচিত একবার যাইয়া প্রবোধ দান করা।[১]

২৩। রুক্মিণী হরণঃ[২]

"বাজায়ে দোকাঠি" নারদ দ্বারকা গিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "গৃহে নাই ভার্যা আছ কি সৌভার্যা, যথারণ্য তথা গৃহ।" কারণ "দ্রব্য নাই তার মাচা, রূপ নাই তার নাচা, গৃহিণী নাই তার গৃহ," একই রকম বেমানান। অতএব "প্রকৃতি আন হে বামে।" কৃষ্ণ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

বিদর্ভপতি ভীষ্মক কৃষ্ণগুণ শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন "আমাদের রুক্মিণী কন্যা তারে করি দান।" রুক্মিণীর অবস্থা, "শুনে নাম আঁখি ঝরে"। এই সময়ে নারদ আসিয়া কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রাজা সানন্দে সম্মত হইলেন। কন্যা দেখা ও বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া গেল। পরদিন প্রাতে "আইবুড় ভাত" হইল। কিন্তু বাধা দিলেন "রুক্মি আদি চারি পুত্র।" তাঁহাদের মতে এই মিলন "যেন দাড়িম্বে আর মাকালে।" পিতার "বৃদ্ধদশায় বুদ্ধি যায়।" কাজেই পিতার অমতে তাঁহারা ভগ্নীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন।

এই কথা শুনিয়া রুক্মিণী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দিয়া কৃষ্ণকে পত্র দিলেন। এই বেহায়াপনা দেখিয়া সখীরা ছি-ছি করিতে লাগিল। রুক্মিণী কহিলেন, "মরি কিংবা মন্ত্রের সাধন গো।" ব্রাহ্মণের এই দৌত্য প্রসঙ্গটি অপূর্ব। দ্বারকাতে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হইল। ব্রাহ্মণের মর্যাদা অসাধারণ। তাই তাঁহাকে প্রচুর আহারাদির দ্বারা তুষ্ট করাইয়া একেবারে, "পদ্মহস্তে পদসেবা করেন পদ্মনাভ।" কিন্তু এখন আর ব্রাহ্মণের এমন আদর করে কে?

১। ইহাতে ১৩টি গান আছে।

২। হরিমোহন, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৩৪-২৩৫; গৌরলাল দে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯-১৭৩।

যাহা হোক পত্র পাইয়া কৃষ্ণ বিদর্ভ যাত্রা করিলেন। রথে চড়িয়া ব্রাহ্মণ "কেঁদে বলে তুমি রথ আনিলে কোথায়। ওহে কৃষ্ণ অবশেষে প্রাণটা বুঝি যায়॥" ব্রাহ্মণের লোভ ছিল অপরিসীম, কৃষ্ণ তাঁহাকে কিছুই দিলেন না বলিয়া মনে ক্ষোভ লইয়া গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার বাড়ির কাছে এক বিরাট প্রাসাদ উঠিয়াছে। সালঙ্কারা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না।

কৃষ্ণ বিদর্ভে রওনা হইলেন একাই। "ভায়া বড় অভদ্র শত্রু মাঝে একা যান তিনি"—এই মন্তব্য করিয়া বলভদ্রও পেছনে গেলেন। স্বয়ম্বর সভায় রাজবৃন্দ বসিয়া ভীষ্মকের বিচার বুদ্ধির নিন্দা করিতেছিলেন। যেমন "ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষেন কাক। ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব ইতু পূজায় ঢাক।" "তেমনি রুক্মিণীকে দিতে চান নন্দের বেটা রাখালে।" এই সময়ে রুক্মিণীহরণের সংবাদ আসিল, কিন্তু বলভদ্রের উপস্থিতির কথা জানিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি কেহই যুদ্ধে গেলেন না। নারদের বুদ্ধিতে শিশুপাল ডুলিতে চড়িয়া দেশে ফিরিলেন এবং বরকন্যা অভ্যর্থনা করিতে আগত জনতার কাছে লজ্জা পাইলেন। ওদিকে রুক্মি বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কেশ মুড়াইয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং দ্বারকাতে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল।[১]

২৪। সত্যভামার ব্রত ঃ[২]

একদা নারদ কৃষ্ণকে একটি পারিজাত দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা রুক্মিণীকে দিলেন। ইহাতে সত্যভামার অভিমান হইল। কৃষ্ণ পারিজাত হরণ করিয়া তাহার মান ভাঙ্গাইলেন। এই ভাবে প্রথমটা মিটিয়া গেল।

"একদিন পুনর্বার বৃথা দ্বন্দ্ব বাঁধাবার" চেষ্টায় "নারদ তথা যান।" সত্যভামা বলিলেন যে স্বামীর উপর তাঁহার একচ্ছত্র অধিকার। কিন্তু নারদ তাহা বিশ্বাস করিলেন না, পরন্তু স্বামীকে বশে রাখিবার জন্য পুণ্যক ব্রতের উপদেশ দিলেন। "সেই ব্রতের বিধি লিখেছেন বিধি দক্ষিণায় পতিদান। আছে ব্যবস্থায় পুনর্বার লবে তায় স্বর্ণেতে করি সমান॥" সত্যভামা রাজি হইলেন।

১। এই পালাতে মোট ১৪টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সং, পৃঃ ২৫৩-২৬২, গৌরলাল দে সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৭-২১৭।

কৃষ্ণের ওজন আর কত হইবে? "বড় জোর মণ দুই ভারি।" কিন্তু ব্রতের পর তুলাদণ্ডে বসিলে দেখা গেল যাবতীয় রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁসা, দস্তা, তামা, মায় বস্ত্রাদি দিয়াও কৃষ্ণের সমান ভার হইল না। তারপর আনা হইল চনক, গম, যব। তবুও কৃষ্ণ উঠেন না। নারদ কৃষ্ণকে লইয়া চলিলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। যাদবগণ কুবেরের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া আনিল। কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া সত্যভামা রুক্মিণীকে গিয়া বলিলেন, "দিদি তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী" সুতরাং "শ্যাম ও মান দুইই রাখ।" রুক্মিণী তখন একটি তুলসী পত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া তুলাদণ্ডের অপর পাত্রে দিলেন। "ত্রিলোকপতি তিলমধ্যে, অমনি উঠেন উর্ধ্বে, তুলসী রহিল ভূমি পরে।" চারিদিকের আনন্দের মধ্যে মেয়েরা নারদকে 'ছাড়কপালে' 'ডেকরা' বলিয়া নিন্দা করিল। কারণ অত ধনের পরিবর্তে তাঁহার কপালে জুটিল একটা তুলসী পাতা। নারদ কিন্তু তুলসীর মহিমা কীর্তন করিলেন।[1]

২৫। সত্যভামা, সুদর্শন চক্র ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ ঃ[2]

"দর্প ঘটে যার, রাজার কি প্রজার, নর কিংবা সুরাসুর। গোলকবিহারী হরি সে দর্প করেন চূর॥" সত্যভামার দর্প তাঁহার মত "শ্যামাঙ্গের সোহাগিনী আর কেহ নাই।" সুদর্শন চক্রের দর্প, "পারি করিতে দমন, করি যদি মন, শমনের কাটি গলা।" গরুড়ের দর্প, "আমি হেন বীর, স্বর্গ পৃথিবীর মাঝে কেবা আছে আর।" "এ তিন জনের, গরব মনের, হরিতে হরি" গরুড়কে নীলপদ্ম আনিতে বলিলেন।

পথে কদলী বনে বসিয়া হনুমান রামনাম জপ করিতেছিল, গরুড় যাইবার পথ চাহিল। হনুমানকে নিরুত্তর দেখিয়া গরুড় নিজের শক্তির বড়াই করিয়া নানাভাবে তাহাকে শাসাইল। হনুমান গরুড়কে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিলে গরুড় বিদ্রূপ করিল, "আমি থাকি হরিদ্বারে, তুমি রও কিষ্কিন্ধ্যাপুরে, আমার

১। এই পালাতে ৭টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৬২-২৭২ ; গৌরলাল দে সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪-২০৬।

পাখা তোমার গায়ে লোম। আমার চিন্তা মোক্ষফল, তোমার চিন্তা মোচা ফল, দাদা তুমি কেবল খাবার যম॥" ক্রমে বাদানুবাদের পর হনুমান "মুচড়ে ধরে গরুড় পাখীর ডেনা।" "রাখে বাম বগলে পুরে, গরুড় বলে মলাম বাপ রে, ত্রাহি ত্রাহি কণ্ঠাগত প্রাণ।" হনুমান নীলপদ্ম তুলিয়া নিজেই চলিল কৃষ্ণের কাছে। গরুড় বলিল "দাদা তোমাকে হার মানিলাম, তুমি জানিলে আর আমি জানিলাম, আর যেন বলোনা কারও কাছে॥"

হনুমান আসিতেছে শুনিয়া কৃষ্ণ রাম রূপ ধারণ করিলেন। বলদেব লক্ষ্মণ হইলেন। সত্যভামাকে কৃষ্ণ বলিলেন সীতা হইতে। সত্যভামা "বাঁকিয়ে কেশ বিনাইয়া বেশ, বসতে গেলেন বামে।" এ কেমন সীতা? সকলে হাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণ বলিলেন, "হব বলে তাল ধরিলে শেষকালে নট্।" রুক্মিণী সীতা হইলেন।

দ্বারকার পথে কৃষ্ণের আদেশে সুদর্শন চক্র বাধা দিল হনুমানকে। হনুমান, "কেন মরিছ ঘুরি ঘুরি, অঙ্গুলে হও অঙ্গুরী, বলি অঙ্গুল মধ্যে দেন পূরে।" হনুমান আসিয়া রামরূপী কৃষ্ণের চরণে নীলপদ্ম দান করিলেন। নারীগণ সত্যভামাকে নিন্দা করিতে লাগিল। "কোন সাহসে বসতে গেলি করি দৌড়াদৌড়ি। তোর সজ্জা বলায় লজ্জা, ছি ছি গলায় দে দড়ি॥" তারপর কৃষ্ণ গরুড় ও সুদর্শনের মুক্তি চাহিলেন। লজ্জিত হইয়া তাহারা চলিয়া গেল।[1]

২৬। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ঃ[2]

"ভারতের সভাপর্ব ভারত মধ্যে অপূর্ব।" দ্বৈপায়ন তপোধনের চরণে ভরসা করিয়া "কিঞ্চিৎ ভেঙ্গে ভাষায় কই ভারতের কথা।" এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভক্তিগুণে কৃষ্ণপদ লাভ করিয়াছিল। অতএব ভক্তিতে না ডাকিলে ভগবানের আসন টলে না।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া দুর্যোধনকে ভাঁড়ার ও অন্যান্য সবাইকে বিভিন্ন কার্য ভাগ করিয়া দিয়া, কৃষ্ণ নিজে রাখিলেন "দ্বিজ পদ ধৌত"

১। এই পালাতে মোট ৭টি গান আছে।

২। হরিমোহন সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭২-২৮৮; গৌরলাল দে সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৯-৪৪১।

করিবার কাজ। সভাতে কে অর্ঘ্য পাইবার পাত্র, ইহা লইয়া বিচার সুরু হইল। ভীষ্ম কৃষ্ণের প্রশংসা ও শিশুপালের নিন্দা করিলেন। কৃষ্ণকেই অর্ঘ্য দেওয়া হইল। ইহা লইয়া শিশুপাল ও কৃষ্ণের বিতণ্ডা ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হইল। এক এক করিয়া শত অপরাধ পূর্ণ হইলে কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলেন।

যজ্ঞে দুর্যোধনও নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। "বিধাতা হইল বাদী, স্ফটিকের দেখি বেদী, বারি জ্ঞান করি দুর্যোধন। মহামানী ভ্রমে ভুলে, চলিলেন বস্ত্র তুলে, দেখে হাস্য করে সভাজন॥" জ্ঞাতিসুখজ্বালাতে ঈর্ষাদগ্ধ হইয়া দুর্যোধন বাড়ী ফিরিলেন। "মাঘে মেঘে মিশালে অসহ্য হয় বটে। ততোধিক অসহ্য জ্বালা জ্ঞাতিসুখে ঘটে॥" কাজেই শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পাশা খেলাতে পাণ্ডবদের নিমন্ত্রণ করা হইল।

পাশা খেলাতে যুধিষ্ঠিরের বরাবর হার হইতে লাগিল। শকুনি ঠাট্টা করিল, "দ্রৌপদীরে করি পণ সমর্পণ করহ এবার।" ইহাতে ভীম ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এই পণেই পাশা ফেলিলেন এবং পরাজিত হইলেন। প্রথম সঞ্জয় দ্রৌপদী আনিতে গেল। কিন্তু দ্রৌপদী না আসায় দুঃশাসন গিয়া কিছু কর্কশবাক্য বিনিময় করিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া নিয়া আসিল। দ্রৌপদী কৃষ্ণ স্মরণ করিলেন। কৃষ্ণ দ্রৌপদীর অন্তরে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরিদ্র কিম্বা ব্রাহ্মণে কখনো বস্ত্র দান দিয়াছ তুমি?" কেননা "কর্মই কর্তা, কর্তা নই হে আমি।" দ্রৌপদী অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন যে এক দুঃখিনীকে পরিধেয়ের অঞ্চলের ভাগ "কিঞ্চিৎ চিরে দিয়েছিলেন।" তাহাতেই কৃষ্ণ অভয় দিলেন। বস্ত্র হরণ পর্ব সুরু হইল। "দুঃশাসন টানে বস্ত্র ক্রমাগত, সপ্তদিন হয় গত, আর পারে না হইল দুর্বল।" সতীর নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাইয়া "বিনয় করি পাঞ্চালীরে, ডেকে পঞ্চ সহোদরে, রাজ্য দিয়া সমাদরে বিদায় করিল।"[১]

১। এই পালাতে ১৬টি গান আছে।

২৭। দুর্বাসার পারণ : [১]

"ভারতের বনপর্ব, শ্রবণে কলুষ সর্ব হয় খর্ব বেদব্যাস বাণী।" পৃথিবীতে সম্পদ হইলেই সকলে জোটে, আর আত্মীয় হইয়া যায়। "বেহায়ের মকরের জ্যেঠা, থাকে যার যেখানে যেটা আত্মীয় ও কুটুম্ব বলে॥" "থাকেন যত শালার শালা," সকলেই আত্মীয়। দুর্যোধনের হইয়াছে সেই দশা। খোসামুদের অভাব নাই।

একদিন "ষাটি হাজার শিষ্য সঙ্গে দুর্বাসা" দুর্যোধনের সভায় আসিলেন "একাদশীর করিতে পারণ"। তাঁহাকে পরিতোষ মত ভোজন করাইয়া দুর্যোধন এই বর চাহিলেন যে আগামী পারণের দিবস যেন সশিষ্য দুর্বাসা কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য স্বীকার করেন, এবং দ্রৌপদীর ভোজনান্তরে সেখানে গমন করেন। দুর্বাসা হরিভক্ত ও পাণ্ডবহিতৈষী হইয়াও সব বুঝিয়াই ইহাতে সম্মত হইলেন।

তারপর যথাকালে সশিষ্য দুর্বাসা কাম্যক বনে উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণিলেন। কারণ দ্রৌপদীর আহার হইয়া গিয়াছে। মুনিকে স্নান করিতে পাঠান হইল। দ্রৌপদী কৃষ্ণস্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ আসিয়া বলিলেন যে, তিনি ক্ষুধার্ত খাদ্য চাই। কোথাও কিছু ছিল না; একটু শাকমাত্র রন্ধনপাত্রে লগ্ন ছিল, দামোদর তাহা আহার করিয়াই তৃপ্ত হইলেন। ভীম দুর্বাসাকে ডাকিতে গিয়া দেখেন যে প্রচুর ভোজনে সশিষ্য দুর্বাসা গড়াগড়ি দিতেছেন। অবস্থা এই প্রকার "একে ফেটে যাচ্ছে পেটের মাস, আমি তো আর ছয় মাস, ভোজন থাকুক জল দিব না মুখে।" ইত্যাদি। পাণ্ডবরা কৃষ্ণস্তুতি করিলেন।[২]

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২২৮-২৯৬; গৌরলাল দে সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯-৩০৯।

২। এই পালাতে মোট ১৩টি গান আছে।

২৮। শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন বা প্রভাস মিলন ঃ[১]

"শতবর্ষ বিরহ" শেষ হইলে একদা নারদ গোকুলে গিয়া দেখিলেন যে কৃষ্ণশূন্য গোকুল "বিষয়শূন্য নরবর, বারিশূন্য সরোবর, বস্ত্রশূন্য বেশ"—ইত্যাদির মত হইয়াছে। ব্রজগোপীদের অনুনয়ে নারদ অঙ্গীকার করিলেন যে "কালি আনিয়ে দেব ব্রজে ব্রজনাথ।"

এক ব্রাহ্মণ শিবের নিকটে কৈলাসে ভিক্ষা করিতে গেল। শিব নিজের অবস্থা বলিলেন, "অন্ন বিনা শুকায় চর্ম, বস্ত্র বিনা ব্যাঘ্রচর্ম, স্থান বিনা শ্মশানে পড়ে থাকি। ভস্ম কপাল অশ্ব নাই, বল কি বলদে যাই, তৈল বিনে গায়ে ভস্ম মাখি॥" শিব পরামর্শ দিলেন কৃষ্ণের কাছে যাইতে ; কৃষ্ণ "অদৈন্য দান" করেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু কৃষ্ণকে চেনেন, "কেবল দ্বারবানের বাড়াবাড়ি, উপুড়হস্ত করা নাই তার মত।" নারদ যাইতেছিলেন, কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা করিলেন ও কৃষ্ণকে গিয়া বলিলেন যে এই নিন্দার প্রতিবাদ করিবার জন্য যজ্ঞ করিয়া কৃষ্ণকে কল্পতরু হইতে হইবে। কৃষ্ণ রাজি হইলেন। "কুরুক্ষেত্র সন্নিকটে প্রভাস নদীর তটে," কাল তিনি যজ্ঞ করিবেন। নারদ চলিলেন শ্যামাগুণ গাহিতে গাহিতে। শ্যাম শ্যামা যে অভেদ "গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়ারা" ইহা মানিতে চাহে না। তাহারা "বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখতে নারে চক্ষের শূল, কালী শুনিলে কানে দেয় হস্ত। দোয়াতের কালিকে সেহাই বলা, কালীতলার পথে না চলা, হাট করে না কালীগঞ্জের হাটে।"

নারদ কৈলাসে নিমন্ত্রণ দিলেন। আসা লইয়া শিবদুর্গার কলহ হইল। গরীব ঘরসংসারের কথা তুলিয়া দুর্গা অনুযোগ করিলেন, "তুমি ত সদা নিঃশঙ্ক, হাতে নাই দুটি বই শংখ, কেমন করে লোকের কাছে দাঁড়াই ? পতি বড় ভাগ্যবন্ত, এক বস্ত্র শত গ্রন্থ দিয়ে পরেছি বছর দুই আড়াই॥" মগধ, সৌরাষ্ট্র হইয়া নারদের নিমন্ত্রণ একেবারে "বঙ্গ গৌড় রাজ্য নবদ্বীপ" পর্যন্ত পৌছিল। "বীরভূঞে সব বামুন জুটে" নিমন্ত্রণে যাইবার সলা-পরামর্শ করিতে লাগিল।

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৯৬-৩২৩ ; গৌরলাল দে সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১-৩৫।

"আর একটা ভারি ভয়, তিনি তামলীর বাড়ী নয়, ভদ্রলোকে বিদায় করিবে তথা। আমি বললাম তখন দেখো, ভারি মুস্কিল হবে ভেকো, সুধায় যদি সন্ধ্যা গায়ত্রীর কথা॥"

নিমন্ত্রণে বৃন্দাবনে উল্লাস দেখা দিল। রাধা কুটিলাকে গিয়া কহিলেন, "হলে তব অনুমতি, করি তবে শীঘ্রগতি নিকটে এলেন শ্যামরায়।" কুটিলা ধমক দিল রাধাকে। জটিলা আসিয়া বড়াইকে তিরস্কার করিল। বড়াইও এবার ছাড়িল না। বলিল, "ঘরে নন্দের বেটা শ্যাম এলে, রাখতে নারিস ঘর সামলে, ঘর না বুঝে পরকে মেলে মন্দ হয় পাছে লো।" খুব বড় কলহের পর রাধা চলিয়া গেলেন। ওদিকে যশোদা যাইতে চাহিলে, নন্দ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, "সে নয় সন্তান তোর," অতএব প্রভাসে যাইয়া কাজ নাই। যশোদা বলিলেন "ধরিতে না পারি ধৈর্য, ধরো না হে তুমি।"

কুরুক্ষেত্র। যশোদা দ্বারপালকে বলিলেন পথ ছাড়িয়া দিতে, তিনি "প্রাণ কৃষ্ণকে" দেখিবেন। দ্বারী, "নিকালো হিঁয়াসে তোড়েগা হাড্ডি" ইত্যাদি হিন্দি গালি দিয়া হটাইয়া দিল। গভীর শোকে, লজ্জায়, অপমানে তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সব জানিয়া বলদেবকে সঙ্গে করিয়া যশোদার পায়ে পড়িলেন এবং তাঁহাকে শান্ত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। দান আরম্ভ হইল। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণ কঠোর মন্তব্য সুরু করিলেন, "একি মানীর মান রাখা, হাজার বেটা পায় হাজার টাকা, তর্কালঙ্কার পেলেন সেই টাকা।" ইত্যাদি।

গৌড়দেশের এক ভক্ত দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রীর কথামত দান লইতে উপস্থিত হইয়াছেন। মনে আশা "পঞ্চাশ হাজার ন্যূনকল্প, অনুমান বরং কিছু বেশী" পাইবেন। "হেথা হরি ভাবিছেন মনে, কি দান দিব ব্রাহ্মণে, রাজ্য দিলে গুণের শোধ নয়। কহেন মাধব রঙ্গে, এস হে দ্বিজ তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি মহাশয়॥" দান শেষ হইল। ওদিকে গৃহে বসিয়া ব্রাহ্মণী বৃদ্ধাদের নিকট হইতে গহনার তালিকা শুনিতেছেন। "গড়ায়ে নিও কোমর বেড়া, গোটা গোটা গোট একছড়া, পুরন্ত পাছায় চূড়ান্ত লাগবে দেখতে।" এমন সময় ব্রাহ্মণ ফিরিলেন শূন্যহস্তে এবং সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া "তপস্যা কারণ বন প্রবেশিল সঙ্গে লয়ে ভার্যে।"

অষ্টসখী লইয়া রাধা আসিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার দিকে না তাকাইয়া "দৈবযোগে চান চন্দ্রাবলী পানে।" ইহাতে শ্রীমতীর খুব অভিমান হইল। বৃন্দাকে তিনি জানাইলেন "কানকাটা সোনা" পরিবেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন "করবনা আর ব্যাভার কৃষ্ণের ক অক্ষর যাতে।" বৃন্দা তখন কৃষ্ণকে বেশ অম্লমধুর বাণী শুনাইল। ছি, ছি, এ কোন ব্যবহার? "উতুরে গেছে বয়স আধা, হয়েছ নাতির ঠাকুরদাদা, আর কি কিছু সাজে?" কিছুই কৃষ্ণের বদলায় নাই, "আছে বুদ্ধিশুদ্ধি সকলই তাই, কেবল নাই ধড়া ধবলী নাই, বুড়ো বয়সে চূড়োটি নাই, বেশটি কেবল বেশী।" তখন "বৃন্দের শুনি বচন, করিতে বিচ্ছেদ মোচন, ধরিয়ে প্যারীর চরণ" কৃষ্ণ মান ভাঙ্গাইলেন। তারপর "অংশ যায় দ্বারকায়, পূর্ণব্রহ্ম শ্যামকায়, বামে লয়ে রাধিকায় বিরাজেন গোকুলে।"[১]

রামায়ণ

১। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ ঃ[২]

বিশ্বামিত্র যোগবলে জানিলেন যে ভগবান "চারি অংশে অবতীর্ণ দশরথের ঘরে।" তাই নির্ভয়ে যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দশরথের কাছে গিয়া তাড়কা বধের জন্য রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা করিলেন। দশরথ প্রথমে ভরত শত্রুঘ্নকে রামলক্ষ্মণ বলিয়া চালাইয়া দিলেন। এই প্রতারণা মধ্যপথে বিশ্বামিত্রের নিকট ধরা পড়িল। ক্রুদ্ধ মুনিকে শান্ত করিতে দশরথ অপরাধ কবুল করিয়া বলিলেন যে প্রাণভয়ে তিনি ইহা করিয়াছেন। কারণ "শাপ দিয়াছেন অন্ধ মুনি পুত্রশোকে হারাবে জীবন।" কিন্তু দশরথ দ্বিতীয় আপত্তি তুলিলেন যে রাম এখনও অস্ত্রধারণ করেন নাই। বিশ্বামিত্র বলিলেন যে অস্ত্রধারণ না করিলে রামকে তিনি চাহেন না। ভাগবত মায়া কে বুঝিতে পারে, কি

১। এই পালাতে মোট ২৩টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩২৫-৩৫০ ; গৌরলাল দে সম্পাদিত সংস্করণ, দশম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩-৩৬৯।

কারণে তখনি কৌশল্যা ও স্থমিত্রার রামলক্ষ্মণকে রণসাজে সাজাইতে সাধ হইল। অতএব বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

বনোপান্তে আসিয়া তাড়কা বধের জন্য অধীর রামলক্ষ্মণকে মুনি অস্ত্রশিক্ষা দিলেন। লক্ষ্মণকে মুনির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখিয়া রাম একা চলিলেন তাড়কা বধ করিতে। তাড়কা রামচন্দ্রের মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাহার "দূর হইল মনোবিকার"। কিছুক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধের পর, তাড়কা রামকে গিলিতে আসিল, "রাখি ধরণীতে অধ ওষ্ঠ, ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ ঠেকিল গগনে।" তাড়কা ও অন্যান্য নিশাচর সহ স্থবাহুকে বধ করিয়া রাম মারীচকে সাগরপারে নিক্ষেপ করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। মুনিগণ রামকে স্তব করিলেন, "তুমি বেদ তুমি বিধি তুমি মহেশ্বর।"

নিমন্ত্রণ নাই বলিয়া রাম মিথিলা যাইতে আপত্তি করিলেন। বিশ্বামিত্র বুঝাইলেন যে গুরুর নিমন্ত্রণে শিষ্যের নিমন্ত্রণ হয়। গৌতমের আশ্রম। বিশ্বামিত্র পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করিতে বলিলেন কিন্তু লক্ষ্মণ আপত্তি করিয়া বসিলেন। কারণ বেদবিধি আছে ব্রাহ্মণ সর্বমান্য। কিন্তু কলি আগমন হবে যখন তখন ব্রাহ্মণদের কি অবস্থা হইবে লক্ষ্মণ তাহারও একটি বিবরণ দিলেন। রাম তখন ব্যবস্থা মতে "পাষাণ বেড়িয়ে ভ্রমণ" করিলেন, বাতাসে পায়ের ধূলা উড়িয়া গায়ে লাগিল তাহাতেই অহল্যার উদ্ধার হইল। অহল্যা স্তব করিয়া কিছু পায়ের ধূলা জমা করিয়া রাখিতে চাহিল, কারণ "আবার যদি পাষাণ কায় হয়" তবে "লেপন করি সর্ব গায় রব না পাষাণ হয়ে।"

ইহার পর কাঠুরিয়া প্রসঙ্গ। "পায়ে-মানুষকরা-ছেলে" দেখিয়া কাঠুরিয়াগণ "পালারে পালারে" বলিয়া ছুটিতে লাগিল। বলিতে লাগিল "দেখলাম চমৎকার নয়নে, ঘাস একগাছি নাই বনে, তৃণ আদি সব মানুষ হলো।" এইবার ভাগীরথী পার হইতে হইবে। নাবিক মহাতর্ক তুলিল। তাহার ভয় পাছে নৌকা মানুষ হইয়া যায়। শেষে রাম নাবিকের হাতে পা রাখিয়া গঙ্গা পার হইলেন। নাবিকের চিত্ত নির্মল হইল, তরীখানিও সোনা হইয়া গেল।

মিথিলার রাজসভা। দশ হাজার মল্লকে ধনুকখানা তুলিয়া আনিতে

দেখিয়া তো সমবেত রাজন্যদের চক্ষুস্থির। শতানন্দ বলিলেন, "এই ধনু বাম হস্তে ধরি, তুলিয়ে সীতা সুন্দরী, রাখতেন বাল্যকালে।" কেহ আর ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইল না। এবার শতানন্দ বলিলেন যে ধনুক ভাঙ্গিতে হইবে না, কেবল স্থানভ্রষ্ট করিয়া রাখিলেই চলিবে। রাজগণ আবার "দক্ষিণে ও বামে" মাথা নাড়িলেন। শতানন্দ বলিলেন, পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে। লক্ষ্মণের কণ্ঠ শোনা গেল, রঘুবীর থাকিতে পৃথিবী বীরশূন্য হইতে পারে না। বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়া "শিশু যেন তৃণ তুলে" তেমনি সহজে রাম ধনু তুলিলেন। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, লক্ষ্মণ পৃথিবীকে ধারণ করিলেন।

সহসা কৈলাসের দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। শিবকে মাথা নাড়িতে দেখিয়া পার্বতী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব প্রথমে রহস্য করিলেন, "সিদ্ধির ঝোঁকে মাথা নড়ে উঠেছে।" পরে বলিলেন যে হরধনু রামের হাতে ভগ্ন হইবার ভয়ে শিবের কাছে আশ্রয় চাহিতেছে এবং শিব তাহার উত্তরে "মাথা নেড়ে তাই বলিলাম ধনু আমার কর্ম নয়।" হরধনু ভগ্ন হইল।

দশরথকে আনিতে দূত পাঠান হইল। তিনি আসিলেন। বরপক্ষের পুরোহিত বশিষ্ঠদেব সিধা দেখিয়া চটিয়া কন্যাপক্ষের নিন্দা করিলেন, কন্যাপক্ষের পুরোহিত শতানন্দও সূর্যবংশের কুৎসা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন। "এখনকার যজমেনে বামুনদের রীত"—এই প্রকার। যাহাহোক, বশিষ্ঠকে "সিধেতে সিধে করে" বিবাহ নিষ্পন্ন হইল। এই প্রসঙ্গে বহু স্ত্রীলোকের নামের তালিকা, গহনার ফর্দ, এবং বিবাহের স্ত্রীআচারের উল্লেখ আছে।

বাসর ঘর। রামকে মেয়েরা প্রশ্ন করিল, "বিবাহ করলে কার কন্যে?" রাম সরল মনে কহিলেন, "জনকের কন্যে বিবাহ করি।" সবাই হাসিয়া উঠিল—"ভগ্নী বিবাহ করে"। এমন সুখের রাত্রি যাহাতে না যায় সকলে প্রার্থনা করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। দশরথ অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। পথে রাম পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিলেন। অবশেষে অযোধ্যায় রামসীতার গৃহপ্রবেশ, "দেখে যুগল রূপ বেশ, আনন্দমন সকলি"।[১]

১। এই পালাতে মোট ২৪টি গীত আছে।

২। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতা হরণ ঃ[১]

রাত্রি প্রভাত হইলে রামচন্দ্রের অভিষেক হইবে। পূর্ণঘট স্থাপিত হইল, নানা তীর্থ হইতে বারি আহরিত হইল, "ভাসিল অযোধ্যাবাসী আনন্দ সলিলে।" মন্থরা কৈকেয়ীকে জানাইল যে তাঁহার সপত্নীপুত্র রাজা হইতেছেন। কৈকেয়ী মন্থরার মনোভাবের নিন্দা করিয়া কহিলেন, আমি কি কি রামের মা নই? অধিকন্তু সুসংবাদের জন্য কণ্ঠে ছিল "রত্নহার দিল দাসীর গলে।"

স্বর্গে দেবগণ প্রমাদ গণিলেন। রাম বনবাস না হইলে, রাবণ বধ হয় না। দেবতারা রামের স্তব করিলেন। তখন রামের ইঙ্গিতে, "স্মরণ করিলা সবে দুষ্টা সরস্বতী।" দেবী আসিয়া কৈকেয়ীর স্কন্ধে ভর করিলেন। কৈকেয়ী অমনি কুব্জাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সওয়া যায় বুকে যদি দংশে কালসর্প। তথাচ না সওয়া যায় সতীনের দর্প।" উপায় কি?

রাণীর দুইটি পূর্ব বরের কথা মনে পড়িল: অমনি তিনি ধন্নায় পড়িলেন। দশরথের কাকুতি মিনতিতে রাণী কহিলেন, "দিতে ভরতে রাজ্য করহে ধার্য আমারে কর হর্ষ। দেহ কালি বিহানে রামকে বনে চতুর্দশ বর্ষ॥" ইহা শুনিয়া রাজা কদলীবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র আসিয়া পিতৃসত্য পালনের অঙ্গীকার করিতেই, রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। কৌশল্যা বলিলেন, "তোরে করিয়ে বক্ষে করিব রে ভিক্ষে হইব দেশান্তরী।" রামও কাঁদিলেন, কিন্তু কহিলেন, "পিতৃকার্যে লাগেনা যেজন সেই মিথ্যা পুত্র।" তারপর আসিলেন সীতা। "রঘুনাথের বনযাত্রা বার্তা পেয়ে সীতে। বরষার বৃক্ষ যেন শুকায় অতি শীতে॥" সীতা বলিলেন যে রাম তাঁহাকে সঙ্গে না লইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। লক্ষ্মণ চাহিলেন বনগমনে রামের প্রতিনিধিত্ব করিতে। যাহোক অবশেষে তিনজনেই বনে চলিলেন।

গুহক মিলন হইল। "রঘুনাথের দয়াকে ধন্য চণ্ডালকে বলেন মিতে।" রাম ভরদ্বাজ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৫০-৩৬৫, গৌরলাল দে সংস্করণ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫০-৬৯।

দশরথের মৃত্যু হইয়াছে। খবর পাইয়া ভরত অযোধ্যা আসিয়া জননীকে তিরস্কার করিলেন। "পিতৃস্বর্গে দানাদি করিল সেইদিনে। পিণ্ডদান অপেক্ষা থাকিল রাম বিনে।" "সৈন্যসহ ভরত উন্মত্ত প্রায় মন। রাম অন্বেষণে দ্রুত কাননে গমন॥" ভরত মিলনের কোন বর্ণনা নাই।

পঞ্চবটী। রূপমুগ্ধা সূর্পণখা রাম ও লক্ষ্মণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল, "দুঃখ আছে নানা মত, কিন্তু দুঃখ নহে এত। অরসিকের সঙ্গে প্রেম আলাপে দুঃখ হয় যত॥" ইহার পর সূর্পণখার নাক কাটা গেল। সূর্পণখার বিলাপ। "অল্‌পেয়ে যদি কান কাটতো, তবু বিধাতা মান রাখতো কেবা দেখতো চুলে ঢাকতো, কাটলি কেন নাক রে?" অতঃপর রাবণের কাছে নালিশ জানাইয়া সূর্পণখা সীতার রূপের উল্লেখ করিয়া বলিল, "দাসী নয় তার মন্দোদরী তোমায় বড় সাজে।"

ক্রুদ্ধ ও প্রলুব্ধ রাবণ পরদিন প্রত্যুষে মারীচকে লইয়া পঞ্চবটীতে আসিলেন। মারীচ স্বেচ্ছায় আসে নাই, "গেলে রামচন্দ্র বধে না গেলে রাবণ।" সীতার আগ্রহে রাম মায়ামৃগরূপী মারীচকে অনুসরণ করিলেন। শরবিদ্ধ মারীচ "লক্ষ্মণেরে ডাকে লয়ে শ্রীরামের স্বর।" সীতা ব্যাকুলা হইয়া লক্ষ্মণকে যাইতে বলিলেন, এবং লক্ষ্মণের আপত্তি দেখিয়া "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ" প্রমুখ অকথ্য ইঙ্গিত করিলেন। লক্ষ্মণ গণ্ডী কাটিয়া দিয়া সাশ্রুনেত্রে প্রস্থান করিলেন, দুই হাতে কান ঢাকিয়া।

"ভবতি ভিক্ষাং দেহি"—বলিয়া যোগীবেশে রাবণ উপস্থিত। সীতা রেখার বাহিরে আসিয়া "ভিক্ষা দেন দশমুণ্ডে, দশানন সেই দণ্ডে, রথে তুলে লয় জানকীরে।" ওদিকে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া রাম জানকীর অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিলেন।[1]

১। এই পালাতে মোট ১৪টি গীত আছে

৩। **সীতা অন্বেষণ ঃ**[1]

সীতার শোকে উন্মত্ত রাম আহত জটায়ুকে দেখিয়া তাহাকেই সীতার ভক্ষক মনে করিলেন। জটায়ু রামকে সীতা হরণের বৃত্তান্ত, এবং "জটায়ু আমার নাম তোমার পিতারই সখা"—এই আত্মপরিচয় দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দুই ভাই তাঁহার সৎকার করিলেন। তারপর সুগ্রীবসমাগম, বালিবধ ও সুগ্রীবের রাজ্যলাভ ঘটনা। ইহার পর সীতার অন্বেষণ আরম্ভ হইল। হনুমান, অঙ্গদাদি দক্ষিণ সমুদ্রতীরে চলিল। হনুমানের নিকট সীতার রূপবর্ণনা করিয়া রাম তাহাকে নিজের অঙ্গুরী দিলেন। দক্ষিণে বানরগণের সহিত সম্পাতির দেখা হইল এবং তাহার নিকট বানরগণ জানিতে পারিল যে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছে।[2]

কিন্তু সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাইবার সামর্থ্য আছে কাহার? জাম্ববানের কথায় হনুমান জয় রাম বলিয়া যাত্রা করিল। পথে সুরসা সাপিনী ও সিংহিকা রাক্ষসীকে বধ করিয়া লঙ্কায় অবতীর্ণ হইতেই হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেল উগ্রচণ্ডীর সঙ্গে। হনুমান স্তবস্তুতি করিয়া উগ্রচণ্ডীকে লঙ্কাত্যাগ করিতে রাজি করাইল।

লঙ্কার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য হনুমানকে মুগ্ধ করিল। মহাপুণ্যবান রাবণ, নচেৎ এত ঐশ্বর্য কেন? প্রচ্ছন্ন ভক্তও তিনি হইতে পারেন, সীতাহরণ রামকে আনিবার কৌশলও হইতে পারে। বাহিরে ভিতরে এই যে বৈষম্য ইহার জন্য রাবণ দায়ী নহে; দোষী স্বয়ং বিধাতা। "যেমন ইক্ষুগাছে ফল ধরে না, চন্দন গাছে ফুল ধরে না," তেমনি "পুণ্যশীল রাবণের কামার্ততা"। হনুমান এইসব ভাবিতেছিল এই সময়ে মন্দোদরীকে দেখিয়া সীতা বলিয়া সন্দেহ করিল। কিন্তু ব্যবহার দেখিয়া ভ্রম কাটিল। বিভীষণকে হরিসংকীর্তন করিতে শুনিয়া, "জিরের গাছে হীরের ফুল" দেখিবার মত অবাক হইল।

১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৫-৩৮৭; গৌরলাল দে ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১-২১৩।

২। লক্ষণীয় এই "যে রাবণ হরিল সীতে, গেলাম তারে বিনাশিতে" (পৃঃ ১৮১, গৌরলাল দে সংস্করণ) ইত্যাদি রাম আগেই কিন্তু জটায়ুর মুখে শুনিয়াছিলেন।

শেষে অশোক কাননে সীতার দর্শন পাইল হনুমান। গোপনে দেখিল রাবণ আসিয়া সীতাকে "আমার সঙ্গে প্রীতি কর" বলিয়া সাধ্যসাধনা করিলেন; এবং সীতার কর্কশ জবাবে তাঁহাকে কাটিতে উদ্যত হইলেন। বাঁচাইলেন রাণী মন্দোদরী। তারপর চেড়ীরা ত্রিজটার স্বপ্ন-কাহিনী শুনিতে চলিয়া গেলে হনু আত্মপ্রকাশ করিল। সীতা মনে করিলেন রাবণের চর। কিন্তু হনুমানের মুখে রাম-বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। "আমার বরে হও অমর"—সীতার এই আশীর্বাদ শুনিয়া হনু সীতাকে অঙ্গুরীয়ক দেখাইল। সীতা নিদর্শনস্বরূপ মাথার মণি ও পাঁচটি অমৃত ফল দিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান চারিজনে চারিটি খাইবেন ও বানর কটক একটি। কিন্তু হনুমান লোভে পড়িয়া একে একে চারিটি খাইয়া শেষে যখন রামেরটিও খাইল, তখন গলায় আটকাইয়া মরিবার উপক্রম হইল। রামনাম কীর্তনে এই বিপদ কাটিয়া গেল বটে কিন্তু লোভ কমিল না। সীতার কাছে গিয়া আরও ফল খাইতে চাহিল। সীতা আম্রকানন দেখাইয়া দিলে হাঙ্গামা বাঁধিতে বিলম্ব হইল না। সসৈন্যে অক্ষয় নিহত হইল। ইন্দ্রজিৎ আসিয়া হনুমানকে নাগপাশে বন্ধন করিলেন। হনু নির্ভয়ে নিজ পরিচয় দিলে রাবণ তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। কিন্তু চর অবধ্য, বিভীষণের এই যুক্তিতে সেই দণ্ড বদলাইয়া লেজে আগুন লাগাইয়া দেওয়া ঠিক হইল। হনুর ক্রমবর্ধমান লেজে কাপড়ের সঙ্কুলান হয় না দেখিয়া রাবণ হুকুম করিলেন সীতার পরিহিত কাপড়খানা খুলিয়া আনিতে। তৎক্ষণাৎ হনু লেজ সংকোচ করিল। তারপর অগ্নিকাণ্ড। শুধু বিভীষণের ঘর ছাড়া গোটা লঙ্কা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু লেজের আগুন নেভে না। সীতার বুদ্ধিমত মুখামৃত দিতে গিয়া একেবারে মুখ পুড়াইয়া ফেলিল হনুমান। দুঃখিত হনুকে সীতা বর দিলেন, "যাও দেশে ত্যজে দুঃখ, তোমার মতন অমনি মুখ, তোমার যত জ্ঞাতিদের সব হবে।" তারপর লঙ্কা হইতে ফিরিয়া হনু "সীতার মাথার মণি রামগুণমণি হস্তে দিল।"[১]

১। এই পালাতে মোট ২০টি গীত আছে।

৪। তরণীসেন বধ ঃ[১]

লঙ্কায় মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে। মকরাক্ষের মৃত্যু সংবাদে রাবণ মূর্ছিত হইলেন। মূর্ছাভঙ্গে কে রণে যাইবে এই আলোচনায় তরণীর নাম উঠিল। রাবণ তরণীকে ডাকাইয়া বিভীষণের বিপক্ষতার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে বলিলেন। তরণী স্বীকৃত হইলে অমনি রাজা "তরণীর করে গুয়াপান দিয়ে" শিরস্ত্রাণ, মুখচুম্বন করিলেন।

তরণীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া সরমা ঘোরতর আপত্তি করিলেন ঃ রাম সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে কাহারও রক্ষা নাই। তরণী বলিলেন যে রামের হাতে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। শুনিয়া সরমা মূর্ছিতা হইলেন। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া তরণী যাইতে পারেন না, কারণ উহা ছাড়া জীবনে সব জিনিসই পণ্ড হয়। এই প্রসঙ্গে কলিকালের পুত্রদের মাতা পিতার উপর ব্যবহারের আলোচনা আছে। যাহোক মাতৃপদধূলি লইয়া জয় রাম বলিয়া তরণী রথে উঠিলেন।

প্রথম বাধা দিল হনুমান। তরণীর বেশভূষা দেখিয়া সে তাঁহাকে "বিড়াল তপস্বী" বলিয়া গালি দিল। ইহা উপেক্ষা করিয়া তরণী রামের স্তব করিতে লাগিলেন। রাম বাহু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এস বাছা, এস কোলে।" বিভীষণকে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র রাবণের ইনি" এবং "রামের ভক্ত"। তরণী বুঝিলেন, স্তবস্তুতি করিলে রাম যুদ্ধ করিবেন না, তাই তিনি, "হৃদয়ে রাখিয়া ভক্তি মুখে করে কটু উক্তি"। বিভীষণ রামকে বলিলেন, "তোমার বধ্য তরণী বীর, আর কারও নয়।" রামচন্দ্রও সহজে তরণীকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। বিভীষণ তখন বৈষ্ণব বাণ ছাড়িতে বলিলেন। ব্রহ্মার বরে অন্য কোন বাণে তরণী অবধ্য। রাম তাহাই করিলেন। মুহূর্তে তরণীর মস্তক দেহচ্যুত হইয়া পড়িল এবং কাটামুণ্ডেই ধ্বনি উঠিল রাম রাম। বিভীষণ মাটিতে পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাম সমস্ত জানিয়া বিভীষণকে তিরস্কার

১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৭-৩৯৬; গৌরলাল দে সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭-৪২০।

করিলেন ও পরে সান্ত্বনা দিলেন। বিভীষণ বলিলেন যে তাঁহার শোক সাধারণ পুত্রশোক নহে, দুঃখ এই যে তরণী বিভীষণের আগেই গোলোক প্রাপ্ত হইল। বিভীষণ রামের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন।[১]

৫। মায়াসীতা বধ ঃ[২]

বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা লাভের পর অমাত্য শুকসারণ পরামর্শ দিলেন কৌশলে রামকে পরাস্ত করিতে। মায়াসীতাকে বধ করিলে রাম সীতা উদ্ধারের আশা ছাড়িয়া যুদ্ধ তো ত্যাগ করিবেনই, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন। রাবণ বিশ্বকর্মাকে ডাকাইলেন। মায়াসীতা নির্মাণের হুকুম দিয়া রাবণ মায়াপ্রসঙ্গে একেবারে "ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা তত্ত্ব" বলিতে থাকিলে সহসা পূর্বজন্মের স্মৃতি তাঁহার মনে উদিত হইল। "ছিলাম আমরা বৈকুণ্ঠের দ্বারে, জয় বিজয় দুই সহোদরে," সেখানে দুর্বাসার সঙ্গে বিরোধ এবং ফলে ভূতলে জন্মলাভ। ভক্ত রাবণের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল, যাবতীয় তুল্য বস্তুর উপমা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন, "রামের তুল্য গুণ আর জগতে আছে কোথা।" কিন্তু "বলিতে বলিতে রাবণ অমনি যায় ভুলে। যেমন মাদক দ্রব্য পান করিলে কত কয় বিহ্বলে।" সঙ্গে সঙ্গেই রামকে গালি দিলেন ভণ্ড বলিয়া।

বিশ্বকর্মা মায়াসীতা নির্মাণ করিলেন এবং রাবণ মন্ত্রপূত করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে শিখাইয়া দিলেন কি কি বলিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে। রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিৎ রামের সমক্ষে মায়াসীতা বধ করিলেন এবং শিক্ষামত সীতা রাম নাম করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাম-শিবিরে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাম-লক্ষ্মণাদি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বিভীষণের সন্দেহ হইল। তাঁহার পরামর্শে হনুমান গিয়া সীতাকে দেখিয়া আসিয়া সুসমাচার জানাইল।[৩]

১। এই পালাতে মোট ১২টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৯৭-৪০৪ ; গৌরলাল দে সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯-৪৫৯।

৩। এই পালাতে মোট ৯টি গীত আছে।

৬। লক্ষ্মণের শক্তিশেল ঃ[১]

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে মূর্ছিত রাবণ সংজ্ঞা পাইয়া রণসাজে সজ্জিত হইলেন। বাধা দিলেন মন্দোদরী, বলিলেন যে রামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণ, "ফিরে দেও সীতা সেই রাঘবে।" রাবণ চটিয়া গেলেন, নারী হইয়া আসিয়াছে রাবণকে ভক্তিধর্ম শিখাইতে। তাঁহার পূর্বজন্ম ও অভিশাপ বৃত্তান্ত বলিয়া রাবণ মন্দোদরীকে শত্রুতার কারণ বুঝাইলেন। "শত্রুভাবে তিন জন্মে পাব কমলাক্ষে। সাত জন্মে পাব চরণ ভজিলে পরে সখ্যে।"

পশ্চিম দুয়ারে উপস্থিত হইয়া রাবণ বিক্রম, ভঙ্গী, ও লেজের পরিমাণ দেখিয়া বানরদের চিনিয়া লইলেন। যুদ্ধের সুরুতে নলবীর লাফ দিয়া রাবণের মাথায় উঠিয়া প্রস্রাব করিয়া দিল। "একে ত দুর্গন্ধ তাতে বানরের প্রস্রাব। দশানন বলে প্রাণ গেল বাপ বাপ ॥"

লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রথমটা বাগ্‌যুদ্ধ হইল। অস্ত্রযুদ্ধের শেষভাগে রাবণ শক্তিশেল মারিলেন—বায়ুবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল। রাম মাটিতে পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "কাজ কি আমার রাজ্যে, কাজ কি আমার ভার্যে, যদি তুমি করলে সমর শয্যা শয়ন।" বলিলেন, "ভার্যা গেলে ভার্যা হয়, রাজ্য গেলে রাজ্য হয়, সহোদর মিলে না তিন লোকে।"

অতঃপর জাম্ববানের পরামর্শমত ছয় মাসের পথ গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধ আনিবার জন্য হনুমান যাত্রা করিল। রাবণও খবর রাখিতেন, তিনি অর্ধরাজ্য ও রাজ্যের অর্ধ রমণীর লোভ দেখাইয়া মাতুল কালনেমিকে পাঠাইলেন হনুমানকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে।

হনুমান কিন্তু গন্ধমাদনে ঔষধ চিনিতে পারিল না। একজন যোগী তাহাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিল। সম্মুখে কাঁদি কাঁদি মর্তমান কলা দেখিয়া হনুমানের জিহ্বাতে জল আসিয়া পড়িল, সে গেল তাড়াতাড়ি স্নান করিতে। গন্ধকালী কুম্ভীর হইয়াছিল, জলে নামিতেই সে হনুমানকে ধরিল।
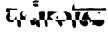
১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪০৫-৪১৯ ; গৌরলাল দে সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৯-২৯৭।

হনুমান তাহাকে মারিয়া ফেলিতেই শাপমুক্তা গন্ধকালী জানাইয়া দিল যোগীবেশী কালনেমির কথা। ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া হনুমান কালনেমিকে বধ করিয়া তাহার দেহ "সাপুটে বীর লেজের সাটে টেনে ফেলে রাবণের নিকটে।"

হনুমান বিশল্যকরণী চিনিতে না পারিয়া গোটা গন্ধমাদন মাথায় করিয়া চলিল। রাবণ দ্বিতীয় কৌশল বিস্তার করিলেন। সূর্যোদয়ে বিশল্যকরণী কার্যকরী হইবে না জানিয়া সূর্যকে উদয়াচলে যাইতে আদেশ করিলেন। পথে হনুমান "তুমি ভানু আমি হনু উভয়ে অঙ্গ এক তনু এস দুজনে করি কোলাকুলি।" এই বলিয়া সূর্যকে একেবারে বগলচাপা করিল। সূর্যও কিঞ্চিৎ রাম সাহায্য করিবার মানসে হনুমানকে পোড়াইলেন না।

নন্দীগ্রামের উপর দিয়া যাইবার কালে "সংবাদ দিয়ে নিয়ে যাইবার" সাধ হইল হনুমানের। রামের পাদুকালঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিবার জন্য ভরত বাঁটুল ছাড়িলেন। হনুমান ভূপতিত হইয়া সকল সংবাদ জানাইল। সুমিত্রা বলিলেন যে লক্ষ্মণের ওষুধ গন্ধমাদনে নাই আছে রামের শ্রীচরণে। প্রবোধ দিয়া যাইবার সময় হনুমানের ইচ্ছা হইল ভরতের শক্তি পরীক্ষা করিতে। পর্বতটা সে মাথায় তুলিয়া দিতে বলিল। তখন "ভরত ছাড়িল বাণ, গিরি সহ হনুমান শূন্য মার্গে যায়।" শেষে লঙ্কায় পৌঁছিলে পর সুষেণ বৈদ্য আসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিল এবং রামজয় ধ্বনির মধ্যে লক্ষ্মণ বাঁচিয়া উঠিলেন।[১]

৭। মহীরাবণ বধ ঃ[২]

রাবণের স্মরণে মহীরাবণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "লক্ষ্মী দিয়ে [illegible] শরণ লও তার চরণ ধরি।" ভক্ত রাবণ পূর্বজন্মের কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিলেন, "মম সম কে আছে জগতে ভাগ্যবন্ত। দারা সহ দ্বারস্থ যাহার লক্ষ্মীকান্ত॥" কিন্তু ইহা বলিতে বলিতেই রাবণের ভ্রান্তি জন্মিল, তিনি

১। এই পালাতে মোট ১৬টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪১৯-৪৩০ ; গৌরলাল দে সংস্করণ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪২-২৫৬।

মহীরাবণকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। মহীরাবণ "আজি তোমার শত্রু শীঘ্র বিনাশিব" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

"লাঙ্গুলের গড় করি পবন অঙ্গজ" রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছে। সবাই সতর্ক ও সাবধান। বিভীষণ তদারক করিতেছেন। মহীরাবণ, জনক, বশিষ্ঠ, কৌশল্যার রূপ ধরিয়া ব্যর্থকাম হইল, হনুমান দুয়ার ছাড়িল না। তারপর মহী বিভীষণের রূপ ধরিয়া গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিভীষণ নিজে যখন আসিলেন, তখন তাঁহাকেই মহীরাবণ মনে করিয়া হনুমান চুলের মুষ্টি ধরিয়া প্রচুর প্রহার করিল। বিভীষণ বলিলেন "যাউক প্রাণ, যাউক মান ছিল কর্মসূত্রে। রাজীবলোচন রামকে একবার দেখরে পবনপুত্র॥" তখন হনুমান গড় প্রবেশ করিয়া দেখিল স্থান শূন্য, রাম লক্ষ্মণ নাই। বানর শিবিরে হাহাকার পড়িয়া গেল।

মহীরাবণ পাতালে রামলক্ষ্মণকে বাঁধিয়া রাখিয়া কালী পূজার আয়োজনের আদেশ দিল। পুরোহিতকে গোপনে বলিল যে নর বলি দিতে হইবে। কথাটি ব্রাহ্মণ গোপনে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তোমায় বলি আর কাহাকেও বলো না।" কোন রকমে রাত কাটাইল ব্রাহ্মণী; "গোপন কথায় তাহার পেট ফুলে হইল ঢাক।" ভোর হইতেই কলসী কক্ষে স্নানের ঘাটে আসিল। এদিকে হনুমান সুরঙ্গপথ ধরিয়া পাতালে উপস্থিত, গোপন কথাটি তাহার জানা দরকার। ঠিক করিল গোপন কথার সব সন্ধান নারীর নিকটে। "নারী ছিদ্র পেলে পরে, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে, সব জানিব সরোবরের ঘাটে।" ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিল যে "আমাদের তিনি" এই কথা বলিয়াছেন, খুব গোপন কথা। "কেবল বলছি লুকায়ে ঘাটে, তোরা পাছে বলিস হাটে, তোদের পেটে কথা জীর্ণ হয় না।"

সব জানিয়া হনুমান গিয়া দেবীকে অষ্টাক্ষরে স্তব করিল। "কঙ্কালি কালবারিণী, কালান্ত কালকারিণী, কৃশকরা কটাক্ষে কৃতান্ত।" পূজার আয়োজন হইয়াছে, দুই ভাইকে বাঁধিয়া আনা হইল। লক্ষ্মণ কাঁদিয়া আকুল, রাম পর্যন্ত ভীত হইলেন—"গেলরে গেল একান্ত প্রাণের লক্ষ্মণ প্রাণ আমাদের ভাই রে।" এই ভীতি কি প্রকার। "কুবেরের চিন্তা যেমন খোল কড়ার

দায়ে। চিন্তামনির তেমনি চিন্তা মহীরাবণের ভয়ে।” যাহোক মক্ষিকারূপে আসিয়া হনুমান দুই ভাইকে আশ্বস্ত করিল।

তারপর পূজার নৈবেদ্যাদি রামচন্দ্রায় নমঃ বলিয়া হনুমান দুই হাতে খাইতে লাগিল। পাছে দেবী রুষ্টা হন, তাই সুন্দর এক কৈফিয়ৎ পেশ করিল হনুমান, “আমায় আদর করে কে খেতে বলে, খাই গো মা হাতের বলে, তোমার অগোচর সে তো নয় মা। যেখানে খেতে যাই তারা, সেই আমাকে করে তাড়া, ধর্ম ভাবিলে প্রাণ ত আর রয় না॥”

অতঃপর নূতন আয়োজন করিয়া পূজা আরম্ভ হইল। হনুমান দেবীকে খুব কড়া করিয়া গালি দিল। কিন্তু দেবী হনুর “মুখে রাগ হৃদে ভক্তি জানিয়া” অভয় দিলেন। হনুমান রামচন্দ্রের কানে কানে বলিল যে মহীরাবণ দেবী-প্রণাম করিতে বলিলে তিনি বলিবেন “রাজপুত্র দুটি ভাই প্রণাম করা জানি নাই, দেখাও তুমি তবে করিতে পারি।” রাম পরামর্শমত কাজ করিলেন। মহীরাবণ প্রণাম দেখাইতে গেলে হনুমান দেবীর খড়্গে তাহার শিরশ্ছেদ করিল। দশমাস গর্ভবতী মহীর রাণী ছুটিয়া আসিলে হনু “এক লাথি মারে পেটে।” সঙ্গে সঙ্গে দুইটি শিশু বাহির হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হনু এই পুনকে শত্রু দুইটিকে মারিয়া ফেলিল। অতঃপর সকলে কালী প্রণামান্তে স্বর্ণলঙ্কায় পুন যান “নাশিতে দুরন্ত দশাননে।”[১]

৮। রাবণবধঃ[২]

মহীরাবণ বধের সংবাদ পাইয়া রাবণ নিজেই সমরসজ্জা করিলেন। মন্দোদরী সীতাকে ফিরাইয়া দিতে বলিলে রাবণ আর একবার তাঁহাকে জয়বিজয়ের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাম-রাবণের বাগ্‌যুদ্ধের পর রাম অর্ধচন্দ্রবাণে রাবণের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কাটা মাথা জোড়া লাগিয়া গেল। রাম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিভীষণ বলিলেন “অস্তু শুন ভগবান, রাবণ

১। এই পালাতে মোট নয়টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৩০-৪৪৬ ; গৌরলাল দে সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭-৪১৮।

অন্তক বাণ আছে রাবণের অন্তঃপুরে।" হনুমানকে বাণ আনিতে পাঠান হইল।

হনুমান মন্দোদরীর নিকট উপস্থিত হইল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে। নাম রামদাস শর্মা, রাবণের বিশেষ বন্ধু। "নাই আর ব্যবহার, ফলমূল করি আহার, তাইতে ভক্তি করে তোর পতি।" এবং "নাপিত ছুঁইনে, তেল মাখিনে, চারিচাল বেন্ধে থাকিনে, জেনে ধার্মিক মোরে বড় বিশ্বাস।" রাবণ তাহাকে পাঠাইয়াছে মৃত্যুবাণটি অর্চনা করিবার জন্য। "কোথা আছে দেও দেখায়ে শর, শরমধ্যে মহেশ্বর পূজা করিব. বিলম্ব না সহে।" প্রথমটায় রাণীর সন্দেহ হইল। কিন্তু কি করেন। "দিলে তত্ত্ব পতির হানি, না দিলে পতির পরাণী যায় বা রাণী ভাবিয়ে অন্তরে। যা করেন ভগবান স্তম্ভ মধ্যে আছে বাণ, সন্ধান দিলেন দ্বিজবরে॥" অমনি পদাঘাতে স্তম্ভ চূর্ণ করিয়া বাণটি হনু বগল-দাবা করিল। বিরাট শরীর ধারণ করিল হনুমান—"লোম পরিমাণ হস্ত একশত।" রাণীরা কদলী ও অন্যান্য ফল লইয়া হনুমানকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু "সেদিন গেলাম ঘর পুড়িয়ে আজ তোমাদের কপাল পোড়াব" এই কথা বলিয়া হনু রামের নিকট উপস্থিত হইল। রাম ধনুকে মৃত্যুবাণ যোজনা করিলে সার্ধ কোটি দেবগণ বাণে প্রবিষ্ট হইলেন।

কৈলাসে হরপার্বতীর কোন্দল আরম্ভ হইল। শিব মৃত্যুবাণে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, পার্বতী বাধা দিলেন। শিব মানিলেন না, কলহাস্তে রামকে প্রণাম করিয়া শরমধ্যে হর নিলেন স্থান। দেবী রাগিয়া কহিলেন, "কোটি দেবতা গিয়ে তত্র, কোট করে হও একত্র, দেখি আমার পুত্র হয় না কি হয় রক্ষে।" রাম মৃত্যুবাণ সন্ধান করিতেই রাবণের প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি দুর্গাস্মরণ করিলেন। "অমনি ভুবনের জননী রণে বসিলেন রাবণে কোলে করি।" রামচন্দ্র ধনুক ফেলিয়া দিলেন, সীতার উদ্ধার হইল না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন পরামর্শ দিলেন বিধাতা, "ভক্তিপথে ভর দিয়া কর পূজা শারদীয়া"; তাহাতেই কার্যসিদ্ধি হইবে।

রাম দশভুজা মূর্তির পূজা করিলেন।[১] দেবী এবার পড়িয়া গেলেন উভয়

১। দাশরথি ইহার প্রামাণ্য বিচার করিয়াছেন: নহে বাল্মীকির উক্তি রঘুনাথ পূজে শক্তি, মতান্তরে আছে রামায়ণ।

সঙ্কটে, কাহার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। শেষে "লজ্জায় অধোবদনা দিয়ে বেদনা পেয়ে বেদনা রামশরে শক্তির গমন।" রাম আবার শরোত্তোলন করিতেই রাবণ শ্রীরামের স্তব করিয়া সীতাহরণের পক্ষে চমৎকার যুক্তি দিলেন। "আমি শুনেছি ব্রহ্মার ঠাঁই, চুরি করতে দোষ নাই, যে বস্তুতে-জীবে পায় মুক্তি।" এবং "চুরি করে আমি যদি না আনিতাম সীতে। ওহে রাম অধমের লঙ্কায় তুমি কি আসিতে।" রাম আবার ধনু নামাইলেন। হনুমান রাবণকে উত্তেজিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। "রাবণের স্তবেতে হরি, ত্যজে রণ রোদন করি কোলে আয়রে কহেন চিন্তামণি।"

তখন দেবগণের স্মরণে দুষ্টা সরস্বতী আসিয়া রাবণের মতিভ্রম ঘটাইল। রাবণ রামকে কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে আরক্তলোচন হরি মৃত্যুবাণ ত্যাগ করিলেন, রাবণের পতন হইল। রাম লক্ষ্মণকে রাবণের কাছে পাঠাইলেন রাজনীতি শ্রবণ করিতে। রামকে ডাকাইয়া রাবণ বলিলেন, "সঙ্কেতে এক বলি ধর্ম, শীঘ্র কর শুভকর্ম, বিলম্ব করিলে বিঘ্ন ঘটে। অশুভেতে কাল হরণ কর ওহে নারায়ণ, অশুভ কাজ শীঘ্র করা মন্দ।"

রাম প্রণত মন্দোদরীকে আশীর্বাদ করিলেন "হও জন্মায়তি" মন্দোদরী বলিলেন, "ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হইবে না।" রাম বলিলেন, "চিরদিন জ্বলিবে তোমার পতির চিতে।"

সর্বাভরণভূষিতা সীতাকে বিভীষণ রামের নিকট আনাইলেন যানে করিয়া। পথে মন্দোদরী অভিসম্পাত করিলেন, "রামচন্দ্র তোমার আনন্দ করিবেন নিপাত।" সীতা রামকে প্রণাম করিলেন। সীতার রূপ ও স্বাস্থ্য দেখিয়া রাম ভাবিলেন, "ছিল বনে একাকিনী, হয়েছে কুলকলঙ্কিনী, তাতে আর কিছু নাই সন্দেহ।" সীতাকে কহিলেন, "যেখানে যাও প্রয়োজন, পাও যেখানে প্রিয়জন আয়োজন কর তার গিয়া।" কাঁদিয়া সীতা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। শোকে আত্মহারা রাম অগ্নিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া অগ্নিদেব সরস মন্তব্য করিলেন, "দেখিলাম এই তো কার্য, যেদিন হবে রামরাজ্য দীনের প্রতি এমনি দয়া হবে।" তখন রত্ন-সিংহাসনে "রাজবেশে বসিলেন হরি স্ববামে জনকসুতা লয়ে।"[১]

১। ইহাতে ১৭টি গীত আছে।

৯। **রামচন্দ্রের দেশাগমন ঃ**[১]

জলধিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া রাম লঙ্কা হইতে যাত্রা করিলেন। ভরদ্বাজাশ্রমে একরাত্রি বিশ্রাম করিবেন কিন্তু চৌষট্টি কোটি বানরকে মুনি জায়গা দিতে পারিবেন কিনা, এই প্রশ্নে মুনি বলিলেন, "যদি থাকে ভালবাসা দিতে পারি ভাল বাসা কোটি কোটি লোক এলে পরে।" বিশ্বকর্মা ও মা অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিলেন ভরদ্বাজ। মুহূর্তে সুবর্ণ আসবাবাদিপূর্ণ কোটি কোটি স্বর্ণসৌধ নির্মিত হইল। অন্নপূর্ণা রন্ধনশালায় গেলেন। মুনি বানর অতিথিদিগকে খেউরি করিয়া স্নান করিতে বলিলেন। নাপিতের হাতে ক্ষুর দেখিয়া বানরগণ গাছের মাথায় উঠিল,—"ও বেটা কি জন্য আনে শাণিত অস্ত্র গলা পানে, অপমৃত্যু ঘটেছিল এখনি।" তারপর আহার পর্ব। অন্নপূর্ণার পরিচয় লইয়া কিছু সরস কথার পর "বানর ভাইরা" ভোজনে বসিল। মোচার ঝাল খাইয়া সকলে আপনার গালে আপনি চড়াইতে লাগিল। মুনি বলিলেন লঙ্কা হয়ত একটু বেশী হইয়াছে। "তখন নল বলে নীল ভাই লঙ্কা আমাদের ছাড়ে নাই, মনে করেছ জিনেছ লঙ্কারে। কই লঙ্কা জয় হলো, লঙ্কা যদি ফিরে এলো, নাগাদ সন্ধ্যা রাবণ আসিতে পারে।" পান খাওয়া লইয়া আর এক বিভ্রাট। মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে দেখিয়া বানরগণ খুব হট্টগোল করিল। শয়নপর্বে মায়া বিদ্যাধরীগণের সহিত সরস আলাপ হইল।

তারপর গুহকমিলন। গুহক অভিযোগ করিল যে সে চৌদ্দবৎসর দিন গণনা করিয়াছে রামের তিন দিন বেশী লাগিল কেন। গুহকের মুখে তুই তোকারি শুনিয়া লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে "ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণের নই, ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই।"

পরদিন নন্দীগ্রাম। ভরত শত্রুঘ্নকে বলিলেন কৈকেয়ীকে বাঁধিয়া রাখিতে, কারণ আবার যদি তিনি বলিয়া বসেন, "রাম তুই যারে বনে।" অন্তর্যামী রাম প্রথমেই আসিয়া কৈকেয়ীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। কৈকেয়ী বলিলেন যে রাবণ বধের জন্য রামই তাঁহার এই অবস্থাটা সৃষ্টি করিয়াছেন। কৌশল্যার পদবন্দনা করিয়া রাম সিংহাসনে বসিলেন।

১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৪৬-৪৫৯, শিরোনাম শ্রীতারকব্রহ্ম রামচন্দ্রের দেশাগমন, গৌরলাল দে সংস্করণ, পৃঃ ৪১-৫৮।

অগস্ত্য আসিয়া বলিলেন যে ইন্দ্রজিৎবধকর্তার চতুর্দশ বৎসর অনাহারে, অনিদ্রায়, ও স্ত্রীলোকের মুখদর্শন না করিয়া থাকিতে হইবে ইহাই শাস্ত্রবিধি। লক্ষ্মণ তাহার প্রমাণ দিলেন। প্রহরাকার্যে রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, সীতার চরণ ছাড়া মুখের দিকে তাকান নাই ও সূর্পনখার নাক কাটিয়াছেন বিমুখ হইয়া এবং চতুর্দশ বৎসরের খাদ্য ফল আনাইয়া দেখাইলেন তিনটি ফল কম হইল, কারণ সীতাহরণের দিন, নাগপাশবন্ধনের দিন ও শক্তিশেলের দিন আহারের আয়োজন সম্ভব হয় নাই। রাম শুনিয়া তখনই সীতাকে বলিলেন লক্ষ্মণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতে।

হনুমান মনে করিয়াছিল যে রাম-লক্ষ্মণের পরই সে প্রসাদ পাইবে, কিন্তু সুগ্রীবাদির ভোগ আগে আসিল দেখিয়া তাহার রাগ হইল। সীতা বুঝাইলেন যে হনু ঘরের ছেলে, তাই তাহাকে আগে দেওয়া যায় না। খুসি হইয়া খাইতে বসিল হনুমান। সীতা "যতবার দেন অন্ন, ততবার পাত শূন্য।" শেষে সীতা অন্নদা হইয়া একবারে এত অন্ন দিলেন যে "হনুর অন্নেতে ডুবিল তনু মাথায় পড়িল।" হনুমানের দর্প চূর্ণ হইল। অতঃপর রাম "জানকী সহ যুগল বেশে বসিলেন রত্নসিংহাসনে।"[১]

১০। লবকুশের যুদ্ধ[২] ঃ

ক্রমে সপ্ত হাজার বৎসর রাম রাজত্ব করিলেন। সীতা তখন পঞ্চমাস গর্ভবতী, একদা ভগ্নীগণের অনুরোধে রাবণের চিত্র অঙ্কন করিয়া ক্লান্তিতে তাহারই পাশে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাম এতদবস্থায় সীতাকে দেখিয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। সরোবরের ঘাটে রজকের মুখেও অনুরূপ কলঙ্কের কথা শুনিয়াছেন। লক্ষ্মণকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিতে। লক্ষ্মণ সীতার সহিত একটু লঘু হাস্য-

১। গৌরলাল দে সংস্করণে ১২টি এবং বঙ্গবাসী সংস্করণে ১৩টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৪৫৯-৪৭৬; গৌরলাল দে সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭-২৯০।

পরিহাসের পর বলিলেন যে রাম তাঁহাকে বাল্মীকির আশ্রমে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। আনন্দে চলিলেন সীতা। তপোবনে গিয়া সব কথা জানাইয়া লক্ষ্মণ কাঁদিয়া ফিরিলেন।

যথাকালে সীতার একটি পুত্র হইল, মুনি তাহার নাম রাখিলেন লব। পাঁচ বৎসরের লব একদা মুনির অজ্ঞাতে নদীর ঘাটে গিয়াছে সীতার সঙ্গে; মুনি ভাবিলেন লবকে হয়ত বাঘে খাইয়াছে, তাই "লবাকৃতি করেন এক কুশেতে নির্মাণ॥ মন্ত্রপূত করে তারে দিলেন জীবন।" সীতা আসিয়া কুশকেও পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

স্বর্ণসীতা লইয়াও কিছুমাত্র শান্তি নাই দেখিয়া রাম ঠিক করিলেন যে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছে তাঁহার, কারণ "ব্রহ্মকুলোদ্ভব ছিল লঙ্কার রাবণ।" অতএব অশ্বমেধ যজ্ঞ করা দরকার। নারদ গেলেন ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিতে। হনুমান ছিল কদলী বনে, রামের পাপ হইয়াছে শুনিয়া চটিয়া গেল। রাম তাহাকে বুঝাইলেন যে "এলে নর যোনিতে ধরণীতে, না চলিলে নর রীতে, ধর্ম পথ নরে নাহি মানে।"

অশ্বমেধের ঘোড়া বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত। বাল্মীকি নাই; লবকুশ অশ্ব ধরিল। শত্রুঘ্ন আসিয়া কিছু বাগ যুদ্ধের পর দুই ভাইয়ের মহাপাশ বাণে হত হইলেন। অনুরূপ ভাবে ভরত ও লক্ষ্মণও যথাক্রমে ঐশিক ও পাশুপত বাণে হত হইলেন। তারপর দুই ভাই যুদ্ধের রক্ত ধুইয়া মুছিয়া "শাক অন্ন শাল পত্রে" ভোজন করিয়া মায়ের কোলে শুইয়া রহিল। পরদিন সীতা রক্ষাকবচ বাঁধিয়া দিলেন। রণজয়ের আশীর্বাদ লইয়া দুই ভাই চলিয়া গেল।

রাম আসিয়াছেন যুদ্ধে। তাঁহার পরিচয় পাইয়া দুই ভাই হাসিয়াই অস্থির। রাঘব তাঁহার নাম? "ভিক্ষা করে রাঘবেতে, রাঘবের সঙ্গে যুদ্ধ দিতে, সেটা বড় লাঘবের কথা"। আর অজ তোমার পিতামহ? "এটা যে অযশের কথা ভারি।" এবং "অযোধ্যাপুরস্বামী কি যুদ্ধে আসিলে তুমি?" রাম তাহাদের আকৃতি দেখিয়া পিতৃপরিচয় জানিতে চাহিলেন। যদি সীতার সন্তান হয় তাহারা তবে তিনি তাহাদের পিতা। দুই ভাই জবাব দিল "যার কাছে পূজার ভয় বাবা বলে ডাকতে হয়, হাঁরে বেটা

বেটা বলে দিস গালি।" ইহার পর যুদ্ধ হইল; রাম মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।[1]

রামের মুকুট ও পোষাক লইয়া এবং জাম্ববান, বিভীষণ ও হনুমানকে বাঁধিয়া কাঁধে লইয়া বাড়ি ফিরিল দুই ভাই। হনুর সম্বন্ধে বলিল "গাটি সাদা মুখটি কালো, এ একতর দেখতে ভালো, তামাসা গিয়ে দেখাব তপোবনে। মানস করেছি মনে মনে, বেটা যদি ভাই পোষ মানে, শিকলি দিয়ে রাখব তপোবনে।" সীতাকে বলিল, অযোধ্যার রাজা রাম যুদ্ধে আসিয়াছিল, সদলে তাহাকে হত্যা করিয়াছে দুই ভাই। "এই দেখ মা রাম রাজার মণিময় কণ্ঠের হার, হীরাযুক্ত শিরের মুকুট।" দেখিয়া সীতা "আঘাত করিয়া বক্ষে" কাঁদিতে লাগিলেন। অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হইল। পুত্ররাও পিতৃঘাতী। "তিন অগ্নিকুণ্ড লব সেই দণ্ডে জ্বালে। উঠিল অনল শিখা গগন মণ্ডলে॥"

চিত্রকূট পর্বতে বাল্মীকি "অকস্মাৎ জলে দেখিছেন রক্তময়।" ধ্যানে সব অবগত হইয়া তিনি আশ্রমে ফিরিলেন এবং "মৃত্যুজীব জল" দিয়া সকলকে বাঁচাইলেন। রামকে কৌশলে অযোধ্যা পাঠাইয়া লবকুশকে যজ্ঞস্থলে নিয়া রামায়ণ শুনাইলেন বাল্মীকি। রাম সীতা "আনাইয়া চান পুনরায় পরীক্ষা।" সীতা দারুণ লজ্জায় জননীকে স্মরণ করিলেন। পৃথিবী সীতাকে লইয়া গেলেন। "জন্মজ্বালা দিলে ছি ছি এমন জামাই। মাটি হয়ে আছি মা আমাতে আমি নাই॥" পৃথিবীর উপর ক্ষিপ্ত হইলেন রাম। নারদ লঘু পরিহাস করিয়া শান্ত করিলেন। ইহার পর কালপুরুষের আগমন। "লবকুশে রাজ্য দেন বুঝে মৃত্যুলগ্ন। চারি ভাই হইলেন সরযূতে মগ্ন॥ চতুর্ভুজ রূপ ধরি চলিলেন সত্বর। চারি অংশ ছিল অঙ্গ হল একত্তর॥" শেষে বৈকুণ্ঠে "বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হয়, বামে লক্ষ্মী সাজে॥[2]

১। দাশরথি প্রমাণ দিয়াছেন "নহে বাল্মীকির কথন, রঘুনাথের রণে পতন, এ বচন জৈমিনীর মতে।"

২। ইহাতে মোট ১৭টি গীত আছে।

১১। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন[১]:

"সগর রাজার বংশ ব্রহ্মশাপে হল ধ্বংস, কপিল মুনির কোপাগ্নিতে।" ক্রমান্বয়ে সগর ও অংশুমান গঙ্গা আনয়নের চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিলে রাজা দিলীপ দুই রাণীর উপর রাজ্য দিয়া তপস্যায় গেলেন এবং প্রাণত্যাগ করিলেন। সূর্যবংশ নষ্ট হইয়া যাইবে—ইন্দ্রাদি দেবগণ চিন্তিত হইলেন। "রাম যদি না জন্মান, নাহি তবে আমাদের ত্রাণ, রাবণের হাতে প্রাণ যাবে।" দেবগণ গেলেন ব্রহ্মার কাছে, এবং ব্রহ্মা চলিলেন সকলকে লইয়া "শঙ্কর সাক্ষাতে"। শিব ব্যবস্থা করিলেন, দুই রাণীকে স্বপ্ন দেখাইলেন, "একশয্যায় শয়ন করহ দুই রাণী। একজনার গর্ভ হবে বর দিলাম আমি॥" প্রাতঃকালে অষ্টাবক্র মুনিও আশীর্বাদ করিলেন, "পুত্রবতী হও"।

এই ভাবে জ্যেষ্ঠা গর্ভবতী হইল এবং দশমাস পরে একটি "মাংসপিণ্ড প্রায় পুত্র" প্রসব করিল। দাসী আনিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল পথের পাশে। অষ্টাবক্র যাইতেছিলেন, বলিলেন যদি "আপন স্বভাবক্রমে কর তুমি এই ক্রমে, আমার বরেতে তবে উঠ তুমি গা তোল।" অমনি কুমার উঠিয়া মুনির স্তব করিল এবং মুনি আশীর্বাদ করিলেন, "একচ্ছত্র রাজা হবে ধরণী উপর। পিতৃগণে মুক্ত কর গঙ্গাতপস্যাতে।"

সপ্তম বৎসরে ভগীরথ পাঠশালাতে গেলে "জারজ বলে গালি দিল মুনি"। ভগীরথ ক্রোধাগারে শয়ন করিলেন। মা সত্যবতীকে প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় মম পিতা কহ সত্য করি।" রাণী তাঁহাকে বশিষ্ঠের কাছে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুনি তাঁহাকে সবিস্তারে সগর বংশের ইতিহাস ও গঙ্গা আনয়নের প্রচেষ্টার কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া মায়ের বাধা অমান্য করিয়া কুমার তপস্যা করিতে গেলেন।

ভয়ঙ্কর বনে "তপস্যাতে বাধা হইল বন্য পশুগুলি।" ভগীরথ দুর্গার নিকট প্রার্থনা করিলে দেবী সিংহ পাঠাইয়া তাঁহাকে নিরাতঙ্ক করিলেন। শেষে শতেক বৎসর পরে "দেখা আসি দিল প্রজাপতি"। ভগীরথের প্রার্থনায় ব্রহ্মা

১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৯৬-১৭৩৩, গৌরলাল সংস্করণে ইহা নাই।

গেলেন গঙ্গার কাছে। গঙ্গা ভগীরথের নিকটে আসিলেন। কিন্তু তিনি নামিবেন কি প্রকারে? "গঙ্গাবেগ কে করে ধারণ?" শিবের কাছে গেলেন কুমার, শিব সানন্দে রাজি হইলেন। "গঙ্গাধর নাম পাইব ইহা হইতে ভাগ্য মোর নাই।" কিন্তু শিবের জটার মধ্যে গঙ্গা ফেলিলেন পথ হারাইয়া, ভগীরথ মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিব তখন "দেখিয়ে শিশুর রোদন, জটা চিরি ততক্ষণ, বাহির করয়ে সুরধুনী।" হিমালয় হইতে নামিতে আবার পথ হারাইলেন দেবী। ভগীরথ ইন্দ্রের ঐরাবতের তপস্যায় গেলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে সদয় হইল শচীপতি। ইন্দ্র ঐরাবত দিলেন বটে, কিন্তু ঐরাবত বলিল, "যদি গঙ্গা ভজে মোরে, দিতে পারি পথ করে।" ভগীরথ গঙ্গার কাছে গেলে গঙ্গা হাসিয়া বলিলেন, "আড়াই ঢেউ যদি মোর, সইতে পারে করিবর, তবে তারে আপনি ভজিব।"

দীর্ঘেতে দ্বাদশ যোজন, "চারি চারি যোজন আড়ে" ঐরাবত আসিয়া "দন্ত বসাইলা করী শৃঙ্গের উপর।" "কুল কুল রবে গঙ্গা বাহির হইলা।" তারপর এক ঢেউতেই "জল খেয়ে করিবর মরে পেট ফুলে।" "শিবের দোহাই দিয়া বাঁচিল ঐরাবত।" অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দিয়া গঙ্গা জহ্নু মুনির আশ্রমে আসিলেন। কোশাকুশি গঙ্গার বন্যায় ভাসিয়া গেল, রাগিয়া মুনি "পান কৈল গণ্ডুষেতে গঙ্গায় আপনি।" শেষে ভগীরথের প্রার্থনায় গঙ্গা "বাহির কৈল মুনি দক্ষিণ জানু চিরি।" জাহ্নবী কাশী আসিয়া ভগীরথকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোথায় যাইতে হইবে? ভগীরথ বলিলেন পাতালপুরীতে। "শুনি শতমুখী গঙ্গা হইলা সেখানে।" সগর বংশের উদ্ধার হইল, তাঁহারা আশীর্বাদ করিলেন।

ভগীরথ মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। "মা সত্যবতী সুমতি সহিত গিয়া, আইওগণে সঙ্গে নিয়া সুবচনী করিল পূজন॥" "সিরণী আনিয়া পরে, সত্যপীরে পূজা করে পরে দিল দাঁড়াগুয়া পান।" বিবাহাদি করিয়া ভগীরথ রাজা হইলেন, অযোধ্যাবাসিগণ জয়ধ্বনি করিল।[১]

১। এই পালাতে মোট ১২টি গীত আছে

১। প্রহ্লাদ চরিত্র[1] :

"হিরণ্যকশিপুর পঞ্চকুমার, অনুজ প্রহ্লাদ তার, কুলের তিলক কৃষ্ণভক্ত।" পঞ্চম বর্ষে তাঁহাকে ষণ্ডামার্ক অধ্যাপকদিগের কাছে পাঠে নিযুক্ত করা হইল। প্রহ্লাদ শিক্ষকদের শত চেষ্টাতেও একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই শিখিলেন না। অতঃপর রাজা একদিন প্রহ্লাদের পরীক্ষা লইতে গিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন ও শিক্ষক যুগলকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। কে আগে যাইবে তাহা লইয়া দুই ভ্রাতায় গোলমাল বাঁধিল। "অমার্ক কয় ষণ্ড দাদা, যদি শাস্ত্রমত কর সমাধা, কৃষ্ণপ্রাপ্তি জ্যেষ্ঠের আগেই ভাল।" কিন্তু দূত বলিল, "এয়ছা বাত মেরে সাথ, লাগায়কে রসি বানকে হাত, দোনকোহুঁই হাজির করণা হোগা।" ষণ্ড গিয়া কৈফিয়ৎ দিল যে কালী রাম সে শিখাইয়াছে, কিন্তু "ছেলে বলে কৃষ্ণই মোর কালী।" রাজা পুত্রকে আর একবার পাঠাইলেন গুরুগৃহে। ষণ্ড প্রহ্লাদকে অনুরোধ করিল "থাকতে যদি দিল দেশে, ফেলিসনে আর রাজার দ্বেষে, হিত উপদেশ বাছা পড়। তুই মজিলে কৃষ্ণপায়, দুটো বামন কৃষ্ণ পায়, দয়া করে ঐ নামটি ছাড়।"

পুনঃ পরীক্ষাতে একই অবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধ রাজা পুত্রকে খড়্গাঘাত করিলেন, কিন্তু খান খান হইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। সর্প প্রয়োগ করা হইল, "কিন্তু ভুজঙ্গ না দংশে গায়।" বিষ দেওয়া হইল, "কিন্তু ধরিল অমৃত গুণ ভুজঙ্গের বিষ।" মত্ত মাতঙ্গের পদতলে ফেলিয়া দেওয়া হইল, "কিন্তু হস্তী নিজ শিশু জ্ঞানে শুণ্ড বুলাইল গায়!" পর্বতের উপর হইতে নীচে ফেলিয়াও কিছু করা গেল না। জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা ধার্য হইল। ভ্রাতারা কাঁদিতে লাগিলেন। রাণী কয়াধু আসিয়া অনেক বুঝাইলেন। আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, এবং "মাতৃবধ পাপে কৃষ্ণ মিলিবে না" যুক্তি দিলেন। প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, "কে হয়েছে অধোগামী করি সাধু সেবা।"

১। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫৭২-৫৮২; গৌরলাল দে সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫-৪৭।

অগ্নি ও সমুদ্র প্রহ্লাদের কিছুই করিতে পারিল না। ব্যর্থ ও উদ্বিগ্ন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় আছে রে পুত্র, তাহার নিবাস কুত্র।" প্রহ্লাদ বলিলেন, সর্বত্র, নিকটস্থ স্ফটিক স্তম্ভেও। হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে আঘাত করিলেন, নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাব হইল। "রাখিতে ব্রহ্মার ধর্ম, সায়ংকালে স্বয়ং ব্রহ্ম, উরুদেশে রাখি দৈত্যেশ্বরে। নখেতে করি বিদীর্ণ, করিলেন ছিন্ন ভিন্ন, পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করে॥" তারপর "দন্তে তৃণ চক্ষে ধরি" প্রহ্লাদ কৃষ্ণ স্তব করিলেন।[১]

২ ও ৩। বামন ভিক্ষা[২] :

বামনের জন্মে প্রচুর আনন্দ উল্লাস হইল। ছয় মাসে অন্নপ্রাশন ও পাঁচ বৎসরে চূড়াকরণ হইল। অষ্টম বৎসর গতে উপনয়নের সময় আসিল। নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।[৩] কশ্যপ উপনয়নের দিন স্থির করিয়া পূর্বদিন খোলা কাটিতে বসিয়াছিলেন। নারদকে দেখিয়া কশ্যপ তাড়াতাড়ি "খোলাগুলি ফেলিলেন বসনেতে ঢাকি।" নারদ আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা করায় সব প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন কশ্যপ বলিলেন যে বামনের পৈতা কোন রকমে সমাধা করিতে চাহেন। নারদ বলিলেন, "আমি ত আর তেমন নই কারু কথা কারে কই।" অতঃপর নারদ বাহির হইয়া গেলেন ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করিতে।

নারদকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া বৃহস্পতি মনে করিলেন যে নিশ্চয় "নারুদে খাইতে আসিয়াছে।" তাই বৃহস্পতি 'তিনি বাড়ী নাই'—এই কথা

১। এই পালাতে মোট ১১টি গীত আছে।

২। বামন ভিক্ষার দুইটি পালা, একটি গৌরলাল দে সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯১-৩১০, পালার নাম 'বলি রাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষা'; হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬০২-৬১৫। অন্যটি গৌরলাল দে ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫-১৬৩, পালার নাম 'শ্রীশ্রীবামনদেবের ভিক্ষা'; হরিমোহনের বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫৮৯-৬০২।

৩। নারদ কশ্যপ সংবাদ দুই পালায় এক রকম নহে। এখানে প্রথমটি অর্থাৎ গৌরলালের ৩য় খণ্ডের বর্ণনা দেওয়া হইল।

স্ত্রীকে বলিতে শিখাইলেন। স্ত্রী তাহাই বলিল। তখন নারদ বামনের পৈতার পৌরোহিত্যের কথা বলিলেন। এইবার বৃহস্পতি বাহির হইলেন অন্তরাল হইতে এবং নারদকে আপ্যায়ন করিলেন। কৈলাস নিমন্ত্রণ লইয়াও দুর্গা ও গঙ্গা দুই সতীনের এক পশলা ঝগড়া হইয়া গেল।

উপনয়নের দিন লোক সমাগম দেখিয়া কশ্যপ প্রমাদ গণিলেন। "কশ্যপ বলেন লেঠা ঘটালে নারুদে বেটা।" নারদ নামের তিন অক্ষরের মধ্যে একটাও ভাল নয়। "না এর দোষ নাঙ্গনা, নফানাফি, নানা নেঠা ইত্যাদি" "র-এর দোষ রোদন, রণ, রোকারুকি ইত্যাদি। "দ-এর দোষ দলাদলি, দ্বন্দ্ব, দৌরাত্ম্য ইত্যাদি।" এমন সময়ে অন্নপূর্ণা আসিলেন, গোল মিটিয়া গেল। "চুপি চুপি কর্ম করিবার দোষ" সম্বন্ধে কশ্যপকে নারদ যে বারটি দৃষ্টান্ত দিলেন তাহার একটি এই "চুপে চুপে কোম্পানির নোট জাল করে। রাজ কিশোর দত্ত জন্মাবধি গেলেন জিঞ্জিরে।"

উপনয়নান্তে বলির যজ্ঞে যাত্রা করিলেন বামন। এইখানে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণদের চমৎকার নকশা আছে। নদীর নাবিক ও বামনের আলাপটিও সুন্দর। নাবিক বলিল যে স্বজাতির কাছ হইতে সে পারের কড়ি নেয় না; বামনও তো ভবপারের মাঝি। বলির কাছে বামন ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা চাহিলে শুক্রাচার্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিকে সাবধান করিলেন "তিন বামুনে একত্রে ত যাত্রা করে না, তিন চক্ষু মৎস্য হলে মনুষ্যেতে খায় না"—ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বলিকে বুঝাইলেন যে "তিন বড় মন্দ কথা।" কিন্তু বলি শুনিলেন না। তখন শুক্রাচার্য গাড়ুর মুখ বন্ধ করিয়া দান বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু বলির কুশের আঘাতে তাঁহার চোখ নষ্ট হইয়া গেল। অভিশাপ দিয়া আচার্য চলিয়া গেলে বামন দুই পায়ে আকাশ এবং পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। স্থান দিতে না পারায় গরুড় আসিয়া বলিকে বন্ধন করিল। প্রহ্লাদ অনুনয় করিলেন। রাণী বৃন্দাবলী প্রথমটা শাপ দিতে চাহিয়া পরে জানিতে চাহিলেন যে তৃতীয় চরণ কোথায়? বামন "নাভি হতে শ্রীচরণ করেন বাহির।" বৃন্দাবলী স্বামীকে বলিলেন "শীঘ্র গতি দেহ পাতি আপনার শির!" বামন বলিকে হয় পাতালে, নয় শত মূর্খ সহ স্বর্গে যাইতে বলিলেন। "মূর্খের অশেষ দোষ, সর্বদা করয়ে রোষ, মূর্খের

নাহিক কোন জ্ঞান। আপন দেমাকে ফেরে, মূর্খ জনা মনে করে, মম সম নাহি বুদ্ধিমান।" বলি পাতালে গেলেন। "ভক্তাধীন ভগবান বাড়াতে ভক্তের মান, দ্বারী হলেন বলির দুয়ারে।" নারদ আসিয়া[1] বিচার করিয়া দেখাইলেন যে বলি শ্রেষ্ঠ। কারণ নারদ আগে ভাবিতেন যে পৃথিবী বড়, "কিন্তু পৃথিবী সাগরে ভাসে।" সাগরকে আবার অগস্ত্য পান করিয়াছেন। অগস্ত্য হইতে বড় আকাশ, "আকাশ মধ্যেতে সবে রন।" কিন্তু আকাশ বামনের চরণকে স্থান দিতে পারিল না। বলির মাথাতে তাহা কুলাইল। অতএব "মহারাজ তোমার তুল্য বড় নাই।"[2]

শিব ও শক্তিবিষয়ক পালা

১। দক্ষযজ্ঞ[3]

"নারদের মুখে সতী পাইয়া সংবাদ। হৈমবতী হইলেন হরিষে বিষাদ॥" এত বড় যজ্ঞ অথচ পিতা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পাঠান নাই। দুঃখিত মনে তিনি কৈলাসের প্রান্ত ভাগে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিলেন চন্দ্রের সাতাইশ ভার্যা অর্থাৎ সতীর দিদিরা চতুর্দোলায় করিয়া যাইতেছেন। বাহকের মুখে—"শিবের কৈলাস এই—" শুনিয়া সতীকে দেখিতে আসিলেন তাঁহারা। পথেই সতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। "পিতার যজ্ঞেতে কবে করিবে গমন"—বড় বোন অশ্বিনীর এই প্রশ্ন শুনিয়া "তারার তারায় বহিতেছে ধারা।" অশ্বিনী প্রবোধ দিলেন। পিতৃ-ভবনেতে যাইতে নিমন্ত্রণ অপেক্ষা কে করে? অশ্বিনী বস্ত্রালংকার তখনি দিতে চাহিলেন সতীকে, কিন্তু মঘা সেয়ানা। সে গোপনে পরামর্শ দিল—"বস্ত্র অলংকার আদি, এখানেতে দাও, যদি আমাদের নাম নাহি হবে।" মায়ের সম্মুখে দেওয়া ভাল। সকলে শিবদর্শনে যাইবেন, সতী গিয়া শিবকে

১। নারদ বিচার গৌরলাল দের ৭ম খণ্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় বামন ভিক্ষা পালাতে আছে।

২। প্রথম পালায় ১৭টি এবং দ্বিতীয় পালায় ১২টি গীত আছে।

৩। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৬-৪৮৫, গৌরলাল দে সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৬-১৩০।

সংবাদ দিলেন। শিব সনকাদির সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন; তাড়াতাড়ি "পোষাকি ছাল" পরিলেন। কিন্তু শ্যালিকারা আসিয়া দেখেন "কটি হতে বাঘাম্বর পড়িয়াছে খসি।" সকলে লজ্জায় ফিরিয়া গিয়া সতীর অদৃষ্ট ও পিতার অবিবেচনার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

সতী পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শিব তাঁহাকে কল্পান্তরের কথা শুনাইয়া বলিলেন,—"আমাদের ভাব কেমন জামাই আর শ্বশুরে। যেমন দেবতা আর অসুরে" ইত্যাদি। তাছাড়া নিমন্ত্রণ নাই। চণ্ডী কহিলেন, "ভৃত্য গুরু, শ্বশ্রূ, পিতা নিকটেতে অনাহুতা গমনে নাহিক প্রতিবন্ধ।" শিব আবার বারণ করিলেন। "তথাচ শিবের বাক্য খণ্ডি চণ্ডী" তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলেন। শিবের আদেশে নন্দী বৃষ লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। দেবী কুবেরালয় হইতে মনোমত অলংকার পরিলেন।[১] নন্দী বলিল যে মাকে গহনায় মানায় নাই, এবং "জবা দূর্বা বিল্বদলে চন্দনাক্ত" করিয়া চরণে উপহার দিল। কুবের নন্দীর ভক্তির প্রশংসা করিলেন।

সতী পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলে, তাঁহার গহনা দেখিয়া সব বোনের তাক লাগিয়া গেল, তাঁহারা নানা মন্তব্য করিতে লাগিলেন। প্রসূতি সতীকে আহার করিতে বলিলেন। সতী কহিলেন আগে যজ্ঞস্থালী দেখিয়া "পশ্চাতে মা করিব ভোজন।" যজ্ঞস্থলে সতীতে দেখিয়া দক্ষ শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সতী "না রাখিব তোমার উৎপত্তি কলেবর"—এই কথা বলিয়া যোগাসনে দেহত্যাগ করিলেন। নন্দী যজ্ঞনাশ করিতে উদ্যত হইলে প্রথম রাজসৈন্য, পরে ঋভুগণ তাহাকে প্রতিহত করিল। নারদ গিয়া শিবকে খবর দিলেন। "শুনিয়া উন্মত্ত হর, ক্রোধে কাঁপে কলেবর, জটা ছিঁড়ি গঙ্গাধর ফেলিলা তখন।" জন্মিলা বীরভদ্র তাতে। শিব বীরভদ্রকে কহিলেন, "যাওরে দক্ষের পাশ সযজ্ঞ সহিত নাশ করগে সকলে।"

ভূতগণ যজ্ঞ নষ্ট করিল। ভৃগুর উপর চরম অত্যাচার হইল। "ভৃগুর ধরিয়া কর, দাড়ি ছেঁড়ে পড় পড়, পিন্ধন বসনপর, মুতে ফেলে ছড় ছড়" ইত্যাদি। বীরভদ্র অতঃপর দক্ষের মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ভূতগুলি ঢুকিল

১। এখানে তৎকালীন গহনার ৪০ রকমের তালিকা আছে।

অন্তঃপুরে মাসিদিগকে মায়ের কাছে পাঠাইবার উৎসাহে। মেয়েরা প্রচুর ভোজন করাইয়া ভূততুষ্টি করিল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আসিয়া শিবস্তুতি করিলেন। দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল। তারপর সতীর বিচ্ছিন্ন অঙ্গাংশ হইতে পীঠস্থান সৃষ্টি হইল। অতঃপর, "হেথা হেমগিরি ঘরে জন্ম নিলা সতী।" এবং "নারদ দিলেন শিব বিভা সতী সঙ্গে। সতী লয়ে কৈলাসে গেলেন ভব রঙ্গে ॥"

২। গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল ও দক্ষযজ্ঞ ঃ[২]

"অর্পণ করিয়া পদ পতিহৃদিপদ্মে। ভগবতী অধোমুখী দেবাদির মধ্যে ॥" গঙ্গা কহিলেন যে, "এহেন কুকর্ম রমণীতে করে না।" দুর্গার পুনরায় কৈলাসে আসা অনুচিত। রুষ্টা দুর্গা জবাব দিলেন, "ত্রিলোক আরাধ্য পতি দেব ত্রিলোচন। তাঁরে ছেড়ে লয়েছিলি শান্তনুশরণ॥" গঙ্গা সওয়াল করিলেন যে তিনি যদি পতিতা তবে কি করিয়া পতিতোদ্ধারিণী হইলেন? দুর্গা কহিলেন যে শিবের লিখন, তাহা না হইলে পতিতোদ্ধারিণী নাম তিনি কাটিয়া দিতেন। দুর্গা আরও বলিলেন, "সুশীলা দুঃশীলা হই, তবু পুত্রবতী।" "গর্ব কর গঙ্গে গর্ভে আগে সন্তান ধর। এখন বন্ধ্যা নারী হয়ে কেন বন্ধ্যা কোন্দল কর॥" গঙ্গা মান করিয়া শিবের নিকট গেলেন, শিব তাঁহাকে প্রিয়বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন যে, গঙ্গার যাহাতে মান থাকে তাহা তিনি করিবেন। গঙ্গার প্রার্থনা "ও যেমন মনোসুখে, চড়িল তোমার বুকে, মস্তকে চড়িয়া আমি থাকি।" শিব বলিলেন, "জটামধ্যে থাকহ গোপনে।"

জটামধ্য হইতে কল কল ধ্বনি শুনিয়া শিবা কারণ জানিতে চাহিলে, শিব বলিলেন যে "শিরঃপীড়া হইয়াছে।" অবিশ্বাস করিয়া উমা মাথায় হাত দিয়া দেখিতে চাহিলেন। "ছলে কন গঙ্গাধর, পতির শিরে দিতে কর, শাস্ত্রমতে বিরুদ্ধ লিখন।" দুর্গা ব্যাপার বুঝিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

১। এই পালাতে মোট ১৩টি গীত আছে।

২। গৌরলাল দে সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩০-২৪১; হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৫-৪৯৫। হরিমোহনে দেবীর শম্ভাসুর বধ ও কালী রূপ ধারণের ঘটনাংশ অধিক আছে এই পালার প্রথম দিকে।

চমৎকার এই বিলাপটি। "কে আছে হেন কাঙ্গালী, অন্নাভাবে অঙ্গ কালী, বস্ত্রাভাবে হইলাম উলঙ্গিনী। দেখিয়া দরিদ্র ঘর, ঘুচাইলাম দশ কর, চারি হস্ত এক্ষণেতে ধরি॥ হয়ে কুলের কুলবালা, ঘুচাতে জঠর জ্বালা, দৈত্য কেটে রক্ত পান করি।" ইত্যাদি। গৌরী চলিয়া যাইবেন, মহাদেব অনুনয় করিতে লাগিলেন।

এমন সময় নারদ আসিলেন দক্ষযজ্ঞের খবর লইয়া। শিব দুর্গাকে যাইতে অনুমতি দিলেন না। দেবী তখন দশ মহাবিদ্যা রূপ দেখাইয়া দিলেন। শিব তখন অভিমান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিশেষ তোমার কাছে আমি নই গণ্য। রাজকন্যা তুমি মান্যা, আমি দীন দৈন্য॥...দুটি কর আমার, তোমার দশ কর। আমি বৃষোপরে তুমি সিংহের উপর॥ তুমি হেমবর্ণা, আমি রজত বরণ।" ইত্যাদি। সতী তখন দক্ষকে শাস্তি দিবার অনুমতি চাহিলেন। দক্ষালয়ে গেলেন সতী। তাঁহার অঙ্গ কালী দেখিয়া প্রসূতি কারণ জানিতে চাহিলেন। সতী উত্তর করিলেন যে পিতা তাঁহার স্বামীর নিন্দা করেন বলিয়া "অঙ্গ কালী হৈল মোর সেই দুঃখে দুঃখী।" তারপর দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, যজ্ঞনষ্ট এই ঘটনাগুলির সংক্ষেপ বর্ণনা। অতঃপর "মেনকার গর্ভে জন্ম নিলেন ভবানী" এবং "নারদ উদ্যোগী হইয়া পুনঃ দেয় বিভা।"[১]

৩। শিববিবাহ:[২]

সতীহারা শিব মহাযোগে সমাসীন। "মানসে ডাকেন কাল কালহরা হল কাল, কত কালে করুণা হবে কালে॥" হিমালয়-গৃহে আনন্দ। কিন্তু পুত্র না হইয়া মেনকার একটি কন্যা জন্মিল। ক্ষোভে রাণী জাতকের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। দুঃখ করিতে লাগিলেন, "মিথ্যা খেলেম ভাজাপোড়া, মিথ্যা লোকে দিল সাধ।" রাণী কাঁদিলেন, "সকল আশায় দিয়ে কালী, কোথাকার এ পোড়াকপালী, মরতে এসেছিস মোর পেটে।" প্রতিবেশিনীরা আসিয়া বুঝাইল,—"পেটের ফল কি হাটে মেলে।" তখন রাণী মেয়ের দিকে

১। এই পালাতে মোট ১৩টি গান আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৯৫-৫১৫, গৌরলাল দে সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০ হইতে ৯৪।

চাহিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। "কোলে করে ঈশানী ভাসে পাষাণী, সুখ জলধি জলে।" দেবতারা আসিয়া মহাদেবীকে দেখিয়া গেলেন। ষষ্ঠী হইল। দেবীর গায়ে হরিদ্রা ও চক্ষুতে কজ্জল দেওয়া হইল। সর্বাঙ্গে ব্রাহ্মণদের পদধূলি মাখান হইল। গিরিরাজ প্রচুর অর্থব্যয় করিলেন। সপ্তম মাসে হইল অন্নপ্রাশন। বিরাট ব্যাপার, চতুর্দিকে শুধু "লহ লহ দেহ স্নেহ বাণী ভিন্ন অন্য বাণী নাই মুখে।"

পার্বতী অষ্টম বৎসরে পড়িতেই নারদ সম্বন্ধ আনিলেন। বর বর্ণনা, "আছে অতুল ঐশ্বর্য, অহং নাস্তি ইতি ধৈর্য, বড়মানুষী কিছুমাত্র নাই তাঁর।" সম্বন্ধ স্থির হইল। নারদ কৈলাসে গেলেন। বিবরণ শুনিয়া শিব তখনই উমাকে আনিতে যাইবেন, নারদ থামাইয়া বলিলেন, "চাই লক্ষকথা সমাপন, এই কথার উত্থাপন, দিনক্ষণ চাই নিরূপণ, ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে নয়।" খরচপত্র আছে। একে শিবের প্রচুর বয়স, তদুপরি দ্বিতীয় পক্ষ, কাজেই জাঁকজমক খুব বেশি করিতে হইবে। দধিমঙ্গলের খাওয়া ও বাদ্য বাজীর ব্যবস্থা করা দরকার। শিব বলিলেন যে বৃদ্ধ বয়সের বিবাহ এমনি লজ্জার, তাহার উপর আর সমারোহের প্রশ্ন উঠে না, "গুরু হরি, আর পুরোহিত বিধি" থাকিলেই হইল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ভূতপ্রেত লইয়া শিব হিমালয়ে গেলেন। সকলে, বিশেষ করিয়া নারীরা ছি ছি করিতে লাগিল। "আশি কিংবা নব্বই, দুই এক বৎসর বেশি বই কম তো হবে না জানি মনে লো।" রাণী কাঁদিয়া অস্থির। কিন্তু কি করিবেন, "প্রজাপতির ভবিতব্য"। কন্যাদান কালে নারদ শিবের বংশ-পরিচয় দিলেন, "আদি পুরুষ কৃত্তিবাস, কৈলাস পর্বতে বাস, সংসারের মাঝে কুলবেত্তা।" ইত্যাদি। বিবাহে স্ত্রীআচারের কালে নারদ আসিয়া বরণ ডালাতে ইস্বর মূল দিলেন। গন্ধে সাপগুলি পলাইয়া গেল, আর "শিব দিগম্বর হইয়া পড়িলেন।" মেয়েরা ছুটিয়া পলাইল। রাণী নারদকে ভর্ৎসনা এবং শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। পার্বতী বলিয়া উঠিলেন যে পতিনিন্দা শুনিলে তিনি আবার প্রাণত্যাগ করিবেন। তখন বিধাতার পরামর্শে শিব দিব্যরূপ ধারণ করিলেন, গোলমাল মিটিয়া গেল। "পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বরমালা। গিরিপুরে দশভুজা হন দুর্গে গিরিবালা॥" তারপর বাসর

ঘরের নানা রসিকতা। "এই ভাবে গত হল দিবস বিংশতি।" নন্দী আসিয়া দীর্ঘদিন শ্বশুর বাড়ী বাসের কুফল সম্বন্ধে শিবকে সচেতন করিলেন। তখন বহু যৌতুকসহ গিরিরাজ কন্যা-জামাতাকে কৈলাসে পাঠাইলেন।[১]

আগমনী[২]

প্রথম খণ্ডের পালার বিবরণ এই প্রকার। উমাকে কোলে করিয়া মিষ্টি খাওয়াইতেছেন, এই স্বপ্ন দেখিয়া মেনকা ব্যাকুল হইলেন। গিরি বলিলেন, "আমিতো অচল, চলাচল শক্তি নাই।" রাণী বলিলেন, "জানি হে পাষাণ তোমায় জানি চিরদিন। স্বভাবগুণে তব কায়া দয়া মায়া হীন॥" অতঃপর হিমালয় দুর্গাস্তব করিয়া মনোগতি তুল্য গতি পাইয়া "ত্বরান্বিত উপনীত কৈলাস পর্বতে।" নন্দী বাধা দিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। গিরি বলিলেন যে উমা তাঁহার কন্যা। নন্দী হাসিয়া বলিল, "যোগমায়ার উদরেতে জন্মে জগজ্জনে। জননীর জনক আছে জন্মে তো জানি নে॥"

উমা শিবের নিকট পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। শিব কহিলেন, "মাসী, পিসী, ভগ্নী, নাই অচলনন্দিনী তাতো জান। বলিছ যাবা তিন দিবা, আমায় কেবল দুঃখ দিবা, তিন দিবা তিন যুগ যেন।" আর্থিক অবস্থা, "আমি প্রাণী একজন কত করিব উপার্জন, ভোজনকালে মিলে পঞ্চজন। উপযুক্ত ছেলে দুটি, আহারেতে নাই ত্রুটি, বড়টি গজমুখ, ছোটটি ষড়ানন॥" দেবীও কটু কথা শুনাইলেন, "যাহার ক্ষমতা রয়, দিয়ে নাহি কথা কয়, অক্ষমের বাক্যজ্বালা বড়।" শিব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তব দেহে নাহি ধর্ম, যা হয় না হয় কর আজি রাগে।" ইহা শুনিয়া "ক্রোধে কন ব্রহ্মময়ী ধর্মহীনা যদি হই, তবে কেন ধর্মপানে চাই। কে আর অনুমতি নেবে, আপনার ইচ্ছায় তবে পিতা সঙ্গে হিমালয়ে যাই॥" শিব কিন্তু বাধা দিলেন।

১। এই পালাতে মোট ১৬টি গীত আছে।

২। দুইটি পালা হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫১৫-৫১৭, প্রথম পালা, এবং পৃঃ ৫২৭-৫৩৪ পর্যন্ত দ্বিতীয় পালা। গৌরলাল দে সংস্করণে ইহা যথাক্রমে প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৫-১১১ এবং অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৫১-২৬০ পর্যন্ত।

উভয় সঙ্কটে পড়িয়া উমা হিমালয়কে বুদ্ধি দিলেন শিবপূজা করিতে। হিমালয় শিবপূজা করিলেন। পূজাতুষ্ট শিব কার্ত্তিক গণেশকে রাখিয়া যাইতে বলিলেন। উমা তাহাই করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দুই ছেলে কান্না জুড়িয়া দিল। শিব বিরক্ত হইলেন। নন্দী বলিল যে ছেলেদের বিবাহ দেওয়া দরকার। "কলাগাছ বিবাহটা আসলে বিবাহ বিষয়ে কলাগাছ দেখাইবার" মত ব্যাপার। "দুই হাত এক হলে পরে, বিধি বন্দী করে ঘরে।" এই প্রসঙ্গে কলির পুত্রদের পত্নীপরতার কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। যাহোক উমা আসিয়া পুত্র দুইটিকে লইয়া গেলেন।

উমার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া মেনকা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন যে গৌরী আসিয়াছেন। গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া রাণী দেখিলেন দশকরা মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি। এ কে? এ তো আমার মেয়ে নয়। দেবী তখন মায়া ত্যাগ করিয়া মাকে দেখা দিলেন। নিরাভরণা উমাকে দেখিয়া মেনকার দুঃখ হইল। উমা বলিলেন যে স্বামী তাঁহাকে অলংকার পরিতে দেন না, কারণ "চান্দে কি বান্ধিলে মণি অধিক উজ্জ্বল করে।" কিন্তু রাণী তবু উমাকে গহনা পরাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে উমার কথাটি মানিয়া লইলেন। এইখানে উনিশ শতকের গহনার একটা লম্বা ফর্দ আছে। তারপর সপ্তমী পূজা হইল। গিরি কহিলেন "বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে কর হরমহিষী। রয় মা যেন শতযুগ এ সুখ-সপ্তমীনিশি।"

দ্বিতীয় খণ্ড আগমনী পালা অন্য প্রকার। উমা আসিয়াছেন এই খবর মেনকাকে দিল প্রতিবেশিনীরা। "গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।" রাণী ছুটিয়া বাহির হইলেন কিন্তু উমাকে দেখিতে পাইলেন না। গিরিরাজ বলিলেন, "হরকথা কি হরি কথা যেথায়, অথবা চণ্ডীপাঠ" উমা সেখানে থাকেন। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া উমা গিয়া এক বিল্ববৃক্ষ মূলে বসিয়া ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিল্বপত্র ও বিল্বমূলের মহিমা বর্ণিত হইল। উমাকে কোলে করিয়া মেনকা নানা অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন মেনকাকে মহামায়াতত্ত্ব শুনাইয়া দিলেন গণেশ। পার্বতী কহিলেন, "ওমা শিখরি আমারে বসালে কোলে করি, আমার গণেশ

দাঁড়ায়ে ধরাতলে।" তারপর মেনকা "গণেশ কোলে গণেশ জননীকে রত্ন সিংহাসনে" বসাইয়া উৎসব করিলেন।[১]

কাশীখণ্ড[২] :

তিন দিনের জন্য উমা পিত্রালয়ে গিয়াছেন, তাহাতেই দারুণ অবস্থা হইয়াছে শিবের সংসারের। "কোথা ঝুলি কোথা সিদ্ধি, ভুলে গিয়েছেন আত্মসিদ্ধি, কোন কর্ম নাই সিদ্ধি বিনে সিদ্ধেশ্বরী।" নন্দী বলিল, যে গঙ্গা মাথায় আছেন তিনি কয়েকটা দিন অনায়াসে চালাইয়া দিতে পারেন; "গৃহমার্জন অন্নপাক বৃষকে তৃণ দেওয়া এইত কাজ।" শিব বলিলেন গঙ্গার কাজ মরণের পর "আপাততঃ মাথায় থাকুন উনি।" পার্বতীকে আনিতে প্রস্তুত হইয়া নারদকে পাঠাইলেন শিব হিমালয়ে খবর দিতে। এবার ঘটক নারদকে হাতের কাছে পাইয়া মেনকা উমার দুর্দশার জন্য নিন্দাবাদ করিলেন। নারদ বলিলেন যে শিব দরিদ্র নহেন, তিনি কাশীতে রাজা হইয়াছেন। মেনকা এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ তাহা হইলে উমার গায়ে অলংকার নাই কেন, উমা চতুর্দোলায় না আসিয়া পদব্রজে আসিলেন কেন, কার্ত্তিক গণেশের ঘোড়া নাই কেন?

শিব আসিয়াই উমাকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। "শশীর তুল্য রূপ নাই কাশীর তুল্য ধাম" ইত্যাদি ৪৪টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মেনকা উমাকে "সন্তানতুল্য স্নেহ নাই" বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। হিমালয় বলিলেন যে শিব "বরং মুক্তি দিবেন চরণ ধরলে, উমা রেখে যাও বললে, ও কথাটি করিবেন নাহে মান্য।" নারীদের অনুরোধে শিব এক রাত্রি বাস করিতে রাজী হইলেন। গিরিরাণী মিনতি করিলেন, "রজনী যেন না পোহায়।" যাত্রার প্রাক্কালে মেনকা গণেশকে রাখিয়া যাইতে বলিলেন। উমা কহিলেন, "সিদ্ধি কে যোগাবে মাতা, এই ছেলেটা সিদ্ধিদাতা, এরে আমি রেখে যাই কেমনে।" "তারপর" "ক্ষীর সর খাওয়াইয়া রাণী "কন্যা আর চন্দ্রধরে বসান রত্নসিংহাসনোপরি।"[৩]

১। প্রথম খণ্ড পালাতে ১৩টি, দ্বিতীয় খণ্ড পালাতে ৭টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫৩০-৫৪৫, গৌরলাল দে সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩-৩৯। ৩। এই পালাতে মোট ১০টি গীত আছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী : মহিষাসুরের যুদ্ধ[১]

মহিষাসুরের পিতা জম্ভাসুরকে শিব বর দিলেন "অমর হবে তোমার পুত্র।" নারদের কাছে এই সংবাদ পাইয়া দেবগণ নারী-সহবাসের পূর্বেই জম্ভাসুরকে হত্যা করিতে আসিলেন। রণক্লান্ত জম্ভাসুর জলপান করিতে গিয়া দেখিলেন "প্রকাণ্ড মহিষী চরে, ভাবে মনে পাছে দেখে কেহ।" "শিবের বাক্য অলংঘন, দিয়ে মহিষীরে আলিঙ্গন, যায় বীর সংগ্রাম ভিতরে।"

মহিষাসুর জন্মের পর নারদই আসিয়া আবার তাঁহাকে জম্ভাসুর বধ কাহিনী শুনাইলেন। ক্ষিপ্ত মহিষাসুর অমনি স্বর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। নিরুপায় দেবগণ ব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া গেলেন শিবের কাছে। জানা গেল মহিষাসুর কোন দেবতার বধ্য নহেন। তখন দেবগণ একত্র হইয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। সকল দেবতার বীর্য একীভূত হইয়া দেখিতে দেখিতে এক নারীরূপ পরিগ্রহ করিল। "পদস্থিত ধরাতলে, মস্তক গগন মণ্ডলে, সহস্র ভুজে দিকসকল ঘিরিলেন অমনি।" দেবগণ দেবীকে স্তব করিলেন। সিংহের পৃষ্ঠে বসিয়া দেবী সঘন গর্জন করিলেন।

দূত মহিষাসুরকে জানাইল এই অপরাজেয়া নারীর কথা। মহিষাসুর হাসিয়া বলিলেন, "করিকে গ্রাসিল ক্ষুদ্র কীটে, কুম্ভীরকে নাশে গিরগিটে, ভেক ভুজঙ্গের মাথা কাটে শুনিনে শ্রবণে।" সেনাপতি চিকুর-চামর চতুরঙ্গ বাহিনী লইয়া দেবীকে আক্রমণ করিয়া হত হইল। তখন মহিষাসুর নিজে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম মহিষরূপে, তারপর হস্তীরূপে, পরে সিংহ-রূপে, আবার হস্তীরূপে যুদ্ধ করিয়া অসুর যেই আর একবার মহিষরূপ ধারণ করিলেন, অমনি দেবী "অসিতে কাটেন তার মাথা।" তখন মহিষের স্কন্ধ হইতে "অর্ধাঙ্গ মহিষাকার অর্ধাঙ্গ দৈত্য" বাহির হইল। দেবী তাহার বক্ষে শূল বিদ্ধ করিলেন, কেশ ধারণ করিয়া নাগ পাশে বন্ধন করিলেন। "তাতেই মহিষমর্দিনী নাম থুইল সব সুরে।" "চিরজীবী মহিষাসুর শম্ভুর কৃপায়। অনুপায়ের উপায় যে পায় সে পায় অসুর পায়। কে আছে মহিষাসুরের

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫৬২-৫৭২, গৌরলাল দে সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩-৪৪৮।

তুল্য ভাগ্যবন্ত। যার স্কন্ধে পদ রেখেছেন দুর্গা একাল পর্যন্ত।" দেবগণ দেবীর স্তব করিলেন।[১]

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী: শুম্ভনিশুম্ভ বধ[২]

শুম্ভ আর নিশুম্ভ তখন বাহুবলে স্বর্গমর্ত্য অধিকার করিয়াছেন। একদা দেবী স্নান করিতে যাইবার পথে দেখিলেন যে দেবগণ স্তব করিতেছেন। দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারা কি জন্য কাহার স্তব করিতেছেন? তৎক্ষণাৎ দেবীর দেহ হইতে কৌষিকী বাহির হইয়া বলিলেন যে দেবগণ শুম্ভনিশুম্ভ বধের জন্য দেবীরই আরাধনা করিতেছেন। কৌষিকী নির্গতা হওয়ায় দেবী "কৃষ্ণাঙ্গী মূর্তি" ধারণ করিলেন।

খবর পাইয়া শুম্ভনিশুম্ভ সুগ্রীব দূতকে পাঠাইলেন। দূত বলিল যে দেবী খুসিমতো দুই রাজার যে কোন একজনকে বরণ করুন। দেবী বলিলেন "বলক্ষয় পরাজয় পাব যার কাছে। সেই ভর্তা ভবিষ্যতে এই পণ আছে।" এই উদ্ধত বাক্য শুনিয়া দৈত্যরাজদ্বয় ধূম্রলোচনকে পাঠাইলেন। দেবীর সিংহ তাহাকে বধ করিল। তারপর আসিল চণ্ডমুণ্ড। দেবীর কপাল হইতে চামুণ্ডা বাহির হইয়া তাহাদের বধ করিলেন। তারপর রক্তবীজ বধ হইল। শেষে দেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিলেন। সর্বশেষে নারদের ব্যাজস্তুতি, "নির্মায়া তোর দেখে আমি, মা না বলে বলি মামী, কেন কালী কুলে দিলি কালী। দিয়া পতির বুকে পাটা, মেয়ের বুকের এত পাটা, ধর্মপথে কেন কাঁটা দিলি॥"[৩]

দুর্গা ও গঙ্গার কোন্দল:[৪]

"কৈলাসশিখরে শিবদুর্গা একাসীন। ইন্দ্রদূত আসি প্রণমিল একদিন॥"

১। এই পালাতে মোট ১১টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫৫৬-৫৬২, গৌরলাল দে সংস্করণ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২১৭-২২৯।

৩। এই পালাতে মোট গীত আছে ১২টি।

৪। হরিমোহনের নূতন সংগ্রহ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭০৬-৭১১। গৌরলাল দে সংস্করণে ইহা নাই।

দৈত্যসৈন্য স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছে, সেনাপতি শ্রীকার্ত্তিকেয়কে অবিলম্বে প্রয়োজন। দুর্গা বলিলেন যে ইন্দ্রের বড় দেমাক। শিবকে সম্মান করেন না। আর সেনাপতি বলিয়াই কুমারকে সব যুদ্ধে যাইতে হইবে কেন? শিব বলিলেন যে সেনাপতির যুদ্ধে না গেলে কি চলে। দেবী চটিয়া কহিলেন, পারিজাত যুদ্ধে কুমারের শরীর খারাপ হইয়াছে, "কুমার আমার হয়েছে বিবর্ণ।" কাজেই আর যুদ্ধে যাইতে দিব না।

জটামধ্য হইতে গঙ্গা উত্তর করিলেন, ছেলের প্রতি মমতা নাই কার, কিন্তু "তাই বলে কেহ কি কার্য নষ্ট করে?" দুর্গার সবই বাড়াবাড়ি। স্বামী শ্মশানবাসী হইলেন, পিতার ছাগমুণ্ড হইল, বাড়াবাড়ির জন্য সোনার সংসার নষ্ট হইল। সেনাপতি হইয়া যুদ্ধে না যাওয়া কলঙ্কের কথা। দুর্গা জবাব দিলেন যে তাঁহার ছেলে তিনি যুদ্ধে যাইতে দিবেন না, তাহাতে গঙ্গার কি? শিবের ভিক্ষা তো গঙ্গা জটায় বসিয়া দেখেন; কিছু করেন না কেন? অকারণ মুখ নাড়া দুর্গা সহিতে পারেন না। আর "শান্তনুরাজা তোর প্রথম পক্ষের স্বামী। ওলো তুই কি আমা হতে হবি নারীর মাঝে দামী।"

গঙ্গা প্রত্যুত্তর করিলেন। শিব ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু আনেন, তাহা ঘরে রাখিলে "গণার ইন্দুরে খায়", বাহিরে রাখিলে "কেতোর ময়ূরে ছড়াইয়া দেয়।" সংসার অচল তো দুর্গার পরিবারের জন্যই। "লক্ষ্মী সরস্বতী তোর কার্তিক গণা। খাবার জন্য সদাই সব করে আনাগোনা।" খায় কত! কার্তিকের ছয় মুখের জন্য "ছয় জোয়ানের খাবার চাই।" গণপতি বাছা "চার হাতে খায়, শুঁড়ে জড়ায় তবু তার পেট খালি।" সিংহ কৈলাসকে পশুহীন করিয়াছে। একদিন ভিক্ষাবন্ধ হইলে সবার "দাঁত কপাটি" লাগিবে কি গুণের ছেলে কার্তিক! স্বভাব গুণেই "আজো তার বিয়ে হল না।" "মা যাহার পাহাড়ে মেয়ে," স্ত্রীলোক হইয়া অসুরের কাঁধে পা দিয়া যুদ্ধ করে, তাহার ছেলে এমন হইবে না কেন! ছাগল ভেড়া মহিষ পূজাতে চাই বলিয়াই দুর্গাপূজা লোকে কম করে। আর পতিতপাবনী গঙ্গার পূজা না করে কে? শান্তনুর স্ত্রী কেন হইয়াছিলেন গঙ্গা, তাহার মর্ম দুর্গা বুঝিবে না। আর ছেলে যদি হয় তবে ভীষ্মের মতই যেন হয়।

দুই সতীনের ঝগড়াতে শিব প্রমাদ গণিলেন। কাউকে মাথায়, কাউকে

বক্ষস্থলে রাখিয়াও শান্তি নাই। "দুর্গা দুর্গতিহরা", কিন্তু শিবের কোন গতি করেন না। দুই সতীনের স্বামী হওয়া ঝকমারি। শিব দেহের দুই ভাগ দুইজনকে দিয়াছেন, তাহা লইয়াও বিবাদের অন্ত নাই। গৌরীর প্রতি শিবের পক্ষপাতিত্ব আছে এই অভিযোগের শিব জবাব দিলেন, "সমুদ্র মন্থন হলে, বিষ খেয়ে মরি জলে, জ্বালা যায় ওর স্তনপান করে।" গঙ্গা বলেন, "ও মা ছি ছি, হে শিব করেছ কি, পত্নীর স্তন পান করেছ, তাই আবার বলছ।" আর তোমার ঘরে থাকিব না। শিবও রাগিয়া বলিলেন, "তোমরা দুটা মরিলেই বাঁচি।" দুই স্ত্রী লইয়া থাকা দেকদারী, মহাঝকমারী। সেকরা বাড়ী সোনা রূপা দেওয়া, খিড়কির ঘাটে বাগান বাড়ী করা, দুই দিকে অসমান ভার লওয়া, ক্ষুধার সময় তাড়াতাড়ি খাইতে যাওয়া, শালী ঠাকুরঝি না থাকিলে শ্বশুর বাড়ী যাওয়া, পরের বাড়ী শালিসী করা ঝকমারি কাজ। কিন্তু "এসব ঝকমারি বরং সহ্য করতে পারি। দুই সতীনের ঝগড়ার ঝকমারি সইতে নারি।"

তখন "গণেশের মা দশহাত নাড়িয়া" কহিলেন যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া কথা দিয়া বিষ ছড়ায় ইত্যাদি। গঙ্গাও কড়া জবাব দিলেন। শিব এবার মধ্যস্থতা করিলেন। কে ভাল কে মন্দ ইহার বিচার হইবে এই ভাবে। "আমি আজি দুই মূর্তি করিব ধারণ। হরগঙ্গা, হরগৌরী যুগল মিলন॥" "আমার বাম অঙ্গ সঙ্গে যে জন মিশিবে। মিশিয়া যে প্রকাশিবে সেই হবে শিবে॥" গঙ্গা শির হইতে নামিয়া হরের বামে মিশিলেন। "রজত ভূধরে যেন তুষার লাগিল। কে রজত কে তুষার বুঝা নাহি গেল॥ জলেতে মিশিলে জল নাই কোন ভাব। প্রকৃতি পুরুষ কিছু হল না প্রভাব॥" কাজেই "হরগঙ্গা রূপ নাহি হইল প্রকাশ। পঞ্চানন পঞ্চমুখে করিল প্রকাশ॥" তারপর "অভিমানে গঙ্গা যান গঙ্গাধর শিরে। দুর্গা আসি বসিল বামের বামে ধীরে॥ দুর্গাশিব এক অঙ্গ হল একাসনে। অশ্রুধারা ত্যজে গঙ্গা যুগল নয়নে॥" কি রূপ! "অর্ধাঙ্গ ধবল গিরি, অর্ধ গিরিসুতা গৌরী, রজতে কাঞ্চন হেরি শিহরে অনঙ্গের অঙ্গ॥"[১]

১। এই পালাতে মোট ৫টি গীত আছে।

লৌকিক পালা

শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন[১]

"সুজনগণের শ্রাব্য, শ্রীকবিকঙ্কণকাব্য কমলেকামিনী দেখে জলে।
গিয়া সিংহল নগর ধনপতি সদাগর, বন্দী শালবান বন্দীশালে ॥"

শ্রীমন্ত একদিন পাঠশালায় তাঁহার মায়ের নিন্দা শুনিয়া স্থির করিলেন পিতার সন্ধানে যাইবেন। মাতা খুল্লনা প্রথম নিরস্ত করিতে খুব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শ্রীমন্ত নাছোড়বান্দা। কাজেই শেষে পুত্রের করে "জাতপত্র সোনার অঙ্গুরী" দিয়া এবং 'স' বর্ণে চণ্ডীর স্তব করিয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন।

শ্রীমন্তের নৌকা কালীদহে গেল। শ্রীমন্ত দেখিলেন, "কমলকানন মধ্যে কোটী চন্দ্রাননী। করে করি কুঞ্জর গিলিছে সেই ধনী ॥ উগারিয়া পুনঃ গিলে মত্ত করিবরে। সাধ্য কি পালাবে করী বদ্ধ বাম করে ॥" শ্রীমন্তের মুখে এই খবর পাইয়া সিংহলরাজ কালীদহে আসিলেন কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। ক্রোধে রাজা কহিলেন, "এ পাষণ্ডে এই দণ্ডে দণ্ড কর প্রাণে।" শ্রীমন্ত 'ক' বর্ণে দেবীর স্তব করিলেন, "তুমি কালবরণী কালহরা মা কালপরে। কুলকুণ্ডলিনী রূপে কমলে বাস কলেবরে।" ইত্যাদি

"কৈলাসে আছেন তারা আসন টলিল।" শ্রীমন্তের বিপদ শুনিয়া "সাজিলেন বিশালাক্ষী সমর সজ্জায়।" পথে নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নারদ বলিলেন, "বধিবারে মক্ষিকারে ব্রহ্মঅস্ত্র কেন করে।" ইহাতে লজ্জিতা হইয়া দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করিয়া মশানে গেলেন। কোটালের নিকট পরিচয় দিলেন, "বিধিমতে বিড়ম্বনা করেছেন বিধি। পিতা মোর অচল দেহ নাস্তি গতিবিধি ॥ শিশুকালে সমুদ্রে ডুবিয়া মল ভাই। দুঃখের সমুদ্রে সদা ভাসিয়া বেড়াই ॥" পরে কোটালকে কহিলেন, "করো না কোটাল আমার শ্রীমন্তরে দণ্ড। আছয়ে ব্রহ্মাণ্ডে আমার ঐ ভিক্ষাভাণ্ড ॥" কোটাল কটূক্তি

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫৮২-৫৮৯, গৌরলাল দে সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২-৩২০।

করিল। দেবী ক্রুদ্ধা হইলেন। "শুনিয়ে ক্রোধে বগলে, ধরি কোটালের গলে, মুণ্ড করে করিলেন খণ্ড। সঘনে কম্পে অধর, নখেতে চিরি উদর, কারু বা করেন প্রাণদণ্ড॥" সৈন্যরা বলাবলি করিতে লাগিল, "এ বেটী সামান্য নয়, মারতে গিয়ে মরতে হয়, দায়ে যেমন কুমড়ার বিনাশ"।[১]

শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের দেশাগমন[২]

সিংহলরাজ শালবান তখন বৃদ্ধাবেশী দেবীর পায়ে ধরিলেন। দেবী বলিলেন, "তোর কন্যা সুশীলাতে আমার শ্রীমন্ত সাথে বিবাহ দাও অদ্য শর্ব্বরীতে।" রাজা রাজী হইয়া গেলেন। শ্রীমন্ত তখন পিতার খোঁজ করিলেন। রাজা তখন কারাগার হইতে "জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ধনপতি সদাগর"কে নিয়া আসিলেন। "বাঁ নাসিকায় আঁচিল, হৃদয়ে সাত তিল" ইত্যাদি দেখিয়া শ্রীমন্ত পিতাকে চিনিলেন। তারপর রাজা অর্ধেক রাজত্ব দিয়া শ্রীমন্তের সঙ্গে নিজের কন্যা সুশীলার বিবাহ দিলেন। অতঃপর ধনরত্নে ডিঙ্গা সাজাইয়া পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া ধনপতি দেশে ফিরিলেন।

দেশের রাজা বিক্রমকেশরী শুনিলেন যে শ্রীমন্ত চণ্ডীর কৃপালাভ করিয়াছেন। "মুনি ঋষি যারে না পান ধ্যানে" সেই দেবী শ্রীমন্তকে রক্ষা করিতে যাইবেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? দূত গিয়া শ্রীমন্তকে ধরিয়া আনিল। শ্রীমন্ত কালীদহের কাহিনী বলিলেন। "রাজা বলে দেখাতে পার, নৈলে তোর বিপদ বড়, শ্রীমন্ত তোর নিকটে কৃতান্ত।" শ্রীমন্ত দেবীর স্তব করিলেন। চণ্ডী আবির্ভূতা হইলেন। "মায়াতে হইল সৃষ্ট, কালীদহ কমলবিশিষ্ট, মা হলেন কমলেকামিনী। প্রত্যক্ষ হইল সবার, অপ্রত্যক্ষ নাই এবার, উগরে গজ বসি গজগামিনী॥" তারপর দেবীর আদেশে বিক্রমকেশরী নিজকন্যা জয়াবতীর সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ দিলেন। "খুল্লনা পায় নিজপতি, সুশীলা আর জয়াবতী, দুই পত্নী শ্রীমন্তের তথা।"[৩]

১। পালাতে মোট ৯টি গীত আছে।

২। হরিমোহনের নূতন সংগ্রহ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১০৩-১০৬, গৌরলালে ইহা নাই।

৩। এই পালাতে ৪টি গীত আছে।

মৌলিক পালা

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব[1]

"আপন আপন ইষ্ট শ্রেষ্ঠ করি কয়। এক শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব পথমধ্যে হয়॥" বাগবাজারে গোকুল মিত্রের মদনমোহনের কাছে এক বৈষ্ণব ছিল, নাম তার নিতাই দাস। একদিন বৈকালে যথাযথ সাজ করিয়া বাহিরে গিয়া, "বাবাজি করে হরিগুণ গান।" এক শাক্ত কালীঘাটে চলিয়াছিল, বৈরাগীকে উপদেশ দিল মায়ের নাম করিতে। বৈরাগী শাক্তকে পালটা পরামর্শ দিল, গৌর ভজন করিতে। শাক্ত কহিল, "গৌর তো ছার কৃষ্ণকে শ্যামার সঙ্গে তুলনা কর।" বৈরাগীর উক্তি, "বিষ্ণুঅঙ্গ হতে সৃষ্টি", এবং "শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের চাঁদ, চাঁদের কাছে তারা।" তথা "মুক্তির কারণ অন্তে নাম নারায়ণ।" শাক্তের জবাব,—"মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী গিরিরাজার মেয়ে। নারায়ণকে রেখেছেন তিনি ভব সমুদ্রের নেয়ে॥" বৈষ্ণবের সওয়াল—"বিষ্ণু সর্বদেবময়, সর্বদেবের পূজা হয়, জল দিলে বিষ্ণুর মস্তকে।" শাক্তের উত্তর,—"যেমন ডাকমুন্সি পেলে চিঠি, পৌঁছে দেয় বাটি বাটি, দেবের মধ্যে সেই কাজটি করেন নারায়ণ।" বৈষ্ণব আবার সওয়াল করিল, শাক্ততন্ত্রে তো বহু নাম আছে কালী কৌমারী, দুর্গা ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের রাম নামটি কেমন কোমল নাম। রা ও ম এই দুই শব্দের গুণ কত। সর্বোপরি "সন্তান তুল্য মায়া, কার্তিক তুল্য কায়া, গোলোক তুল্য ধাম, রামের তুল্য নাম।" ইহা জগতে দুর্লভ। শাক্তের জবাব, "শ্যামা মার কি নামটি কোমল বলি কাকে রে। অতি দুগ্ধপোষ্য বালক, আগে মা বলে ডাকে রে।"

ঝগড়া করিয়া উভয়ে স্ব স্ব উপাস্য মূর্তির কাছে চলিল। "উভয়ে চৈতন্য দেন উভয়ের ইষ্ট। কৃষ্ণ হয়েছেন কালী রূপ, কালী হয়েছেন কৃষ্ণ।" ইহা দেখিয়া তাহাদের জ্ঞান হইল। "সেই পথে উভয়ে আইল পুনরায়॥ উভয়ে উভয়ে হেরি মগ্ন প্রেমভরে। কৃষ্ণকালী তুল্য বলি কোলাকুলি করে॥"[2]

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬১৫-৬২২, গৌরলাল দে সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-২৬৬।

২। এই পালাতে মোট ১১টি গীত আছে।

বিধবার বিবাহ[১]

"বিধবাবিবাহ কথা, কলির প্রধান কলিকাতা নগরে, উঠিছে এই রব। ...ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্যগণ্য গুণধাম, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম। তিনি কর্তা বাঙ্গালীর, তাতে আবার কোম্পানীর হিন্দু কলেজের অধ্যাপক।" হাকিমের রায় হইয়াছে, কারণ "হাকিমের এই বুদ্ধি ধর্মবৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি এ বিবাহ সিদ্ধ হলে পর॥" "বিধবা করে গর্ভপাত, অমঙ্গল উৎপাত তাতে রাজার রাজ্যে হতে পারে।" ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া বৃথা। "রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত, এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।" জনমত এই প্রকার, "কেউ বলিছেন নিষেধ রউক, কেউ বলিছেন হয় তো হউক, কেউ বলিছেন হউক হউক বেশ।"

শান্তিপুরে যেদিন এই কথা রটিল, সেই দিন গঙ্গার ঘাটে বিধবাদের একটা কমিটি বসিয়া গেল। "নষ্ট, ক্লীব, কিম্বা মৃত, অথবা পতি পতিত, উদাসীন, এই পঞ্চ যদি। বচন আছে মুনির হইয়াছে যে রমণীর পুন বিবাহ করিতে তার বিধি॥" "...বলেছেন এসব পরাশর।" কিন্তু মুখপোড়া পণ্ডিতরা চাপিয়া গিয়াছে সেই সব কথা। "এখন আমাদের দিতে নাগর, এসেছেন গুণের বিদ্যাসাগর, বিধবা পার করতে তরীর গুণ ধরেছেন গুণনিধি॥ কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে, নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হয়ে।" উৎকল কি চমৎকার দেশ, "বর মলে পায় দেবর।" ইংলণ্ড কি সুখের দেশ; "পতি মরিলে পুত্র নিজে খুঁজে লগ্নপত্র করে যায় জননীর বিয়ে দিতে"। ভারতবর্ষে মুসলমানে এত মানে না। গৌরাঙ্গও একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইভাবে সকলে মিলিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি সামাজিক অত্যাচারের নানা কথা আলোচনা করিল এবং ঠিক করিল "নারী পুরুষের সমান বিচার বিধিমতে হল এতদিনে।" একজন বলিল যে বিধবা বিবাহ অসম্ভব কথা, "হবে না হবার নয়, লাভে থেকে এই হয়, পতির শোকটা পুরাণ পড়েছিল," সেইটা বাড়িয়া গেল আবার। শেষে এক প্রবীণা বিধবাকে লইয়া রহস্যালাপ হইল। বৃদ্ধা বলিল, "এসে ভ্রমর

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬২৮-৬৩২; গৌরলাল দে সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৩-৯৯।

তোদের যৌবনকমলে বসুক।" "আমার বয়েস বাহাত্তর, মনের মতন পাত্তর, এখন আর তো জুটিবে না ঘরে।"[১]

কর্তাভজা[২]

"নূতন হয়েছে কর্তাভজা, শুন কিঞ্চিৎ তার মজা, সকল হতে শ্রবণে বড় মিষ্ট। ইহার ঘোষপাড়াতে পূর্ব সূত্র গোপাল ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেই উহাদের কর্তার প্রধান। চারিজন তার আছে চেলা, মদন, সুবল, গোরথ, ভোলা তারা এখন বড় মান্যমান॥" "তারা পুরুষ নারীকে ভুলিয়ে আনে মাথায় বুলিয়ে হাত।" প্রতি শুক্রবারে নানা দ্রব্য ও দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন লইয়া যায়। "কোথা ভজন কোথা পূজন। লাগিয়ে দেয় শিবের গাজন, কতকগুলো এক জায়গায় জুটে।" কোন জাতির বিচার নাই। "পরে না কপ্নি বহির্বেশ, নয় বৈরাগী নয় দরবেশ, নয় কোন ভেকধারী। ওরা পুরাণ মানে কি কোরাণ মানে, তার কিছু বুঝিতে নারি। বিধবার নাই একাদশী, বিশেষ শুক্রবারের নিশি, হয় ভোজন যার যে ইচ্ছামত।"

"কর্তা বাজান বাঁশরী, কখন হন নিকুঞ্জ বিহারী। কখন হন কৃষ্ণকালী, কখন হন বনমালী, কখন বা হয় গিরিধারী।" মূলকথা "জুয়োচুরী সব শিক্ষে।" মানুষ কি কর্তা হইতে পারে? "কে এমন দৈব আছে মৃতকে বাঁচায়। কে এমন মনুষ্য আছে কর্তা হতে চায়॥" "অসম্ভব কি হয় রে বোকা, চাঁদের তুল্য জোনাকি পোকা, বাসুকী নাগের তুল্য হয় কি ঢোঁড়া।" তবে এই কর্তা কি প্রকার? "যেন ঢেঁকিশালের কুকুর কর্তা বনের কর্তা পশু।" আসল কথা এই যে "একমাত্র জগতের কর্তা হরি আর কে কর্তা আছে ভবে।" ভগবান নিত্য নিরঞ্জন লীলাহেতু রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কৃষ্ণ হইয়া ব্রজলীলা করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ হইয়া নবদ্বীপ লীলা করিয়াছেন। তাঁহারাই পূজ্য। "মৃত দেহে ঔষধি দিলে ঔষুধে গুণ করেনা। মানুষ কর্তা ভজে কখন পরকালে তরে না।"

১। এই পালাতে মোট ৬টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬২২-৬২৮, গৌরলাল দে সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৭০-১৮০।

কর্তাভজারা জব্দ হইয়াছে। "ছিল ঐ দলে এক প্রধান ভক্ত নিধিরাম চট্টো। তার ছেলে ছিল নারাণপুরে কাশীনাথ ভট্ট।" পাটুলিতে ইহার কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। "কেউ খায় না ভাত, দেয় না হুঁকো, ছিদাম সরকার মণ্ডল বকো ছিল তার সঙ্গী।" রাজার কাছে নালিশ হইয়া গেল তাহাদের বিরুদ্ধে। "রাজার কাছে রাজদণ্ড দিয়ে গেল বাড়ী। কর্তাভজা ত্যাগ করেছে মুড়িয়ে গোঁফদাড়ি।" "গ্রামস্থ সকল লোকে, একঘরে করেছে তাকে, বিপদে বড় ব্রাহ্মণ পড়েছে।"[১]

বসন্ত আগমনে বিরহিণীদের বিরহ বর্ণন[২]

"হেমন্ত মিয়াদগত, বসন্ত হলো আগত, ওষ্ঠাগত বিরহিণীর প্রাণ।" চিৎপুরে বসন্ত রাজার কাছারী, "রতন রায় যতন করে দিয়েছে।" "পিয়াদা পিকবর মধুকর" খাজনা চাহিতেছে। তাহাতে বিরহিণীদের "লোমাঞ্চ হয় কলেবর।" তাহারা সকলে একত্র বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। এক নারী বলিল, "মরি মদনেরই শরাসনে, পাছে পিতা মাতা শুনে, শয়নাসনে পড়ে থাকি জ্ঞানহত।" আর এক বিরহিণী বলিল "কুলীন পতি প্রজাপতি।" বংশজের নারী বলিল, "বিয়ে হয়েছে বাল্যকালে, পতি চিনিনে কোন কালে, যে পর্যন্ত জ্ঞানোদয় হয়েছে।" তার উপর আছে ননদ-শমনের শাসন। ইহার ১৬টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। নমুনা "লক্ষ্মী যেমন শাসন হয়েছেন জগৎ শেঠের ঘরে।" কেহ কেহ বলিল যে বারাঙ্গনা হওয়া ভাল। অপরে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বৃদ্ধকালে বেশ্যাদের যে দুর্গতি হয় তাহার বর্ণনা করিল। "হলে গায়ের মাংস লুলিত, কেউ কবে না কথা, মিলবে না কো ছেঁড়া কাঁথা।" অতএব "ওসব কথা কাজ নাই তুলে, গৌর বলে দুই হাত তুলে, ভেক লয়ে যাই ভেকধারিদের কাছে।" পরে "বাস করিব বৃন্দাবনে, ভ্রমণ করিব বনে বনে, মজা করিব কে কবে কি কথা।" শুনে "কেউ বলে নয় পথ সোজা, ভাল বরং

১। পালাতে মোট সাতটি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৩২-৬৩৭; গৌরলাল দে সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬-৩৬২।

কর্তাভজা, হবে মজা বজায় রবে দুই দিকে।" অতএব, "কর্তাভজা করতে চল যাই সকলে।"[১]

বিরহ[২]

"কতগুলি বিরহিণী বিষাদ অন্তরে। আপন আপন মনের দুঃখ বলচে পরস্পরে॥" ইহারা বারাঙ্গনা। নাগরদের আদর যত্ন হারাইয়া বিরহিণী। ভব বলিতেছে যে তাহার নাগর "ভাবত মনে আমি যেন গুরুপত্নী তার।" "ঠোঙ্গা ভরে খাবার এনে খাওয়াত যতনে!" "এনে দিত স্ত্রীর গায়ের খুলে অলঙ্কার।" কিন্তু সম্প্রতি "রাগ করে চলে গেছে আসে নাক আর।" একজন বলিল যে বয়স বেশি হইলে আর প্রেম থাকে না। "সেটা কেবল যেন ভাই ভাঙ্গা হাটের বাদ্যি।" তারপর সতী অসতী বিচার। অম্বিকা, অম্বালিকা, কুন্তী, মাদ্রী, অহল্যা, মৎসগন্ধা, অঞ্জনা, মন্দোদরী, তারা, গঙ্গা ইহারা হইলেন সতী। কারণ "দেবতাদিগের বেলা লীলা বলি ঢাকে। আমাদের পক্ষে কেবল পাপ লেখা থাকে॥ তারা সবে প্রেম করে পেলে সতী নাম। অনায়াসে লভিলেন ধর্ম অর্থ কাম॥" তারপর প্রেম বিচার। প্রেম দুই প্রকার। বিশুদ্ধ, আর প্রেতত্ব। বিশুদ্ধ প্রেম যেমন ধ্রুব প্রহ্লাদের কৃষ্ণ প্রেম। আর প্রেতত্ব প্রেম, "মন পতঙ্গ পুড়ে মরে অনল শিখাতে। ধৈর্য, শান্তি, নিবৃত্তি আদি পালায় তফাতে।" ইহা ছাড়া আর আছে ফক্ক প্রেম, "তার আগাগোড়া ধোঁকার টাটি, কিছু নহে সাঁচা।"

অতঃপর তাহারা বনে গিয়া বিশুদ্ধ প্রেম সাধন করিবে স্থির করিল। "হৃদয় হইবে অতি রম্য তপোবন। হইবে লাবণ্য তায় কুটীরবন্ধন॥" ইত্যাদি। তারপর "সকলেতে ঐক্য হয়ে বনে প্রবেশিল।" প্রথম দেখা হইল এক লম্পটের সঙ্গে। তারপর এক প্রবীণ আসিয়া সকলকে হরির নামে ডাক দিল। সকলে তখন ভেক লইয়া "গায়ে দিল নামাবলি, বেড়ায় লোকের গলি গলি, গলাতে তিন কণ্ঠী মালা দিল।" নবদ্বীপ ধামে উপস্থিত হইল সকলে।

১। মোট সাতটি গীত আছে এই পালাতে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৩৭-৬৪৫, গৌরলাল দে সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১—২৭২।

সেখানে, "ধনী পেলে আপনার বঁধুর দেখা, অঙ্গে গোপী মাটি মাখা বসে আছে কত রঙ্গে। পূর্বের ভাব সকলি গেছে, ভাবের ভাবুক জুটেছে কাছে, সারি সারি হরিনাম লিখেছে সর্বাঙ্গে॥" প্রেমমণি কহিল, "কপট ভক্তির কর্ম নয়, রিপুজয় করতে হয়, সাধনা কি অমনি হয় পোঁদে দিলে কপ্নি।" ইত্যাদি শুনিয়া "তখন লজ্জা পেয়ে কয় বৈরাগী, আবার মরতে এসেছে মাগী, যার জ্বালাতে হয়েছি দেশান্তরী।" প্রেমমণি কহিল, "আছে কেবল কথার আঁটুনি, লা ডোঙ্গা নাই শুধু পাটুনি, বসে বসে কুকাটুনি, গর্জে গগন ফাটে। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি আছে জানা, ক অক্ষর খুঁজে মেলে না, ডুবুরি নামালে পেটে।" বৈরাগীর অভিযোগ: "নারী সর্বনাশের মূল, নারী হতে নরকেতে বাস।" প্রেমমণি পাল্টা জবাব দিল। বৈরাগী বলিল যে তাহার ভজনে নারী বাগড়া দিতে আসিয়াছে, এবং মনস্থ করিল যে পালাইবে। "এমন সময়ে গৌরমণি তার টিকি ধরলে এসে।" বৈরাগী কহিল "দিলে না দিলে না আমায় ভজিতে গৌরাঙ্গ।" গৌরমনি জোর ধমক দিল, "করিস যদি বাড়াবাড়ি তবে দিব হরিণবাড়ী, না হয় তো পুলি পোলাও পাঠাব।"[১]

স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব: নবীনচাঁদ ও সোণামণি[২]

"বালির উত্তরপাড়ায় বাড়ী, জেতে কায়স্থ উত্তর রাঢ়ী বড় রসিক নামটি তারি নবীনচাঁদ। বড় রসিকা তার রমণী, নামটি তার সোণামণি,……কান্তি ভাল শান্তিপুরের মেয়ে।" একদিন সোণামণি জিজ্ঞাসা করিল, "নারী পুরুষ দুই জন, বিধি করেছেন সৃজন, এ দুয়ের ব্যাখ্যা কর কার॥" তাহার মতে নারীর ব্যাখ্যা বড়, কারণ "নারী অতি প্রশংসার, নারীর নামে এ সংসার, নারী নইলে সকল অন্ধকার।"

নবীনচাঁদ কহিল—"নারীর এখন ভারি সুখ, টাকায় হল নারীর মুখ, পুরুষে হয়েছে বিধি বাম। নারীর বুক ভারি তাজা, মুলুকে হল নারী রাজা, বিলাতে নারী ভিকটোরিয়া নাম॥" তবু "নারীর সঙ্গে সম্ভোগ পুরুষ করে নরক ভোগ

১। এই পালাতে মোট সাতটি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৫২-৬৬১, গৌরলাল দে সংস্করণ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৯-৯২।

দেখেছি আমি শাস্তি শতক পড়ে।” সোণামণি নারীর গুণ কহিল, বৃন্দাবলী ও পাণ্ডবদের নারীর কথা উল্লেখ করিল। “নারী পতির সঙ্গে পুড়ে মরে, কিন্তু পুরুষের দয়ামায়া নাই।” নবীনচাঁদ উত্তর করিল যে নারীর যদি দয়ামায়া থাকিবে “তবে কেন রাধা শক্তি শ্মশানে দেন সজীব সন্তানে।” পুতনা ও কৈকেয়ীর দৃষ্টান্তও দেখান হইল। সোণামণি বলিল যে পুরুষের যে দয়া নাই তাহার প্রমাণ নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ভৃগুরাম মায়ের মাথা কাটিয়াছিলেন, রামচন্দ্র ত্যাগ করিয়াছিলেন পাঁচ মাসের গর্ভবতী সীতাকে। “সেই অবধি সীতা নাম রাখে না কেহ সংসার মধ্যে।”

নবীনচাঁদ বলিল যে সত্য ত্রেতার কথা তুলিয়া কাজ নাই, “আর নাই সে পতিব্রতা নারী।” সহমরণে নারী যে পতিব্রতা তাহা প্রমাণ হয় নাই। “গভর্ণমেণ্টের কৌশলে চূড়ান্ত বিচার, হয়েছে—শাস্ত্র খুঁজে প্রকাশ হয়েছে অত্যাচার, আগুনে পুড়ে মরতে আর দেয় না কেবল অপমৃত্যু বুঝে॥” তারপর দ্বিজ, বৈষ্ণব, কুলীন, সতী কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নির্বাচন করিয়া নবীনচাঁদ কহিল, সতী কে? “পতি যার অতি দীন, অন্নহীন মান্যহীন ছিন্নভিন্ন পরণে জীর্ণ ধুতি। দুঃখের শেষ হেন ব্যক্তি, তার নারীর যে পতিভক্তি, তাকেই বলি পতিব্রতা সতী।” এখন টাকা পয়সা না দিলে আর পতিভক্তি নাই।

সোণামণি বলিল যে পুরুষের অধঃপতন হইয়াছে অনেক বেশি। পথে স্নানের ঘাটে মেয়েরা বাহির হইলে বড় বড় বিদ্বান, দ্বিজ, কুলীন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মেলিয়া ধরে। নবীনচাঁদ জবাব দিল যে মেয়ে মানুষদের লিখিতে দেয় না তাহাতেই তাহারা “ফিকির পাইলে ফকির করে দেয়।” বাসর ঘরে মেয়েদের বিদ্যা কত! “যিনি মুখ দেখান না কুলের বধূ, তিনি সে রাত্রে গান নিধু, রসের ছড়ায় খৈ ফুটে তার মুখে।” তারপর বিদ্যার অপকীর্তির ও মেয়েদের যৌবন-চাঞ্চল্যের কথা কহিল নবীনচাঁদ। সোণামণি উত্তেজিত হইয়া কহিল “পুরুষকে যে বলে ভদ্র, সতের পোঁদে শতছিদ্র, পুরুষের ব্যাভার বড় মন্দ।” দৃষ্টান্ত বিধাতার কন্যার সঙ্গে উন্মত্ততা, ইন্দ্রের অহল্যাগমন, রাবণের ভ্রাতৃবধূ হরণ ইত্যাদি। সোণামণির মতে পুরুষের শাস্তি হইত যদি মেয়েদের বহু বিবাহের আইন থাকিত। তাহাতে “পুরুষের ঘুচিত জারী ঘুচিত জাঁক।” এবার চরম

আঘাত দিল নবীনচাঁদ এই বলিয়া যে বাজারে বারাঙ্গনা হইতে নারীরাই যায়। সোণামণির জবাব "পুরুষ ছাড়া খানকি নাই, আমরা জানি তোমরা এর বাড়া।" "এক হাতে তালি বাজে না," "ষাঁড় লোচ্চা এই যে দুটি, এ দুয়ের কেউ নয়কো খাঁটি।"[১]

কলিরাজার উপাখ্যান ও চার ইয়ারী[২]

"তারাচাঁদ, গোরাচাঁদ, রামচাঁদ, নিমচাঁদ রূপগুণ চারির সমভাব। মনে নাই ভেদাভেদ, প্রাণ এক দেহ অভেদ, সভ্য ভব্য সরল স্বভাব।" চার বন্ধু একত্র বসিয়া আলাপ করিতেছিল। রামচাঁদ কহিল যে মানুষের অধঃপতনের মূল কাল। দেখ "যুগের মধ্যে অধম কলি, তাই অধম কার্যে রত সকলি, সর্বদা বলেন সকলি কাল মাহাত্ম্যে করে।" নিমচাঁদ প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল যে কলির দোষ তো নাই-ই, "অধিকন্তু করলে কলিতে দেব আবাহন, তিন দিনে বাক্‌সিদ্ধ হন, হন সিদ্ধ গুটিকা নায়িকা, পিশাচে।" রামচাঁদ টিপ্পনি করিয়া বলিল, যে তাহা ঠিক, "অন্য বড় গণ্য নয় নায়িকা পিশাচেই বেশী।" নায়িকা অর্থ স্ত্রী। "মাগ হয়েছেন ব্রহ্ম পদার্থ।" নিমচাঁদ বলিল, যে ইহাতে কলির দোষটা হইল কিসে? "চিরদিন ভার্যের অধীন দেখছি শুনছি এ ভারতে।" প্রমাণ শিব, তাঁহার বুকে কালী, মাথায় গঙ্গা। রামচাঁদ বলিল, যে পরম পদের সঙ্গে এই কথার তুলনা হয় না। বর্তমানে পিশাচ-সিদ্ধ যাহারা তাহাদের কথা অন্য প্রকার। "সে পিশাচ ছাড়ালে ছাড়ান যায়, ছাড়ে না এ পিশাচ পেয়েছে যায়, ভেবে দেখ আসল কি নকল।" স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বেশ্যাগৃহে গমন, "ভুলে পিতার শ্রাদ্ধ তর্পণ বেশ্যা চরণে মন অর্পণ।" নিমচাঁদ কহিল যে "এ কর্মটা সর্বকালে আছে, বরং কলিকালে কম দেখতে পাই।" কলির লোক পরস্ত্রীতে বা বারবনিতায় তত রত নয় যেমনটা ছিলেন প্রজাপতি, সুরপতি, পরাশর ও বেদব্যাস প্রভৃতি। রামচাঁদ উত্তর করিল যে, "তখনকার গণিকায়, এদের ঘরে গণি কায়, তাদের নামে শুদ্ধ কায়

১। এই পালাতে মোট ৯টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৪৫-৬৫১, গৌরলাল দে সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬-৪৬৮।

হয় প্রাতঃস্মরণে।" তাছাড়া, "এখন যারা ছিল সদর, তাদের কল্লে অন্দর, অন্দর সদর হয়ে গেল।"

তারপর কলিরাজার দরবার ও বিচার বর্ণনা। "বিশ্বাস ঘাতকী সেরেস্তাদার, দত্তাপহারী পেশকার" প্রভৃতি রাজার অনুচর। কলি রাজার কন্যার বর্ণনা, "কলিকাতার রাস্তার দুপাশে আছে বসে বিদ্যুৎ সমান।" "তামাকটি খান আলবোলায়, নয়ন ঠেরে মন ভুলায়, কত মিঞা পার তলায় পড়ে গড়াগড়ি। মন কেড়ে লন কথার ছলে, কত সহস্র ক্রোড়পতির ছেলে, সদরে আছেন বাঁদরের মত লাগিয়ে গাড়ীজুড়ি। কলিরাজার কন্যা যারা, ধর্মকর্ম জাতি মারা, বেশ্যা রূপে আছে তারা ফাঁদ পেতে কৌশলে।" তারপর মাতাল আর গুলিখোরদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া রামচাঁদ কহিল, "ধন্য কলিকন্যার কি মাহাত্ম্য, ভুলিতে হয় আত্মতত্ত্ব।"

এই বাদানুবাদের মধ্যে গোরাচাঁদ ও তারাচাঁদ চরম কথা বলিয়া মীমাংসা করিয়া দিল। কোন যুগের দোষ নাই, কারণ, "যে যুগের যে বিধান করেছেন গোলকের প্রধান, তার কখন হয়ে থাকে অন্যথা" এবং "পূর্ব জন্মের কর্মফল, ভুগিতে সেই ফলাফল, সকল হয় বিফল, কভু ফলে।" "মিছা দোষ যুগধর্ম, যে যা করে আপনার কর্ম, মিথ্যে লোকের দোষ দাও সকলে।" ইহাতে সকলের সন্তোষ হইল এবং গাহিল, "সার ভাব শ্রীগোবিন্দ শ্রীচরণ।"[১]

বিরহ : প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ[২]

প্রেমমণি আর প্রেমচাঁদের মিলন "যেন চাঁদে আর চকোরে।" সেখানে "বিচ্ছেদ প্রবেশ হয় শেষ।" কিন্তু "দেখে নারীর যৌবন গত প্রেমচাঁদ ত্যজে পুরাতন প্রেয়সীকে, রসবতী নামে রসিকে, মজিল গিয়ে সেই যুবতীর প্রেমে।" প্রেমমণি খলের পিরীতে মর মর হইয়া বিলাপ করিয়া সখীকে বলিল, "ধনি, বিচ্ছেদবিকারে প্রাণ যায় লো।" সখী গিয়া প্রেমচাঁদকে

১। এই পালাতে মোট আটটি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৬৬১-৬৭২, গৌরলাল দে সংস্করণে এই পালাটি নাই।

তিরস্কার করিল। "কঠিন তো অনেক আছে, সকল কঠিন তোমার কাছে হার মেনেছে দেখে কঠিনতা।" প্রেমচাঁদ স্বীকার করিয়া বলিল, যে সে কঠিন এবং পিরীত সমানে সমানে হইয়াছিল কিন্তু এখন প্রেমমণি তাহার কাঠিন্ত অর্থাৎ প্রগাঢ় যৌবন পরিহার করিয়াছে বলিয়া এই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। "তারে কে দেবে অঙ্গ, তার নিরখি অঙ্গ আমার অঙ্গে বাস করে না অনঙ্গ।" সখী প্রেমচাঁদকে কঠিন কথা শুনাইল, "সুজনে সুজনে প্রেম, হীরায় জড়িত হেম, জীবন পর্যন্ত থাকে বন্দী।" প্রেমের দৃষ্টান্ত দিল, শেষে "মূর্খ জনে মিথ্যা বলা" ভাবিয়া প্রেমমণিকে গিয়া সকল কথা জানাইল। প্রেমমণি বিলাপ করিতে লাগিল। বঁধুর সঙ্গে তাহার পিরীত কি প্রকার ছিল তাহা বুঝাইতে "যেমন মাটি আর পাটে, লোহা আর কাঠে" ইত্যাদি ২৯টি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রেমমণি যৌবনকে ভর্ৎসনা করিল, "কি করিলি রে যৌবন, যুবতীর দুঃখের অন্ত।"

একদিন নির্জন পথে পাইয়া প্রেমমণি প্রেমচাঁদকে শাসাইল যে যদি চুরির মাল প্রেমচাঁদ ফেরৎ না দেয় তো তাহার নামে নালিশ করিবে। "রাজা নয় সামান্য নর, তিনি বসন্ত গবরনর, কমিশনার আদি সঙ্গে সব।" প্রেমচাঁদ জানাইল যে সে কিছু চুরি করে নাই সব জিনিসই প্রেমমণির ঘরে মজুত আছে। প্রেমমণি বলিল, "মানে মানে মান ফিরে দাও, মন ফিরে দাও মন-চোরা।"

বসন্ত রাজার দরবারে প্রেমমণি কুলশীলমান দাবী দিয়ে আরজী দাখিল করিল। আরজীটি এই প্রকার, "মহামহিমগুণবন্ত, শ্রীমন্ত রাজা বসন্ত, অশান্ত দুরন্ত ক্ষান্ত শান্তপালকেষু। লিখিতং প্রেমমণি, বিরহিণী কুলকামিনী, বাদী প্রেমচাঁদ কালের স্বরূপ।" ইত্যাদি। প্রেমচাঁদকে ধরিয়া আনা হইল। সে বলিল যে তাহার দোষ নাই, "পিরীত বেটা আমাকে লয়ে যেত ঐ ধনীর আলয়ে", "সে যায় না আমার কি শকতি।" তখনি "পিরীতের গেরেপ্তারি পরোয়ানা হয় পুলিসের উপরে।" চিৎপুরে প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় পিরীতের সন্ধান মিলিল। পিরীত এজাহার দিল যে দোষ তাহার নয়, দোষ বিচ্ছেদের, "সেই বেটা মজালে অবলারে।" "বিচ্ছেদের হুকুম হল গেরেপ্তার।" গোয়েন্দা দিয়া কতগুলি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনীর মধ্যে চোর

বাগানের গলিতে বিচ্ছেদকে দেখে এক ঠাঁই।" বিচ্ছেদকে হুজুরে হাজির করা হইলে "সবাই বলে মার মার।" বিচ্ছেদ সওয়াল করিল, "পিরীতকে পবিত্র করি যখন পিরীতে বাঁধে মলা।" তারপর "বসনের ময়লা যেমন কেটে দেয় সাবানে"; প্রমুখ এগারটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিচ্ছেদ বলিল "সেই রূপ পিরীতির ময়লা কাটি।" দোষ বিচ্ছেদের নয়, দোষ যদি কাহারো থাকে তো সে রূপের। "নারীকে মজালে রূপ।" কারণ "রূপ দেখে প্রেমের উৎপত্তি", "প্রেমচাঁদ প্রেম করেছিল রূপ দেখে।" এখন প্রেমমণির রূপ না থাকাতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

রূপের নামে শমন জারি করা হইল। ভুল করিয়া রূপ গোসাঁইকে "পাকড়া করে আনে রাজসভাতে।" রাজা ভুল বুঝিতে পারিয়া গোস্বামীকে খালাস দিলেন। তখন "নারী মজানে রূপে"র খোঁজে বসন্তের চাপরাশী সৌদামিনী, মদনসদন, কার্তিকেয়, চাঁদের নিকট হইতে ঘুরিয়া, চাঁদের পরামর্শ মত কলিকাতার বৌবাজারে দশ যুবতীর কাছে রূপকে পাইয়া ধরিয়া আনিল। রূপ বলিল যে যার জোরে রূপের থাকা সে না থাকিলে রূপ থাকে কেমন করিয়া। "রূপ থাকে কার কাছে যৌবন যখন গেছে, ত্যজে যুবতীর অঙ্গ।"

যৌবনের নামে পরোয়ানা হইল। উর্বশী বলিল যে যৌবন আছে তিলোত্তমার আশ্রয়ে। তারপর এদিক ওদিক খুঁজিয়া শেষে "রূপের ঘরে করে করে বাঁধিয়ে যৌবনে" বসন্ত রাজার কাছে আনা হইল। যৌবন বলিল "হলে সন্তান তার কাছে মান যৌবনের কি রয়?" কারণ "শিশু অধর দিয়ে আপনি পয়োধরে ধরে।" দোষ শিশু সন্তানের। কাজেই "শিশুর তলপ মওকুপ, ডিসমিস হইল মোকদ্দমা।"

"প্রেমমণি মনোদুঃখে হয়ে মৃত্যুসমা," ধর্ম ঘরে আদালতে আপীল করিল, "আপীলে ফিরিল মোকদ্দমা।" সকল বাদী শরণাগত হইল। "ভেটিয়াছিল যৌবন পুনরায় ধরে উজান," সঙ্গে সঙ্গে রূপ ও প্রেম আসিল, কাজেই "প্রেমচাঁদ সদয় নারীর পক্ষে।" অতঃপর "বরং কিছু প্রাদুর্ভাব হোলো পিরীত বিচ্ছেদের পরে।"[১]

১। এই পালাতে মোট ১১টি গীত আছে

নলিনী ভ্রমর[১]

"দ্বন্দ্ব করি মধুকর করে তীর্থযাত্রা।" ইহাতে বিরহিণী নলিনীর প্রতি "কুমুদী আমোদ করি" নিজের প্রেমের অহংকার প্রকাশ করিয়া বলিল যে, তাহার সহিত কদাপি তাহার বঁধুর বিরহ হয় না। বিবাহ করা স্বামী নয়,— এ তার বঁধু! "আমরা ত প্রেম করে থাকি এমন নয় যে সতী। এমনি ধার করেছি বশ তার তফাৎ নাই এক রতি॥" এবং "পশ্চিমে ভানু উদয় হয় যদি কোন কালে। সাত সাগর শুকায় যদি আমার বঁধুর সঙ্গে মন কি টলে?" ইহাতে কমলিনী বলিল যে অযোগ্যের সহিত প্রেম করিলে পরিণামে ইহাই ঘটিয়া থাকে। "গজমুক্ত গেঁথে দিলাম বানর পশুর গলে।" ফল তো ইহা হইবেই! পদ্মিনী আর ভ্রমরে কিরূপ তফাৎ তাহা বুঝাইতে, যেমন "শুকসারী আর শালিকে, চাকরে আর মালিকে" ইত্যাদি ২৮টি তুলনাগুচ্ছ উল্লেখ করিয়া পদ্মিনী বলিল, "শুন দিদি কুমুদি গো যে দুঃখেতে জ্বলি; কিছু খ-কার ঘটিত খেদের কথা খেদ মিটায়ে বলি।" ভ্রমরের নজর খুব ছোট। "যে জন খড় পেতে খেজুরের চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে। তাকে খাট পালঙ্গ খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে?" অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে কমলিনী ঠকিয়া গিয়াছে। "বেটা রাং দিয়ে নিয়েছে চাঁদি ফেলে ভারি ভোগায়।" সই রে—"মন দিয়ে শঠে" ভয়ংকর ঠকিয়া গিয়াছি। এখন "যেমন চণ্ডালে ব্রাহ্মণে মারে, দ্বিজ প্রকাশিতে নারে, সেই দশা মোর হয়েছে প্রচণ্ড।"

এদিকে ভ্রমর তীর্থে চলিয়াছে, "যেন শুকদেব গোস্বামী ডাকিলে কথা কন না কারু সনে।" পথে শিমূলফুল ভৃঙ্গকে দেখিয়া প্রেম নিবেদন করিল। ইহাতে ভৃঙ্গ চটিয়া গেল। "শিমূলের সঙ্গে পিরীত করে পিরিলি হয়ে থাকতে" চাইল না। কিন্তু তীর্থে যাইবার উপায় কি? "দৈবে এক রাত্রে নৌকা যাচ্ছে গঙ্গা বেয়ে, তাহাতে দক্ষিণ দেশী যত ছেনাল মেয়ে দল বাঁধিয়া কাশী চলিয়াছে।" মধুকর গিয়া নৌকার বাঁশের কোটর মধ্যে মাস্তলে বসিল। কিন্তু সেই নৌকাতেই পদ্মিনীর উপস্থিতি জানিয়া অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিল ভ্রমর।

১। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণের পৃ. ৬৭২-৬৭৮; গৌরলাল দে সংস্করণে এই পালা নাই।

কুড়িটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ভ্রমর বলিল "জ্বরের বালাই বৈদ্য যেমন, ঘরের বালাই উই। আমার পরমার্থের বালাই তেমনি পদ্মি, হয়েছিস তুই।"

গয়াতে উপস্থিত হইয়া ভ্রমর গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিতে গেল। এখানেও পদ্ম। "পাদপদ্ম রবে ভৃঙ্গ মনে ভাবে পদ্ম কি মান্য জগতে!" পণ্ডদান করিবার পর ভ্রম ঘুচায়ে "জ্ঞান প্রাপ্ত হয় অমনি অলি।" তারপর কাশী হইয়া প্রয়াগেতে গিয়ে ভ্রমর মুড়াইল মাথা। এইখানে নাপিতের সঙ্গে তাহার বিবাদ লাগিল। কারণ "নাপিত চুল বলে হুল কেটে তার দিল তাড়াতাড়ি।" মহা মুসকিলে পড়িয়া গেল ভ্রমর। "পদ্মিনীও গেল, অথচ মুক্তিও লাভ হইল না।" দুয়ের বাহির হইয়া ভ্রমর এখন হইয়াছে "মরাও নয়, জীয়ন্তও নয়, যেমন চিররোগী।" এখন "রাম ভজি কি রহিম ভজি" বুঝিতে না পারিয়া বিস্তৃত বিলাপ করিয়া ভ্রমর স্থির করিল, "চল মক্কা কাশী, মন উদাসী, দোনো বিনে তরবো ক্যায়সে।"[১]

নলিনী ভ্রমরের বিরহ বর্ণন[২]

"দিন দুই তিন কমলিনী না হেরিয়া ভৃঙ্গে," কাঁদিয়া কাঁদিয়া কুমুদিনীকে বলিল যে নিশ্চয় ভৃঙ্গ কেতকীর সঙ্গে মজিয়াছে। দেখ অরসিকের সহিত প্রেম করিয়া কি জ্বালা হইয়াছে তাহার। কিছুদিন পর "ভ্রমিয়া নানা বনে নলিনীর কাছে উপস্থিত হইল ভ্রমর।" নলিনী তীব্র ভর্ৎসনা করিল। কাহার কাছে ছিল ভ্রমর এতদিন? "যদি শুনতে পাই স্থলপদ্ম, তোরে দিবে কি স্থল পদ্ম?" ইত্যাদি শাসাইয়া, নিজের অদৃষ্ট ও ভ্রমরের রুচির ব্যাখ্যা করিয়া শেষে পদ্মিনী ভ্রমরের সঙ্গ তাহার পক্ষে কি রকম অপমানজনক তাহা বুঝাইতে যেমন "রাখাল বসে বাদসার পাটে" ইত্যাদি দশটি দৃষ্টান্ত দিল।

নলিনীর কথায় "ক্রোধে জ্বলে কোমর বেঁধে" ভ্রমরও প্রচুর কড়া কথা বলিয়া আর আর ফুলের কাছে তাহার কেমন আদর তাহা বুঝাইতে যেমন "এক জেতে পুরুতের আদর যজমানের কাছে" প্রমুখ তেরটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিল। নলিনীও

১। এই পালাতে মোট ৪টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৭৯-৬৮৯, গৌরলাল দে সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮-৪৫১। গৌরলালের পালাটি খণ্ডিত।

ছাড়িয়া দিল না। তীব্র শ্লেষ করিয়া বলিল "মান্যমান ফুলবান তুমি যে কুলীনের ছেলে।" তদুপরি "চারি পেয়ে হলে পরে তার যেমন মান্য। তুমি ছপেয়ে নাগর আমার তার দেড়া মান্য॥ দু দলে থাকিলে নরে ঠক বলে লোকে। সে দফার চূড়ান্ত তুমি শতদলে থেকে॥" তারপর ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিল নলিনী, "বেটাকে আর দেব না ভাই পাতে ভোজন করতে।" ভ্রমর জবাব দিল যে নলিনীর "এখন প্রাচীন দশা ভোমরা পোষা আর কি লো সয় তোর এমন কালে।" পদ্মিনীর মধু নাই, কাজেই মানও নাই। "কিসে রাখবে কসে, পাপড়ি খসে ফুলের শোভা গেছে।" পাপড়ির শোভা যে পদ্মিনীর কতখানি তাহা বুঝাইতে "কালীর শোভা করে অসি, শিবের শোভা শিরে শশী" প্রমুখ ৩৮টি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিল ভ্রমর।

ইহাতে নলিনী "ঢেকে মকরন্দ করেন প্রেমের দ্বার বন্ধ, প্রতিজ্ঞা আর দেখব না ভ্রমরে।" ভ্রমর কাবু হইল। বিনয় করিয়া কহিল "পিরীত কাজিয়ে রসের কুঠি।" নলিনী ও ভ্রমরের প্রেমের পরিমাণ কত তাহা দেখাইতে "তুমি পর্বত আমি লতা" প্রমুখ ২৩টি দৃষ্টান্ত দিয়া "অনেক রসের কথা বলি প্রাণান্ত করিয়া অলি, মানান্ত করিতে না পারিল।" ভ্রমর কুমুদিনীর কাছে নিজের দুঃখের কথা জানাইয়া বলিল, "সকলি অসার, কাজেই বাসনা বৃন্দাবনে বাস।" বৈরাগী হইয়া ভ্রমর চলিল বৃন্দাবনে। মধুমালতীকে কহিল, "হব বৃন্দাবনবাসী, হতে পার সেবাদাসী।" তাহা হইলে দিব "প্রেমের পথ দেখিয়ে কর্তাভজন করতে হদিস পাবে।" দুইজনে বৃন্দাবনে চলিল। "ভ্রমর প্রেমদাস নাম ধরেন আপনি, সেবাদাসীর নাম গৌরমণি।"

"হেথা নলিনীর মানভঙ্গ, না হেরে নাগর ভৃঙ্গ, বিরহে অস্থির হইল।" পরে "ভেকের বদনে শুনি, ভেক আশ্রিত গুণমণি, কাঁদয়ে প্রাণ ভৃঙ্গ কোথা বলে।" পদ্মিনী ভ্রমরকে পত্র দিল, "লেখনে সুচরিতেষু, আসিতে হইবে.আশু, লিখনং প্রয়োজনঞ্চ বিশেষ।" "ডাকমুন্সী কালো কুকিল।" শিরোনামা ভ্রমরের নামে। কিন্তু ভ্রমর বলিল, আমার নাম প্রেমদাস। পত্র ফিরৎ পাঠাইল। রিয়ারিং পোস্ট পত্র ছিল কাজেই না হইল "কর্মউসুল লাভে হতে ডবল মাশুল।" পদ্মিনী তখন নিজেই বৃন্দাবন চলিল। "দূর হইতে দেখে অলি ধরলে পাছে বলিয়া পলায় অলি পদ্মিনীর ত্রাসে।" নলিনী মিষ্টস্বরে

ভ্রমরকে আশ্বাস দিয়া ডাকিল, কিন্তু "নলিনী যত দেয় আশ্বাস ভ্রমরের অবিশ্বাস" কারণ যদি "ফণী চায় মণি দিতে তার নিকটে ঘনাইতে, ভরসা করে না ভদ্রজনে।" ভ্রমর পলাইয়া গেলে রাগটা নলিনীর পড়িল মালতীর উপর। পরের সোণা কানে পরিয়াছে বলিয়া গালি দিল। শেষে নলিনী ভ্রমরকে বলিল, "বিবাদের পথ না বাধিয়ে মন ফিরে দিয়ে ধরা দিয়ে, আপত ঘুচাও করে আপোষ।" ভ্রমর রাজী হইল না। তখন কমলিনী আরজী লিখে মাজিষ্টরীতে। পরে "বসন্ত মাজিষ্টরের রোকে, মদন দারোগার তদারকে, বৌবাজারে ধরা পড়িলেন অলি।" বিচারে হুলকাটা ব্যবস্থা হইল বেটার। তারপর ফকিরবেশে ভিক্ষাছলে পদ্মিনীর ডেরাতে গিয়া ভ্রমর হাজির হইল, "মেরে নাম মজনু ফকির, মোকাম মেরি মাটিয়ারি।"[১]

ব্যাঙের বিরহ[২] :

"একদিন কার্তিক মাসে মধুপান আশে। উত্তরিলা অলিরাজ নলিনীর পাশে॥ দেখে সোনা ব্যাঙ এক পদ্মপত্র পরে। বসিয়া রয়েছে তথা প্রফুল্ল অন্তরে॥ ভ্রমরের গুণ গুণ রব শুনি সেই ব্যাঙ। জলমধ্যে লাফ দিল প্রসারিয়া ঠ্যাং॥ জলেতে ডুবিল ভেক আর না উঠিল। দেখিয়া অলির মনে সন্দেহ জন্মিল॥" এই গুপ্ত প্রেমের জন্য ভ্রমর নলিনীকে খুব তিরস্কার করিল। "তাইতে এখন নাই সে বরণ, নাই সে মধু আর।" পদ্মিনী বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, "এ যে কার্তিক মাস, পড়িছে শিশির। তাইতে ভেক পত্র পরে, দিবাকর করে, শুকায় শরীর॥" কিন্তু এই "কৈফিয়ৎ শুনিয়ে ভ্রমর অগ্নিসম জলে।" ভ্রমর বলিল, "কাজ নাই পিরীতের পায়ে নমস্কার। তীর্থবাসে যাব হলো বৈরাগ্য আমার।"[৩]

১। এই পালাতে মোট ৯টি গীত আছে।

২। হরিমোহন সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৮৯-৬৯০।

৩। একটি গীত আছে এই পালাতে। উল্লেখযোগ্য এই যে পালা পরিচয়ের অধিকাংশ উদ্ধৃতি গৌরলাল দে সংস্করণ হইতে গৃহীত। গৌরলালে যে পালাগুলি নাই, সাধারণতঃ সেগুলির উদ্ধৃতি হরিমোহন হইতে নেওয়া হইয়াছে। গানের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও উক্ত রীতি অনুসারেই করা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঁচালীর বিচার

ক

বিচারের পটভূমিকা

দাশরথির পাঁচালীর বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমে বিচারের পটভূমিটি ঠিক করিয়া লইতে হইবে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যরস আস্বাদনের মন ও বিচারের মান লইয়া পাঁচালীর, শুধু পাঁচালীর কেন সুবিশাল জন ও লোক সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে ঘোরতর অবিচার করা হইবে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রূপকথার বিচার প্রসঙ্গে যে সুচিন্তিত মন্তব্যটি করিয়াছেন পাঁচালীর বিচার প্রসঙ্গেও অনেকাংশে সেই মন্তব্যটি প্রযোজ্য।[১] কাহারা, কাহাদের জন্য, কি উদ্দেশ্যে, সমাজের কোন পরিবেশে রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কবিমন, পাঠকমন ও পারিপার্শ্বিক এইগুলির দিকে নজর রাখিয়া, উৎস ও পরিণতির সীমারেখার মধ্যে উহার সার্থকতা বিচার করিতে হইবে। বিংশ শতকের পশ্চিমার্ধ হইতে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে হইবে সুদূর অতীতে, একশত বৎসর ছাড়াইয়া উনবিংশ শতকের পূর্বার্ধে। মানস পরিমণ্ডলে এই কালবোধ বা ঐতিহাসিক চেতনা জাগ্রত না থাকিলে, আমাদের বিচার অসঙ্গত বিরূপতার আগুনে দগ্ধীভূত কিংবা অযথার্থ ভাবালুতার রসাতিশয্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ে পাঁচালীর উৎসবিচার ও স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে আমরা নানাদিক হইতে পাঁচালীর, বিশেষতঃ নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর ভাব, বিষয়বস্তু, গঠনপদ্ধতি, প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রমতে পাঁচালী দৃশ্যকাব্য শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু শ্রীরাম পাঁচালী, ভারত পাঁচালী অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালী কালক্রমে শ্রব্য

১। "রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে ইহা গড়িয়া উঠে নাই, আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠন প্রণালী ইহার ছিল না।"—রূপকথা।

(যথার্থভাবে বলিলে পাঠ্য) শ্রেণীতে গোত্রান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর, অর্থাৎ দাশুরায় প্রমুখগণের পাঁচালীর ক্ষেত্রে দৃশ্য হইতে শ্রব্য শ্রেণীতে এই গোত্রান্তরীকরণ ক্রিয়াটি বহুলাংশে কার্যকরী হয় নাই। কেবল পাঠ করিলে যেমন নাটকের ষোল আনা রসভোগ করা যায় না, অভিনয় দর্শনের অপেক্ষা থাকে, নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর ক্ষেত্রেও তেমনি শুধু পাঠ করিয়া ইহার সম্পূর্ণ রসভোগ করা বা পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যায় না। ভাবব্যঞ্জক আবৃত্তি, সুরতাল সমন্বিত গান, ভাবানুগ অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতির মধ্যে যে চমৎকারিত্ব থাকে, শুধু পাঠ করিয়া গেলে পাঁচালীর মধ্যে তাহার এক আনাও লাভ করা যায় কিনা সন্দেহ। পাঁচালীর বিচার প্রসঙ্গে এই কথাটি সর্বদা মনে রাখা উচিত।

অতএব দাশরথির কবিমানস ও দাশরথির পারিপার্শ্বিক যেমন মনে রাখিতে হইবে, তেমনি শুধু পাঠ করিয়া পাঁচালীর সম্পূর্ণ রস আস্বাদনের যে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা আছে, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। সমসাময়িক কালে দাশরথি যে বিপুল খ্যাতি ও অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণসমূহও তৎকালীন ইতিহাসের মধ্যেই অনেকাংশেই রহিয়া গিয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি, এবং আলোচ্য অধ্যায়েও বার বার তাহা স্মরণ করিব। ভাব ও রস পরিবেশনে, বিষয়বস্তু নির্বাচনে, চরিত্র সৃষ্টিতে, ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগে, সর্বত্র জনকবি দাশরথির মধ্যে তদানীন্তন জনমানস বহুলাংশে প্রতিমূর্ত হইয়াছে। স্থান কাল পাত্রের এই পটভূমিকা বর্জন করিলে, সকল সাহিত্যের বিচারের মত, দাশরথির পাঁচালীর বিচারও অপূর্ণাঙ্গ ও ব্যর্থ হইবে।

খ

ভাষা

দাশরথির ভাষা সম্বন্ধে পাঁচালীর বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবনাতে এই মন্তব্যটি করিয়াছেন: "দাশুরায় ভাষারাজ্যের অধীশ্বর। তাহার হাতে ভাষা যেন [illegible] ন্যায় ক্রীড়া করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক পরলোকগত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন—'যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যকরূপে ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।' যিনিই দাশুরায়ের সমগ্র পাঁচালী যত্নপূর্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"[১]

দাশরথি পণ্ডিত ছিলেন না, টোলে বা ইস্কুলে তিনি যথারীতি ভাষা শিক্ষা করেন নাই, কবির দলে সরকারী করিতে গিয়াই তিনি মুখ্যতঃ ভাষাচর্চা আরম্ভ করেন। কবির দলের রচনার বনিয়াদ কথ্য ভাষা। দাশরথির পাঁচালীর ভাষাও সম্ভবত সেই কারণে কথ্য ভাষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনে হয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের বা কাশীদাসী মহাভারতের ভাষার সহিত দাশরথির ভাষার মৌলিক প্রভেদ এইখানে। ভারতচন্দ্রের নাগর ভাষার ভিত্তি দাশরথির কথ্য ভাষার ভিত্তির একেবারে বিপ্রতীপ কোণে অবস্থিত। লঘু অংশ বিশেষে কথ্য ভাষার প্রভাব থাকিলেও ভারতচন্দ্রের ভাষার ভিত্তি নিঃসংশয়ে বিদগ্ধ ভাষা, সাধুভাষা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের এবং দাশরথির সমসাময়িক গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষার বনিয়াদের সহিত দাশরথির ভাষার সগোত্র-সম্বন্ধ আছে। কারণ কথ্য ভাষাকেই মূল ধরিয়া তাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শব্দ চয়নে কিন্তু দাশরথি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই। সংস্কৃত, আর্বী, ফার্সী, হিন্দি, ইংরাজী, দেশী সকল ভাণ্ডার হইতে তিনি প্রয়োজন মত অকৃপণ ভাবে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং আবশ্যক বোধ করিলে প্রাচীন শব্দে নূতন অর্থধ্বনি আনিয়া দিয়াছেন। কবির দলের টপ্পা ও ছড়া রচনা করিতে গিয়া আসরে বসিয়া মুখে মুখে শব্দ চয়ন করিবার যে শক্তি, যে প্রত্যুৎপন্নতা দাশরথি প্রথম জীবনে অনুশীলন করিয়াছিলেন, পাঁচালীকারের জীবনেও তাহার প্রভাব কম কার্যকরী ছিল না। অনুপ্রাস ও মিল খুঁজিবার জন্যও তিনি যথেচ্ছ ভাবে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফার্সী অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞাত ভাষার শব্দসমুদ্র নিবিড়ভাবে মন্থন করিয়াছেন, প্রয়োজনানুসারে শব্দগুলিকে বিকৃতাকারে খণ্ডন করিয়াছেন বা খুসি মত নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রচলিত শব্দকে সম্পূর্ণ নূতন অর্থে ব্যবহার করিবার দুঃসাহসিক

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৪।

দৃষ্টান্তও দাশরথির পাঁচালীতে কম পাওয়া যায় না। স্থল বিশেষে সম্পূর্ণ নূতন শব্দও তিনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন।

দাশরথির পাঁচালীর সর্বত্র ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়ান রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসা লইয়া যে কোন একটি পালার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইলেই শব্দ সম্বন্ধে উপরে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহার যথার্থতা বুঝিতে পারা যায়। সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত এইখানে দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যাই সর্বাধিক। দাশরথির পাঁচালীতেও যে ইহার অন্যথা হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কতগুলি তৎসম শব্দ দীর্ঘ সমাসসূত্রে গ্রথিত করিয়া দাশরথি পাঁচালীতে ব্যবহার করিয়াছেন। সবগুলি না হইলেও উহাদের অনেকগুলিই যে দাশরথির সৃষ্টি তাহাতে ভুল নাই। যথা, দুর্গাধবধব=শ্রীকৃষ্ণ (আর রাখবে না বন্ধুবর্গে, তখন সেই দুর্গে রাখিবেন দুর্গাধবধব, পৃঃ ২৯৪)[১]; পক্ষিনাথনাথ=শ্রীকৃষ্ণ (ওহে পক্ষিনাথনাথ তোমার হে লক্ষ্মীহৃত, পৃঃ ২০৬); শশধরশিরবিহারিণী=গঙ্গা (শশধরশিরবিহারিণি শমনভবনগমনবারিণি, পৃঃ ৬৯০); ত্রিশূলীমোহিনী= কালী (মা তুমি ত্রিশূলধরা ত্রিশূলীমোহিনী, পৃঃ ৬৮); শিশুশশধরভালিনী= কালী (শিশুশশধরভালিনী, শশিশেখরসীমন্তিনী পৃঃ ৪২৬); শিবকর্ত্রী= মঙ্গলকারিণী, কালী (শুভদাত্রী শিবকর্ত্রী কন দৈববাণী, পৃঃ ২১৩); হাটকবরণী=কনকবরণী, দুর্গা (সে হাটকবরণীর হাটে জগজ্জনের যাতায়াত, পৃঃ ১২৪) প্রভৃতি এতজ্জাতীয় অনেক শব্দ আছে।

বাঙ্গালায় নাতিপ্রচলিত অনেক সংস্কৃত ও তৎসম শব্দও পাঁচালীতে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। যথা: পথী=পথিক (দস্যুকে ডরায় পথী, পৃঃ ৫৬); হাটক=সোনা (হাটকবরণীর হাটে, পৃঃ ১২৪); বসু=ধন (দেখেন কাঁদিছে বসু কোথারে অমূল্য বসু, পৃঃ ২১৫); গীর্বাণ=দেবতা (যার ভয়েতে নির্বান গীর্বাণ প্রভৃতি, পৃঃ ৪৩১); তুণ্ড=মাথা (অনিবার্য অতি প্রচণ্ড, কাটিল রাবণতুণ্ড, পৃঃ ৪৩৫); নক্র=কুম্ভীর (বক্র হলে নক্র একেবারে, পৃঃ ১৮); অঙ্ঘ্রিতল=পদতল (অঙ্ঘ্রিতল অতুলনা, পৃঃ ২৪১); অতিরেক=অতিশয় (করি উষ্মা অতিরেক, হাতীকে লাথি মারে ভেক, পৃঃ ২৫৮); জলদগ্নি=জলন্ত

১। সমস্ত উদাহরণ বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ পাঁচালী হইতে গৃহীত।

(আগুন রাগে জলদগ্নি প্রায়, পৃঃ ৪২৮) ; সব্য=(আজানুলম্বিত বাহু সব্য করে শোভে ধনু, পৃঃ ৪২৫) প্রভৃতি অনেক শব্দ আছে।

দাশরথির রচনায় প্রচুর আর্বীফার্সীমূলক শব্দ দেখা যায়। তখনকার বাঙ্গালা ভাষায় আর্বী ফার্সী শব্দের যে স্বাভাবিক প্রাধান্য ছিল দাশরথির রচনা তাহার সরল প্রতিফলনে সমৃদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ফিকির=কৌশল (সেটা শুধু আলাপ নয় পেটটালা ফিকির, পৃঃ ৬৩৮) ; ইয়ার=বন্ধু (ইয়ার জুটে কতগুলি, পৃঃ ৬৪০) ; মুরদ=সামর্থ্য (মুরদ হবে না আড়াই বুড়ি পৃঃ ৩১১) ; মদ্দ=মরদ (সাহসী পুরুষ ভদ্রকালীর পূজা করে মদ্দ হয়েছ ভারি, পৃঃ ৪২২) ; মজলিশ=বৈঠক, (আসর মজলিশ ছাড়া গল্প পৃঃ ৩২) ; শরম=লজ্জা (শরমে শরচ্চন্দ্র কাঁদে, পৃঃ ২৩৬) প্রমুখ শব্দগুলি আমরা হামেশা ব্যবহার করি। কিন্তু আশোক=প্রেম (যদি অশোকের সঙ্গে শুনি আশোক, পৃঃ ৬৭৯) ; হায়া=লজ্জা (ভায়া দয়া মায়া হায়া কায়ামধ্যে নাই, পৃঃ ২৫২) ; জিঞ্জির=শিকল, জেল (রাজকিশোর দত্ত জন্মাবধি গেলেন জিঞ্জিরে, পৃঃ ৬০৮) প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার চালু বাঙ্গালাতে কম। এই জাতীয় অনেক শব্দ দাশরথি ব্যবহার করিয়াছেন। ইস্তক=পর্যন্ত (ইস্তক সন্ধ্যা নাগাদ ভোর, পৃঃ ৬৬৬) ; হাড্ডি=হাড় (তোরেঙ্গে হাড্ডি, পৃঃ ৩১৫) ; রেণ্ডী=বেশ্যা (ব্রাণ্ডী রেণ্ডী গাঁজা গুলি, পৃঃ ৬৪০) ; ঝুটা=মিথ্যা (ব্রজকী গোয়ালিনী ঝুটা রেণ্ডী, পৃঃ ৩১৫) ইত্যাদি হিন্দী শব্দও অনেক আছে।

প্রচলিত ইংরাজী বা ইংরাজীমূল কতগুলি শব্দও দাশরথি ব্যবহার করিয়াছেন। আরগিনি=অর্গ্যান বাদ্যযন্ত্র (আরগিনিতে মন ভুলল না, পৃঃ ২৫০) ; মার্কা=মার্ক, চিহ্ন (শালকে রেখে যবে স্থবে চটকে দিয়েছেন মার্কা, পৃঃ ২৫০) ; সুপ্রীম কোর্ট, ডিক্রি, জজ (সুপ্রীম কোর্টে ডিক্রি হলে কি করিবে জেলার জজ, পৃঃ ৬১৮) ঃ নট= না (হবে বলে তাল ধরিলে শেষকালে নট, পৃঃ ২৬৯) প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ পাওয়া যায়।

খাঁটি সংস্কৃত পদ ও পদাংশ দাশরথি যত্রতত্র যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। অহং=আমি (অহং তীর্থবাসী যোগী, পৃঃ ৩৬৪) ; কুরু=কর (কর পরীক্ষে চক্ষে নিরীক্ষে যে উচিত কুরু, পৃঃ ৫৭৫) ; কিং=কি (কিং ভয় তার মরণে, পৃঃ ৫৭৯) ; তস্য=তাহার (শুন তস্য গুণানুকীর্তন, পৃঃ ২৯৭) ; নাস্তি=নাই

(তোমার বিছা নাস্তি বুদ্ধি নাস্তি, পৃঃ ১৮১) ; ত্বং=তুমি (ত্বং দিবা ত্বং হি রাত্রি , পৃঃ ২১৩) ; প্রসীদ=প্রসন্ন হও (প্রসীদ প্রভু পতিতপাবন, পৃঃ ৪৮৫) ; পুরুষেষু=পুরুষের মধ্যে (পুরুষেষু বিষ্ণু মহারাজ, পৃঃ ২৩৭) ; ময়ি=আমাকে (ময়ি দীনে কর দয়া, পৃঃ ৪৯২) ; ইদমর্ঘ্যং এতৎ পাদ্যং (ইদমর্ঘ্যং এতৎ পাদ্যং সোপকরণনৈবেদ্যং রামচন্দ্রায় নমঃ বলি মুখে, পৃঃ ৪২৭) ; দাসানুদাসোঽহং (দাসানুদাসোঽহং দাশরথ্যতি সুদীন, পৃঃ ৬৯৬) প্রমুখ অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। দাশরথি বহু সংস্কৃত পদাংশ শ্লোকপাদ বাঙ্গালার ফোড়ন দিয়া পাঁচালীতে ব্যবহার করিয়াছেন। দোষা বাচ্যা গুরোরপি (পৃঃ ২৩১), সর্ব ধর্ম বিনশ্যতি (পৃঃ ৪৯৬), বৃদ্ধস্য বচন গ্রাহ্য (পৃঃ ২৫১), ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ৪৯৫), কিং ধনে কিং কুলেন বা (পৃঃ ২৩৬) ইত্যাদি। একেবারে পুরা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহারও আছে :

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ (পৃঃ ১০৫)

দাশরথির প্রযুক্ত সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের মধ্যে অনেক ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। চন্দ্রাননী (প্রমাদ গণি চন্দ্রাননী, পৃঃ ৩৬৫) ; চকোরিণী (চন্দ্র আশ্রিত চকোরিণী, পৃঃ ১৭৭) ; দৌবারিণী=দ্বাররক্ষিকা (লয়ে বৃন্দাদি সঙ্গিনী হয়ে দৌবারিণী, পৃঃ ৮৯) ; বিদ্যাবন্ত=বিদ্বান (এক এক জন বিদ্যাবন্ত, পৃঃ ৩০৩) ; শিখরী=মেনকা (মৃতদেহে যেন শিখরী পাইল জীবন, পৃঃ ৫২৮) ; মান্যমান=মহামানী (মান্যমান বিদ্যমান অপ্রমাণ আছে মান, পৃঃ ৫০৪) ; সতীত্বতা=সতীপনা (সকলি জানি সতীত্বতা ছাড়, পৃঃ ৬৫৭) ; সেবকী=সেবিকা (সেবকী ভেবে কি দয়া হল, পৃঃ ১৭১) ; মাতঙ্গিনী=মহাবিদ্যা (পরে মাতঙ্গিনী যেন মত্তমাতঙ্গিনী, পৃঃ ৪৯২) ; ঐক্যতা=ঐক্য (কার সনে হবে ঐক্যতা, পৃঃ ২০৯) প্রভৃতি অনেক অনুরূপ ব্যাকরণদুষ্ট পদ আছে।

প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিবার দৃষ্টান্তও দাশরথির পাঁচালীতে অল্প নাই। কয়েকটি মাত্র নমুনা দেওয়া হইল। পিতৃপক্ষ, প্রচলিত অর্থ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ, প্রযুক্ত অর্থ পিতার দিক (বাছা হরি ত হয় অরি তোর পিতৃপক্ষে, পৃঃ ৫৭৭) ; চঞ্চলা, প্রচলিত অর্থ লক্ষ্মী,

প্রযুক্ত অর্থ বিদ্যুৎ (নিরখি গগনে চঞ্চলা চঞ্চলা, পৃঃ ৫১৩) ; শিবশক্তি, প্রচলিত অর্থ শিব ও দুর্গা, প্রযুক্ত অর্থ কালিকা (মুখে রাগ হৃদে ভক্তি বুঝিলেন শিবশক্তি, পৃঃ ৪২৯) ; সহবাস, প্রচলিত অর্থ সংসর্গ, প্রযুক্ত অবস্থিতি অর্থে (ভাই সঙ্গে সহবাস, বনে যেন স্বর্গবাস, পৃঃ ৩১) ; দ্বিদল, প্রচলিত অর্থ দ্বিপর্ণ, প্রযুক্ত অর্থ দুই দল (নারদের আনন্দ যেমন দ্বিদলের দ্বন্দ্বে, পৃঃ ২৮০) ; দুষ্ট বাণী, প্রচলিত অর্থ খারাপ কথা, প্রযুক্ত অর্থ দুষ্ট সরস্বতী (শুনি দেবের বাণী দুষ্টবাণী বসেন রাণীর স্কন্ধে, পৃঃ ৩৫২) ; আরতি, প্রচলিত অর্থ আরত্রিক, প্রযুক্ত অর্থ আদেশ, (বলিয়ে চলে মারুতি রামের আরতি ধরি শিরে, পৃঃ ৪৩২); নির্বান, প্রচলিত অর্থ মুক্তি, প্রযুক্ত অর্থ নিবারণ (অমনি বানে বানে লক্ষ্মণ করেন নির্বান, পৃঃ ৪১০) ; তুল, প্রচলিত অর্থ সদৃশ, প্রযুক্ত অর্থ গোলমাল, (বাধায়ে তুল এলি গিয়ে কোথা, পৃঃ ৫১) ; অগণ্য, প্রচলিত অর্থ অগণনীয়, প্রযুক্ত অর্থ তুচ্ছ (হেন গুরু মোর অগণ্য, পৃঃ ৫৭৪) ; অদৃষ্ট, প্রচলিত অর্থ ভাগ্য, প্রযুক্ত ললাট অর্থে (অদৃষ্টে দিয়া হাত ভাবিতেছে, পৃঃ ৩১৯) ; জঘন্য, প্রচলিত অর্থ ঘৃণিত, প্রযুক্ত অর্থ তুচ্ছ, (এ কোন জঘন্য কার্য জন্য জগন্মান্য দাসানুদাসে স্মরণ, পৃঃ ২৬৭) ; অনুব্রত, প্রচলিত অর্থ সদৃশ, প্রযুক্ত অর্থ সর্বদা (অনুগত মোর অনুব্রত রাবণ আমার, পৃঃ ৪৩৬) ।

নূতন অর্থেও দাশরথি কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রচলিত আভিধানিক অর্থের সহিত ইহাদের তেমন কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। বিবন্ধ, মূল অর্থ কোষ্ঠবদ্ধতা, নূতন অর্থ বিপদ (ক্ষম, কেন ঘটাও বিবন্ধ, পৃঃ ৩৬৩) ; অনীল, মূল অর্থ যাহা নীল নহে, নূতন অর্থ নির্মল (অনীল নীলকান্ত মণি, পৃঃ ৩৬৮) ; মহাপ্রেত, ভূতযোনী বিশেষ, নূতন অর্থ ঘোরকৃপণ (মহাপ্রেত সে গিরিবেটা, পৃঃ ৫০২) ; অগ্রসূচী, মূল অর্থ সূচ্যগ্র, ব্যবহৃত অর্থ শীঘ্র, আগে (যদি কিছুকাল অগ্রসূচী আসিতে হে জলদরুচি, পৃঃ ১৩১) ; অচ্ছিদ্র, মূল অর্থ ছিদ্রশূন্য, ব্যবহৃত অর্থ মুক্ত (দয়া করি বীরভদ্র করি দিল অচ্ছিদ্র, পৃঃ ৪৮৪) ; অপ্রমাণ, মূল অর্থ প্রমাণশূন্য, ব্যবহৃত প্রচুর অর্থে (মান্যমান বিদ্যমান অপ্রমাণ আছে মান, পৃঃ ৫০৪) ; অঙ্গহীন, মূল অর্থ দেহহীন, ব্যবহৃত হইয়াছে অনঙ্গ, কামদেব অর্থে (নিরখি ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অঙ্গহীন দেয় ভঙ্গ, পৃঃ ৬৯) ; বিশ্বাস, প্রচলিত অর্থ আস্থা, ব্যবহৃত অর্থ শ্বাসহীন

(বিশ্বাস হইলে বিশ্বাস ঘটে, পৃঃ ৪৪২); বিবরণ, মূল অর্থ বৃত্তান্ত, ব্যবহৃত অর্থ বিবর্ণ (এ যে মন্দ বিবরণ কিছু হয় নাই বিবরণ দিব্য আভরণযুক্ত দেহ, পৃঃ ৪৪৪); বিপাক, আভিধানিক অর্থে জীর্ণতা প্রাপ্তি, ব্যবহৃত অর্থ অজীর্ণ (হবে ভাই বিপাক পরিপাকে, পৃঃ ১৩৯); অতিব্যাপক, প্রচলিত অর্থ বিস্তৃত, নূতন অর্থ প্রগাঢ় দৃষ্টি (আছেন বড় বড় অধ্যাপক, ধর্মশাস্ত্রে অতিব্যাপক, পৃঃ ২২); আর্তি, আভিধানিক অর্থ বেদনা, প্রযুক্ত অর্থ আনন্দ (লাঠালাঠি দেখে বড় আর্তি, পৃঃ ৪৬৬); টিকা, আভিধানিক অর্থ তিলক, প্রযুক্ত অর্থ কলঙ্ক (নির্মল কুলে দিলি টিকে, টিকটিক করিবে লোকে, পৃঃ ১২২); অভ্রম, আভিধানিক অর্থ ভ্রমশূন্য, প্রযুক্ত অর্থ সম্ভ্রমহীন (অভ্রম হয়েছ ত্রিভুবনে, পৃঃ ২০৬); ধ্যান, আভিধানিক অর্থ গভীর চিন্তা, প্রযুক্ত অর্থ প্রণালী (এমনি কি সব লেখার ধ্যান, পৃঃ ১৭); পরিবাদিনী আভিধানিক অর্থ নিন্দাকারিণী, প্রযুক্ত অর্থ কলঙ্কিনী (প্যারী বিনোদিনী হরিপরিবাদিনী, পৃঃ ১৩৬); আস্ত্রিক, আভিধানিক অর্থ অস্ত্রসম্বন্ধীয়, প্রযুক্তার্থ অন্তর (আস্ত্রিকেতে ব্রহ্ম তারা জানি, পৃঃ ৫১৯); বিবর্ণ, আভিধানিক অর্থ মলিন, প্রযুক্তার্থ অসমর্থ (বর্ণন করিতে বর্ণ বিবর্ণ পঞ্চাশ বর্ণ, পৃঃ ৬৯); অত্যাচার, আভিধানিক অর্থ দৌরাত্ম্য, প্রযুক্তার্থ নিন্দা (তোমরা ভবে অত্যাচার করতেছ প্রচার, পৃঃ ৮০); পৌরুষ, আভিধানিক অর্থে পরাক্রম, ব্যবহৃত অর্থ প্রশংসা (দশে পৌরুষ করে থাকে, পৃঃ ৫০৩); কোদণ্ড, আভিধানিক অর্থ ধনুঃ, প্রযুক্তার্থ কোদাল (ষড়রিপু হল কোদণ্ডস্বরূপ, পৃঃ ৬৯৪)।

কোদণ্ড প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপে পণ্ডিতগণের আসরে একদা দাশরথি গানের একটি অংশে এই কথাগুলি গাহিলেন,

ষড়রিপু হল কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্রমাঝে কাটিলাম কূপ,

এইখানে কোদালি অর্থে কোদণ্ড শব্দের ব্যবহার শুনিয়া টোলের একটি নূতন শিক্ষার্থী স্বীয় অধ্যাপকের কাছে দাশরথির শব্দার্থ জ্ঞানের ঘোরতর নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহাতে উক্ত অধ্যাপক ও সমবেত পণ্ডিতগণ জানাইলেন যে কোদণ্ড অর্থ ধনুক, কোদালি নহে। কিন্তু দাশরথির মুখ দিয়া যখন কোদালি অর্থে উহার ব্যবহার হইয়া গেল, তখন কোদণ্ডের কোদালি

অর্থও গৃহীত হইল। ঘটনাটি নবদ্বীপের পণ্ডিতদের দাশরথিপ্রীতির অন্যতম প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে দাশরথি ধনুক অর্থেও কোদণ্ড শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, "আমি কোদণ্ড ধরিলে রে নিতান্ত" ইত্যাদি (লক্ষ্মণ শক্তিশেল, পৃঃ ৪০৯)। অবশ্য উহা হয়ত উল্লিখিত ঘটনার পরেও হইতে পারে।

অনেকগুলি নূতন শব্দও দাশরথির পাঁচালীতে দেখা যায়। মনে হয় এইগুলির অধিকাংশই দাশরথির নিজের সৃষ্টি। মুখ্যতঃ সমাসবদ্ধ করিয়া প্রয়োজনমত অভীপ্সিত অর্থে অলংকার ও ছন্দের মধ্যে প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। তারাকারা=অবিরল (চক্ষে ধারা তারাকারা তারা পানে চেয়ে, পৃঃ ৫১৫); দনুজবৈরঙ্গ=অসুরারি (কোথা দনুজভয়নিবারি দনুজবৈরঙ্গ, পৃঃ ৫৮২); দীনময়ী=দীনতারিণী (দীনময়ি দিবে দিন কতদিনে দীনে, পৃঃ ৫০০); ধড়াপরা=কৃষ্ণ (পোড়াকপালে ধড়াপরাকে, পৃঃ ৩০৯); নির্মায়া=মমত্বহীন (নির্মায়া তোর দেখে আমি মা বলিনা বলি মামী, পৃঃ ৪৮৭); পাকী=পাচিকা (পাকী হন বড় মানী পাক করেছেন পরমান্ন, পৃঃ ৫০৩); প্রেতকীর্তি=ভূতুড়ে কাণ্ড (প্রেত লয়ে প্রেতকীর্তি, পৃঃ ৫০৫); প্রপন্নপালিনী=আশ্রিত-পালিনী (প্রপন্নপালিনী মান রক্ষ, পৃঃ৫৫৬);[১] বিবাদিনী=বিরুদ্ধচারিণী (বিবাদিনী ননদিনী, পৃঃ ৩০৮); বিপদস্থ=বিপন্ন (দেবগণ বিপদস্থ, পৃঃ ৫৭২); মৃতাঙ্গ=মৃতদেহ (মৃতাঙ্গ ছেদন করিবারে, পৃঃ ৪৯৫); ভূতঘটা=ভূতগণ (সঙ্গে কাঁদে ভূতঘটা, পৃঃ ৪৯৭); ভাগ্যধর=ভাগ্যবান (তব পতি ধরাধর ধরাতে কি ভাগ্যধর, পৃঃ ৪৯৭); ভাব্য=চিন্তনীয় (কত ভাব্য ভাবনায়, পৃঃ ১৯৮); শিবকর্ত্রী=মঙ্গলকারিণী (শুভদাত্রী শিবকর্ত্রী কন দৈববাণী, পৃঃ ২১৩); রাগাপন্ন=ক্রুদ্ধ (যে করেছে নিমন্ত্রন্ন তার উপরে রাগাপন্ন, পৃঃ ৫০১); লোপাপত্ত=একেবারে লুপ্ত (কারে জানাইব তথ্য, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাপত্ত, পৃঃ ৫১৯); সৌভার্য=সুশৃঙ্খল (প্রিয়বাদিনী হইলে ভার্যে ঘরকন্না সৌভার্যে, পৃঃ ১০৫); সুমন্ত্রিনী=সুবুদ্ধিদাত্রী (তুমি বট মোর সুমন্ত্রিনী, পৃঃ ৩১৭); জারজাতক=জারজ সন্তান (যা রে যা রে জারজাতক, পৃঃ

১। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর "প্রপন্নার্তিহরে দেবী" ইত্যাদি অনুকরণে রচিত।

৫৮৩) ; নির্বেদন=বেদনাহীন (সে বেদন হল নির্বেদন, পৃঃ ৪১১) ; বিভোগ= দুর্ভোগ (লংকায় যে এত বিভোগ সে কেবল অপরাধের ভোগ, পৃঃ ৪৩১) ; বিচিত্ত=ব্যাকুল (শুনে চিত্ত হয় বিচিত্ত, পৃঃ ১০) ; বিরসমতি=বিষণ্ণ মন (যশোমতী বিরসমতি, পৃঃ ৩৭) ; অবসতি=অবসান, বাসের অযোগ্য (তোর জ্বালায় কি ব্রজবসতি অবসতি হবে একেবারে, পৃঃ ৫১) : জীবনধরবরণ= মেঘবর্ণ (জীবন রাখ রে জীবনধরবরণ, পৃঃ ৫৩) ইত্যাদি।

দাশরথি পাঁচালীতে যে পরিমাণ দেশী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, মনে হয় পূর্বাপর কোন বাঙ্গালী কবি বা সাহিত্যিক এত অধিক সংখ্যক দেশী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় দাশরথিকে "চলিত শব্দ ভাণ্ডারের কুবের ভাঁড়ারী" আখ্যা দিয়াছেন।[১] এইখানেও অধুনা অপ্রচলিত ও নাতিপ্রচলিত কয়েকটি দেশী শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। ওজরটালা (পৃঃ ৩০০) ; খিরকিচ (পৃঃ ৫০৩) ; চেংড়া (পৃঃ ৩০২) ; ডোঙ্গা (পৃঃ ২৫০) ; যবেস্থবে (পৃঃ ২৫০) ; টেক (পৃঃ ১৮৪) ; শুলুক (পৃঃ ১৮৪) ; ডোকলা (পৃঃ ২৯৯) ; ধাঁচা (পৃঃ ৪৯৭) ; থোড়াল (পৃঃ ৪২৯) ; পুনকে (পৃঃ ৪২৯) ; পাঁচুটে (পৃঃ ৪২৯) ; বেওরা (পৃঃ ১৮২) ; ভাতার্তি (পৃঃ ৩২০) ; উটনা (পৃঃ ৩৮) ; সারকুড়ে (পৃঃ ৩১৭) ; অন্নহুড়ো (পৃঃ ১৬৪) ; আখাম্বা (পৃঃ ৪০৬) ; কোৎরা (পৃঃ ৬২৬) ; জুবড়ন (পৃঃ ৩৮৫) ; ধুমড়ী (পৃঃ ২৩)।

শব্দসম্ভার অনেক ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু অফুরন্ত শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ দাশরথির ভাষা, ভাব প্রকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। সাহিত্যাচার্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে "দাশুরায়ের ভাব ভাষাকে টানিয়া আনে, না, ভাষা ভাবকে টানিয়া আনে বলা শক্ত।"[২] বিখ্যাত টীকাকার দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন : "দাশরথির রচনা অনুশীলন করিলে ইহা ধারণা হয় যে কবিত্ব শক্তির সহিত অপূর্ব ভাষা সম্পদ থাকাতেই উহা এমন লোকপ্রিয়। ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল বলিয়াই তিনি যেখানে যে রস ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে সেই রস অবাধে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৯৯৮।

২। বঙ্গবাসী দাশরথির পাঁচালী, ৪র্থ সংস্করণ, সমালোচনা, পৃঃ ২৫

ভাষা যেন প্রবাহের মত চলিয়াছে। অনেক স্থানে কোথাও কষ্ট রচনা লক্ষিত হয় না। দাশরথির ভাষার আর এক গুণ উহার সরলতা। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সহজ ও সুখবোধ্য।" ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্যও অনুরূপ : "দাশরথির রচনা অলংকৃত হইলেও অনায়াস সরল।"[১]

এইবার দাশরথির বাক্য প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করিয়া এই অংশ শেষ করিব। পাঁচালীর অনেক বাক্য ও বাক্যাংশ প্রয়োগে অনেক রকমের বৈচিত্র্য দেখা যায়। অলংকরণের চাতুর্য, অন্ত্যানুপ্রাস বা মিলের আকস্মিকতা এইগুলি তো আছেই, ইহা ছাড়া নানাধরণের বৈয়াকরণ অশুদ্ধ প্রয়োগের আতিশয্যও কম নাই। এই সব দুঃসাহসিক প্রয়াসের মধ্যে জনকবি দাশরথির লোকপ্রিয়তার রহস্য কী পরিমাণে লুক্কায়িত ছিল, তাহা আজ একশত বৎসর পরে বিচার করা কঠিন হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবির দলের সরকারীতে সিদ্ধহস্ত দাশুরায়ের অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা ও দুঃসাহসিক বাক্যপ্রয়োগ চাতুর্য যে সমসাময়িক শ্রোতৃবর্গকে মশগুল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সন্দেহাতীত। দাশরথির ব্যবহৃত প্রবাদ বাক্যের একটা নির্বাচিত সংগ্রহ আমরা পরিশিষ্টে সংকলিত করিয়াছি। এইখানে কিছু প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। সুনিদ্র সূতিকা ঘরে (জন্মাষ্টমী, পৃঃ ১৫)=যে সূতিকা ঘরের লোকজন গভীর নিদ্রামগ্ন; মাংসপিণ্ড অস্থি নাস্তি ছিল (রামবিবাহ, পৃঃ ৩৩৪) নাস্তি=না; প্রকোপ সে কোপ ছাড় মোরে (কুরুক্ষেত্র মিলন, পৃঃ ৩০৯) =আমার প্রতি সে ভীষণ ক্রোধ ত্যাগ কর; ইহার অন্তরীভূত কেটা (প্রহ্লাদ চরিত্র, পৃঃ ৫৭৪)=ইহার পশ্চাতে কে আছে; হব বলি তাল ধরিলে শেষ কালেতে নট (সত্যভামার দর্পচূর্ণ, পৃঃ ২৬৯)=নট, ইংরাজী Not; রাক্ষস প্রতি চাক্ষুস ছিল না (লবকুশের যুদ্ধ, পৃঃ ৪৫৯)=চোখ দিয়া দেখি নাই; ঢালেন গাড়ুর জল ভূপতি বর্ধিষ্ঠ (বামনভিক্ষা ২, পৃঃ ৬১২), বর্ধিষ্ঠ=মহান; মূর্খ অতি বিদূষক হয় (বামনভিক্ষা ২, পৃঃ ৬১৪) অর্থাৎ পরের দোষদর্শী; তুষ্কর দেখিয়া ভাবে তস্করের মত (কমলে কামিনী, পৃঃ ৫৮৬): এখানে কেবল তুষ্করের সঙ্গে মিলের জন্য তস্কর দেওয়া হইয়াছে, ইহা ছাড়া আর কোন সার্থকতা নাই। বৃন্দে গো গোবিন্দের আশা প্রত্যয় নহে প্রত্যাশা (মানভঞ্জন

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, সং পৃঃ ৯৯৮।

প্রথম, পৃঃ ১২৮) প্রত্যয় ও প্রত্যাশার অর্থের দ্যোতনা লক্ষণীয় ; তোমার এবে সম্ভ্রম মনে হয় মনের ভ্রম, অভ্রম হয়েছে ত্রিভুবনে (মাথুর দ্বিতীয়, পৃঃ ২০৬), অভ্রম=সম্ভ্রমহীন ; হয়ে রণ সজ্জীভূত (রাবণবধ, পৃঃ ৪৩০)=রণসজ্জিত ; কপালে দিয়ে হরিমন্দিরে নারী মন্দিরে চুরি (অক্রূরসংবাদ দ্বিতীয়, পৃঃ ১৭৯) হরিমন্দির=তিলক ; দ্বারে দ্বারে সব ছিল খিল অমনি হল অখিল (জন্মাষ্টমী, পৃঃ ৯) অখিল=খিলশূন্য ; সীতাকে করিতে দণ্ড অমনি হল উদ্দণ্ড অন্বীয়ভাবে অসি লয়ে (সীতা অন্বেষণ, পৃঃ ৩৭৭) অন্বীয়ভাবে=শত্রুভাবে ; প্রভুর সঙ্গে আমার বড় হৃদ্য (কুরুক্ষেত্র মিলন, পৃঃ ৩০৪) হৃদ্য=হৃদ্যতা ; তোমার কি আছে লোকলৌকতা (কুরুক্ষেত্র মিলন, পৃঃ ৩০৪) লৌকতা=লৌকিকতা ; হয়েছেন অবতরি বামনরূপেতে (বামনভিক্ষা দ্বিতীয়, পৃঃ ৬০৬) অবতরি= অবতীর্ণ ; এমনি গলি বার করেছ ভাই (নন্দোৎসব, পৃঃ ২৪) গলি=ফিকির, Way এই ইংরাজি শব্দের ধ্বনি ; সাধুর অধরামৃত খাও হে (বিরহ ২, পৃঃ ৬৪৩) প্রসাদ খাও ; রামনামে রাগ তুলিলে রাশি রাশি পাপ ছাড়ে (শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৬১৯) রাগ তুলিলে=গান ধরিলে ; তার সজ্জা দেখে লজ্জা পেয়ে পলায় সূর্যাঙ্গজ (বামনভিক্ষা ২, পৃঃ ৬০৩) সূর্যাঙ্গজ=যম ; শ্যামাপূজায় বসু আনা (বামনভিক্ষা ১, পৃঃ ৫৯৭) ; বসু আনা=আট আনা ; মাবারি-মৃত্তিকা মাখ (অক্রূরসংবাদ ১, পৃঃ ১৬০)=গঙ্গা মাটি মাখ ; পড়ে থাকে বেশ্যাবাড়ি হয়ে তাদের আজ্ঞাকারী (বিরহ ২, পৃঃ ৬৪০) আজ্ঞাকারী= আজ্ঞাধীন ; আসন করি-অরিপৃষ্ঠে নিরখিলাম দৃষ্টে হাস্যাননে (মহিষাসুরের যুদ্ধ, পৃঃ ৫৭০) করি অরিপৃষ্ঠে=সিংহপৃষ্ঠে, দৃষ্টে=চক্ষুতে ।

গ

ছন্দ

দাশরথির ছন্দের বনিয়াদ হইতেছে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। মুখ্যতঃ এই তিনটি ছন্দেই তাঁহার সমগ্র পাঁচালী রচিত। কিন্তু মজার ব্যাপার হইতেছে এই যে, পাঁচালীর মধ্যে ছন্দের বিশুদ্ধি একেবারেই রক্ষিত হয় নাই। পাঁচালী পাঠ করিলে নিঃসংশয়ে ধারণা হয় যে ছন্দের সুতীক্ষ্ণ কান দাশরথির

ছিল, শব্দের কুবের ভাণ্ডারের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তবুও সমগ্র পাঁচালীর মধ্যে অশুদ্ধ ছন্দের যে প্রাচুর্য দেখা যায় তাহার কারণ, অন্ততঃ প্রধান কারণ বোধহয় এই যে এই বিষয়ে সযত্ন ও সতর্ক হইবার কোন প্রয়োজন বা তাগিদ দাশরথি বোধ করেন নাই। পাঁচালী দৃশ্য কাব্য। গানের মধ্যে সুরে ও তালে যেমন কথার দৈন্য ও ত্রুটি ঢাকা পড়ে তেমনি পাঁচালীর আবৃত্তির আড়ালে ইচ্ছামত ধ্বনির সংকোচন ও প্রসারণে ছন্দের ত্রুটিকে এড়াইয়া যাওয়া যায়। দাশরথি নিজেই পাঁচালী গাহিতেন বলিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন বেগ পাইতে হয় নাই এবং এই কারণেই হয়ত ছন্দের বিশুদ্ধির দিকে কোন বিশেষ নজর দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

দ্বিতীয় কথা এই যে দাশরথির কবির দলের অভিজ্ঞতা ছিল। আবৃত্তি করিবার সময় মিলের চাতুর্য, অনুপ্রাস-যমকের অনুরণন মাধুর্য, গূঢ় অর্থের সংকেত ও ব্যঞ্জনা, বক্তব্য বিষয়ের তাৎপর্য ও চমৎকারিত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য সুর ও কণ্ঠস্বরের দ্রুত মন্থর উচ্চ নীচ বিস্তার এই সবই যে জনচিত্তে বিপুল আনন্দ সঞ্চার করিত, তাহা তিনি সম্যক জানিতেন। সেই জন্যই দাশরথি আলোচ্য ভাবটিকে জনমনগ্রাহ্য ও সরস করিবার ঝোঁকে ছন্দের বেড়া খুসিমত ডিঙাইয়া গিয়াছেন, এবং আবৃত্তির কৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকায় প্রয়োগ ক্ষেত্রে পাঁচালী কদাচ অশ্রাব্য ও কটু হইয়া উঠে নাই।

এইবার দাশরথির পাঁচালীতে ব্যবহৃত নানা ছন্দের কিছু নমুনা দিতেছি।

পয়ার : একদিন সখীসহ শ্রীমতী রাধায়।
মন্ত্রণা করিল সবে বসিয়া কুঞ্জায়॥
হরিকে ভুলাব অন্য করিরূপ হইয়া।
দেখি কৃষ্ণ কি করেন কুঞ্জায় আসিয়া॥

—নবনারীকুঞ্জর (২), পৃঃ ৯৭

তরল পয়ার :

১ অতিত্রস্ত নিকটস্থ ব্রহ্মার নন্দন।
প্রেমানন্দে সদানন্দে করেন বন্দন॥

—কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন, পৃঃ ৩০৫

২ বলে, স্বর্ণলতা বিবর্ণতা রাশি তোর কুমারী।
করি ভিক্ষা প্রাণরক্ষা করেন ত্রিপুরারি॥
সবে ধন উমা ধন আরাধনের ধন।
রাখিতে চাই ঘরজামাই মানে না ত্রিলোচন॥

—আগমনী (১) পৃঃ ৫২৫

দীর্ঘ পয়ারও আছে। অনেক জায়গায় দাশরথি হিল্লোলিত পয়ার রচনা করিয়া রসসৃষ্টি করিয়াছেন। যথা—

মুনি কন রসনা তুমি যদি বল রাম রাম।
চরণ চলরে যথা রামগুণধাম ধাম॥
জপরে যতন করি জানকীরমণ মন।
লোভ তুমি সঞ্চয় কর শ্রীরাম সাধন ধন॥
শ্রীরাম নামের মালা ধারণ রে কর কর।
করে পাবে মোক্ষ ধন দিবেন রঘুবর বর॥

—লবকুশের যুদ্ধ, পৃঃ ৪৭৪

পাঁচালীর অনেক জায়গায় এরূপ পদ পাওয়া যায়।[১]

লঘু ত্রিপদী :

১ যত দেবগণ সুখেতে মগন,
নিরখিতে জননী রে।
সবে স্ববাহন করি আরোহণ
চলিলেন গিরিপুরে॥

—শিববিবাহ, পৃঃ ৪৯৮

২ নয়নে নয়ন কমলনয়ন
করেন গোপন ছলে।
আর চক্ষে চাই নিরখিতে রাই
অভিমানে যান জ্বলে॥

—কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন, পৃঃ ৩২১

১। কলঙ্ক ভঞ্জন (২), পৃঃ ১২৬ : বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৭৬ : বামনভিক্ষা (১) পৃঃ ৫৯৯ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

দীর্ঘ ত্রিপদী :

শ্রবণে সুখ শুকবাক্য মহাবীর হিরণ্যাক্ষ
হিরণ্যকশিপু নাম ধরে।
দিতি গর্ভে দুই দৈত্য দম্ভে কম্পে স্বর্গমর্ত্য
সদা জয়ী অমরসমরে॥
দৈত্য ভয়ে অপদস্থ দেবগণ বিপদস্থ
স্বপদ রহিত সর্বজনে।
দেখে ঘোর তেজস্কর ভাস্কর মানে দুষ্কর
শমন স্বমনে শংকা মানে॥

—প্রহ্লাদচরিত্র, পৃঃ ৫৭২

লঘু চৌপদী :

কে করে রক্ষে যম বিপক্ষে বসিয়ে বক্ষে ধরিবে কেশে।
সে কমলাক্ষ সহিত সখ্য থাকিলে মোক্ষ পাইবে শেষে

—শিববিবাহ, পৃঃ ৪৯৯

দীর্ঘ চৌপদী :

এই মতে শীঘ্র গতি উপনীত হইল তথি
যে স্থানেতে পশুপতি বৃক্ষমূলে বসি।
দেখে সবে মহেশ্বর হয়েছেন দিগম্বর
কটি হৈতে বাঘাম্বর পড়িয়াছে খসি॥

—দক্ষযজ্ঞ, পৃঃ ৪৭৭

এই সব ত্রিপদী চৌপদী ছন্দে অনেক সময় অন্ত্যবর্ণের মিলের মধ্যে হে, লো, রে, তো, লেন ইত্যাদি যোগ করিয়া এবং পয়ারের মধ্যে কখনো একটানা [illegible] বা ট্ট, কখনো ক্ষে, ক্যে, থ্যে, কখনো হ্ন, ম্ন, র্ণ, ন্ত, কখনো বা সিতে, শীতে, সীতে এই নানা ধরণের অন্ত্য বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছাদি ব্যবহার করিয়া একটা ধ্বনিগত দোলা সৃষ্টির পরিচয় পাঁচালীর অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

ত্রিপদী :

১ কে তুমি নীলবরণি কার সুতা কোকিলধ্বনি
তুমি কার ঘরণী বল তো ॥
কও না প্রয়োজন থাকে বিরলে গিয়ে কও আমাকে
সম্প্রতি রাইকুঞ্জ থেকে চল তো ॥

এই রকম 'তো' অন্ত্য পর পর চারটি শ্লোক চলিয়াছে।

২ নারদে কাশ্যপমুনি কহি নানা স্তুতিবাণী
আনন্দে বামনদেবে আনিলেন।
অগ্রে অধিবাস করে বসুধারা দিয়ে দ্বারে
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ তারপরে করিলেন ॥

—বামনভিক্ষা (২), পৃঃ ৬০৯

এই রকম 'লেন' যোগে ক্রমান্বয়ে ছয়টি শ্লোক আছে।

চৌপদী :

১ বিবাহকালে দেখেছ কাল এখন কালের সেই কাল
দর্প করে সেই কাল সর্পগুলি তায় লো।
সেই ডম্বুরের ধ্বনি দেখে এলাম ওলো ধনি,
সেই রূপ কুল কুল ধ্বনি হরের জটায় লো ॥

—কাশীখণ্ড, পৃঃ ৫৩৯

'লো' যুক্ত এই রকম পর পর পাঁচটি চৌপদী আছে।

২ কেমনে কক্ষে দেই বাকল মনে করতে প্রাণ বিকল,
দাসী হতে এই সকল কেমনে শোভা পায় হে।
যে গলে মালতীর হার পরিয়ে করি পরিহার,
মরে যাই, কেমনে হাড় মালা দিব গলায় হে ॥

—মানভঞ্জন (১), পৃঃ ১৩৭

এই রকম 'হে' যুক্ত পর পর চারটি চৌপদী আছে।

পয়ার : কালীদহে কমলে কামিনী উপবিষ্ট।
উপমা নাই কোন রূপ রূপের গরিষ্ঠ ॥

অনঙ্গ হইতে অঙ্গ কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ।
কটি দেখে কেশরী পলায় পেয়ে কষ্ট ॥
—কমলেকামিনী, পৃঃ ৫৮৫

অন্ত্যবর্ণে এই রকম 'ষ্ট' ও 'ষ্ঠ' যুক্ত সাতটি শ্লোক আছে।[১]

ছন্দ সম্বন্ধে দাশরথির অসতর্কতা ও অমনোযোগিতার কথা পূর্বে বলিয়াছি। আবৃত্তির ঝোঁকটাই মুখ্য নিয়ামক ছিল বলিয়া অক্ষর সংখ্যার, মাত্রার, পর্বের, পর্বাঙ্গের কোন কিছুরই ন্যূনাধিক্য বিষয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামান নাই। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে বর্ণনা করিতে করিতে একটি শ্লোকের পূর্বার্ধের প্রথম দুই পাদকে প্রয়োজনবোধে পাঁচগুণ করিয়া অর্থাৎ দশপাদে প্রবর্ধিত করিয়া আবৃত্তি করিতে দাশরথি কোন ইতস্ততঃ করেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

কহেন বসন্ত ভূপ শিশুর তলপ মহৎকূপ
ডিসমিস হইল মোকদ্দমা।
শত্রু নেচে উঠিল সুখে প্রেমমণি যায় অধোমুখে,
মনোদুঃখে হয়ে মৃত্যুসমা ॥
মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দিলেন বনমালী
অপমানটা হল খালি মুখে উঠে মার্গের কালি,
প্রেমচাঁদের সাহস আলি বেড়ে উঠল নাগরালি,
পিরীত দিচ্ছে গালাগালি বিচ্ছেদ দিচ্ছে হাততালি,
রূপ বলছে মরুক শালী যৌবন বলে পোড়াকপালী
আবার আমাকে চান।
হেঁলো বেটী একি বেজায়, দোয়া দুধ কি বাঁটে যায়
ছেড়ে কি গঙ্গা ফিরে বাউরে যান ॥
—প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ, পৃঃ ৬৭২

১। ষ্ট, ষ্ঠ দিয়া ১২টি শ্লোক বামনভিক্ষাতে, (২) পৃঃ ৬১২ এবং ৬টি শ্লোক, মানভঞ্জন (২), পৃঃ ১৩৩ : ক্কে, খ্যে, ক্যে, ইত্যাদি যুক্ত ১২টি শ্লোক মানভঞ্জন (২), পৃঃ ১৩৮ : হ্ন, ন্থ, র্ণ, ন্ন ইত্যাদি যুক্ত ৬টি শ্লোক কমলেকামিনী পৃঃ ৫৮৫ : সিতে, শীতে, সীতে ইত্যাদি যুক্ত ৯টি শ্লোক রাবণবধ, পৃঃ ৪৩৯ ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত পাঁচালীতে পাওয়া যায়।

চৌপদী ক্ষেত্রে এই ধরণের অন্য দৃষ্টান্ত :

খেদ করে বলে পবন ঘুচালে বেটা রাবণ
মুক্ত করি তার ভবন ভারি কর্ম ভোগে।
মনের দুঃখে বলে অগ্নি আমার কপালে অগ্নি
ভেবে মোর মন্দাগ্নি রন্ধন কালে যোগাই অগ্নি
না যোগালে রেগে অগ্নি দেখে শঙ্কা লাগে ॥

—রামচন্দ্রের বনগমন, পৃঃ ৩৫১

ইহা ছাড়া এক ছন্দের সহিত অন্য ছন্দের মিশ্রণ ও যোগ তো প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। পয়ারের মধ্যে ত্রিপদী, বা ত্রিপদীর সঙ্গে চৌপদীর সংযুক্তি খুসিমত যত্রতত্র করা হইয়াছে। একই শ্লোকের প্রথম দুই অংশেও বিভিন্নতা আছে।

দেখি বাকি হদ্দ একটি পাই ভারতবর্ষে মদ্যপায়ী
আর দেখতে পাই না পাই কিছুদিন বাদেতে।
ঢাকে কি ধর্ম ঢাকবাজায় থাকবে নাকো মান বজায়
ফেলবে প্রমাদেতে ॥

—কলিরাজার উপাখ্যান, পৃঃ ৬৫০

ইহার প্রথমার্ধ চৌপদী, দ্বিতীয়ার্ধ ত্রিপদী।

দাশরথির পাঁচালীর ছড়াগুলিও সব এক ছন্দে রচিত নয়। অনেকগুলি একেবারে খাঁটি পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

পয়ার ছড়া : অসতী না করে যত্ন পতিরত্ন ধনে।
বিজ্ঞ লোক দেখি যত্ন করে না অজ্ঞানে ॥
দেবদ্রব্য বলি কখনো যত্ন করে শিশু।
মুক্তাহার যত্ন করে কি গলায় পরে পশু ॥
নির্গুণ নিকটে নাই গুণীর যতন।
মানীর না করে যত্ন অহংকারী জন ॥
তুমি ভবসিন্ধুত্রাণকর্তা ভবারাধ্য ধন।
নন্দ কি জানিবে হরি তোমার যতন ॥

—অক্রূরসংবাদ (২), পৃঃ ১১২

ত্রিপদী ছড়া : কৃষ্ণশূন্য গোকুল কি প্রকার ?

যেমন, বিষয়শূন্য নরবর, বারিশূন্য সরোবর
বস্ত্রশূন্য বেশ।
দেবীশূন্য মণ্ডপ কৃষ্ণশূন্য পাণ্ডব
গঙ্গাশূন্য দেশ॥ ইত্যাদি

—কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃঃ ২৯৮

অন্যান্য ছড়ার নিদর্শন :

১। মাটি আর পাটে। লোহা আর কাঠে॥
দেবতা আর কুসুমে। জরি আর পশমে॥
গুড়ে আর ছানায়। মুক্ত আর সোনায়॥ ইত্যাদি

—প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ, পৃঃ ৬৬৪

২। তুমি জমি আমি কৃষাণ। তুমি ভাঁড় আমি দশান॥
তুমি খোঁপা আমি চাঁপা। তুমি তাবিজ আমি ঝাঁপা॥

—নলিনীভ্রমর (২), পৃঃ ৬৮৪

৩। রাবণের দ্বেষ হনুমানে। বৈরাগীর দ্বেষ বলিদানে॥
কুপুত্রের দ্বেষ বাপখুড়াকে। ষষ্ঠীর দ্বেষ আঁটকুড়াকে॥

—লবকুশের যুদ্ধ, পৃঃ ৪৬০

কতগুলি স্থান আছে একটানা হালকা মিলের আবেগে উচ্ছল :

বীরভদ্র বলে ধর রাগে করে গর গর,
ভৃগুর ধরিয়া কর দাড়ি ছেড়ে পড় পড়
বহিয়া তার কলেবর রক্ত পড়ে ঝর ঝর
মুখে নাহি সরে স্বর গলা করে ঘর ঘর
ভূমে পড়ি মুনিবর করিতেছে ধড় ফড়। ইত্যাদি

—দক্ষযজ্ঞ, পৃঃ ৪৮৩

পাঁচালী পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ছন্দ সম্বন্ধে দাশরথির যথেষ্ট জ্ঞান ছিল কিন্তু তাঁহার একান্ত অসতর্কতার জন্যই প্রায় সর্বত্র ছন্দপতন

দোষ ঘটিয়াছে। আর এই যে অসতর্কতা তাহাও আসিয়াছে অপ্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্য। আবৃত্তি করিয়া, সুর করিয়া পাঠের আড়ালে এই ছন্দপতনগুলি ঢাকা পড়িত এবং অন্ত্যানুপ্রাসের আশ্রয়ে প্রচলিত ছন্দের রীতি লঙ্ঘন করিয়া বা পর্বগুলির মাত্রা সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সাধন সত্ত্বেও শ্রোতৃবর্গের মনে দোলা লাগিত, হয়ত পাঁচালীকার দাশরথি এই দিকটাতেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়া থাকিবেন।[১] দাশরথির ছন্দের এই অবাধ স্বাধীনতা ও অফুরন্ত গতিবৈচিত্র্য দেখিয়াই ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ইহার নাম দিয়াছেন: "The metre for the masses."[২]

ঘ

অলংকার

দাশরথির পাঁচালীতে অলংকারের ভিত্তি হইতেছে অনুপ্রাস ও উপমা। এই দুইটি অলংকার সর্বকালে সকল কবিরই প্রিয়। "বস্তুতঃ অনুপ্রাস ও উপমা ইহারাই শ্রেষ্ঠ কাব্যালংকার। অনুপ্রাস যেমন বর্ণসাম্য ও ধ্বনিসাম্য, উপমা তেমনি রূপসাম্য ও অর্থসাম্য। একের কারবার শব্দজগৎ ও সঙ্গীত লইয়া, অপরের কারবার দৃশ্যজগৎ ও চিত্রজগৎ লইয়া।"[৩] "এক অলংকারের প্রসাদে কানের কাছে শব্দসমূহ সমান অনুভূত হয়, অপর অলংকারের প্রসাদে মনের কাছে বস্তুসদৃশ প্রতীয়মান হয়।"[৪]

১। কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "আবৃত্তিকালে ফাঁক থাকিলে সুরে ভরিয়া লওয়া হইত, মাত্রাধিক্য থাকিলে জলদ উচ্চারণে সুর ঠিক রাখা হইত। ইহাই পাঁচালীর আসল ছন্দ।" প্রাচীন সাহিত্য, ৩য় অংশ, পৃঃ ৩৭০।

২। History of Bengali Language & Literature—D. C. Sen, p. 818.

৩। কাব্যশ্রী—ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, পৃঃ ২২।

৪। প্রমথ চৌধুরী রচিত চিত্রাঙ্গদা প্রবন্ধ, কবি পরিচিতি, পৃঃ ৪১।

অনলংকৃত শ্লোক বা চরণ দাশরথির পাঁচালীতে বিরল। অনুপ্রাস-প্রাধান্য এত বেশি যে পাঁচালীর যে কোন একটি পৃষ্ঠা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই অনুপ্রাসের অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, এবং এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে সে অরণ্যে সর্বত্রই সুগন্ধ বর্ণিল ফুলের বাহার নাই, কিছু কিছু উদ্ধত কণ্টকও আছে।

অনুপ্রাসের শ্রেণীবিভাগের নানা রকমফের ও বিশ্লেষণবাহুল্য বাদ দিয়া কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাউক।

১ শুষ্ক তরু মুঞ্জরে গুঞ্জরে কুঞ্জে অলি।—মাথুর (৩), পৃঃ ২১৫

২ যতদিন থাকে কান্ত ঐ কান্তে ঐকান্ত
করে কাল কাটায় যুবতী।—বিধবা বিবাহ, পৃঃ ৬৩০

৩ ত্যাজি পতির অনুমতি যশোমতী অযশ অতি
হবে সেই দায়।—গোষ্ঠলীলা (২), পৃঃ ৩৯

৪ কালস্বরূপ কাল কোকিল কাল বসন্তকালে।—কৃষ্ণকালী, পৃঃ ৬৩

৫ চিন্তিলে চিন্তা হরে চিন্তে যারে বিধি হরে।
সজনি, চিন্তাজ্বরে ওষধি শ্যামচিন্তামণি।—কৃষ্ণকালী, পৃঃ ৪৭

৬ রঙ্গে পরে অঙ্গেতে ত্রিভঙ্গ নামাবলী।
মুখে বলে মনমনুয়া বলরে গৌরবুলি॥—শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৬১৬

৭ তুমি কালাকালে কলুষ কায় কর মুক্ত কালকরে।
কৃতার্থকারণে কালি কাল তৎকামনা করে॥
—কমলে কামিনী, পৃঃ ৫৮৬

৮ দেখ, স্বল্পবুদ্ধি শিশুর আমার সিংহলে সাজন।
সঙ্কটে শঙ্করি তোমার লয়েছি শরণ॥—কমলে কামিনী, পৃঃ ৫৮৪

৯ ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী ভববিপদভঞ্জিনী।
ভক্তমনোরঞ্জিনী নাচে দৈত্যরণ জিনি॥—বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৬৯১

১০ তব জন্ম সহ গুরুর গঞ্জন কর হে বিশ্ববিপদ ভঞ্জন,
তুমি মনোরঞ্জন এসো নিরঞ্জন, নয়নে অঞ্জন করি।
—মানভঞ্জন (১), পৃঃ ১২৯

১১ ওহে কৃষ্ণ কংসারি কৃতান্তভয়াস্তকারি,
করপুটে কাঁদে কিশোরী করুণা প্রয়াসী ॥—কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১২৫

১২ গগনে লুকায় তারা সমস্ত, তারাপতি হন অস্ত,
তারা তারা বলে লোক গা তোলে অমনি।
গাভীর গভীর রব নিশির নাশি গৌরব
উদয় হইলেন দিনমণি ॥ —গোষ্ঠলীলা (২), পৃঃ ৩৪

১৩ মানসাগরে মানভরে ভাসেন কমলিনী।
ত্যজিলেন নীলকমল অঙ্গে কমলনয়নী ॥
কাতর কমলাকান্ত হৃদয়কমলে।
রতন কমল ভাসে কমলাক্ষির জলে ॥ —মানভঞ্জন (১), পৃঃ ১৩৫

১৪ তোমায় মিথ্যে অনুযোগ কর্ম অনুযায়ী ভোগ,
অনুক্ষণ বেদাগমে বলে।
যায় দুঃখের অনুশীলন অনুরক্ত হয় ভুবন
তোমার কৃপার অনুকম্পা হলে ॥
—কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১২৫

১৫ না কন কথা পরাৎপর সখীরে লাগে ফাঁফর
তারপর অপর বচনে।
শুনিলেন বিবরণ রাই বিরহে শ্যামবরণ
বিবরণ হয়ে ধরাসনে ॥ —মানভঞ্জন (১), পৃঃ ১৩৬

১৬ নিরখি ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অঙ্গহীন দেয় ভঙ্গ
অঙ্গ দেখে রয় কেমনে অঙ্গনে অঙ্গনা।
বর্ণন করিতে বর্ণ বিবর্ণ পঞ্চাশ বর্ণ
বর্ণে না হয় বর্ণের বর্ণনা ॥ —গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৬৯

অনুপ্রাস যমকাদি শব্দালংকার তৎকালে সমসাময়িক কবিগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গুপ্তকবির গদ্য রচনায়ও ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট।[১] "আসল কথা

১। "রামপ্রসাদের পদী· রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল। তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্ত পদের প্রয়োজন কি। পদ পাইয়াই পদ পাইয়াছিলেন। সেন সদাত্মার যে পদ তাহাই বিপদ, অথচ বিপদ নহে,

সেকালের লোকে অনুপ্রাস যমকের ঘটা ছটাকে সৎকাব্যের লক্ষণ মনে করিত।"[1] কিন্তু সংশয় নাই যে অনুপ্রাস যমকাদির অতিঝোঁক অনেক সময় অর্থহীন অবান্তর শব্দ যোজনা করিয়া রসহানি ঘটাইয়াছে।

১ ভুবাহু পসারি সুখে নাচে সারীশুক। —মাথুর (৩), পৃঃ ২১৫

২ এমন বিষণ্ণ কেন যেন আসন্ন দীন দুঃখে
প্রসন্নহীন দেখি হে তোমায়। —মানভঞ্জন (১), পৃঃ ১৬৩

৩ জোড় নাই করিতে জোড় চরণ দেখি মানিকজোড়
উড়ে গেছে উড়ের মুলুকে। —মাথুর (২), পৃঃ ২০৫

এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অনুপ্রাস যমকের আত্যন্তিক প্রীতির ফলে উদ্ধৃত অংশের মত অযোগ্যতা, ব্যাকরণগত ত্রুটি, অবান্তরতা প্রভৃতি নানা দোষ ঘটিয়াছে দেখা যায়। ইহাতে আপাত শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করিলেও আখেরে যে ভাবসৌন্দর্যের হানি করে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া এই অনাবশ্যক অজস্রতাও রসাপকর্ষক। "রন্ধনে লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, অথচ মাত্রা অধিক থাকিলেও অখাদ্য হয়, অনুপ্রাসও সেইরূপ পরিমিত প্রয়োগে রচনার সৌন্দর্যসাধন করে, ভূরি পরিমাণ প্রযুক্ত হইলে কর্ণপীড়া উৎপাদন করে।"[2]

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার (ঈশ্বর গুপ্তের) অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ—স্থান কাল পাত্র। সংস্কৃত

বিপদনাশক বিপদ। যিনি যথার্থ দ্বিপদ, তিনি এই পদ ও বিপদের মর্মগ্রাহী হইবেন, নচেৎ অন্য কেহই তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন না।" কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রবন্ধ, সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, ১লা পৌষ সংখ্যা।

১। প্রাচীন সাহিত্য, শ্রীকালিদাস রায়, তৃতীয়াংশ, পৃঃ ৬৬৬।

২। অনুপ্রাস—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যের অবনতির কাল হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই কবিওয়ালার কবিতায় পাঁচালীওয়ালার পাঁচালীতে ইহার বেশি বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু, তাই তাঁহার পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, পাঁচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই। এই অলংকার প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তারপরেই, এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করেন নাই।······অনুপ্রাস যমক যে সর্বত্রই দূষ্য এমত কথা আমি বলি না।······কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে, অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে, বাঙ্গালাতেও তাই।"[১]

যুগের রুচি ও চাহিদা তো ছিলই, অধিকন্তু দাশরথির কবির দলের অভিজ্ঞতা ও সংস্কার অনুপ্রাস যমক সৃষ্টির ব্যাপারে যে অন্যতম প্রধান প্রেরণাস্বরূপ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যমকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ বাছা করে সর সর পাপিনী বলে সর সর
অবসর হয় না সর দিতে।
সর সর করে ত্রিভঙ্গ হয়েছে বাছার স্বরভঙ্গ
বাক্যশর হানে আবার তাতে॥

—কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১২৫

২ একান্ত তোমার পদে সঁপে শ্রীমতী মতি।
তোমাকে ভজিয়ে আমার এই হল সঙ্গতি গতি॥
একে তো ব্রজের মাঝে নামটি কলঙ্কিনী কিনি।
আমার কালি জানেন কালী কালভয়ভঞ্জিনী যিনি॥

—কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১২৭

১। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব প্রবন্ধ, বসুমতী সংস্করণ ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২৪।

বিধি অতি প্রেমামোদে　　　　বিধির বিধির পদে
　　বিধিমতে করিয়ে প্রণতি।
বিনয়ে বলেন বিধি　　　　বল প্রভু করি বিধি
　　বিধিকে বিধি দাও হে গোলকপতি॥

—বামনভিক্ষা (১), পৃঃ ৫৯০

কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কেবল সেই পীতবাসে
যে থাকে হৃদয়বাসে, ওলো সেকি বাসে বাস করে।
কাজ কি গো কুল, কাজ কি গোকুল, গোকুলের সব হক প্রতিকূল
আমিত সঁপেছিগো কুল, সেই অকূলকাণ্ডারী করে॥

—বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৮৩

তুই ভজিলে কৃষ্ণ পায়,　　　দুটা বামন কৃষ্ণ পায়।

—প্রহ্লাদচরিত্র, পৃঃ ৫৭৫

অন্যান্য শব্দালংকারের উদাহরণ

শ্লেষালংকার :

১　বৈদ্যবেশী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

ধনি আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার বৈদ্যনাথ আমার বিশেষ গুণ সে জানে।
ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক,　আমারি সৃষ্টি করা চতুর্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ ভ্রমণ করি ভুবনে॥　ইত্যাদি

২　জরতীবেশিনী দুর্গার উক্তি :

বিধিমতে বিড়ম্বনা করিয়াছে বিধি।
পিতা মোর অচল দেহ নাস্তি গতিবিধি॥
শিশুকালে সমুদ্রে ডুবিয়া মলো ভাই।
দুখের সমুদ্রে সদা ভাসিয়া বেড়াই॥　ইত্যাদি

—কমলেকামিনী, পৃঃ ৫৮৮

৩ বৃদ্ধবেশী হনুমানের উক্তি :

আমার নাম জানে বিশ্ব শ্রীরাম শিরোমণির শিষ্য
লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের ছাত্র।

... ...

নাই অন্ন ব্যবহার ফলমূল করি আহার
তাইতে ভক্তি করে তোর পতি ॥
নাপিত ছুঁইনে তেল মাখিনে চারি চাল বেঁধে থাকিনে
জেনে ধার্মিক মোরে বড় বিশ্বাস। —রাবণবধ, পৃঃ ৪৩৬

৪ কুটিলার প্রতি রাধার উক্তি :

একথা জটিলে বুঝিতে পারে কুটিলে বুঝিতে নারে
তুমি তত্ত্ব বুঝিবে কেমনে।
—গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৮২

সভঙ্গ শ্লেষ :

অপরূপ রূপ কেশবে।
দেখবে তারা এমন ধারা
কালোরূপ কি আছে ভবে ॥
—অক্রূরসংবাদ (২), পৃঃ ১৫৯

শ্লেষ বক্রোক্তি :

১ দশরথের প্রতি পরশুরাম :

বেটার কিছু শঙ্কা নাই গাত্রে, কত বুদ্ধি কব অজের পুত্রে
ডেকেছে আজ রবির পুত্রে, যা পুত্রগণ সহিতে ॥
—রামবিবাহ, পৃঃ ১৫৯

২ লবকুশের প্রতি রামবাক্য :

শুনিয়া কহেন রাম শ্রীরাম আমার নাম
আর নাম রাঘব রঘুবর।
অযোধ্যার অজ ভূপ ভূতলে ইন্দ্রস্বরূপ
তাঁর পুত্র দশরথ নাম ধরে ॥ ইত্যাদি

লবকুশের উত্তর :

হাঁ হে একি শুনিলাম রাঘব তোমার নাম
তবে যে হইল সব বৃথা।
শুনি ভিক্ষা করে রাঘবেতে রাঘবের সঙ্গে যুদ্ধ দিতে
সেটা বড় লাঘবের কথা॥
শুনে শুনে পরিচয় মনে যে অশ্রদ্ধা হয়
হয় লতে এসেছ করে জারি।
অযোধ্যানাথ একি কহ অজ তোমার পিতামহ
এটা যে অযশের কথা ভারি॥

—লবকুশের যুদ্ধ, পৃঃ ৪৭০

৩ বিবাহ বাসরে রাম ও সীতার সখীগণ :

স্বামী গোলকের বলেন জনকের
কন্যে বিবাহ করি।
সব নারী বলে রাম, রাম রাম রাম
শুনে যে লাজে মরি॥
এমন কথা শুনিনে কোথা
ভগিনী বিবাহ করে।

—শ্রীরামের বিবাহ, পৃঃ ৩৪৩

এই গেল মোটামুটি শব্দালংকারের কথা।

অর্থালংকারের মধ্যেও উপমাদৃষ্টান্তাদির প্রাচুর্য অনুপ্রাস যমকের মতই প্রতি পৃষ্ঠায় অজস্র চোখে পড়ে। যেসব ছড়া ও তালিকা দাশরথি পাঁচালীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলি উপমা দৃষ্টান্তের মালা।[১] ক পরিশিষ্টের মধ্যে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে, পুনরুক্তি ও বাহুল্য ভয়ে এইখানে দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল।

মালোপমা আর এই উপমার-মালিকাকে এককোঠায় ফেলা বোধহয় ঠিক হইবে না।

১। কবির রচনার অনেকাংশ কেবল তালিকা। তবে এই তালিকা দৃষ্টান্তের মালিকা। শ্রীকালিদাস রায়, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য, ৩ অংশ, পৃঃ ৩৬৮।

শুনিয়া কুটিলা পথে আসে দৌড়াদৌড়ি
সীতারে ঘেরিল যেন রাবণের চেড়ী ॥
যমদূত গিয়া ধরে যেন পাপগ্রস্ত নরে।
বিদ্যুল্লতা রাক্ষসী যেমন জলধরে ধরে ॥ —কৃষ্ণকালী, ৫৯

অথবা, কুপিয়ে কুটিলে রাধার ধরে দুটি বাহু।
যেমন ব্যাঘ্রেতে হরিণী ধরে, চাঁদকে ধরে রাহু ॥—ঐ, পৃঃ ৫৯

এইগুলি মালোপমা। কিন্তু

যেমন বিষয়শূন্য নরবর বারিশূন্য সরোবর
বস্ত্রশূন্য বেশ।
দেবীশূন্য মণ্ডপ কৃষ্ণশূন্য পাণ্ডব
গঙ্গাশূন্য দেশ ॥ ইত্যাদি —কুরুক্ষেত্র মিলন, ২৯৮

এই উপমাগুচ্ছকে মালোপমা না বলিয়া উপমার মালা বলা বোধহয় সঙ্গত। প্রসঙ্গত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "কথিত আছে কালিদাসের উপমা গুণ, নৈষধের পদলালিত্য গুণ, ও ভারবির অর্থগৌরব গুণ, এই সকল কবিগণের গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু দাশু রায়ের গুণের সীমা নির্ধারণ করা যায় না। যখন কবি উপমা দিতেছেন তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝোঁকে চলিয়াছেন, লেখনীর মুখে মসীবিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্থগিত হওয়া নাই।

পণ্ডিতের ভূষণ ধর্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী,সতীর ভূষণ পতি।
যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতি ॥
বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম।
পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের গুণ গুণ স্বর, উভয়ে উভয় প্রেমে বদ্ধ ॥
শরীরে ভূষণ চক্ষু যাতে জগত হয় দৃষ্ট।
দাতার ভূষণ দান করে বলি বাক্য মিষ্ট ॥

কবিকে থাম থাম বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্থগিত হওয়ার নহে।"[১]

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৬

কিন্তু দাশরথির সমসাময়িক শ্রোতৃবর্গ বোধহয় ডঃ দীনেশচন্দ্রের সহিত একমত ছিলেন না। থাকিলে দাশু রায়ের ছড়াগুলি এত জনপ্রিয় হইত না। সমালোচক দীননাথ সান্যাল মহাশয় এই সম্পর্কে বলিয়াছেন: "দাশরথির কাব্যের আর এক বৈশিষ্ট্য তাঁহার ছড়াগুলি। অলংকার শাস্ত্রে ইহাকে মালোপমা বলে। দাশরথির হাতে ইহা যেন বা বাস্তবিকই উপমানের মালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময় উপমেয়কে ভুলিয়া গিয়া ঐ মালার সৌন্দর্যেই অবাক হইতে হয়, তখন উহার উপমাত্ব ছাড়া উহার নিজস্ব একটি রূপ ফুটিয়া উঠে। উহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত সার কথাই যে সন্নিবিষ্ট তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। উহার নিজস্ব রূপ গুণ আছে বলিয়াই সর্বসাধারণ উহাকে ছড়া নামে বিশেষিত করিয়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও ঐসব ছড়ার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভিন্নরুচির্হিলোকঃ, কেহ কেহ নাকি ঐ ছড়াগুলির উপরেই বিষম বিরক্ত।......এগুলি দাশরথির পাঁচালীর একটি চমৎকার উপভোগ্য সামগ্রী।"[১]

পাঁচালীর অলংকার-বিচিত্রা হইতে সামান্য কয়েকটি নমুনা দিতেছি।

রূপক:

১ সেজেছ শ্যামজলদের বামে, রাধে সৌদামিনী।

—কৃষ্ণকালী, পৃঃ ৬৪

২ ডুবেছে রাই কমলিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।

—গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৮৩

৩ আমাদের চিত্ত সকল নির্মল গঙ্গার জল
জেনে পাদ্য দিয়েছি চরণে।
কুলের সৌরভ ছিল সুগন্ধি চন্দন হল,
যদি বল পুষ্প কোথায় পেলাম।
ছিল ষোড়শ দল হৃদি পদ্ম পুষ্প করি সেই পদ্ম
পদ্ম আঁখির পাদপদ্মে দিলাম॥

—গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৮২

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, সমালোচনাংশ, পৃঃ ২৬

সমস্তবিষয়ক সাঙ্গ রূপক :

১ হৃদি বৃন্দাবনে যদি বাস কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয় তোমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥ ইত্যাদি

২ দনুজদলদলনি সুরপালিনি শিবে।
আমার দেহাসুরের পাপাসুরে কবে বিনাশিবে॥ ইত্যাদি

৩ কর কর নৃত্য নৃত্যকালী একবার মনোসাধে
রণক্ষেত্রে মা মোর হৃদয় মাঝে। ইত্যাদি

পরম্পরিত রূপক :

১ সোহাগের তরণী মাঝে রেখে প্রাণ ব্রজরাজে
আনন্দ সাগরে করি খেলা।
ওরে নিদ্রা তুই আসিয়ে দুর্যোগ পবন হইয়ে
ডুবায়ে দিলি রসের ভেলা॥

—অক্রূর সংবাদ (২), পৃঃ ১৭৪

২ তোমার বিচ্ছেদে শ্যাম উপায় কি করি।
উন্মত্ত হইল আমার মন মত্তকরী॥
বিরহ কেশরী হেরে পলায় বারণ।
প্রবোধ অংকুশাঘাতে না মানে বারণ॥
দুরন্ত মাতঙ্গ মন ভ্রমিতেছে ধরা।
ধৈর্যরূপ মাহুতেরে নাহি দেয় ধরা॥ —মাথুর (১), পৃঃ ১৯৭

অধিকারূঢ় বিশিষ্ট রূপক :

১ পরে অকলঙ্ক শশীর হার গলে। —নবনারীকুঞ্জর (১), পৃঃ ৯২

২ অকলঙ্ক বিধুমুখ তব। —কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১১২

প্রতিবস্তূপমা :

১ লোহায় জড়িত হেম চাঁদের সঙ্গে রাহুর প্রেম
শ্যামাঙ্গে কুব্জা মিশেছে তাই। —মাথুর (২), পৃঃ ২০৫

২ ছাই দিয়ে কি তোমার অঙ্গের জ্যোতি রাখবে ঢেকে
সখা হে গরুড়ের পাখা ঢাকতে কি পারে কাকে
বজ্রাঘাতের ঘোর শব্দ ঢাকে কি কখনো ঢাকে ?

—মানভঞ্জন (২), পৃঃ ১৩৮

৩ নারীর ঢেউ স্বামী বিনে অন্য কে ধরে ভূতলে।
গঙ্গার ঢেউ গঙ্গাধর ধরেছেন শিরোমণ্ডলে॥

—কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ২৩

ব্যতিরেক :

১ শশির কাঁপিল শির শশিধর মহিষীর
নিরখিয়ে শশিমুখখানি।
বর্ণনাতে হারে বর্ণ অতসীর মন অপ্রসন্ন
শোকে মলিন হল সৌদামিনী॥
কটিতট কেশরী জিনি রবে পিক নীরব অমনি
বেণী দেখি ফণী মানিছে দুঃখ।
ভুবন মত্ত নাসিকায় দুঃখ নাশে নাসিকায়
নাশিয়াছে শুকপক্ষিসুখ॥ —জন্মাষ্টমী, পৃঃ ১৪

২ রূপ দেখে বিশ্বরূপী লজ্জায় লুকায় রূপী
বদন দেখে ভেক পালিয়ে যায়।
নাক দেখে লুকায় পেঁচা নয়নের দেখে ধাঁচা
বিড়াল বিরলে কাঁদে বসে।
ধনীর ধ্বনি শ্রবণ করি গাধা হল দেশান্তরী
মেষের সঙ্গে ধ্বনি মেশে॥
দুটি কান দেখে কানাই হাতীর খাতির নাই
কাননে লুকায় মনোদুঃখে।
জো নাই করিতে জোর চরণ দেখে মানিক জোড়
উড়ে দেখে উড়ের মুলুকে॥ —মাথুর (২), পৃঃ ২০৫

৩ তরুণ অরুণ জিনি জিনি রক্তসরোজিনী
কেশব মনোরঞ্জিনী কত শোভা চরণে।

সরোজনিন্দিত কর সুধামুখীর শোভাকর
সলজ্জিত সুধাকর পদনখকিরণে ॥
কিশোরীর কি মধ্যদেশ, কেশরী তায় করি দ্বেষ
বনে যায় ছাড়ি দেশ বলে জালে মরিবে।
কিবা নাভি গভীর কিশোরীর কি শরীর
মদনের গেল শরীর পেয়ে তাপ শরীরে ॥ —কৃষ্ণকালী, পৃঃ ৫৭

অতিশয়োক্তি :

লোকে বলে এই কথা পর্বতে জন্মায় লতা
লতায় পর্বত জন্মে শুনেছ কি কানে ?
ভেবে ভেবে বিবর্ণতা প্যারী আমার স্বর্ণলতা
তার মধ্যে কুচগিরি কেনে ? —কৃষ্ণকালী, পৃঃ ৬৪

উল্লেখ :

রমণীগণের মন দেখে কামরূপী নারায়ণ
ঋষিগণে দেখে যজ্ঞেশ্বর।
ভোজবংশ দেখে হরি কুলের দেবতা করি
ভক্তে দেখে বিষ্ণু পরাৎপর ॥
ব্রজ রাখালের চিত্ত আমাদের রাখাল মিত্র
নন্দ দেখে আমার গোপাল।
পণ্ডিতে বিরাট ভাবে পুত্র ভাবে বাসুদেবে
কংস দেখে আইল মোর কাল ॥

—অক্রূরসংবাদ (২), পৃঃ ১৮৫

সার

পৃথিবীর ভূষণ রাজা রাজার ভূষণ সভা
সভার ভূষণ পণ্ডিত সভা করে শোভা
পণ্ডিতের ভূষণ ধর্মজ্ঞানী -কৃষ্ণকালী, পৃঃ ৫৯

অধিক

সিংহপ্রতি বলে বধ রে বধ রে আদরেতে হাসি অধরে না ধরে
মৃগেন্দ্র উদরে যে ধরে বিদরে এসেছি শরীরে আমি কি পুণ্যে ?

—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, পৃঃ ৫৫৯

ব্যাজস্তুতি : শিব বর্ণনা

আছে অতুল ঐশ্বর্য অহং নাস্তি ইতি ধৈর্য
বড়মানুষী কিছু মাত্র নাই।
তার সঙ্গে করে ভাব কত জনার প্রাদুর্ভাব
সংসারে হয়েছে দেখতে পাই ॥
কোন অংশে নাহি দোষ পুরুষ ননতো আশুতোষ
অনায়াসে দেন আনুকূল্য।
মান্যমান বিদ্যমান অপ্রমাণ আছে মান
কিন্তু মানঅপমান তুল্য ॥—শিববিবাহ, পৃঃ ৫০৪

ব্যাজোক্তি : জরতীবেশী দেবীর উক্তি

কোথা রই মাতৃকুলে নাহিক মাতুল।
সবেমাত্র স্বামী একটা সে হৈল বাতুল ॥
মানের অভিমান রাখে না প্রাণের ভয় নাই।
বিষ খায় শ্মশানে বসে গায়ে মাখে ছাই ॥
দূরে থাকুক অন্য সব অন্নাভাবে মরি।
কখনো বা বস্ত্রাভাবে হই দিগম্বরী ॥
সামান্য ধন শংখ একটা না পরিলাম হাতে।
স্বামীর এই ত দশা আবার সতীন তাতে ॥
সে পাগল দেখিয়া পতির শিরে গিয়া চড়ে।
তরঙ্গ দেখিয়া তার রইতে নারি ঘরে ॥

—কমলেকামিনী, পৃঃ ৫৮৮

রস বিচার

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥

দাশরথির সমগ্র পাঁচালীর পটভূমি এই ভক্তিরস। তবে স্থায়ী ভাব কৃষ্ণরতি এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়াও মুখ্যতঃ কালী ও গৌণতঃ গঙ্গাদি অন্যান্য দেবতার রতিতেও প্রসারিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ও কালী লীলাতে আলাদা হইলেও সিদ্ধান্তে দাশরথির চোখে যেই শ্যাম সেই শ্যামা অর্থাৎ কৃষ্ণকালী অভেদাত্মক হইয়াছেন। শুধু শাক্ত আর বৈষ্ণব নহে—সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য হিন্দু সমাজের এই পঞ্চোপাসনার মূলেও দাশরথি এই অখণ্ড ঐক্যই দেখিয়াছেন।

মন ভাবরে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি, কমলাপতি, পতিতপাবনী তারা।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা॥[১]

কাজেই দাশরথির ভক্তিরসের স্থায়ী ভাব ভগবদ্‌ভক্তি, "একে পঞ্চ, পঞ্চে এক" রতি।

দাশরথির রচনার পটভূমি যে ভক্তিরস, তাহা দুর্বোধ্য নহে। তবু কতগুলি প্রমাণ আলোচনা করা গেল। প্রথমতঃ, পাঁচালী পালার সংখ্যা বিচার করা যাউক। হরিমোহন কর্তৃক প্রকাশিত ৬৪টি পালার মধ্যে ৫৩টি মুখ্যতঃ দেবদেবীর লীলামহিমাজ্ঞাপক। এই পালাগুলি পৌরাণিক ও লৌকিক বিষয়ে রচিত এবং বলা বাহুল্য ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভক্তিরস পরিবেশন। অবশিষ্ট ১১টি মৌলিক পালার মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব পালাটির মূল বক্তব্য অসম্প্রদায়িক ভগবদ্‌ভক্তির প্রতিষ্ঠা। কর্তাভজা ও বিধবাবিবাহ পালা দুইটি সমসাময়িক দুইটি ঘটনা ও সমস্যার সমালোচনা। কর্তাভজা পালায় মানুষ কর্তা ভজনের সম্বন্ধে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে, এবং "জগতের কর্তা হরি, আর কে কর্তা আছে ভবে। মজ তার পদাম্বুজে ভজ রে কেশবে সবে॥"[২] এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। অন্যান্য আটটি পালা "রসিকরঞ্জন-রস-রঙ্গ"।[৩] অর্থাৎ লঘু রসরচনামাত্র। কোন গভীর কথা

১। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৬২১
২। কর্তাভজা, পৃঃ ৬২৫
৩। পাঁচালীর মঙ্গলাচরণ, পৃঃ ২
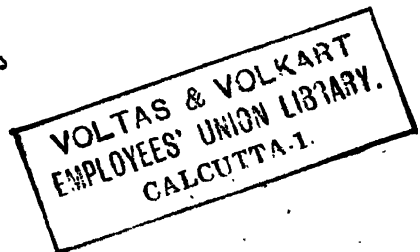
ইহাদের মধ্যে প্রত্যাশা করা অনুচিত। কিন্তু ইহার মধ্যেও স্থানবিশেষে "সার ভাব শ্রীগোবিন্দচরণ"[১]—এতজ্জাতীয় সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, দাশরথির বিবিধ সঙ্গীত বিচার করিলেও এই কথাটিই প্রমাণিত হয়। হরিমোহন সম্পাদিত বঙ্গবাসী চতুর্থ সংস্করণে মোট ৮৮টি বিবিধ সঙ্গীত দেওয়া হইয়াছে। উহাদের মধ্যে মোট চারিটি মাত্র ব্যঙ্গরঙ্গ, বাকি ৮৪টি ভক্তিমূলক ও আত্মতত্ত্ববিষয়ক গীত।

তৃতীয়তঃ, পালার কাহিনী নির্বাচন পদ্ধতির দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা যাউক। শুধু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পালাই দাশরথি রচনা করিয়াছেন মোট ২৮টি। ভাগবত, হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি উৎস হইতে তিনি এই সব কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল ঘটনার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা, রঙ্গ ব্যঙ্গ করিবার সুযোগ লাভ করা, বা নিছক হাস্য করুণাদি রসের বিস্তারসাধন করাই যদি দাশরথির পাঁচালী রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তবে সত্যভামার ব্রত, সত্যভামা সুদর্শনচক্রের ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ, দুর্বাসার পারণ প্রভৃতি পালা অপেক্ষা শুধু মহাভারত হইতেই কীচক বধ, ভীম-হিড়িম্বা সংবাদ, নলদময়ন্তী উপাখ্যান, সাবিত্রী উপাখ্যান জাতীয় পালা নির্বাচন করিতেন, এবং সেই সব যে অধিকতর লোকরঞ্জক হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দাশরথি তাহা করেন নাই। আর তাহা না করিবার কারণ এবং বোধ হয় প্রধানতম কারণ এই যে এই সব পালার সহিত শ্রীকৃষ্ণের তথা ভক্তিরসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। যেসব পালার সহিত ভগবদ্‌ভক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নহে, তাহাদের অন্যান্য সুবিধা বা মূল্য যাহাই হউক না কেন, দাশরথি উহাদিগকে পাঁচালীতে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই।

চতুর্থতঃ, আভ্যন্তরীণ বিষয় বিস্তার ও সংগঠন রীতি বিচার করিলেও এই ভক্তিরসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি অনেক সময় ভক্তিরসের অপরিমেয়তা ও আবেগ কাহিনীর গতিকে শ্লথ করিয়া দিয়াছে, অবান্তরতা দোষে দুষ্ট করিয়াছে, নানা অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনার আমদানী করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালাতে গর্গমুনির পত্নীর কৃষ্ণ রূপের ব্যাখ্যা[২],

---

১। কলিরাজার উপাখ্যান, পৃঃ ৬৫১

২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৫-১৬

কালীয়দমন পালায় দ্বিজরমণীর ইষ্ট ভাবে বলা[১], শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ পালায় "এক দ্বিজকন্যা কেঁদে কয়"[২], কলঙ্কভঞ্জন পালাতে নারদের নন্দালয়ে গমন ও কৃষ্ণ মহিমা কীর্তন[৩], কুরুক্ষেত্র পালায় গৌড়দেশীয় এক ব্রাহ্মণের কথা[৪], দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালায় ভক্তির প্রাধান্য বর্ণনা ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের আখ্যান[৫], এই পালাতেই দুর্বাসা ও নারদের কথোপকথন[৬], আগমনী পালাতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভবনে দুর্গা[৭], প্রভৃতি বিষয় ও ঘটনা সংযোজনার একমাত্র উদ্দেশ্য বোধ হয় ভক্তিরসের প্লাবন সৃষ্টি করা। কারণ মূল কাহিনীর সহিত ইহাদের সংশ্রব নগণ্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে এগুলি একান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। তবু দাশরথি ইহা না করিয়া পারেন নাই। চরিত্রসৃষ্টি বিষয়েও এতজ্জাতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। দাশরথির রাবণ মহীরাবণ তো বটেই, তাড়কা রাক্ষসী পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভক্ত, দাশরথির দুর্বাসামুনি নারদের মত কৃষ্ণভক্তিতে একেবারে কাঁদিয়া আকুল।

এই ভক্তিরসের পটভূমিকায় হাস্য, শৃঙ্গারাদি নানা রসের বিচিত্র বর্ণে দাশরথি তাঁহার পাঁচালী চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বিশ্রুত সমালোচক দীননাথ সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন: "প্রত্যেক পালার আখ্যানাংশ এমন করিয়া গঠিত যে ভক্তিরসকে মজ্জা করিয়া অন্য নানাবিধ রস ফুটাইবার বেশ অবসর আছে।"[৮] এই নানাবিধ রসের মধ্যে প্রধান হইতেছে হাস্যরস এবং তারপর সাধারণ ভাষায় শৃঙ্গার, অথবা আরও স্পষ্ট ভাবে দেখিলে বিপ্রলম্ভ করুণ। অন্যান্য রসও আছে, কিন্তু তাহারা সর্বত্র সুপরিস্ফুট নহে, কোথাও অস্ফুরন্ত

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪১
২। ঐ ঐ পৃঃ ৮৫
৩। ঐ ঐ পৃঃ ১১৬
৪। ঐ ঐ পৃঃ ৩১৭
৫। ঐ ঐ পৃঃ ২৭২
৬। ঐ ঐ পৃঃ ২৮
৭। ঐ ঐ পৃঃ ৫২৯
৮। দাশরথির পাঁচালী, সমালোচনা, পৃঃ ১৯

হাসির উচ্ছল ছটায় অবলুপ্ত হইয়াছে, কোথাও বা অবিরল অশ্রুর ঘনমেঘভারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। যথাস্থানে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হাস্যরস পরিবেশনে দাশরথি অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। অলংকার-শাস্ত্রোক্ত নয়টি রসের মধ্যে হাস্যরসের কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই। হাস্যরস হইতে আদি, করুণ, বীর প্রমুখ রস অধিকতর কবিপ্রিয়, কারণ রতি, শোক, উৎসাহাদিকেই মূল স্থায়ী ভাব হিসাবে গ্রহণ করিয়া কবিগণ অধিকাংশ কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাজেই দাশরথির রচনায় হাস্যরসের কেন প্রাধান্য হইল সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আছে।

দাশরথি মুখ্যতঃ জনগণের কবি ছিলেন। কাজেই জনচিত্তে যে রস একেবারে অতি দ্রুত "শুষ্কেন্ধেনেন ইবানলঃ" বিস্তারলাভ করিতে পারে ও সহজে আলোড়ন তোলে তাহাই তাঁহার পক্ষে নির্বাচন করা স্বাভাবিক। সুতরাং জনচিত্তধারা বিশ্লেষণ করিলে এই রস নির্বাচনের একটা কারণ পাওয়া সম্ভব।

সাধারণ মানুষ স্থূল সুখদুঃখের জগতে বাস করে। সংসারে হাসি ও কান্না দুইটিই মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু মানুষ কান্নাকে এড়াইয়া, দুঃখকে তাড়াইয়া কেবল হাসি বা সুখকেই একমাত্র করিয়া পাইতে চাহে। কাজেই দুঃখের দুনিয়ায় হাসির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকাটা কিছু অস্বাভাবিক নহে। হাস্যরস এই কারণে অতি সহজে এবং অনায়াসে জনমনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

শোক স্থায়ী ভাব হইতে করুণ রস সৃষ্টি হয়। শোক জীবনে যতখানি সত্য, ততোধিক অবাঞ্ছিত। কিন্তু তবু করুণ রস কাব্যে শুধু একটি অতিবাঞ্ছিত রসই নহে, অনুপম আস্বাদ্য রস, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রস। আলংকারিকগণ বলিয়া থাকেন যে রসরূপতা প্রাপ্ত হইলে যে অলৌকিক চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়, তাহাতে লৌকিক বেদনার কোন আভাস থাকে না। রামায়ণ করুণরসপ্রধান মহাকাব্য, তাহার মধ্যে অফুরন্ত অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ না পাইলে অবাঞ্ছিত শোকজনিত লৌকিক দুঃখলাভের জন্য কেহ রামায়ণ পাঠ করিত না। কিন্তু পাঁচালীতে, শুধু পাঁচালীতে কেন, সমসাময়িক জনসাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই অবিমিশ্র করুণ রস একান্ত দুর্লভ। ইহার মূল কারণ বোধহয় এই যে ভক্তিতত্ত্বে শোকের অর্থাৎ

ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ইষ্টনাশের ও প্রিয় বিয়োগের স্থান নাই। সেখানে যে বিচ্ছেদ আছে তাহা আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নহে, তাহা মূলতঃ বিরহ। নিশ্চিত মিলনের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি বিরহের মধ্যে অনুস্যূত থাকেই। এই কারণে ভক্তিরসের পটভূমিকার যে লীলা হয়, তাহার মধ্যে অবিমিশ্র করুণ রসের বদলে বিপ্রলম্ভ করুণরসই মুখ্য স্থান অধিকার করে। এই একই কারণে দাশরথির করুণরসও বিপ্রলম্ভ করুণ। ইহার স্থায়ী ভাব শোক নহে, রতি। ভক্তিরসের পটস্থলীতে ভগবদ্‌লীলার দিব্য আলেখ্য অঙ্কন করিতে দাশরথি উজ্জ্বল হাস্যের সঙ্গে বিপ্রলম্ভ করুণের কৃষ্ণ রং প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই অফুরন্ত হাস্যধারার সঙ্গে যদি বিপ্রলম্ভ করুণের অশ্রুলবণ না মিশ্রিত হইত, তবে পাঁচালীর সমগ্র ভক্তিরস আলুনী হইয়া যাইবার ষোল আনা আশঙ্কা ছিল। যাহাহউক এইসব কারণেই—সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের হাসি-অশ্রুর গঙ্গাযমুনার ধারা দাশরথির পাঁচালীতে প্রাধান্য ও অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে "নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য রস" বলিতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বুঝাইয়াছেন[১], তাহা হয়ত দাশরথির রচনাতে সর্বত্র পাওয়া যাইবে না। খানিকটা স্থূলতা ও ভাঁড়ামি, মুখ্যতঃ যুগধর্মের প্রভাবে, দাশরথির রচনাতে থাকা খুবই সম্ভব এবং আছে। তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের ঝাঁঝ দাশরথির হাস্যরসের মধ্যে বেশ খানিকটা স্বাদবৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে।

হাস্যরসের মূল উৎস হইতেছে বিকৃতি, অর্থাৎ প্রত্যাশিত অভ্যস্ত, স্বাভাবিক কথাবার্তা, পোষাকপরিচ্ছদ, উদ্যোগ আয়োজন হইতে অপ্রত্যাশিত, অনভ্যস্ত, অস্বাভাবিক কিছুর সাক্ষাৎকার।[২] দাশরথির পাঁচালীতে বাক্‌-বিস্তারে, ভাবপ্রকাশে, ঘটনাবিন্যাসে এই অপ্রত্যাশিত বিকৃতিজনিত হাস্যরসের সহিত ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ, কৌতুকাদির অবাধ মিশ্রণ হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে অনুপ্রাস যমকাদির প্রভাবও হাস্যরস সৃষ্টিতে সহায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দাশরথির প্রতিটি পালা হইতে ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত দেখান যায়।

১। আধুনিক সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ

২। বিকৃতাকারবাগ্‌বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্‌ ভবেৎ।
হাস্যো ... ... । সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ

রুক্মিণীহরণ পালা হইতে সুদীর্ঘ হাস্তরসের নিদর্শন তুলিতেছি। রুক্মিণী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট লিপি পাঠাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের মনে আশা অনেক অর্থলাভ হইবে। কিন্তু দ্বারকায় গিয়া ব্রাহ্মণ রাজকীয় প্রাসাদে ঢুকিতে পারিতেছেন না দেখিয়া অন্তর্যামী কৃষ্ণ এক দ্বারী পাঠাইয়া দিলেন। দ্বারী মানেই আমাদের পরিচিত ভোজপুরিয়া দারোয়ান। অতএব তাঁহার মুখে হিন্দি জবান দরকার। দ্বারী বলিল "কিষণজী বোলায়নে তোমকো জলদি হুজুর যানা।" অনেক কথাবার্তার পর দ্বারী ব্রাহ্মণকে একপ্রকার জোর করিয়াই লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে খুব পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। কত ব্যঞ্জন নালতে শাক, কচু শাক, ঘণ্ট, মাছ, মাংস, চালতের অম্বল, পায়েস, ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে খাইতে লাগিলেন।

এক একবার খায়না ডরে আবার লোভে মনে করে
খেলাম না হয় জন্মের মত খাই।
খেলাম খেলাম খেয়ে মরি মহাপ্রাণীকে শীতল করি
একবার বই তো দুবার মরণ নয়॥[১]

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন এই রকম খাওয়ার দক্ষিণাটাও অনুরূপই হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সে সব কিছু না বলিয়া ব্রাহ্মণকে রথে তুলিয়া বিদর্ভ যাত্রা করিলেন। হতাশ ব্রাহ্মণ ভাবিলেন :

লক্ষণেতে ভেবেছিলাম লক্ষ টাকা পাব।
শেষে একটি পাই পাইনে ভাইরে কোথা যাব॥[২]

রথে চড়িয়া আর এক বিপদ। ভয়ে ব্রাহ্মণ চেঁচাইতে লাগিলেন,
"ঘটি গেল হে ঘটিল বিপদ, ছাতি গেল হে ছাতি ফাটে।"

কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে তাঁহার বাড়ীর নিকটে নামাইয়া দিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণের পাতার কুটির রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছে। রত্নাভরণ-পরিহিতা ব্রাহ্মণীকে আর চেনা যাইতেছে না। গৃহ ও গৃহিণী দুইটিই অপরিচিত। ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ আভূমি নত হইয়া কহিলেন, "কে তুমি রাজরাজেশ্বরি, আমাকে কৃপা কর কৃপাময়ি।" ইহার উত্তরে

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৪
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৬

"ব্রাহ্মণী কয় হয়ে রুক্ষ, আই মা ছি ছি একি দুঃখ, একেবারে খেয়েছ চক্ষু ও পোড়াকপালে।"[১]

এই পালার শেষের দিকে নারদ-শিশুপাল সংবাদ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ রুক্মিণীহরণ করিয়াছেন, নারদ আসিয়া শিশুপালকে বুদ্ধি দিলেন যে শিশুপাল যেন কিছুদিন অন্তঃপুরে লুকাইয়া থাকে, এবং একটা ডুলি করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। শিশুপাল তাহাই করিল। ওদিকে নারদ শিশুপালের রাজ্যে গিয়া কহিলেন যে শিশুপাল বউ নিয়া ফিরিতেছে। শিশুপালের ডুলি আসিতেই বাদ্য বাজনা সুরু হইয়া গেল।

শিশুপাল কয় একি রূপ, ওরে বেটারা চুপ চুপ
এ কি লজ্জা পড়িলাম সংকটে!
মুনি বলেন বলিল রাজা বাজা বেটারা বাজা বাজা
কামাই দিসনে গাঁয়ের নিকটে॥[২]

এই তো গেল পথের কথা। বাড়ীতে শিশুপালের ভগিনীগণ বধূবরণ করিবার জন্য পাড়ার মেয়েদের নিয়া বসিয়াছিল। ডুলি আসিতেই সাগ্রহে গিয়া আচ্ছাদন তুলিয়া "আই মা বলি দন্তে জিহ্বা কাটে।" কারণ "বিয়ের কনের গোঁফ দেখেছ কেউ।"[৩]

অনেক পালাতেই এমন সুদীর্ঘ হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর হাস্যরসের প্রকীর্ণ টুকরা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া নাই, এমন পালা দাশরথির পাঁচালীতে একান্তই বিরল। অভ্রখনির নিকটে ধূলাবালির মধ্যে অথবা অন্ধকার সমুদ্রসৈকতে বালুকণার মধ্যে চলিতে গেলে যেমন পায়ে পায়ে অসংখ্য অভ্রকণা বা প্রস্ফুরক চিক চিক করিয়া উঠে, তেমনই দাশরথির পাঁচালীতে প্রতি পৃষ্ঠায় হাস্যরসের অফুরন্ত ঝিকিমিকির সাক্ষাৎ মেলে।

হাস্যরসের প্রতি এই অস্বাভাবিক ঝোঁক কিন্তু, অনুপ্রাসের প্রতি অতিমমত্বের মত, অনেক সময় রসসৃষ্টিতে উৎকট বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রসের অপকর্ষক হইয়াছে। বিরোধী রসের প্রয়োগে কাব্য দুষ্ট হয় ইহা

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৮
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৫১
৩। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৫২

অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি।[১] রসের পরিবেশনে, বিশেষতঃ হাস্যরসের অবতারণায় দাশরথি এই বিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। করুণ ও হাস্য এই দুইটি বিরোধী রস।[২] ইহারা একত্র থাকে না, থাকিলে রসাপকর্ষ হয়। কিন্তু দাশরথি তাহা করিয়াছেন।

লবকুশ ও সীতাকে রাম অযোধ্যায় নিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু "সীতাকে আনাইয়া চান পুনরায় পরীক্ষে।" সীতা কাঁদিয়া জননী পৃথিবীর কাছে আশ্রয় চাহিলেন। সীতার পাতাল প্রবেশ রামায়ণে একটি অন্যতম করুণরসঘন ঘটনা। কিন্তু এই করুণরসের বর্ষণোন্মুখ শ্রাবণঘনমেঘরাশি দাশরথির স্বভাব-সুলভ হাস্যরসের পাগলা হাওয়ায় হালকা মেঘের মত উড়িয়া গিয়াছে।

সীতার রোদনে দুঃখে ধরা ত্বরা ফাটে।
মূর্তিমতী বসুমতী রথ লয়ে উঠে॥
ধরিয়া ধরণী রামঘরণীর করে।
বলে মা কেঁদোনা এস পাতাল নগরে॥
জন্মজ্বালা দিলে ছি ছি এমন জামাই।
মাটি হয়ে আছি মা আমাতে আমি নাই॥

চিরকাল পোড়ালে তোমারে পোড়া পতি
এখনও পোড়াতে চায় ভাবিয়া অসতী॥
মেদিনী বিদায় হয়ে সীতারে লয়ে যান।
পৃথিবীর প্রতি উষ্মা করেন ভগবান॥
আমায় এত বিড়ম্বনা করে গেল বুড়ী।
মানিব না করিব নষ্ট কিসের শাশুড়ী।
নারদ কহেন শুন রাম দয়াময়।
জামাই হয়ে শাশুড়ীকে নষ্ট করা নয়॥[৩]

১। সাহিত্যদর্পণ, ৭।৬

২। ভয়ানকেন করুণেনাপি হাস্যোবিরোধভাক্।—সাহিত্যদর্পণ, ৩।২৩২

৩। দাশরথির পাঁচালী বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৫

ইহার মধ্যে রামচরিত্রের মহিমা যে ক্ষুণ্ণ হইতেছে এবং গ্রাম্যতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আলোচনার স্থান স্বতন্ত্র। এইখানে একটি নিম্নশ্রেণীর শাশুড়ী জামাইয়ের কলহের টিপিকাল ফটোগ্রাফ আঁকিয়া এক করুণঘন পরম মুহূর্তের উদ্যত অশ্রুকে অট্টহাস্যে পরিণত করায় বিষয় বস্তুর গৌরবহানি এবং সহৃদয় শ্রোতা ও পাঠকের মর্মপীড়াসৃষ্টি এই দুইটি দোষই যুগপৎ ঘটিয়াছে।

কিন্তু এই প্রশ্নটি আর একটু তলাইয়া দেখা দরকার। অলংকার শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়া হাস্যরসের যথেচ্ছ প্রয়োগ সুপ্রচুর পরিবেশনে যদি পাঁচালীর শ্রোতৃবর্গের চিত্ত যথার্থই পীড়িত হইত এবং শ্রোতৃসাধারণ এই ধরণের প্রয়োগ সাগ্রহে ও সানন্দে অনুমোদন না করিতেন, তবে নিশ্চয়ই দাশরথি এই ধরণের অসংখ্য প্রয়োগদ্বারা পাঁচালীকে ভারাক্রান্ত বা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেন না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে হাস্যরসটি জনচিত্তজয়ের একটি পরীক্ষিত সোনার কাঠি এবং দাশরথি নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই শ্লেষে, বিদ্রূপে, কৌতুকে যে কোন ভাবেই হউক মানুষকে হাসাইতে পারিলেই যে অনেকখানি জনপ্রিয়তা ও সার্থকতা লাভ করা যায় জনকবি দাশরথি এই তত্ত্বটি জানিতেন। আসল কথা এই যে নানা দুঃখ কষ্ট, অভাব অনটনের জীবনের খানিকটা হাসিয়া লইতে পারিলেই সাধারণ মানুষ খুসি হয়, আনন্দ কীর্তন বাসরে রসাস্বাদের মালপোয়া প্রসাদ না পাইলেও হরির লুটের ফুলবাতাসা সাধারণকে কম আনন্দ দেয় না আর অধিকাংশই ইহার বেশি প্রত্যাশাও করে না। এই রহস্যটি জনকবি দাশরথি জানিতেন। আর এই কারণেই হাস্যরসের শুধু অতিব্যয় নহে, চূড়ান্ত অপব্যয় করিয়াও দাশরথি জনচিত্তে নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

উক্ত হইয়াছে যে অবিমিশ্র করুণ রস দাশরথির রচনায় বিরল। রামের বনগমনে দশরথের বিলাপ, তরণীসেন বধ, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেই করুণরস চকিতে দেখা দিয়া চপলার মত মুহূর্তে অন্তর্হিত হইয়াছে।

কিন্তু বিপ্রলম্ভ করুণ রস পাঁচালীর দ্বিতীয় প্রধান রস রূপে সর্বত্র নিজের অধিকার ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কৃষ্ণলীলায় কালীয়দমন, কলঙ্কভঞ্জন,

অক্রূরসংবাদ, মাথুর, নন্দবিদায়, উদ্ধবসংবাদ, কুরুক্ষেত্রমিলন, রামলীলায় রামের বনগমন, সীতা অন্বেষণ, মায়াসীতা বধ, লক্ষ্মণ শক্তিশেল প্রভৃতি পালায়, শিবশক্তি লীলায় শিববিবাহ, আগমনী, কাশীখণ্ড প্রভৃতি পালাতে বিপ্রলম্ভ করুণরসের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। অবশ্য এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে বিপ্রলম্ভ করুণরস শুধু মধুরা রতিকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্ট হয় নাই, বৎসলতা রতি, বিস্রম্ভ রতির স্থানও বিপ্রলম্ভ করুণরস সৃষ্টিতে অসামান্য প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বরংচ এই কথা বলিলেও খুব অসঙ্গত হইবে না যে বাৎসল্য রসের আশ্রয়েই বিপ্রলম্ভ করুণ দাশরথির রচনাতে সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে। স্থানবিশেষে সেবা রতিকে আশ্রয় করিয়াও বিপ্রলম্ভ করুণরসের ক্ষীণাভাস পাওয়া যায়।[১]

এইখানে স্মরণ রাখা দরকার যে বিপ্রলম্ভ করুণরস কথাটিকে অতি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। রতি স্থায়ীভাব হইতে শৃঙ্গাররস সৃষ্ট হয়। রতি কেবল নায়ক নায়িকার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কৃষ্ণরতি পঞ্চধা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারিটি রসেরও স্থায়ী ভাব রতি বা কৃষ্ণরতি। মধুররস সহ বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসকেই এইদিক হইতে শৃঙ্গাররস বলা যায়। তাহা হইলে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের এই দুইটি ভাগকেও কেবল মধুরা বা পঞ্চমারতির অর্থাৎ নায়ক নায়িকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না করিয়া সকল প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে প্রসারিত করিতে দোষ কি? দাসের সঙ্গে প্রভুর প্রার্থিত মিলন, সখার সহিত সখার অভিপ্রেত মিলন, পিতামাতার সহিত সন্তানের আকাঙ্ক্ষিত মিলন কেন সম্ভোগের ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য হইবে না? প্রিয়জনের পরস্পরের মিলনজনিত যে আনন্দ তাহাই তো সম্ভোগ। আর যেখানে এতজ্জাতীয় মিলনে বাধা সেখানেই বিপ্রলম্ভ। যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে নবনী খাওয়াইতেছেন তখন বাৎসল্য সম্ভোগ, আর যখন গোষ্ঠে পাঠাইয়া ব্যাকুল হইতেছেন, তখন বিপ্রলম্ভ করুণ। উভয় ক্ষেত্রেই যশোদার স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি বৎসলতা। কেবল অভীষ্ট ভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া না পাওয়ার দরুণ তাহা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ হইয়াছে। অবশ্য মধুর রসের তীব্রতা ও গভীরতার জন্যই সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ করুণ সাধারণতঃ মধুর রসেই

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫৮৭, প্রহ্লাদ চরিত্র পালা দ্রষ্টব্য।

প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তজ্জাতীয় গভীরতা ও তীব্রতা থাকিলে অন্যত্রও তাহা প্রসারিত হইবার বাধা কি? আমরা কিন্তু এই ব্যাপক দৃষ্টি দিয়াই এই অংশটি আলোচনা করিয়াছি এবং বাৎসল্য ও সখ্যরসের একাংশকে বিপ্রলম্ভ করুণ বলিয়াছি।

মধুরা রতিকে আশ্রয় করিয়া যে বিপ্রলম্ভ করুণ রস দাশরথি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অক্রূরসংবাদ, মাথুর, উদ্ধবসংবাদ, কুরুক্ষেত্রমিলন প্রভৃতি পালার মধ্যে সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে।

এখন আমার কেবল মরণ মঙ্গল
মন্থনেতে শুধু উঠিল গরল,
জীবন ধারণ বিফল কেবল
তা হতে এখন মরণ শ্রেষ্ঠ।[১]

অন্যত্র বলে চিতাসজ্জা কর সই কিবা জলশায়ী হই
কত সই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।
বনদগ্ধা মৃগী প্রায় মন দগ্ধা দগ্ধকায়
বলি কায় করি কি মন্ত্রণা।[২]

এতজ্জাতীয় শ্রীমতীর খেদসূচক গীতগুলি নানা দিক হইতে অনুরূপ মহাজন পদাবলীর সহিত অনেকাংশে তুলনীয়। কিন্তু অসুবিধা এই যে রস সব ক্ষেত্রে প্রগাঢ় ও পূর্ণ পরিণত অবস্থা লাভ করিতে পারে নাই। খানিকটা পাঁচালীর লঘু গঠন-পদ্ধতির জন্য, খানিকটা দাশরথির হাস্য কৌতুকাদির প্রতি অতি-প্রীতির জন্য উদ্গত অশ্রুর উচ্ছল মেঘমালা অধিকাংশ স্থলেই হাসি ও কৌতুকের দমকা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়াছে। শ্রীমতীর শোকাবেগ পরিপূর্ণ রসরূপতা প্রাপ্তির পূর্বেই বৃন্দের সহিত কৃষ্ণের বা নাবিকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষাত্মক কলহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সখ্যরসাশ্রিত বিপ্রলম্ভ করুণের চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় কালিয়দমন, ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ, নন্দবিদায়, রামের বনগমন, রামের দেশাগমন প্রভৃতি পালার মধ্যে।

১। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ১৮৬ মাথুর (১)।
২। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ২১১ মাথুর (৩)।

দাশরথির বিপ্রলম্ভ করুণের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে বাৎসল্য রসের পরিবেশনে। দেবকী, কৌশল্যা, যশোদার এবং সর্বোপরি মেনকার আর্তি ও অশ্রু বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। গোষ্ঠলীলা, কালিয়দমন, কলঙ্কভঞ্জন, অক্রুরসংবাদ, নন্দবিদায়, উদ্ধবসংবাদ, কুরুক্ষেত্রমিলন, রামের বনগমন, আগমনী, কাশীখণ্ড প্রভৃতি পালার মধ্যে ইহা প্রচুর পরিবেশিত হইয়াছে।

গিরি গৌরী আমার এনেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্ত করিয়ে
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকাল ॥[১]

—প্রমুখ গীতগুলি অতুলনীয়। বাহুল্যভয়ে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিলাম না। রায় বাহাদুর দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন: "দাশরথির আগমনী তুলনা রহিত। কোন কবিই মেনকাকে এমন করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। গোষ্ঠপালায় দাশরথি যশোদাকে যেমন কৃতিত্বের সহিত আঁকিয়াছেন, তাঁহার আগমনীতে মেনকাও ততোধিক কৃতিত্বের সহিত চিত্রিতা।"[২]

পাঁচালীতে যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে বীর ও রৌদ্র রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চণ্ডী ও মহিষাসুর বধের মধ্যে বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের সমাবেশ হইয়াছে।

পদস্থিত ধরাতলে মস্তক গগন মণ্ডলে
সহস্র ভুজে দিকসকলে ঘিরিলেন অমনি।
হেমগিরি জিনিয়ে বরণ লোমকূপে সূর্যের কিরণ
ভয়ংকর মূর্তি ত্রিনয়নী ॥

—মহিষাসুরের যুদ্ধ, পৃঃ ৫৬৮

অদ্ভুত রসের চমৎকার উদাহরণ।

বীর ও রৌদ্র রসের কিছুটা মিশ্ররূপ দেখা যায় লক্ষ্মণ শক্তিশেল পালাতে রাবণের যুদ্ধ বর্ণনায় (পাঁচালী, পৃঃ ৪০৮) এবং দক্ষযজ্ঞ নাশ পালাতে দক্ষযজ্ঞ নাশের বর্ণনায় (দক্ষযজ্ঞ, পৃঃ ৪৮৩) বীভৎস রসের সঙ্গে মিশিয়া রৌদ্র রস

১। ঐ, ঐ, ঐ, আগমনী (১), পৃঃ ৫১৫।
২। ঐ, ঐ, ঐ, সমালোচনা, পৃঃ ২০।

একটা হালকা হাস্যকর পরিণতির মধ্যে ফুরাইয়া গিয়াছে। রাবণের যুদ্ধের উদাহরণটি দিতেছি।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদে ক্রুদ্ধ রাবণ ক্ষিপ্ত হইয়া যুদ্ধে আসিয়াছেন। ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে। "কখন বানর কটক জয়ী, কখন দশানন।" এই যুদ্ধে বানর সেনাপতি নীল রাবণের দশমুণ্ডে চড়িয়া নাচিতে লাগিল।

হাসে নীল খিল খিল মারে কিল ঘাড়ে।
ধড়াধড় মারে চড় টেনে চুল উপাড়ে ॥
রাবণ বলে কি হল দায় নীল বানর কোথায়।
করে দাপ করে প্রস্রাব রাবণের মাথায় ॥
মুখ বুক দিয়ে প্রস্রাব গড়িয়ে পড়ে যত।
দুর্গন্ধে দশস্কন্ধের প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥
একে ত দুর্গন্ধ তাতে বানরের প্রস্রাব।
দশানন বলে প্রাণ গেল বাপ বাপ ॥
বলে ওরে বেটা দুরাচার কি করলি মাথায় বসে।
নীল বলে কিছু মনে করো না মুতেছি তরাসে ॥

—লক্ষ্মণ শক্তিশেল, পৃঃ ৪০৯

অশ্লীলতা বিচার

দাশরথির পাঁচালীর বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড অভিযোগ হইল পাঁচালীর অশ্লীলতা। অভিযোগটি বিচার্য। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে অশ্লীলতা তিন প্রকার, ব্রীড়াব্যঞ্জক, জুগুপ্সাব্যঞ্জক ও অমঙ্গলব্যঞ্জক। পদে, পদাংশে, বাক্যে ও অর্থে এই অশ্লীলতা হইতে পারে। ইহা অনিত্য দোষ, কারণ আদি-রসের ক্ষেত্র বিশেষে অশ্লীলতা দোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। যে পদ, পদাংশ, বাক্য ও অর্থ লজ্জা, ঘৃণা বা অমঙ্গল প্রকাশ করে তাহা অশ্লীল অর্থাৎ শ্রীহীন, অসুন্দর। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের চিত্ত যাহাতে সংকুচিত হয় ব্যাপকার্থে তাহাকে অশ্লীল বলা চলে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে,

এই সংকোচ আসে রুচিবিরুদ্ধ বস্তু পরিবেশনের মধ্য দিয়া। আর রুচি জিনিসটি যে অধিক পরিমাণে স্থান ও কালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই রুচির ব্যবধানের জন্যই এক যুগের সৌন্দর্য, প্রেরণা, কল্যাণাদর্শ অন্য যুগে কদর্য, ঘৃণার্হ, ও অশুভ বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায়।

লং সাহেব তাঁহার Descriptive Catalogue-এ লিখিয়াছেন :

...they (Bengali songs) are filthy and polluting, of these the most known are the Panchalis, which are sung at festivals and sold in numerous editions and by thousands. Some are on good papers well got up, others are on the refuse of old canvas bags. The Panchalis are recitation of stories chiefly from the Hindu sastras in metre, with music and singing. They relate to Vishnu and Siva, intermixed with pieces in the style of Anacraeon. Dasarathi Roy is the most famous composer of them, by which he has gained much money."

Descriptive Catalogueটি দাশরথির জীবৎকালে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইখানে সাধারণ ভাবে বাঙ্গালা গানকে filthy and polluting বলা হইলেও পাঁচালী সম্বন্ধে stories chiefly from the Hindu sastras এবং they relate to Vishnu and Siva এই দুইটি কথাই সুস্পষ্ট। পাঁচালী বলিতে মুখ্যতঃ এই অংশকেই বুঝান হইত। দাশরথির প্রকাশিত প্রচলিত ৬৪ পালার মধ্যে দাশরথির মৌলিক রচনা মাত্র ১১টি এবং উহাদের মধ্যেও তিনটি[1] সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর নকসামাত্র। পাঁচালীর ভূমিকায় দাশরথি বলিয়াছেন,

সাধুর সন্তাপ দূর জন্য যত সুমধুর
সার তত্ত্ব হইল যোজন।
শ্রবণেতে জীবমুক্ত ভারতী ভারত উক্ত
শ্রীগোবিন্দগুণানুকীর্তন॥

১। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, বিধবা বিবাহ, কর্তাভজা।

অপরে করিবে রাগ ঘুচাইতে সে বিরাগ
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ।
প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি প্রেম বিচ্ছেদের বাণী
রসিক-রঞ্জন রস-রঙ্গ ॥[১]

"রসিক-রঞ্জন রস-রঙ্গ" রূপ "অপর প্রসঙ্গ" অপরের অর্থাৎ স্থূলরসপিপাসু সাধারণের রাগ বিরাগ দূর করিবার জন্যই তিনি রচনা করিতেন। মূল বক্তব্য হইল "শ্রীগোবিন্দগুণানুকীর্তন"। সুতরাং এই কথা অনেকখানি নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে দাশরথির পৌরাণিক পালার মধ্যে অশ্লীলতা একরকম নাই, আর থাকিলেও তাহা নগণ্য, রসিকদের চিত্ত পীড়িত হইবার মত নহে। এই সম্বন্ধে কয়েকটি বিদগ্ধ মন্তব্য উদ্ধার করা যাউক।

দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন: "দাশরথির যে সমস্ত পৌরাণিক পালা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল, তাহাদের মধ্যে অশ্লীলতা দোষ নাই। এ কথা বলিতে হইতেছে এ জন্য যে অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা দাশরথির সর্বাঙ্গই অশ্লীলতাময়। ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক ধারণা। তাঁহার পৌরাণিক পালাগুলি পড়িয়া দেখিলেই এই ধারণা দূর হয়।[২]"

পুনশ্চ বিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রশেখর কর মহাশয় লিখিয়াছেন: "দাশরথির রচনায় যে অশ্লীলতা আছে ইহা কে অস্বীকার করিবে? তবে একথা ঠিক যে তাঁহার পৌরাণিক আখ্যানমূলক পাঁচালীতে অশ্লীলতার অংশ অতি অল্প। অনেক পালাতে অশ্লীলতা একেবারেই নাই। নলিনীভ্রমরোক্তি, বিরহ বা নবীন সোনামণির দ্বন্দ্ব প্রভৃতি দাশরথির মূল গ্রন্থ নহে, প্রহসন মাত্র।"[৩]

পুনশ্চ আধুনিক সমালোচক কবিশেখর কালিদাস রায়ের কথা: "রঙ্গ রসিকতা মাঝে মাঝে শ্লীলতার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে, তবে তাহা পৌরাণিক পালায় নয়, প্রাকৃত বিষয়ক পালায়। দাশুর রচনায় অশ্লীলতা হইতে গ্রাম্যতাই বেশি।"[৪]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২।
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, সমালোচনা অংশ, পৃঃ ২৬
৩। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, অভিমত সংগ্রহ, পৃঃ ৪।
৪। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, তৃতীয় অংশ, পৃঃ ৩৬৬।

রায় বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন: "শ্রুতিসুখকর কিন্তু কুরুচিদুষ্ট গীত রচকদের মধ্যে দাশরথি সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১] কিন্তু কয়েক পংক্তি পরে একই অনুচ্ছেদে আবার তিনি লিখিয়াছেন: "তাঁহার অশ্লীলতার পরিচয় পাঠক অনেক স্থলেই পাইবেন। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, উহা সেই যুগের পরিচায়ক, সুতরাং এই দোষের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে দোষী করা সমীচীন হইবে না।" এই মন্তব্য পাঠ করিয়া মনে হয় যে ডঃ সেন প্রথমতঃ স্বীয় শিক্ষিত মনের রুচির মানদণ্ডে বিচার করিতে উদ্যত হইয়া উনবিংশ শতকের জনরুচির দিকে সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ড লাঘব করিবার ওকালতি করিয়াছেন। বস্তুতঃ যুগরুচি বলিতে রায় বাহাদুর এইখানে যে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের কথা বলেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সেই যুগে কবি যাহাদের জন্য কাব্য রচনা করিতেন তাহাদের সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া কাব্য বিচার করা সমুচিত নহে। এই কারণে "কুরুচিদুষ্ট" এই বিশেষণটি নিরপেক্ষ বিচারে দাশরথির প্রতি প্রযোজ্য কিনা তাহাই বিচার্য।

ডঃ দীনেশচন্দ্র অন্যত্র দাশরথি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন "Essentially a poet of the masses"[২]—এককথায় ইহাই বোধ হয় দাশরথির শ্রেষ্ঠ কবিপরিচিতি। দাশরথির গুণমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের একটা বৃহৎ অংশ যে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের যে অংশটি তাঁহার গুণগ্রাহী ছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল প্রাচীনপন্থী, ইংরাজী-শিক্ষিত রুচির প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত। সুতরাং সে যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত শিষ্ট রুচির সম্বন্ধে দাশরথির মনে কোন আগ্রহ বা জিজ্ঞাসা ছিল না। দাশরথি মূলতঃ যাহাদের কবি, তাহাদের মানসমণ্ডলটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

অশ্লীলতা প্রধানতঃ সৃষ্টি হয় আদি রসের উৎস ধারায়। রসাল মধুর দারু রস বা দ্রাক্ষারস যেমন আবহাওয়া উত্তাপাদির প্রভাবে অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণে গাঁজিয়া উঠে এবং উগ্র সুরায় পরিণত হয়, তেমনি আদি বা শৃঙ্গার রসের

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৩১।

২। History of Bengali Language and Literature—D. C, Sen, P. 745

মধুর ধারাও স্থানকালের অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ও যুগরুচির চাহিদায় স্থূল অশ্লীলতায় পরিণত হয়। আদিরসের প্রতি সকলেরই সহজ একটি আকর্ষণ আছে, কাহারও কাছে উহা পরোক্ষ, সুপ্ত ও সূক্ষ্ম, আবার কাহারো কাছে বা প্রত্যক্ষ, জাগ্রত ও স্থূল। জনমন বিদগ্ধ-মন হইতে কম জটিল। কাজেই যে আবেগ সহজ ও স্বাভাবিক, তাহার প্রতি জনমনের আকর্ষণও প্রচুর ও স্পষ্ট। আদিরসকে স্থূলভাবে আস্বাদন করিবার আগ্রহে সমবেত এই জনগণের প্রতি দাশরথি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, কি উপায়ে তাহাদের রসতৃষ্ণা মিটাইয়া নিজের খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন, এই দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। "অপরের" রাগ বিরাগ দূর করিতে যে কয়টি রসরচনা তিনি লিখিয়াছেন, তাহা বাদ দিলে দেখা যায় যে আদিরসকে দাশরথি একেবারেই মুখ্য স্থান দিতে চাহেন নাই। প্রথমতঃ আদিরসের মদিরঝর্ণাকে ভক্তিরস-গঙ্গাধারায় মিশাইয়া দিয়াছেন, এবং তাহাতে সাধারণ রতি "কৃষ্ণ রতি" হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জনমনকে ভুলাইবার জন্য আদিরসের উগ্র সুরার বদলে শ্লেষ ব্যঙ্গ কৌতুকের ঝাঁঝ মেশানো হাস্যরসের মধু ভাণ্ড আগাইয়া দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ অনুপ্রাসাদি অলংকরণ প্রাচুর্যে ও বিচিত্র মিলযুক্ত ছন্দের মাধুর্যে তাঁহার পাঁচালীকে জনগণের শ্রবণ-রঞ্জন করিয়া তুলিয়াছেন। চতুর্থতঃ সমসাময়িক বিষয়গুলির চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র ও নকসা আঁকিয়া জনগণকে কৌতুক রসে মুগ্ধ করিয়াছেন। সমগ্র পাঁচালীর পরিবেশনে দাশরথির এই সংযমপূর্ণ কলাকৌশলটি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় না কি?

রায় বাহাদুর ডঃ সেন দাশরথির কুরুচিদুষ্টতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া "বিশেষ বাঙ্গালা সাহিত্য তখন রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া জনসাধারণের পদচিহ্নিত ধূলিকাদার রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল"[১]—বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে সুবিচার হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ অশ্লীলতা বলিয়া রায় বাহাদুর যাহাকে নিন্দা করিয়াছেন, সেই ধারাটি জনসাধারণের ধূলিকাদার রাস্তায় আসিয়া পড়িবার বহু পূর্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের লেখনীমুখে কল্লোল তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ স্থানকালপাত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে দাশরথির

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৩১।

রচনাতে ভারতচন্দ্র হইতে অধিকতর সংযম ও ন্যূনতর অশ্লীলতার সন্ধান পাওয়া যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখানে উনবিংশ শতকের বা তাহার পরের ইংরাজী-শিক্ষিত মনের রুচিসম্মত হইয়া সংযম ও অশ্লীলতা শব্দ দুইটি প্রয়োগ করিতেছি। নতুবা প্রত্যেক যুগের রুচিসম্মত সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিতে এই মতবাদ নির্ভুল কিনা সে সম্বন্ধে গভীর সংশয়ের অবকাশ আছে। যাহা হউক ভারতচন্দ্র ও দাশরথির শ্রোতৃবর্গ, দুই কবির শিক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা, দুই কবির কাল ও পারিপার্শ্বিক প্রভৃতির কথা ভাবিয়া দেখিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যায়। সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ শ্রোতৃবর্গের শ্রবণপাত্রে ভারতচন্দ্র যতখানি আদিরসের সুরা ঢালিয়াছেন, ততোধিক আর পারা সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। অথচ দাশরথি তাঁহার অশিক্ষিত ও স্থূল আদিরসপিপাসু শ্রোতৃসাধারণের নিকট সে রস পরিবেষণে যে কার্পণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। ইহা নিশ্চিত যে মূল কাব্য হিসাবে একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিলে দাশরথির শ্রোতৃবর্গ বিপুল আগ্রহে, অধিকতর তৃপ্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিত এবং তাহার মধ্যে দাশরথির প্রতিষ্ঠা আরও বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু তাহা দাশরথি করেন নাই। এমন কি যেখানে স্বাভাবিক সুযোগ আসিয়াছে সেখানেও তিনি অস্বাভাবিক সংযম দেখাইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ লীলায় কোথাও সম্ভোগ বা তৎভাবানুরঞ্জিত কোন বর্ণনা তিনি করেন নাই।

দাশরথির মৌলিক পালাগুলির মধ্যে অনেকটা অশ্লীলতা আছে। কিন্তু এই স্থলেও লক্ষণীয় এই যে বিষয়বস্তুর মধ্যে বা আদর্শের মধ্যে এই দোষটি ততখানি নাই যতটা রহিয়াছে প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে। তাঁহার মৌলিক রচনার মধ্যে সাধারণ ভাবে কোন কাহিনী বা প্লট নাই, পালাগুলি কবির ছড়ার মত সাজান কতগুলি উক্তি প্রত্যুক্তির সমাহারমাত্র। এই বাক্যালাপের যুক্তি, শব্দ, উপমা, বিস্তার সবটা জনসাধারণের মর্মগ্রাহী ও বোধগম্য করাইবার জন্ত প্রকাশভঙ্গীটি এমন গ্রাম্য ও রূঢ় হইয়াছে যে ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট শিষ্টরুচিতে তাহা সহজেই আঘাত করে। ইহার বেশির ভাগই গ্রাম্যতা, অশ্লীলতা নহে এবং উদ্দেশ্যের দিকে তাকাইলে আর যাহাই হউক দাশরথির রুচিকে বাহবা দিতে হয়।

পাঁচালীর অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গান। দাশরথির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশও

হইয়াছে গানের মধ্য দিয়া। এই গীতধারার মধ্যে দাশরথির রুচির মূল উৎসটি ধরা পড়ে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন : "দাশুর পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, তাঁহার রচিত শ্যামা-বিষয়ক গানগুলির প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিব, এইখানে বাক্য চপল, অসার আমোদপ্রিয়, শব্দকুশল দাশু সহসা ধৈর্য গম্ভীর গুরুত্ব দ্বারা স্বীয় গানগুলিতে এক আশ্চর্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্লুত কাতরতা ঢালিয়া দিয়াছেন।[১]

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বের সমালোচনা করিতে গিয়া অশ্লীলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন এইবার তাহা উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। দাশরথি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে মত পোষণ করিতেন, মনে হয়, তাহার আভাসও ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে। গুপ্ত কবির পক্ষে সওয়াল করিয়া ও মূলতঃ যেসব যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে,"—সেই যুক্তিগুলি পুরাপুরি ভাবেই দাশরথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন : "যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্যভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরা এরূপ ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাব ছিল।"[২]

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৭।

২। বসুমতী প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত জীবনচরিত ও কবিত্ব অংশ, পৃঃ ১৯।

দাশরথির অশ্লীলতা সম্বন্ধে সমালোচক দীননাথ সান্যালের এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সব দেশের সনাতন সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর অশ্লীলতার সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।...সকল দেশেই দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া, কবিদিগের ঐ সকল দোষ উপেক্ষিত হইয়া তাঁহাদের সাহিত্য সনাতনরূপে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পুরাতন সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্যও কি অশ্লীলতা দোষবর্জিত হইতে

ছ

বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও প্রয়োগ-পদ্ধতি

পাঁচালীর বিষয়বস্তু-বিন্যাস ও প্রয়োগপদ্ধতি লক্ষণীয়। দাশরথির পাঁচালীর পটভূমি যে ভক্তিরসসিক্ত তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। পৌরাণিক তথা লৌকিক পালার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে মুখ্য নিয়ামক-রূপে কাজ করিয়াছে ভগবদ্-মাহাত্ম্য-বর্ণনা। মুখ্যতঃ এই কারণেই বোধ হয় প্রত্যক্ষভাবে রাম, কৃষ্ণ, দেবীমহিমা নিঃসম্পর্কিত কোন পৌরাণিক বা মহাভারতীয় কাহিনী, তিনি পাঁচালীর জন্য নির্বাচন করেন নাই। কারণ উহাদের বিষয়-গৌরব যতই হউক না কেন, প্রত্যক্ষতঃ ভগবানের মহিমা বা লীলা উহার মধ্যে পরিস্ফুট হয় নাই। মহাভারতের কীচকবধ, বকরাক্ষসবধ, চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান জাতীয় কাহিনী উপেক্ষা করিয়া দুর্বাসার পারণ, সত্যভামার ব্রত প্রমুখ কাহিনী লইয়া পাঁচালী রচনার উদ্দেশ্য যে কৃষ্ণমহিমা প্রচার তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দেবলীলা প্রচার পাঁচালীর মুখ্য বিষয় হওয়ায় মানুষের মহিমা গোটা পাঁচালীর মধ্যে কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই। পৌরাণিক পালায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে বা মৌলিক পালায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে সব

পারিয়াছে? শ্লীল ভাষায় অশ্লীল ভাবের ও ব্যবহারের প্রকটন কি গুরুতর দোষের নহে? তাহার উপর এখন আবার জুটিয়াছে ছবির অশ্লীলতা। কিছুদিন পূর্বে যে পত্রিকায় ঐরূপ কিছু থাকার সম্ভাবনামাত্র মনে করি নাই, তাহাতে ঐরূপ ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, এখনও কোন কোন পুস্তকে ও পত্রিকায় অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখিয়া বিস্মিত হই। কথা এই যে সর্ব লোকের মনোরঞ্জন করিতে গেলেই মাঝে মাঝে ঐরূপ করিতে হয়। দাশরথিকেও সে সময়ে অশিক্ষিত লোকের মনোরঞ্জনার্থই কখন কখন ঐরূপ সং দিতে হইত। আধুনিকের বেলায় Realism ও Aesthetics আর বৃদ্ধ দাশরথির বেলায় গলাধাক্কা।"—দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, সমালোচনা অংশ, পৃঃ ২৭।

মানুষগুলি ভিড় করিয়া আছে তাহারা প্রধানত টাইপ বা নক্সা মাত্র। রসিক ভক্তের বা ভক্তিরসের অনুকূল পরিবেশের সহায়ক ছাড়া উহাদের আর কোন গুণ, আবশ্যকতা এমন কি অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই। আর যাহারা আছে তাহারা প্রায় সকলেই কতগুলি সামাজিক দোষত্রুটির প্রতিচ্ছবি মাত্র। পাঁচালীর মধ্যে অনেকাংশে এই কারণেই পৌরাণিক মহৎ চরিত্র-গুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন, অসঙ্গত, কৃত্রিম ও প্রাচীন মহিমাচ্যুত হইয়াছে। চরিত্র বিচার প্রসঙ্গে ইহার বিশদ আলোচনা করিব।

দাশরথির মৌলিক পালাগুলিতে কোন মূল কাহিনী নাই। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া প্রচুর বাগ্‌বিতণ্ডা, প্রভূত হট্টগোল আছে, কিন্তু কাহিনীর ক্রমিক বিস্তার ও পরিণতি নাই। বিধবাবিবাহ ও কর্তাভজা পালা দুইটি হইতেছে দুইটি ঘটনা বা বিষয় সম্বন্ধে সরস মন্তব্য মাত্র। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব পালায়ও কাহিনী নাই, প্রথম দুই পদের বিতণ্ডা ও পরে সমন্বয় দর্শনের প্রচার আছে। বিরহ, নবীনচাঁদ ও সোনামণি, প্রেমচাঁদ ও প্রেমমণি, নলিনী ভ্রমর পালাতে কোন ধারাবাহিক কাহিনী নাই। ইহাদের মূল উপজীব্য মানুষের দোষগুণ, মুখ্যতঃ দোষ বর্ণনা এবং প্রেমবিরহের ব্যঙ্গচিত্র ও নক্সা অঙ্কন করা। এই সব ক্ষেত্রে কাহিনীর প্রয়োজনই একান্ত গৌণ, আসল উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের বিচিত্র স্খলন ও ত্রুটি সম্বন্ধে নানা ব্যঙ্গ কৌতুক রচনা করিয়া "রসিক-রঞ্জন-রস-রঙ্গ" সৃষ্টি।

পৌরাণিক কাহিনী ধারার মধ্যে প্রাচীন খাতটা মোটামুটি দাশরথি রক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বাঁধুনি না থাকায় ঘটনাস্রোত সর্বত্র মন্থর এবং বহু স্থানে বিকৃত, কোথাও নিষ্ঠুরভাবে পরিবর্জিত কিংবা অনাবশ্যকভাবে পরিবর্ধিত হইয়াছে। মূল কাহিনীর মধ্যে বহুক্ষেত্রে অবান্তর প্রসঙ্গ অকারণে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, কোথাও টাইপ চরিত্র সৃষ্টির ঝোঁকে কিংবা সমসাময়িক নানা ঘটনা বা আধুনিক হালচালের সম্বন্ধে সরস মন্তব্য করিবার উৎসাহে দাশরথি খেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ইহার মধ্যে খানিকটা অত্যুক্তি ও শ্রোতৃবর্গ সম্বন্ধে কিছু অযথার্থ কথা রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করি। ডঃ সেন লিখিয়াছেন: "শব্দের বাঁধুনির জন্য যেরূপ প্রশংসাই দাশুর প্রাপ্য

হউক না কেন, তাঁহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দাশুর প্রসঙ্গ অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্বত্রই ইনি দন্তরুচিকৌমুদি দেখাইয়া ঠাট্টার হাসি হাসিতেছেন। প্রভাস মিলন পড়িয়া দেখুন, যে প্রভাস মিলনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ, যুবা, বালক একস্থানে বসিয়া কাঁদিয়া বিভোর হইয়াছে, যে প্রভাস মিলনের সঙ্গে হিন্দুর কত উন্মাদকর করুণ স্বপ্ন বিজড়িত, দাশু তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া একটি নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ তদুপলক্ষে কৃষ্ণের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া কিরূপে গলাধাক্কা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ একটি মিথ্যা গল্প দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দাশুর পাগল প্রতিভা প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গ গণ্য করে না। পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয় যেন বহুসংখ্যক ইতর অর্ধশিক্ষিত লোক-মণ্ডলীর মধ্যে দাশু গাহিয়া যাইতেছেন, যে কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইতেছে, দাশু প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেই দিকেই গল্পের স্রোত বহাইয়া দিতেছেন, অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়া মনে মনে সা, ঋ, গ, ম, বাঁধিয়া স্থর দিতেছেন এবং কোন সময় কবি মূল স্থর ধরিবে তাহার অপেক্ষা করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন পালা শেষ হইয়া গিয়াছে।”[১]

ইহার কারণ বোধ হয় এই যে কাহিনীটিকে যথাযথ বর্ণনা করার মধ্যেই পাঁচালীর শিল্প-চাতুর্যের বা মুখ্য কলাকৌশলের মূল রহস্যটি নিহিত নাই। ভক্তির পটভূমিটি সুস্পষ্ট রাখিয়া সরস মন্তব্যে বক্তব্য বিষয়টিকে হাস্যোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিলেই তখনকার শ্রোতৃবর্গ হয়ত প্রসন্ন মনে তাহা গ্রহণ করিতেন। ক্ষিপ্র উত্তর-প্রত্যুত্তর, চাতুর্য ও কলহপটুতা, শ্লেষাঢ্য বাগ্‌বিন্যাস, অনুপ্রাসযমকাদি অলঙ্কারের অজস্রতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ-কৌতুকের বৈচিত্র্য, উজ্জ্বল হাস্যরসের প্রাচুর্য, বিচিত্র উপমাদি অলঙ্কারের মালিকা, বিস্ময়কর বস্তুতালিকা-সমন্বিত সুদীর্ঘ ছড়ার চমৎকারিত্ব প্রভৃতিই পাঁচালীর মুখ্য বৈশিষ্ট্য বলিয়া অনায়াসে কাহিনীর গৌরব ও প্রাধান্য দাশরথি উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদ্বারা পাঁচালীর রসব্যঞ্জনা ক্ষুন্ন হইয়াছে মনে করেন নাই। পূর্বে রসবিচার প্রসঙ্গে ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক এই সব কারণেই কাহিনীর পক্ষে যাহা পূর্ণ সাহিত্যিক বিচারে অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বলিয়া মনে হয়, তাহাই পাঁচালীকারের বিশিষ্ট কলাকৌশলের খাতিরে বহু-

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ ৫৪৭

বাঞ্ছিত এবং শ্রোতৃবর্গের কাছে পরম উপভোগ্য হইয়া থাকে। অতএব পাঁচালীতে যে কাহিনীর সঙ্গতি, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি প্রভৃতি মুখ্য বিবেচ্য রূপে গুরুত্ব লাভ করে নাই সেকথাটি মনে রাখিয়া পাঁচালী বিচার করিলে যথার্থ সুবিচার হয় মনে করি।

বলা হইয়াছে যে, সমসাময়িক ঘটনার সরস বিবৃতি, নানা বস্তুর সুদীর্ঘ তালিকা, নরনারীর বিচিত্র হালচালের শ্লেষাত্মক বর্ণনা পাঁচালীর একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে উল্লেখমাত্র করিয়াই দাশরথি ক্ষান্ত হন নাই। পাঁচালী প্রচারপ্রধান সাহিত্য। কাজেই কোন্‌টি অপকৃষ্ট, বর্জনীয় ও অকল্যাণকর এবং কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, গ্রহণীয় ও কল্যাণকর, তাহা তুলনামূলক ভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সে সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ভাষায় উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। অহল্যা উদ্ধার প্রসঙ্গে লক্ষ্মণ কর্তৃক কলির ব্রাহ্মণের দোষ বর্ণনা,[১] তরণীসেনের মাতৃভক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে কলিকালে মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির বিবৃতি,[২] প্রভৃতি অংশ উল্লেখযোগ্য। এমন কি মৌলিক পালাগুলির হালকা রসরচনার মধ্যেও দাশরথি মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "সার ভাব শ্রীগোবিন্দচরণ",[৩] "চলরে মন তীর্থবাস, করো না আর মধুর আশ, নয়ন মন সফল কর হেরিয়ে সেই পীতবাস।"[৪]

পাঁচালী প্রচারপ্রধান সাহিত্য। দাশরথি ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। সমালোচক দীননাথ সান্ন্যাল মন্তব্য করিয়াছেন: "কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণ প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাস যেমন মহাভারত প্রচারের জন্য, তেমনই দাশরথি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বঙ্গে কৃষ্ণলীলা প্রচারের জন্য।"[৫]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৩৫ ও আলোচ্য প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।

২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৯১ এবং প্রবন্ধের আলোচ্য পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।

৩। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সং, কলিরাজার উপাখ্যান, পৃঃ ৬৫১।

৪। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, নলিনী-ভ্রমর (২), পৃঃ ৬৯০।

৫। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, সমালোচনা, পৃঃ ১৬।

শুধু কৃষ্ণলীলা নহে, কালী ভক্তিও দাশরথি প্রচার করিয়াছেন। আর এই কালী ও কৃষ্ণকে দাশরথি কোন ভেদাত্মক দৃষ্টিতে দেখেন নাই। পৌরাণিক পালাগুলির মধ্যে ছাড়াও শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এই মৌলিক পালাটির মধ্যেও দাশরথির সিদ্ধান্ত "কালী কৃষ্ণ অভেদ আত্মা।"[১] শুধু কালী ও কৃষ্ণ কেন,

মন ভাবরে গণপতি ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি, কমলাপতি, পতিতপাবনী তারা
একে পঞ্চ পঞ্চে এক[১]

কালী, কৃষ্ণ, শিব, গণেশ, সূর্য এই পাঁচটিই হিন্দুদের পঞ্চ দেবতা, মূলতঃ এক। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর ইহাদের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন প্রভেদ নাই। আসল কথা হইতেছে ঈশ্বর ভক্তি। দাশরথি এই ভক্তিরস প্রচারের কবি।

দাশরথির রচনা-ভঙ্গীকে একদিক দিয়া আক্রমণাত্মক বলা যায়। যখনই তিনি প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছেন, নিজের অনভিপ্রেত কোন কিছু লইয়া কাহারও সহিত বিচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই শ্লেষ বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে উন্মত্তবৎ আচরণ করিয়াছেন, কোন মাত্রাজ্ঞান বা সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভণ্ড বৈষ্ণব,[২] কলিকালের বামুন,[২] কলিকালের পুত্র,[২] আধুনিকা নারী,[২] কর্তাভজা[৩] প্রভৃতি যখনই যাহার উপর দাশরথির শ্লেষদৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে, তখনই ক্রুদ্ধ শার্দূলের মত প্রচণ্ড আক্রমণে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বিধবাবিবাহ পালাতে ইহার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিধবাবিবাহ দাশরথি পছন্দ করেন নাই, এবং তাহা লইয়া শ্লেষ বিদ্রূপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রচলনের ঋষি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধাপূর্ণ শ্লেষ করেন নাই।

তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কি রূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে ॥

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৬২১।

২। আলোচ্য প্রবন্ধের পরিশিষ্ট-ক।

৩। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬২২।

রাজ আজ্ঞায় দূত আসি কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
রশি দিয়ে ফেলে অন্ধকূপে,
তা বলে দূত কখনো দূষী হয় না সেই পাপে ॥[১]

ইহা কি ঈশ্বরচন্দ্রের দোষ ক্ষালনের প্রচেষ্টা নহে ?

পুনশ্চ : বিবাহ করিতে দিদি আছে বিধবাদের বিধি
মরুক দেশের পোড়া কপালে সকলে
কথা ছাপিয়ে রাখে হয়ে প্রতিবাদী ॥
আমাদিগকে দিতে নাগর এলেন গুণের বিদ্যাসাগর
বিধবা পার করতে তরীর গুণ ধরেছেন গুণনিধি ॥
... ...
ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণ বধি ॥

কটাক্ষপাত স্পষ্ট, কিন্তু সশ্রদ্ধ ও কোমল।

পাঁচালীতে প্রচারপ্রাধান্য সম্বন্ধে দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের মন্তব্যটি উল্লেখ করি : "দাশরথি লোকশিক্ষার কবি। এখন আমরা চাষার ছেলেকে পৃথিবী গোলাকার, দেখিতে কমলালেবুর মত, গরুর চারিটি পা, দুইটি শিং একটি লেজ থাকে ইত্যাকার শেখানোকে লোকশিক্ষা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু সেকালের লোকশিক্ষার ধারা অন্যরূপ ছিল।...ব্যক্তিগত বা জাতিগত শিক্ষাতেই আমাদের দেশে লোকশিক্ষা পর্যবসিত হয় নাই। সেকালে সমাজ নেতৃগণ ধর্মশিক্ষাকেই প্রকৃত লোকশিক্ষার লক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে লোকসমাজে অশান্তি নিবারণ ও মঙ্গল স্থাপন করিতে ধর্মশিক্ষার তুল্য আর কিছুই নাই।"[২]

তুলনামূলক বিচার, বিশেষতঃ পাশাপাশি বিপরীত বস্তুর সন্নিবেশ করিয়া একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সৃষ্টির প্রয়াস দাশরথির পাঁচালীর একটি অন্যতম শিল্পকৌশল। একটি উদাহরণ দিতেছি। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ পালাতে লক্ষ্মণ চতুষ্পদী ছন্দে ছয়টি শ্লোকে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিলেন :

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬২৯।

২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, আলোচনা, পৃঃ ১।

পূজিলে ব্রাহ্মণের পদ হয় তার মোক্ষপদ,
কোন তুচ্ছ ব্রহ্মপদ হাঁ হে ভৃগুপদধারী।[১] ইত্যাদি

শ্লোকের পরই মিশ্র ত্রিপদী ছন্দে সুদীর্ঘ আটটি শ্লোকে লক্ষ্মণের মুখে কলির ব্রাহ্মণের নিন্দা শুনি:

ত্যাগ করে ত্রিসন্ধ্যে কুকর্মেতে ত্রিসন্ধ্যে
যাগ যজ্ঞ সকলি হবে হত।—ইত্যাদি।

এই রকম তরণীসেন বধ পালাতে মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির[২], গোপীগণের বস্ত্রহরণ পালায়,[৩] কলঙ্কভঞ্জন পালায়,[৪] নবীনচাঁদ ও সোনামণি[৫] প্রভৃতি পালাতে নারী ও বৈষ্ণবের প্রসঙ্গে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এমন কি গহনার তালিকাও সেকালের এবং একালের এই ভাবে আলাদা করিয়া দেখাইয়া দাশরথি রসসৃষ্টি করিয়াছেন।[৬]

ঘটনার পৌর্বাপর্য রক্ষা বা কালৌচিত্য সম্বন্ধে দাশরথি একেবারেই সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। এই কারণে পাঁচালীর বহু স্থানে কালানৌচিত্য দোষ দেখা যায়। যেমন কৃষ্ণকালী পালাতে কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি: জরাসন্ধ ভয়ে তুমি ব্যস্ত[৭] অথবা শিশুপালের ভগ্নীর উক্তি: "মেনেছিলাম সত্যপীরে, পীর মেনে চেয়েছেন ফিরে"[৮] এইরকম আরও দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এইখানেও স্থানকালপাত্র স্মরণ করিতে হইবে। বিদগ্ধ সাহিত্যিক বিচারে কালানৌচিত্য একটি দোষ সন্দেহ নাই, কিন্তু পাঁচালীর ক্ষেত্রে তাহার বিচার ভিন্নরূপে করিতে হইবে। শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান ও সংস্কার অনুসারেই পাঁচালীতে তথ্য সন্নিবেশ করা হইয়াছে। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় জরাসন্ধের

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৩৪।
২। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৩৯১, ৩৯২ এবং পরিশিষ্ট ক।
৩। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৭১, ৭৩।
৪। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ১২২।
৫। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৬৫৫।
৬। ঐ, ঐ, ঐ, দক্ষযজ্ঞ, পৃঃ ৪৭৯ এবং পরিশিষ্ট ক।
৭। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৬২।
৮। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ২৫২।

কোন স্থান নাই। কিন্তু পাঁচালীর শ্রোতৃগণ সমগ্র কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেই পরিচিত বলিয়া রাধার মুখে জরাসন্ধ সম্বন্ধে শ্লেষবাক্য শুনিয়া তৃপ্তই হইয়াছেন।

পাঁচালীতে নিসর্গ বর্ণনা নাই বলিলেই হয়। মাত্র চারিটি শ্লোকে কৈলাস বর্ণনা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য নিসর্গ বর্ণনা পাঁচালীতে পাওয়া যায় নাই।[১] ঘটনার বিবৃতি দান প্রসঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে প্রকৃতির উল্লেখমাত্র ছাড়া পাঁচালীতে প্রকৃতির আর কোন প্রাধান্ত দেওয়া হয় নাই।

পাঁচালীতে দাশরথি ঘটা করিয়া ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। দক্ষের যজ্ঞসভা,[২] শিববিবাহের[৩] এবং রামবিবাহের উৎসব,[৪] উমার[৫] ও কৃষ্ণের জন্মোৎসব,[৬] বামনের উপনয়ন,[৭] বানর ভোজ[৮] প্রমুখ দৃশ্যগুলি পাঁচালীতে অনেকাংশে বেশ বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই দৃশ্যাবলীর প্রায় সবটাই দাশরথির সমসাময়িক উনবিংশ শতকের বড়লোকের বাড়ীর উৎসবের অতিকৃত ফটোগ্রাফ। নমুনা স্বরূপ দক্ষের যজ্ঞসভার বর্ণনা উদ্ধার করিতেছি।

স্থানে স্থানে কতজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ
করিতেছে শাস্ত্র আলাপন।
... ...
রত্নবেদী কত শত নির্মাণ করেছে কত
ঘৃতের কলস সারি সারি।
দধি দুগ্ধ ঘৃতচিনি রাখিয়াছে নৃপমণি
হ্রদে হ্রদে পরিপূর্ণ করি॥
আর কত আছে দ্রব্য কহিবারে অসম্ভব্য
সুভব্য করেছে যজ্ঞ কুণ্ড।
কত কুস্তিগির মাল বাহুতে ধরয়ে তাল
পাথরে আছাড়ে নিজ মুণ্ড॥

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং পৃঃ ৬০৫ এবং পরিশিষ্ট ক।
২। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৪৮১।
৩। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৫০৭।
৪। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৩৪৩।
৫। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৫০০।
৬। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ২৬।
৭। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৬০৯।
৮। ঐ, ঐ, ঐ, ৪৪৮।

চোপদার জমাদার হাতে লেঙ্গা তলোয়ার
সম্মুখে সর্বদা আছে খাড়া।[১]

বধূবরণের দৃশ্য :

আয়লো জয়া জগদম্বা নিয়ে পান গুয়া রম্ভা
সাধের বউকে উলিয়ে ঘরে আনি ॥
কোথা গেলি লো তারামালিনী শীঘ্র দেলো পিঁড়িতে এলোনি
ঐ দেখ সিকিতে আলো চালি।
মেনেছিলাম সত্যপীরে পীর মেনে চেয়েছেন ফিরে
ঠাড়ো গুয়ো পান দিতে হবে কালি ॥[২]

বলা বাহুল্য যে এইসব ক্ষেত্রে দাশরথির কল্পনা নিজের অভিজ্ঞতার অতিক্রম করে নাই। কবিশেখর কালিদাস রায় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন : "দাশুর বৃন্দাবন, মথুরা, হস্তিনাপুর, দ্বারকা, কৈলাস বাংলারই মাঠঘাট, ক্ষেতখামার, চণ্ডীমণ্ডপ, ঘরসংসার। রসকলহের ক্ষেত্রে পৌরাণিক নরনারীরা কাটোয়া মহকুমার নরনারীতে পরিণত হইয়াছে।"[৩] পাঁচালীতে ইহাই স্বাভাবিক মনে করি। সৌভাগ্যক্রমে দাশরথি পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন না। পৌরাণিক বিষয়, পরিবেশ প্রভৃতিকে তিনি তাঁহার যুগের জনগণের জ্ঞান ও সংস্কার ও জীবন অভিজ্ঞতার ভাষায় সার্থক অনুবাদ করিয়াছেন। ভক্তিরসের মূল সুর ঠিক থাকিলে তিনি আর কিছু লইয়া মাথা ঘামান নাই।

পাঁচালী দৃশ্যকাব্য। কাজেই পাঁচালীর মধ্যে নাটকীয় প্রয়োজনে উক্তি প্রত্যুক্তির প্রাধান্য ও বর্ণনার অপ্রাধান্য স্বাভাবিক ভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ণনার প্রয়োজন হইয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাক্যালাপের যোগসূত্ররূপে। এই বাক্যালাপ আবার বেশির ভাগই কলহমূলক। রস-কলহে উহার চমৎকারিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি পরিস্ফুট হইয়াছে। কবির দলের ঝোঁক অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং পৃঃ ৪৮১
২। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ২৫২।
৩। ঐ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, ৩য় অংশ, পৃঃ ৩৬৬।

১ দেবকীর প্রতি কংস :

কন্যা তো মানবী বটে ফেলিতে পারে সংকটে
পাপিনী তোর ও পাপ উদরে।
যদি এক ভেক জন্মে তথাপি না বিশ্বাস জন্মে
অস্ত করা আছে মোর অন্তরে ॥
জঠরে জন্মিলে হংস বিশ্বাস করে না কংস
তখনই ধ্বংস করিব তার প্রাণী।
অথবা যদি জন্মে শিখী আমার হাতে বাঁচিবে সে কি
আমি শিখি তোর শিখান বাণী ॥[১]

২ ভ্রমরের প্রতি নলিনী :

যদি শুনতে পাই স্থলপদ্ম তোয় কি দিবে স্থল পদ্ম
পাদপদ্মে পড়ে যদি থাকিস।
যদি অশোকের সঙ্গে শুনি আশোক আমি কি তোর করিব রে শোক
প্রাণের নাশক হব বেটা দেখিস ॥
যদি শুনি মজেছ বকে যেন ক্ষুদ্র মীন খায় বকে,
তেমতি হানিয়া প্রাণ মারিব।
যদি শুনি বেলফুলের কথা বেলভাঙ্গার ন্যায় ভাঙ্গব মাথা
বেল মোক্তার মোক্তা মারা সারিব ॥
যদি নাম শুনি অতসীর এখনি হত করিব শির
সে মাসীর আর কোরনা ভরসা।
যদি শুনি টগরের নাগর নগরের মাঝে বাজায়ে ডগর
গোর দিয়া গৌরব করব ফরসা ॥[২]

নিজের প্রশ্ন তুলিয়া বা পূর্বকথার সূত্র উল্লেখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উহার অপূর্ব উত্তর রচনামূলক ভঙ্গীটির মধ্যে যে অলংকৃত বাক্‌চাতুর্য ও শ্লেষাঢ্য চমৎকারিত্ব থাকে, দাশরথির পাঁচালীতে তাহারও সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, জন্মাষ্টমী, পৃঃ ১৩।
২। ঐ, ঐ, ঐ, নলিনী ভ্রমর (২), পৃঃ ৬৭৯।

১। কুটিলার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি :

বস্ত্র কি হরিলেন হরি আমরাই বস্ত্র প্রদান করি
ষোড়শ উপচারে বস্ত্র লাগে ॥
যদি বল এই কথা বস্ত্র দিয়ে পূজে দেবতা
আপন বস্ত্র ত্যাগ করে কোন জন।
জগন্নাথকে যা দেয় নরে তাই কি ফিরে ব্যাভার করে
সেটা ত্যাজ্য জনমের মতন ॥
আবার বললি ধনবান নয়, গুণবান নয়, জ্ঞানবান
নয়, রসবান ও নয় যশোবান।
ও যদি নয় কোন বান আমরা তবেই পেলেম নির্বাণ
আমাদের কপাল বলবান ॥
আবার বললে ডুবে মর ডোবা অতি সুদুষ্কর
না ডুবিলে কি জানা যায় হরি কি গুণযুক্ত।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ণবে যে না ডোবে সেই তো ডোবে,
যে ডোবে সে ডুবে হয় মুক্ত ॥[১]

২। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা :

এখন রসাতলে যায় পৃথ্বী রাই হয়েছেন কালীমূর্তি
গোকুল আকুল কূল কিসে রয় বল।
যদি বল ওহে হরি কালী যে তিনি দিগম্বরী,
সে রূপ কি রূপ ধরেন কিশোরী।
শুন ওহে পীতাম্বর ত্যাজ্য করি পীতাম্বর
দাঁড়িয়ে আছেন হয়ে দিগম্বরী ॥
যদি বল শ্যাম নয়নতারা তারার যে তিনটি তারা
তিন চক্ষু রাধার কি বল।
হয়ে তোমার উপরে রুক্ষ কপালে উঠেছে চক্ষু
তাইতে রাধা ত্রিনয়নী হলো ॥

১। দাশথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, গোপীগণের বস্ত্রহরণ পালা, পৃঃ ৮২।

যদি বল কালকামিনী বলি গ্রহণ করেন তিনি
কমলিনী বলি পান কি করি।
রাধার কাছে বনমালি অনেক দেখিলাম বলি
যত বলি কাটেন ব্রজেশ্বরী॥
যদি এ কথা কও আমাকে কালীর হাতে মুণ্ড থাকে
রাধার সে রূপ ঘটেছে প্রকারেতে।
অতুল্য ধন তুমি নাথ ছিলে রাধার হস্তগত
এখন তোমায় হারিয়ে মুণ্ড হয়েছে হাতে॥
যদি বল গুণমণি চতুর্ভুজা কালকামিনী,
কমলিনী হয়েছেন তাই রাগে।
আর কি রাধার সেদিন আছে, এখন মান করে দুহাত বেড়েছে
কে দাঁড়াবে ভয়ংকরীর আগে।
যদি বল হে বনমালি পাষাণনন্দিনী কালী
সে তুলনা ধরেছি রাধাকে।
না হলে পাষাণকুমারী এ ধন পাসরি প্যারী
কেমনে জীবন ধরে থাকে॥
যদি বল কাল শশি কালীর হাতে থাকে অসি
অসি কিরূপ ধরেন প্রেয়সী।
প্যারী স্বীয় ধরিতেন তোমায় তখন, অস্বীয় ধরেছেন এখন
ব্রজনাথ কম্পিত ব্রজবাসী॥[১]

একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে পাঁচালীর মধ্যে উক্তি প্রত্যুক্তি-মূলক নাটকীয় ভঙ্গী প্রাধান্য পাইলেও পালার মধ্যে কিন্তু কোন নাটকীয় সংঘাত বা তজ্জাতীয় উৎকর্ষ নাই। কাহিনী যেক্ষেত্রে একান্ত শিথিল, চরিত্র সৃষ্টি যেখানে উপেক্ষিত, সেক্ষেত্রে নাটকীয় সংঘাত, পরিণতি, ও উৎকর্ষের প্রত্যাশা করাই বৃথা।

একই বিষয়ে একাধিক পালা রচনার উদাহরণ দাশরথির পাঁচালীতে রহিয়াছে। গোষ্ঠলীলা, নবনারী কুঞ্জর, কলঙ্কভঞ্জন, মানভঞ্জন, অক্রূর সংবাদ,

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, মানভঞ্জন (২), পৃঃ ১৪৫।

আগমনী, বামনভিক্ষা, বিরহ, নলিনী-ভ্রমর, গঙ্গা-ভগবতীর কোন্দল বিষয়ে দুইটি করিয়া পালা, এবং মাথুর সম্বন্ধে তিনটি পালা দাশরথির পাঁচালীতে দেখা যায়। তাছাড়া কয়েকটি পালার মধ্যে অন্য পালার আখ্যান ভাগের খানিকটা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে প্রধানতঃ ভূমিকা বা সূত্র হিসাবে। যেমন নন্দোৎসবের মধ্যে জন্মাষ্টমী, গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দলের মধ্যে চণ্ডীর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ইত্যাদি।

কেন যে দাশরথি একই বিষয়ে একাধিক পালা রচনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে নানা অনুমান করা যায়। পাঁচালীর সুযোগ্য সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন : "আসরে পাঁচালী গাহিতে বসিয়া অনেক সময় দাশুরায় স্বরচিত পালার প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন করিয়া লইতেন। পালা লিখিবার সময় একরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন, গাহিবার সময় হয়তো তাহার কোন স্থল বদলাইয়া আবার নূতন করিয়া লইতেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর ভদ্রত্ব ইতরত্ব বুঝিয়া, পাণ্ডিত্য-মূর্খত্ব বুঝিয়া অনেক সময় তিনি পাঁচালী পালায় যথাবশ্যক শব্দযোজনাও করিতেন। যে আসরে ভদ্র শ্রোতার সংখ্যাই বেশি, সে আসরে পাঁচালীর পালায় স্থল বিশেষে তিনি যে শব্দ ব্যবহার করিতেন, যে আসরে ইতর শ্রেণীর শ্রোতাই অধিক, সেখানে তাহা ব্যবহার না করিয়া যথাযোগ্য নূতন শব্দ বসাইয়া লইতেন। একই বিষয়ের পালাও তিনি ছোট বড় মাঝারি একাধিক তৈয়ার করিয়া রাখিতেন।"[১]

মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রথমে একই বিষয়ে যে সব একাধিক পালা মুদ্রিত আছে, তাহাদের আকারের ইতর বিশেষের একটা মোটামুটি হিসাব লওয়া যাউক।

পালার নাম	শ্লোকসংখ্যা	গীতসংখ্যা
গোষ্ঠলীলা (১)	৫৫	৬
গোষ্ঠলীলা (২)	৬৬	৮
নবনারী কুঞ্জর (১)	৬৯	১০
নবনারী কুঞ্জর (২)	৬৫	৪

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৫।

পালার নাম	শ্লোকসংখ্যা	গীতসংখ্যা
কলঙ্কভঞ্জন (১)	২৪৮	১৩
কলঙ্কভঞ্জন (২)	২০০	১৭
মানভঞ্জন (১)	২৮০	১৫
মানভঞ্জন (২)	১৭৭	১৭
অক্রূরসংবাদ (১)	১৬০	১৬
অক্রূরসংবাদ (২)	১৯৬	১৫
মাথুর (১)	১৭৫	১৫
মাথুর (২)	১৩৯	১৫
মাথুর (৩)	৬৯	৮
গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল (১)	১৫৫	১৬
গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল (২)	৯৮	৫
আগমনী (১)	২১৬	১৩
আগমনী (২)	৮৫	৬
বামনভিক্ষা (১)	১৮৯	১৩
বামনভিক্ষা (২)	২২৫	১৭
বিরহ (১)	৫৩	৭
বিরহ (২)	১৪৭	৭
নলিনী ভ্রমর (১)	৯৩	৬
নলিনী ভ্রমর (২)	১০৬	৯

এই হিসাব[১] হইতে দেখা যায় যে অন্ততঃ ৩৫টি শ্লোকের ন্যূনাধিক্য আছে কলঙ্কভঞ্জন, অক্রূরসংবাদ, মাথুর, গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল, আগমনী, বামনভিক্ষা, বিরহ এই পালাগুলির বিভিন্ন আকারের মধ্যে। পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে আসরে বসিয়া এগুলির পরিবর্তন হয় নাই। এগুলি একেবারে পৃথক রচনা। গাহিতে বসিয়া পালার অংশবিশেষের সংযোগ-বিয়োগ ও আসর বুঝিয়া শব্দের পরিবর্তন সম্বন্ধে হরিমোহন যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হয়ত অসম্ভব নহে এবং জনকবি দাশরথির পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু

১। হিসাবটি দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ হইতে গৃহীত।

মুদ্রিত পালাগুলির আকার আয়তন সে মন্তব্যের প্রমাণ নহে, সেগুলি একেবারেই আলাদা রচনা। মানভঞ্জন পালা দুইটির মধ্যে কাহিনী দুইটি: একটি যোগী বেশে মিলন, দ্বিতীয় বিদেশিনী বেশে মিলন। ইহা ছাড়া অন্যান্য পালার কাহিনী মোটামুটি এক। আমাদের ধারণা একই বিষয়ে একাধিক ও বিভিন্ন আয়তনের পালা রচনার অন্য কারণ ছিল। হয়ত এই বিষয়গুলি অধিকতর জনপ্রিয় ছিল, এবং ইহার পরিবেশনে দাশরথি হয়ত সমধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই সব কারণেই বোধহয় অভিনবত্ব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে নূতন ভাষায় ও গানে একেবারে ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষণীয় এই যে বিষয় এক হইলেও একটি পালার সহিত ভাষা, ছড়া, ছন্দ, গান ও কাহিনী বিন্যাস প্রভৃতিতে অন্যটির বিশেষ সাদৃশ্য নাই। যে কোন দুইটি পালা ধরিয়া বিচার করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলঙ্কভঞ্জন পালা দুইটি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

কলঙ্কভঞ্জন (১) পালাটির শ্লোকসংখ্যা ২৪৮। ছন্দ মুখ্যতঃ পয়ার। পয়ার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২১০। গীত আছে মোট ১৩ খানা: নন্দ ১, রাখালগণ ১, যশোদা ৩, জটিলা ১, কুটিলা ১, চন্দ্রাবলী ১, রাধা ১, বর্ণনা ৪। ছড়া আছে মোট ৬টি। পালার স্থূল সূচী এই প্রকার: কৃষ্ণের নিকট রাধার দুঃখ নিবেদন, কৃষ্ণের কপট মূর্ছা, যশোদার প্রতি রাখালগণ, যশোদার খেদ ও মূর্ছা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা, নন্দ ও উপনন্দের বিলাপ, রাধার বিলাপ, রাধার প্রতি দৈববাণী, বৈদ্যবেশে শ্রীকৃষ্ণ, বৈদ্যহরির ব্যবস্থা, জটিলাকুটিলার নিকট যশোদার গমন, যশোদা ও জটিলা, জটিলার প্রতি সখীর ব্যঙ্গোক্তি, সখীর প্রতি জটিলার ভৎর্সনা, জটিলার কথায় কুটিলার কোপ, ছিদ্রকুম্ভ লইয়া জটিলার যমুনায় গমন, জটিলার দর্পচূর্ণ, কুটিলার দর্পচূর্ণ, বৈদ্যরাজের গণনা, বৈদ্যের প্রতি কুটিলার কোপ, কুটিলার প্রতি চন্দ্রাবলী, কুটিলার ক্রোধ, শ্রীরাধার আগমন, ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়ন ও আনন্দ, যুগলমিলন।

কলঙ্কভঞ্জন (২) পালার শ্লোকসংখ্যা ২০০। ছন্দ মুখ্যতঃ ত্রিপদী চৌপদী এবং উহাদের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০। গান আছে মোট ১৭খানা: রাধা ৪, যশোদা ৩, নারদ ৩, বৃন্দা ২, কৃষ্ণ ২, নন্দ ১, জটিলা ১, বর্ণনা ১। ছড়া আছে

মোট ৪টি। পালার স্থূলসূচী এই প্রকার: শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার অভিমান, কৃষ্ণের কলঙ্কভঞ্জনের প্রতিজ্ঞা, কপট মূর্ছা, যশোদার খেদ ও গৃহে নারীগণের জটলা, নন্দের বিলাপ, যশোদার প্রতি নন্দের কোপ, নন্দালয়ে নারদ, বৈদ্যহরি, বৈদ্যহরি ও বৃন্দা, বৈদ্যের কাছে বৃন্দার ঔষধ প্রার্থনা, বৃন্দার প্রতি বৈদ্যের ব্যবস্থা, নন্দালয়ে বৈদ্যহরি, কুটিলার ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়ন প্রচেষ্টা ও দর্পচূর্ণ যশোদা ও বৈদ্যহরি, বৈদ্যহরির গণনা, রাধার নামে জটিলা কুটিলার ব্যঙ্গোক্তি, রাধার কৃষ্ণস্তব, যমুনাতে রাধা, রাধার জল আনয়ন, কৃষ্ণের মূর্ছাভঙ্গ, যশোদার কোলে রাধা কৃষ্ণ।

পাঁচালী গানে মধ্যে মধ্যে গদ্য ব্যাখ্যা ও সরস টীকা টিপ্পনী দ্বারা রসবৃদ্ধি করিবার চাল আছে। কীর্তনে আখর যোজনার মত এই বিষয়ে পাঁচালী গায়কের নিজস্ব প্রতিভাই মুখ্যতঃ কার্য করিয়া থাকে। মুদ্রিত পাঁচালীর মধ্যে কয়েক স্থানে গদ্য ছুট কথার নিদর্শন আছে। দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

১। অক্রূরকে তিরস্কার করিয়া চিত্রা বলিতেছেন:

"হারে তোর কে রাখে অক্রুর নাম ?
তুই তো অতি ক্রূর।"

তারপরই গদ্য ব্যাখ্যা:

"অক্রূর বলি কাকে যার শরীরে ক্রূরতা না থাকে। তুই অত্যন্ত ক্রূর, যদি তোর নাম অক্রূর হয়, তবে তোর পূর্বভাগে যে অ আছে, ওটা দোষযুক্ত অ। কেননা,

অজ্ঞানের মত কর্ম দেখিরে অদ্ভুত।
অর্থলোভে হয়ে এলি অসুরের দূত ॥
অজ্ঞা হয়ে করেছিস অশ্বসম অহংকার।
অবলা বধিয়ে করিস অধর্ম সঞ্চার ॥ ইত্যাদি'

২। গোপিকার দুঃখ দেখি সজল কমলআঁখি
প্রবোধিয়া কন আত দৈন্যে।

দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, অক্রূরসংবাদ (২), পৃ. ১৭৮।

অচিরাতে আসিব সই কি ধন কিশোরী বই
অমঙ্গল রোদন কি জন্যে ?

অতঃপর গদ্য কথা :

"একথা শুনিয়া বৃন্দা বলিতেছেন, কৃষ্ণ হে তোমার অমঙ্গল হবে না। যদি বল অমঙ্গল হবে না কিসে। দেখ, বামে শবশিবা কুম্ভ, দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ ইত্যাদি দেখিলে যাত্রা সফল হয়, প্রকারে তাবৎ ঘটিয়াছে। বৃন্দা কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে বিরহবিধুরা ব্রজগোপীগণের অবস্থা জানাইতেছেন,

তখন বৃন্দা বলে করি ছল হবে না শ্যাম অমঙ্গল,
সুমঙ্গল ঘটেছে তোমায়।
দক্ষিণে গো দেখ সুখে নন্দের ধেনু উর্দ্ধমুখে
একদৃষ্টে রথপানে চায়॥" ইত্যাদি[১]

জ

ছড়া

ছড়া দাশরথির পাঁচালীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুদীর্ঘ তালিকাই হউক বা উপমা দৃষ্টান্তের মালিকাই হউক, ইহার মধ্যে এমন একটি বাক্‌চাতুর্য ও চমৎকারিত্ব আছে যে শ্রবণমাত্রেই মানুষের মন অতি সহজে আকৃষ্ট হয়। দাশরথির পূর্বকার পাঁচালীর কোন পূরা নিদর্শন পাওয়া যায় নাই এবং প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালীতে ছড়ার কোন স্থান ছিল না। কাজেই পাঁচালীতে ছড়ার সংযোজন দাশরথির অন্যতম কীর্তি বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

পাঁচালীর এই ছড়াগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এখনও পল্লী অঞ্চলের সাধারণ লোকে পাঁচালী বলিতে এই ছড়াগুলিকেই বুঝিয়া থাকে। এই ছড়াগুলি দাশরথির পুরাণেতিহাস জ্ঞানের এবং সামাজিক প্রথা, লোকাচার, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রমুখ ভূয়োদর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ।[২]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, অক্রূরসংবাদ, পৃঃ ১৭৯

২। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ছড়া ও ছড়াজাতীয় তালিকা দাশরথি অজস্র রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যথেচ্ছ বা যত্রতত্র ছড়াগুলির ব্যবহার করেন নাই। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় ছড়া প্রয়োগের একটা রীতি আছে। যে কোন একটি বিষয়ের বা ভাবের সম্বন্ধে যখন দাশরথি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন, তখনই ছড়ার ব্যবহার করিয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য বক্তব্যটিকে বিশদ, রসাল, ঘনীভূত ও সুতীক্ষ্ণ করা। একটি উদাহরণ দিতেছি।

এক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করায় নারদ উত্তেজিত হইয়া প্রথমটা ব্রাহ্মণকে মূর্খাদি বলিয়া প্রচুর গালমন্দ করিলেন। তারপর বুঝাইলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সামান্য দান দেন না, তাহাকে "মুক্তি ভিক্ষা দেন যার ভক্তি ঝুলি।" শেষে ব্রাহ্মণের পক্ষে এই জাতীয় ব্যাপারটা অর্থাৎ কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারাটা কত খারাপ ও জঘন্য তাহা বিশদ করিতে এই ছড়াটি উক্ত হইল :

দেবের দুর্লভ দুগ্ধ—চুঁয়ে যেমন গন্ধ।
যবনে স্পর্শিলে শিব, পূজা যেমন বন্ধ॥
নানা উপকরণে যেমন মদিরার ছিটে।
পক্ষিরাজ ঘোড়ার যেমন পক্ষাঘাত পিঠে॥
পরম পণ্ডিতের যেমন চোর অপবাদ রটে।
মিশকালি কালীর পাঁঠা যেমন একটু খুঁটে॥
দাতার ব্যাখ্যা যায় যেমন রূঢ় বাক্য জন্য।
ব্যাকরণ অদৃষ্টে যেমন পুস্তক অমান্য॥
ভৃষ্ট দ্রব্যে এক ফোঁটা জল পড়িলে যেমন যায়।
দিব্যাঙ্গ নারীর যেমন বোটকা গন্ধ গায়॥
কন্দর্প পুরুষের যেমন অন্ধ দুটি চক্ষু।
ধিক ধিক ততোধিক ব্রাহ্মণের ঘরে মূর্খ॥[১]

কেবল একই পালায় একটি ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য কোথাও ছড়াগুলির হুবহু পুনরুক্তি পাঁচালীর মধ্যে চোখে পড়ে নাই। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালাতে দুর্যোধনের আনন্দ বর্ণনা করিতে দাশরথি এই ছড়াটি বলিয়াছেন :

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন পালা, পৃঃ ৩০১।

কুমুদীর আনন্দ যেমন নিরখিয়া সন্ধ্যা।
পুত্র প্রসবিয়া যেমন আনন্দিত বন্ধ্যা॥
ভক্তের আনন্দ যেমন নিরখি গোবিন্দে।
অসুরের আনন্দ যেমন শুনি দেবনিন্দে॥
হিংস্রকের আনন্দ যেমন গাঁয়ের লোকের মন্দে॥
ব্যাধের আনন্দ যেমন মৃগ ধরিলে ফান্দে॥
কয়েদীর আনন্দ যেমন ত্রাণ পেয়ে বিবন্ধে।
আশু চক্ষু পেয়ে যেমন আনন্দিত অন্ধে॥
শনির আনন্দ যেমন প্রবেশ করে রন্ধ্রে।
চকোরের আনন্দ যেমন হেরে পূর্ণ চন্দ্রে॥
ভ্রমরের আনন্দ যেমন কমলের গন্ধে।
নারদের আনন্দ যেমন দ্বিদলের দ্বন্দ্বে॥[১]

ঠিক এইগুলিই ঐ একই পালায় নারদের আনন্দ বুঝাইতে পুনরুক্ত হইয়াছে।[২] কেবল শেষ চরণটির বদলে "তোমার আনন্দ যেমন উপস্থিত দ্বন্দ্বে" এই পাঠটুকু মাত্র তফাৎ।

একই বিষয়ের পুনরুক্ত ছড়ার মধ্যেও বিষয়-বস্তুর বিন্যাসে ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বা ঢং-এর বিচিত্র উপস্থাপনায় সর্বদাই খানিকটা নূতনত্ব সঞ্চার করা, দাশরথির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। (ক) কৃষ্ণ ও আয়ানের শত্রুতা কেমন?

যেমন রাবণ আর রামে।
দুর্যোধন আর ভীমে॥
বিড়াল আর ইঁদুরে।
শার্দুলে আর নরে॥
শুম্ভ আর ভগবতী।
শিব আর রতিপতি॥

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৮০।
২। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ২৮৭।

ব্যাধ আর জানোয়ার ।
পাঁঠা আর কর্মকার ॥[১]

১। (খ) দক্ষ আর শিবের ভাব অর্থাৎ শত্রুতা কি রূপ ?

যেমন দেবতা আর অসুরে ।
যেমন রাবণ আর রামে ।
যেমন কংস আর শ্যামে ॥
যেমন স্রোত আর বাঁধে ।
যেমন রাহু আর চাঁদে ॥
যেমন যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনে ।
যেমন গিরগিটি আর মুসলমানে ॥
যেমন জল আর আগুণে ।
যেমন তৈল আর বেগুণে ॥
যেমন পক্ষী আর সাতনলা ।
যেমন আদা আর কাঁচাকলা ॥
যেমন ঋষি আর জপে ।
যেমন নেউল আর সাপে ॥
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে ।
যেমন গৃহস্থ আর চোরে ॥
যেমন কাক আর পেচকে ।
যেমন ভীম আর কীচকে ॥
যেমন শরীরে আর রোগে ।
যেমন দিন কতক হয়েছিল ইংরাজে আর মগে ॥[২]

২। (ক) নূতনের দোষ : কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা

করিছ এবার নূতন নূতন, নূতনের গুণ সকলি বিগুণ
নূতন বেগুণ খেতে লাগে না মিষ্ট ।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, কলঙ্কভঞ্জন (১) পৃঃ ১০৭।
২। ঐ, ঐ, ঐ, দক্ষযজ্ঞপালা, পৃঃ ৪৭৮।

নূতন জলে কফের বৃদ্ধি নূতন ঘোড়া কার সাধ্যি
বশ করে শীঘ্র বিনে কষ্ট ॥
নূতন পীরিতে বিচ্ছেদ একেবারে মর্মচ্ছেদ
লাগে না জোড়া নূতন পীরিত ভাঙ্গলে ॥
নূতন জ্বরে বিকার হলে বাঁচে না ধন্বন্তরী এলে
নূতন মাঝি ডোবে বাতাস উঠলে ॥
মোট আনা দায় নূতন মুটে অসুখ হয় নূতন শুঁটে
পাক পায়না নূতন চেলের অন্ন।
উপকারী নয় নূতন সিদ্ধি নূতন গুড়ে পিত্ত বৃদ্ধি,
নূতন বুদ্ধি হলে মান উচ্ছন্ন ॥
শাসিত হওয়া ভার নূতন রাজ্যে, বশ হওয়া ভার নূতন ভার্যে,
জিনিষ বিকায় না গেলে নূতন হাটে।
মিষ্টি হয় না নূতন কুল, নূতন মুহুরীর ঠিকে ভুল,
নূতন কথা থাকে না নারীর পেটে ॥
যোগ জানে নূতন না যোগী, আহার পায়না নূতন রোগী,
নূতন শোক প্রাণনাশক হয়।
মান রাখে না নূতন ধনী, দায়মাল হয় নূতন খুনী
গুণমণি নিত্য নূতন কীর্তি ভাল নয় ॥[১]

২। (খ) ছল করে কয় বৃন্দে ধনী, কৃষ্ণ তুমি নূতন ধনী,
তাইতে উচিত বলতে ভয় হয়।
নূতন ধনীর বিদ্যমান কভু মানীর রয় না মান
নূতন কিছু প্রশংসিত নয় ॥
নূতন চালে অগ্নি নষ্ট, নূতন রাজ্যে শাসন কষ্ট
নূতন.ভার্যে পতির বশ হয় না।
নূতন বয়সে ধরে না জপ নূতন জলে ধরে কফ,
নূতন হাঁড়িতে তৈল সয় না ॥

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, মাথুর (১) পৃঃ ১৯২

গুণ করে না নূতন সিদ্ধি নূতন গুড়ে পিত্ত বৃদ্ধি,
নূতন বালকে কথা কয় না।
নূতন চোর পড়ে ধরা নূতন বৈরাগী মুখচোরা,
সদর হতে চেয়ে ভিক্ষা লয় না॥
নূতন শোক প্রাণনাশক, নূতন বৈদ্য ভয়ানক,
গৃহস্থের সকল দ্রব্য রয় না।
নূতন ইক্ষুর নাই মিষ্টি, নূতন জলে শিলাবৃষ্টি,
নূতন হাটে যত যায় বিকায় না॥
ওহে নিদয় কৃষ্ণ ধন, যে পায় নূতন ধন
অহংকারে সে চোখে দেখতে পায় না॥[১]

প্রথম উদাহরণ দুইটিতে (১ক ও খ) যথাক্রমে ৮ এবং ১৯টি বিরোধী দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাধারণ মাত্র দুইটি। দ্বিতীয় উদাহরণের দুইটিরই (২ক ও খ) কাহিনী মাথুর, বক্তা বৃন্দা, উদ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। যথাক্রমে দৃষ্টান্ত সংখ্যা ২৩ ও ২৪ এবং ইহাদের মধ্যে সাধারণ মাত্র ৯টি। বলাবাহুল্য যে ইহার মধ্যে পুরাণ, ইতিহাস, লোকাচার, প্রথা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিচিত্র ও সরস সমাবেশ হইয়াছে।

ঝ

গান

গান পাঁচালীর শুধু অপরিহার্য অঙ্গ নহে, একেবারে অন্যতম প্রধান অঙ্গ। পাঁচালীর পদ্য বর্ণনার চরম মুহূর্তটি গানের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। একটু অবহিত হইয়া বিচার করিলেই পাঁচালীতে গীত ব্যবহারের বিশেষ একটি নিয়ম দেখা যায়।

পাঁচালী পালার গঠনে প্রারম্ভিক সঙ্গীত অপরিহার্য নহে। পাঁচালী গানের আসরে বন্দনামূলক প্রারম্ভ সঙ্গীত অপরিহার্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বদাই যে

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, মাথুর (২), পৃঃ ২০১।

উহা গেয় পালাটির অঙ্গরূপে হইত তাহা নহে, আসরে গায়ন ইচ্ছামত যে কোন প্রার্থনা ও বন্দনা পদ গাহিতেন। এগুলি ছুট সঙ্গীত। গৌরচন্দ্রিকা পাঁচালী গানে দেখা যায় না। কীর্তন গানের সহিত পাঁচালী গানের চালে এইটি অন্যতম মুখ্য পার্থক্য। দাশরথির ৬৪টি পালার মধ্যে একমাত্র দক্ষযজ্ঞ[১] ও বামনভিক্ষা (২)[২] এই দুইটি পালা ছাড়া ৬২টি পালায় প্রারম্ভিক গীত নাই।

অন্ত্য-সঙ্গীত কিন্তু প্রতি পালাতেই অপরিহার্য। ৬৭টি পালার প্রতিটিতেই অন্ত্য-সঙ্গীত আছে। এই অন্ত্য-সঙ্গীতগুলিকে বাক্যালাপ বা আবেগমূলক, যুগলমিলনাত্মক, মাহাত্ম্যসূচক ও বর্ণনামূলক মোটামুটি এই চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়। বাক্যালাপ বা আবেগমূলক গানের সংখ্যা সর্বাধিক ৩০টি। বিভিন্ন চরিত্রের জবানীতে স্তবস্তুতি বা মহিমাজ্ঞাপক সরস মন্তব্যযুক্ত গভীর আবেগের প্রকাশ হইয়াছে এই গানগুলির মধ্যে। "ননদিনী বল নাগরে, ডুবেছে রাই কমলিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে"[৩]—রাধার মুখের এই আবেগপূর্ণ সুন্দর গানটি বা "ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ"[৪]—ব্রজগোপীদিগের মুখের এই গানটি অন্ত্যসঙ্গীত। যুগলমিলনাত্মক অন্ত্য সঙ্গীত আছে মোট ২৬টি। এই শ্রেণীর অন্ত্যসঙ্গীতগুলির বিভাগ এই প্রকার: রাধাকৃষ্ণ—১১; হরগৌরী—৫; রামসীতা—৩; রামলক্ষ্মণ—৩; রুক্মিণীকৃষ্ণ—২; লক্ষ্মীনারায়ণ—১; কৃষ্ণবলরাম—১। মাহাত্ম্যসূচক অন্ত্যগীত মোট ৪টি। ইহাদের মধ্যে স্থানমাহাত্ম্য, ভক্তি বা ভক্তের মহিমার কথা আছে। বর্ণনামূলক অন্ত্যগান মোট ৪টি; ইহাদের মধ্যে উৎসব বর্ণনা আছে। গণেশজননী-কোলে মেনকার রূপ বর্ণনাটি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্ত্য সঙ্গীতগুলির মধ্যে কয়েকটি পুনরুক্তি আছে। "বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যাম" ইত্যাদি, "কি শোভেরে রামরূপ" ইত্যাদি, "কিরূপ বিহরে" ইত্যাদি এই তিনটি যথাক্রমে অক্রূরসংবাদ (২), ও মাথুর (৩) পালা দুইটিতে, রাবণবধ ও রামচন্দ্রের দেশাগমন পালা দুইটিতে, শিববিবাহ এবং গঙ্গা ও

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৭৬।

২। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৬৩২।

৩। ঐ, ঐ, ঐ, গোপীগণের বস্ত্রহরণ পালা, পৃঃ ৮৩।

৪। ঐ, ঐ, ঐ, গোষ্ঠলীলা (১) পৃঃ ৩৪। এই গানটি দ্বিরুক্ত হইয়াছে অক্রূরসংবাদ (২), পৃঃ ১৮৪, মথুরাবাসিনীদের জবানীতে।

ভগবতীর কোন্দল (১) পালা দুইটিতে অন্ত্য সঙ্গীতরূপে এবং গোষ্ঠলীলার অন্ত্য সঙ্গীত "ও কে যায়গো কালো মেঘের বরণ" ইত্যাদি অক্রূরসংবাদ(২) পালার একোপান্ত সঙ্গীতরূপে পুনরুক্ত হইয়াছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব পালার অন্ত্য সঙ্গীত দুইটি উক্ত পালা দুইটির প্রথম গীতেরই অংশ, কাজেই পুনরুক্ত বলিয়া ধরা চলে।

দাশরথির ৬৪টি পাঁচালী পালার মোট গীতসংখ্যা ৬৫৬, অমৌলিক পালার সংখ্যা ৬৭৫ এবং মৌলিক পালার সংখ্যা ৮০টি।[১] গানগুলির মধ্যে মাত্র ১০৫টিতে দাশরথির ভণিতা আছে, বাকিগুলিতে নাই।

পালার গানগুলি অধিকাংশই বাক্যালাপ। মোটামুটি মাত্র ১০০ গানকে বর্ণনাসূচক বলিয়া ধরা যায়। এই বর্ণনার মধ্যে নিসর্গের স্থান প্রায় শূন্য। সাধারণভাবে দেখা যায় যে দক্ষযজ্ঞ জাতীয় উৎসব বর্ণনা, আনন্দ নিরানন্দ বর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা, যুগলমিলন বর্ণনা, রূপবর্ণনা, ভক্তি মহিমা বা ব্রাহ্মণ মহিমা বর্ণনা, কলিকালের নকসা প্রভৃতি নানাজাতীয় গান আছে। কখনো কবি সরাসরি নিজের নাম ঘোষণা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কখনো সাধারণভাবে বলিয়াছেন, কখনো বা বর্ণনার সঙ্গে চরিত্রের মুখে কথা বা আবেগ যোগ করা হইয়াছে। কয়েকটি নমুনা:

১। আনন্দিত ব্রজধাম:

> নিত্য গোপালেরে হেরে নেত্রে বারি ঝরে
> প্রেমে নৃত্য করে গোকুলবাসিগণ।
> কি আনন্দ নন্দ পেয়ে নিত্যানন্দ
> হয়না নন্দের চিতে নৃত্য নিবারণ॥[২]

২। নিরানন্দ ব্রজধাম:

> আসি দেখিছেন উদ্ধব ছিন্নভিন্ন ব্রজমণ্ডলে।
> হেরি কৃষ্ণশূন্য অচৈতন্য, পড়ে সব ধরাতলে॥

১। এই হিসাবটি বঙ্গবাসী ৪র্থ সংস্করণ দাশরথির পাঁচালী হইতে করা হইল।

২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সং, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, পৃঃ ১৭।

ভ্রমে না ভ্রমরসব, কমলে নাহিক রব,
হয়ে নীরব কোকিল কাঁদে তমালে।
না শুনিয়ে মধুর বেনু কাঁদে ধেনুসকলে,
যমুনা হয়েছে প্রবল গোপিকার নয়ন জলে ॥[১]

৩ দেবগণের আনন্দ :

দ্রিম তানা না না দে রে না দে রে না
গায় গুণী মুনি ভবনে আসি।
ওদানি ওদানি তোমাদের দানি
সা রি গা মা সম সাগরি গাগরি
সুরেতে মোহিত সুর পুরবাসী ॥ ইত্যাদি[২]

পালার বাকী ৬৫৬টির মত গান (মৌলিক ৭০ + অমৌলিক ৫৮৬) বাক্যালাপসূচক। দাশরথির পাঁচালীতে রাখালগণ, সখীগণ প্রভৃতি গণ-চরিত্র বাদ দিলেও চরিত্রসংখ্যা প্রায় ২২৫। গণচরিত্রের মুখে গান দেওয়া হইয়াছে মোট ৪৪ খানি।[৩] তাহা হইলে এই সব চরিত্রের মুখে গীত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১২ খানি। সব চরিত্রের মুখে গীত নাই। প্রধান বা ক-শ্রেণীর চরিত্র সংখ্যা পুরুষ ২৪ এবং নারী ১৪ জন। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে ২২ জন এবং ১৩ জনের মুখে গান দেওয়া হইয়াছে। প্রধান পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দক্ষ ও বামনের এবং স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে সত্যভামার মুখে কোন গান দেওয়া হয় নাই। অপ্রধান বা খ-শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৭ এবং ২৩ জন। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে ৩৯ এবং ২০ জনের মুখে গান আছে। আনুপাতিক হিসাবে স্ত্রী চরিত্রের মুখে গানের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও এই সম্বন্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। গণচরিত্রগুলিতে পুরুষ চরিত্রের মুখেই বেশি গান দেওয়া হইয়াছে।

গানের পাত্রপাত্রী নির্বাচন সম্বন্ধে কোন বিশেষ নীতি আছে বলিয়া মনে হয় না। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে একদিকে যেমন দক্ষ, বামন, কংস, সুবল,

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, উদ্ধবসংবাদ, পৃঃ ২২৮।
২। ঐ ঐ ঐ বামনভিক্ষা(২), পৃঃ ৬০৭।
৩। চরিত্র আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

শিশুপাল, অঙ্গদ প্রভৃতির মুখে গান নাই, অন্যদিকে তেমনি হিরণ্যকশিপু, রাম, দুর্বাসা, কাশ্যপ, শ্রীদাম, বিশ্বামিত্র, দুর্যোধন, অষ্টাবক্র প্রভৃতির মুখে গান আছে। স্ত্রী চরিত্রে সত্যভামা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতির মুখে গান না থাকিলেও ভগবতী, পার্বতী, কৈকেয়ী, সূর্পনখা, তারকা প্রভৃতির মুখে গান পাওয়া যায়। চরিত্র অনুযায়ী গানের সংখ্যা এই প্রকার: বৃন্দা—৫১; রাধা—৩৯; নারদ—৩৩; যশোদা—২৫; হনুমান—২৪; কৃষ্ণ—১৯; রাবণ—১৮; মেনকা—১৩; সীতা—১৩; শিব—১৩; নন্দ—১০ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়া রাধা, যশোদা, মেনকা, সীতা, শিবের গীত গভীর ভাবাবেগমূলক, নারদ, হনুমান, রাবণ, ও নন্দের গানের বেশীর ভাগ ভক্তি-মাহাত্ম্য ও অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচারসূচক, বৃন্দা ও কৃষ্ণের, মুখ্যতঃ বৃন্দার বেশীর ভাগ গানের বিষয়বস্তু ভক্তিরসে জারিত সূক্ষ্ম শ্লেষ।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে পাঁচালীর পটভূমি হইতেছে ভক্তিরস। কাজেই ভক্তি প্রচারের সামান্যতম সুযোগটিকে ছাড়িয়া দেওয়া তো দূরের কথা সময়ে-অসময়ে, স্থানে-অস্থানে পালার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র যোজনা করিয়া বা অকারণে নারদকে হাজির করিয়া ভক্তিতত্ত্ব ও ভগবদ্‌মহিমা প্রচার করা হইয়াছে, এবং সর্বক্ষেত্রেই এই মহিমামূলক আবেগটির মুখ্য প্রকাশযন্ত্র হইতেছে গান। জন্মাষ্টমী পালাতে গর্গমুনির পত্নী, নন্দোৎসবে পথিক, গোষ্ঠলীলার(১) ব্রজরমণী, রাধিকার দর্পচূর্ণে দ্বিজরমণী, ব্রহ্মার দর্পচূর্ণে দ্বিজরমণীপ্রমুখ চরিত্রগুলির একমাত্র প্রয়োজন সঙ্গীতমুখে কৃষ্ণমহিমা প্রচার। কলঙ্কভঞ্জন(২) পালাতে নারদের অপ্রাসঙ্গিক অবতারণার হেতুও গীতের মাধ্যমে ভক্তিরস পরিবেশন মাত্র।

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে এইসব অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র যোজনা প্রভৃতি এখন আমাদের চোখে বা বিশুদ্ধ নাটকীয় প্রয়োজনের দিক যতই অবান্তর বলিয়া বিবেচনা হউক না কেন পাঁচালীর কাহিনী বিন্যাসে ও রস নিবেদনে তখনকার দিনে বোধ হয় ইহার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা কম ছিল না। আর লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে এই গীতবাহক চরিত্র বা ক্ষেত্র যতই অপ্রাসঙ্গিক হউক গীত যোজনার কারণটি কিন্তু আবেগের দিক দিয়া কখনও অবান্তর হইত না। উপরন্তু বহু ক্ষেত্রেই আসন্ন বলিয়া মনে হইত। দাশরথির

গীত যোজনার এই কৌশলটি বরাবর লক্ষ্য করা যায়। হঠাৎ কাহারও মুখে তিনি গান তুলিয়া ধরেন নাই। বাক্যালাপের মধ্যে যখন কোন আবেগ সঞ্চার হইয়া উঠিয়াছে, কিংবা কোন রসাল ইঙ্গিত ঝিকমিক করিয়া উঠি উঠি করিতেছে, তখনই দাশরথি একটি গান জুড়িয়া দিয়াছেন, আর এই প্রয়োজন হাঁসিল করিতে কোন উপস্থিত চরিত্র না থাকিলে এক দ্বিজরমণীকে ধরিয়া আনিয়া গান গাওয়াইয়া ছাড়িয়াছেন, কদাচ আবেগটিকে ব্যর্থ করিয়া ফিরাইয়া দেন নাই। মনে হয় ইহাই পাঁচালী পালার গীত পরিবেশনের মূল নীতি।

গানের বিষয়বস্তু বিচিত্র। পূর্বে বর্ণনামূলক গান সম্বন্ধে বলিয়াছি। উক্তিমূলক গানগুলির মধ্যেও ভক্তি প্রচার, অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ, রূপবর্ণনাদি রহিয়াছে ; সূক্ষ্মশ্লেষ এবং রূপকও আছে অনেক গানে। অমৌলিক পালার মধ্যে প্রায় ২৫ খানি গান আছে হালকা ভাবের। আর মৌলিক পালার অধিকাংশ গানই লঘু ও সরস রচনা। আধুনিক কাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা শ্লেষপূর্ণ এবং সমালোচনামূলক গানগুলি ছাড়া অমৌলিক পালার কোন গানই লঘু রচনা নহে, সকল গীতের মধ্যেই ভক্তিরসের ভাবগাম্ভীর্যটি, অন্ততঃ প্রচ্ছন্ন ভাবেও বিদ্যমান আছে।[১]

দাশরথির অনেক সঙ্গীতই তখনকার লোকের কণ্ঠে স্থান পাইত। ইহাদের মধ্যে পালার অন্তর্ভুক্ত গীতও আছে কয়েকখানি। "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলেন আমি পদ্মবনে যাব"—এই গীতটি 'সরলা' নাটক অভিনয়ে নীলকমলের মুখে ৩০।৪০ বৎসর পূর্বেও খুব জনপ্রিয় ছিল। গীতটি সত্যভামা, সুদর্শন ও গরুড়ের দর্পচূর্ণ পালায় গরুড়ের গান।[২] দাশরথির অনেকগুলি গান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় ছিল। "কি করলে হে কান্ত"[৩], "শুনেছি রাম তারক ব্রহ্ম"[৪], "আমার কি ফলের অভাব"[৫], "হৃদিবৃন্দাবনে যদি বাস কর

১। পরিশিষ্ট ক, সংগীত সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২৬৪।

৩। ঐ ঐ রাবণবধ, পৃঃ ৪৫৩।

৪। ঐ ঐ মহীরাবণ বধ, পৃঃ ৪২০

৫। ঐ ঐ রাবণবধ, পৃঃ ৪৩৫।

কমলাপতি"[১], "দোষ কারু নয় গো মা"[২], "একি বিকার শংকরি"[৩], "জাগ জাগ জননী"[৪] প্রমুখ গানগুলি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে আছে।[৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দাশরথির নামে কতগুলি গান বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাইতেছে, যেগুলি হরিমোহনের পাঁচালীতে কি প্রচলিত পাঁচালী গ্রন্থে নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগে "জীব সাজ সমরে" গানটির

১। পরিশিষ্ট ক, সংগীত সংগ্রহ ও কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১১৬।
২। ঐ ঐ ও বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৬৯৫।
৩। ঐ ঐ ও ঐ ঐ
৪। ঐ ঐ ও ঐ পৃঃ ৬৯৪।

৫। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর কর কাব্যবিনোদ মহাশয় লিখিত এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "ত্রিশ বৎসর পূর্বে নলডাঙ্গার বিখ্যাত ভূস্বামী শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর রাজবাটিতে সঙ্গীতের আয়োজন হইল। রাজাবাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান বরদাবাবু স্বয়ং গান ধরিলেন: 'কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী, কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী' ইত্যাদি। ইহার তিন বৎসর পরে বাঁকুড়ায় গিয়াছিলাম, সেখানেও পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণের মুখে প্রথমেই শুনিলাম: "মন রে বিপদে ত্রাণ আর হলিনে, বলিতে হরি তোয় আর বলিনে, তুই এ জনমে হরিপদনলিনে স্থান নিলিনে" ইত্যাদি। বার চৌদ্দ বৎসর পূর্বে ঢাকা জিলার বকযুড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার মুনসী বাবুদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব দেখিতে গিয়াছি। রাত্রিতে দেবী মন্দিরের সম্মুখে বামাকণ্ঠে গান হইতেছে: "জামাই নাই মা আর তোর ভিখারী। শিব কাশীতে রাজরাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী॥" শুনিলাম গৃহস্বামী শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন সেন বি. এল. মহাশয় এই গানটি বড়ই ভালবাসেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ঢাকা জিলার এক প্রান্তে পদ্মাবক্ষে তীরলগ্ন নৌকায় বসিয়া আছি, সকাল বেলা, এক ভিক্ষুক বৈষ্ণব নৌকায় আসিয়া গান ধরিল: "কানাই একি ভাই, রইলি প্রভাতে অচৈতন্য। উঠলো ভানু, ও নীলতনু, যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন।" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য এসবই দাশরথির গান। আর কত বলিব। এ পর্যন্ত বাঙ্গালার চৌদ্দ পনরটি জেলা ঘুরিয়াছি, যেখানে গিয়াছি সেখানেই দাশরথির গান

ভনিতায় দাশরথির নাম আছে।[১] কিন্তু প্রচলিত সংগ্রহে এটি পাওয়া যায় না। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তাঁহার শাক্ত পদাবলীতে "মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি" এই গানটি দাশরথির বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[২] কিন্তু দাশরথির প্রচলিত পাঁচালী গ্রন্থে এটি দেখি নাই।

দাশরথির গীতও ক্ষেত্রবিশেষে অন্যের নামে চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "দোষ কারোর নয় গো মা" দাশরথির এই বিখ্যাত গানটিকে প্রসাদী সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৩] অতুলচন্দ্র ঘটক তাঁহার সংকলন গ্রন্থ গীতি মালিকায় "ননদিনী বল নগরে" এই গানটি মধুসূদন কিন্নরের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দাশরথির ছুট গানগুলি অর্থাৎ পালার সহিত সম্পর্কচ্যুত বিবিধ সঙ্গীত-সমূহ—সর্বজনপ্রশংসিত হইয়াছে। বিবিধ সঙ্গীতগুলিকে হরিমোহন শ্রীগণেশ-বিষয়ক, শ্রীগঙ্গাবিষয়ক, শ্রীশ্যামাবিষয়ক, শ্রীদুর্গাবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, শ্রীরাম-বিষয়ক, ব্রহ্মবিষয়ক, আত্মতত্ত্ববিষয়ক, রঙ্গব্যঙ্গ এই কয়টি শিরোনামায় ভাগ করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া এই ভাগটি ত্রুটিহীন নহে। উক্ত বিবিধ সঙ্গীত সংগ্রহের ৫৪ সংখ্যক গান "কর ত্রাণ কর হে শঙ্কর"[৪] স্পষ্টতঃ শিববিষয়ক, অথচ হরিমোহনের সংগ্রহে তেমন কোন শিরোনামা দেওয়া হয় নাই। বিন্যাসেরও ত্রুটি আছে। গঙ্গাবিষয়ক গীতগুলি গঙ্গার বর্ণনা নহে, গঙ্গাস্তব ও আর্তি। তেমনি শ্যামাবিষয়ক গীতগুলির মধ্যে শ্যামার বর্ণনা ছাড়া স্তব ও আর্তিগুলিও শ্যামাবিষয়ক গীতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে "জাগ জাগ জননি", "কালি অকূলে কূল দেখিনে", "একি বিকার

শুনিয়াছি। একদিকে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, অন্যদিকে রাজসাহী, দিনাজপুর অথবা ঢাকা, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম ইহার কোন স্থানেই দাশরথি অপরিচিত নহেন। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।"—সাহিত্য, ১৩২০ সাল, বৈশাখ।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ।

২। শাক্তপদাবলী, ৫ম সং, ২৩০নং গীত।

৩। সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩১৮ সাল, পৃঃ ৩৮০।

৪। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭৭৭।

শংকরি", "আমি আছি গো তারিণী ঋণী", "হের কালকান্তে মা", "দিন দিলে না মা", "হের গো তারিণী কৃপানেত্রে", "মা সেদিন প্রভাত কবে হবে", "কত পাতকী তরে", "ত্রাণ কর ত্রিনয়নী", "শিবে সম্প্রতি ও মা", "শমন নিকটে গো শংকরী", "তব সুতের অবসান হল গো শিবে", "আমি পতিত পতিতপাবনী", "তারা দীনতারা দীনদুঃখ হারিণী", "কর কর নৃত্য নৃত্যকালী", এই গানগুলি শ্যামাবিষয়ক বিভাগে এবং "মা কর দুর্গে", "গিরিশরাণি পরমেশানি",—"দুর্গে পার কর ভবে"—এই গানগুলি শ্রীদুর্গাবিষয়ক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত।

সকল রসোত্তীর্ণ রচনার সাধারণ লক্ষণ হইতেছে ভাব ও রূপের সহজ সঙ্গতি এবং চমৎকারিত্ব। দাশরথির অধিকাংশ গানের মধ্যে বিপুল ভাবগাম্ভীর্যের সহিত সরল ভঙ্গী ও বলিষ্ঠ ভাষার বিচিত্র মিলন হইয়াছে। "দোষ কারো নয় গো মা," "আমি আছি গো তারিণি ঋণী তব পায়," "কর নৃত্য নৃত্যকালী," "মম মানস শুক পাখি," "মম হৃদিবৃন্দাবনে যদি বাস কর কমলাপতি," "গিরি গৌরী আমার এসেছিল," "মা প্রাণউমা" প্রমুখ গানগুলি[১] ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন দাশরথির পাঁচালীর বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু দাশরথির গান তাঁহাকেও মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন: "দাশুর পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, তাঁহার রচিত শ্যামা বিষয়ক গানগুলির প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিব।"[২]

দাশরথির গান প্রসাদী সঙ্গীতের মতই জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু প্রসাদী সঙ্গীতে সুরের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, দাশরথির গানে তেমন সুরবিশিষ্টতা ছিল না।[৩] দাশরথি নিজে সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন, তাই প্রচলিত সুরবৈচিত্র্যের

১। পরিশিষ্ট ক, সঙ্গীত সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৭।

৩। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর কর কাব্যবিনোদ মহাশয়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "দেশের ভিক্ষুক হইতে ভূস্বামী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের এমন প্রচার অন্য কাহারও কবিতায় আছে কি? এমন কি রামপ্রসাদের গানেরও নাই। প্রসাদের গানগুলি প্রায় একই সুরের, একই ভাবের, দাশরথির গানগুলি নানা সুরের নানা ভাবের।"—দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, অভিমত সংগ্রহ, পৃঃ ৫।

ধারায়ই মোট ৯২টি সুরে ও ২৬টি তালে তিনি গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন: "রামপ্রসাদের গানের ন্যায় তাঁহার (দাশরথির) গান ও গানের সুর সহজ, এজন্য লোকে আগ্রহ সহকারে উহা শিক্ষা করিত। সেকালের প্রাচীনের মধ্যে দাশুরায়ের গান জানে না এমন লোক নাই বলিলেই হয়। এখনো অনেক ভিখারী মধ্যাহ্নকালে গৃহস্থ প্রাচীনা কামিনীগণের ফরমায়েস মত দাশুরায়ের ঠাকরুণ বিষয়ক গান গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস দেবলীলা লিখিয়া যেমন বাঙ্গালার আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, দাশুরায় সেইরূপ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দজন্য সহজ নূতন রূপ সঙ্গীতামোদ প্রদান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। কি ইতর কি ভদ্র, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই দাশুর গানের পক্ষপাতী। এইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের হয়?"[১]

এও

পালার চরিত্রবিচার

দাশরথির ৬৪টি পালাতে বিভিন্ন রকমের অসংখ্য চরিত্র ভিড় করিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে গণচরিত্র বাদ দিয়া যে মোটামুটি হিসাবে চরিত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৫। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, নাবিক প্রভৃতি চরিত্র বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন প্রকার। এই স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া গণনা করিলে সংখ্যা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। আলোচনার জন্য এই চরিত্রগুলিকে মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। ক শ্রেণী—পাঁচালীর প্রধান চরিত্রসমূহ: খ শ্রেণী—অপ্রধান চরিত্রসমূহ: গ শ্রেণী—গৌণ চরিত্রসমূহ: ঘ শ্রেণী—টাইপ চরিত্রসমূহ। এই শ্রেণীবিভাগানুসারে চরিত্রের আনুপাতিক সংখ্যা দাঁড়ায় এই রকম:

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৩১।

	অমৌলিক পালা		মৌলিক পালা			সংখ্যা				
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী		পুরুষ		স্ত্রী		মোট
ক শ্রেণী	২৪	১৪	০	০	=	২৪	+	১৪	=	৩৮
খ শ্রেণী	৪৯	২০	৮	৩	=	৫৭	+	২৩	=	৮০
গ শ্রেণী	৫০	৩১	৯	৫	=	৫৯	+	৩৬	=	৯৫
ঘ শ্রেণী	১০	২	০	০	=	১০	+	২	=	১২
	১৩৩	৬৭	১৭	৮	=	১৫০	+	৭৫	=	২২৫

স্বতন্ত্রভাবে চরিত্র আলোচনার পূর্বে দাশরথির চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে একটা স্থূল আলোচনা করা প্রয়োজন। মুখ্যতঃ আবেগপ্রধান দুই চারিটি চরিত্র বাদ দিলে দাশরথির সৃষ্ট এই বিপুলসংখ্যক চরিত্রের মধ্যে কোন জীবন্ত মূর্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধিকাংশ প্রধান চরিত্রগুলিও মানুষ হিসাবে নিষ্প্রাণ কলের পুতুল, আর দেবতা হিসাবে মহিমাচ্যুত নিষ্প্রভ। শ্রীকৃষ্ণ বা রামরূপে ভগবান সপরিকর নরলীলা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই তত্ত্বটি তাঁহার মনে তো সদাজাগ্রত আছেই, অধিকন্তু লীলাসহচরগণও ক্ষণে ক্ষণে এই সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সচেতন করিতেছেন, নিজেদের হুঁসিয়ারী দিতেছেন। প্রতি-পাদক্ষেপে গভীর দুঃখের মধ্যেও এই কথা স্মরণ করাইবার জন্য নারদ, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, হনুমান প্রভৃতি লীলাসহচরগণ বার বার কারণে অকারণে আসা যাওয়া করিতেছেন। ফলে এইসব চরিত্রের অধিকাংশই না পরিপূর্ণ দেবতা, না ষোলআনা মানুষ, দেব মানবের এক মিশ্রিত অদ্ভুত সংস্করণ হইয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টির দিকে তাকাইয়া বিচার করিলে মনে হয় দাশরথি উত্তম চিত্রকর ছিলেন না, ছিলেন খুব উচ্চস্তরের নক্সাকার বা কার্টুনিষ্ট। গভীর আবেগের পূর্ণাঙ্গ ও সুসমঞ্জস পরিণতি তাঁহার কাহিনীর মধ্যেও নাই, চরিত্র-সৃষ্টিতেও পাওয়া যায় না। সুশিক্ষিত রুচিসম্পন্ন নিপুণ মালাকরের মত তিনি তাঁহার পাঁচালী মালঞ্চকে সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করিয়া সাজাইতে পারেন নাই, ভক্তির উর্বর মাটিতে যেমন খুসি বীজ ছড়াইয়া ইতস্ততঃ অজস্র ফুলের গাছ লাগাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে যে বাগিচার সুসম সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে

সন্দেহ নাই, কিন্তু বিক্ষিপ্ত বৃক্ষের যে স্বতন্ত্র বাহার ও বৈচিত্র্য আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অসার্থক চরিত্রসৃষ্টির ত্রুটি সার্থক নক্‌সা ও টাইপ সৃষ্টির পূর্তিতে দাশরথি পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে মঙ্গলকাব্যের সহিত পাঁচালীর একটা বড় পার্থক্য বোধ হয় এই যে মঙ্গলকাব্যে একটা কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপ ও পরিপূর্ণ চরিত্র-চিত্রণ আছে, কিন্তু পাঁচালীতে দুইটিই শিথিল ও কৃত্রিম। দাশরথি অনেক সার্থক টাইপ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু একজন ভাঁড়ুদত্ত তাঁহার হাতে সৃষ্টি হয় নাই।

পাঁচালীর মধ্যে বোধহয় এই জাতীয় পূর্ণাঙ্গ কাহিনী ও জীবন্ত চরিত্র শ্রোতৃবর্গ প্রত্যাশাও করিতেন না এবং হালকা চালের রচনার ও দুই তিন ঘণ্টার আসরের স্বয়ংসম্পূর্ণ পালার মধ্যে নানা রুচিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহা করিবার অবসরও ছিল না। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ে অনেক ব্যক্তিই সামান্য মানবের নায়ক নায়িকাভাবের বর্ণনা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রতি রচনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মভাবমিশ্রিত নায়ক নায়িকাভাবের অপূর্ব বর্ণনা দ্বারা দাশরথি রায় ভক্তিপ্রীতিরসে ভাবুক মাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[১] "ভক্তিপ্রীতিরসে ভাবুক" লইয়াই তখনকার শ্রোতৃমণ্ডলী মুখ্যতঃ গঠিত ছিল। কাজেই তাঁহারা সহজেই এই ব্যাপারে মোহিত হইতেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক দীননাথ সান্যাল মহোদয়ের মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য: "তবু যদি কোন সমালোচক ইহাতে কাব্য সৌন্দর্য না দেখিতে পান, সমালোচকেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। দেশের লোকসমাজ, এমন কি কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিতসমাজও ইহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন, এবং যত দিন লোকের মনে ভক্তিরসের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন এরূপ রসসৌন্দর্যোজ্জ্বল কাব্যের অনাদর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।"[২] এই "ভক্তিরস"ই পাঁচালী আস্বাদনের মুখ্য করণ ও উপায়।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৩

২। ঐ, ঐ, ঐ, সমালোচনা, পৃঃ ১৫।

দাশরথির খণ্ডিত এক একটি পালার মধ্যে চরিত্র বিশ্লেষণের সুযোগ কম, এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভিন্ন পালাগুলিকে বিষয়ের মোটামুটি পারম্পর্যে ও ভাবৈক্যসূত্রে সাজাইয়া লইলে এক একটি লঘু রামায়ণ, কৃষ্ণায়ণ, শিবায়ণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া নারদপ্রমুখ কয়েকটি চরিত্র প্রায় সকল শ্রেণীর পৌরাণিক পালাগুলির মধ্যেই দেখা দিয়াছেন। এইসব কারণে ভাবৈক্যসূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন পালার মধ্যে চিত্রিত চরিত্র লইয়া আলোচনা করা সঙ্গত।

ক ও খ শ্রেণী লইয়া আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। দাশরথির রাম সচেতন পূর্ণব্রহ্ম। তিনি যে ভগবৎ সত্তা কখনো বিস্মৃত হন নাই এমন নহে, কিন্তু দুইদিকের ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। যখন তিনি পূর্ণব্রহ্ম তখন তিনি অনায়াসে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পালন ও শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রামকে বনে পাঠাইতে কৈকেয়ী রাজী হইতেছেন না দেখিয়া রাবণবধ সম্বন্ধে শঙ্কিত দেবতারা আসিয়া রামকে স্তব করিলেন। তখন

দেবগণে চৈতন্য দিলেন গোলকপতি।
স্মরণ করিলা সবে দুষ্ট সরস্বতী ॥[১]

অথবা আর একটি চিত্র। রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলা যাইতেছেন। নাবিক "পায়ে-মানুষকরা-ছেলেকে" পার করিতে চাহিল না। তখন পূর্ণব্রহ্ম রাম নাবিককে লোভ দেখাইতেছেন, "পাঠাব স্বর্গে," "পাঠাব গোলকে", "হবি চতুর্ভুজ" ইত্যাদি।[২]

রাম আত্মবিস্মৃতও হইয়া পড়েন। মায়াসীতাবধ দেখিয়া "রাম চিন্তামণি ধরায় পতিত হন অমনি।" বিভীষণ তখন ব্রহ্মস্মৃতির ধারক হইয়া বলিলেন:

একি হরি হলে হে ভ্রান্ত, ভ্রান্তিমোচন কেন হে ভ্রান্ত,
হও হে ক্ষান্ত লক্ষ্মীকান্ত তুমি।
রাক্ষসের মায়ায় ভুলে গেলে রাম স্থূলে ভুলে
তোমার মায়ায় জগত ভুলে আছে হে ভবস্বামী ॥[৩]

১। দাশরথির পাঁচালী, রামের বনগমন, পৃঃ ৩৫২।
২। ঐ, ঐ, ঐ, রামচন্দ্রের বিবাহ, পৃঃ ৩৩৮।
৩। ঐ, ঐ, ঐ, মায়াসীতা বধ, পৃঃ ৪৩৪।

দাশরথির রামের দুর্বিনয়ও উল্লেখযোগ্য। পরশুরাম প্রতি রামবাক্য :

"শুনে কন চিন্তামণি, ধনুকবাণের কি জান তুমি,
তপস্যা কর সঙ্গে ঋষিমুনি, বসে তপোবনে।"[১]

যখন মানুষ রাম তখন তিনি পরিচিত একজন বিত্তবান, অহঙ্কারী বা জনগণের চোখে দেখা অতি সাধারণ শোকার্ত মানুষমাত্র। আর যখন ভগবান তখন সকল কিছুর উপরে লীলাময় ঈশ্বর। নরত্ব ও ভগবত্তা এই দুইটি প্রান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য না থাকায় রাম চরিত্রটি একান্ত কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। বাল্মীকির দেবমানব বা কৃত্তিবাসের ভক্তের ভগবান একটিও দাশরথির রামের মধ্যে যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার কারণ দাশরথি রামচরিত্রকে স্থির আলোকে দেখেন নাই। সাধারণ লোকের নিকট রামের পরিচয় দিতে গিয়া রামের যে গুণাবলী তাহাদের নিকট বিশেষ লক্ষণীয়রূপে প্রতিভাত হইবে সেই খেয়ালী ক্ষমতাই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই জনগণের আদর্শ ছিল অমিত প্রতাপশালী জমিদার। যে পালকীতে চাপিয়া বেহারাদের উপর নিজ খেয়ালখুসি মত দাবন দিতে পারিল না, সে গণচিত্তে কখনই দাগ কাটিতে পারিবে না। শক্তির অতিশায়িত সংস্করণই ইহাদের নিকট আদর্শস্থানীয়।

এখানে আর একটি কথা আছে। সমালোচকের দৃষ্টিতে যাহাই হউক না কেন, রসিক ভক্তের দৃষ্টিতে কিন্তু এই রাম বা কৃষ্ণ চরিত্র তদানীন্তন সাধারণ মানুষকে এমন কি পণ্ডিতবর্গকে পর্যন্ত প্রচুর আনন্দ দিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন: "অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মভাবমিশ্রিত মানবলীলা বর্ণনা যেরূপ দেখা যায়, দাশরথি রচিত কি রামচন্দ্র কি শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎবিষয়ক সকল লীলাই সেইরূপ।"[২]

প্রতিনায়ক রাবণও পরম রামভক্ত, বীরভক্ত। জয়বিজয় নামে যে বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিলেন দুই ভাই, রাবণ তাহা ভুলেন নাই। কাজেই রাম কি বস্তু রাবণ তাহা বুঝেন। রাবণকে রামতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার অর্থ নারদকে ভক্তিযোগ ও বৃহস্পতিকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার মত। রাবণ জানেন

১। দাশরথির পাঁচালী, রামচন্দ্রের বিবাহ, পৃঃ ৩৪৮

২। ঐ, ঐ, ঐ, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৩।

যে "তিনি জন্মে শত্রু ভাবে দিবেন মুক্তিভিক্ষে।" রাবণের গৌরববোধও

মমসম জগতে কে আছে ভাগ্যবন্ত।
দারা সহ দ্বারস্থ যাহার লক্ষ্মীকান্ত ॥[১]

জয়ে পরাজয়ে, উল্লাসে বিলাপে, প্রাসাদে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্রই রাবণ যেন একজন ধনী, প্রমত্ত, মতিচ্ছন্ন বাঙ্গালীর প্রতিচ্ছবি। যুদ্ধরত রাবণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মাঝে মাঝে দাশরথি এমন কৌতুককর সব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন যে রাবণের সামান্যতম ইজ্জৎ বা মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। রস সম্পর্কে আলোচনার শেষে এই জাতীয় একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি ও আলোচনা করিয়াছি।[২]

লক্ষ্মণ নিষ্ঠাবান রামভক্ত ও গোঁড়া শাস্ত্রজ্ঞানী। ব্রাহ্মণ-পত্নী অহল্যার পাষাণ অঙ্গে পাদস্পর্শের যে আদেশ রামকে বিশ্বামিত্র করিলেন, লক্ষ্মণ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ স্পষ্টতঃ বলিলেন: "একার্য অবিধি, করা উচিত নয়।" লক্ষ্মণের দুর্বলতাও প্রচুর। মহীরাবণের গৃহে "হরি হে আজ বুঝি প্রাণ হারালাম" বলিয়া লক্ষ্মণ একেবারে কাঁদিয়া আকূল।

রামায়ণের বিভীষণ, তরণী, মহীরাবণ সকলেই ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ। অবশ্য ভক্তি প্রকাশের রকমফের আছে।

দাশরথির রামায়ণে একমাত্র জীবন্ত চরিত্র হনুমান। তাঁহার ভক্তি, সাহস, বিশ্বাস, বিক্রম এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত কিংবা স্খলিত হয় নাই। দৃঢ়দেহ, মহাবীর, দুঃসাহসী, অদ্ভুতকর্মা, সুরসিক ভক্তরাজ হনুমান কথায় ও কার্যে, ব্যবহারে ও বিচারে সুসম্পূর্ণ—স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত একটি সচেতন পুরুষ। রামায়ণের বিষয় লইয়া দাশরথি মোট দশটি পালা রচনা করিয়াছেন, তাহার আটটির মধ্যেই মহাবীর হনুমান স্বমহিমায় বিরাজমান এবং তাঁহার মহাভক্তি ও মহাবীরত্ব এই দুইটি ভাবই সর্বত্র সুস্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ২৮টি পালার মধ্যে সর্বপ্রধান চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই কৃষ্ণ একেবারে ভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ও "গূঢ়-কপটমানুষঃ।"

১। দাশরথির পাঁচালী, মহীরাবণ বধ, পৃঃ ৪২০।

২। এই প্রবন্ধের এই অধ্যায়ের 'ঞ' অংশের শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তাঁহার ভাগবতসত্তা-সূর্য মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃতি-মেঘে আবৃত হয় নাই। কাজেই প্রতিটি আচরণের মধ্যে সদা সচেতন ভগবানের লীলাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে—মানুষকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানুষের আচরণের বা মানুষী লীলার বিচারে আলংকারিকের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে ধীরোদ্ধত ধৃষ্ট নায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। গোপীগণের বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণকালী, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর প্রমুখ পালাগুলির মধ্যে বাকচতুর শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় সুস্পষ্ট। শ্রীরাধার বা বৃন্দার সঙ্গে রসালাপে শ্রীকৃষ্ণের সওয়াল সুন্দর এবং উপভোগ্য।

শ্রীদাম, উদ্ধব, অক্রূর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সখা ও ভক্ত। কৃষ্ণকে তাহারা স্বয়ং ভগবান বলিয়াই জানে। ইহারা সকলেই যেন প্রায় ষোল আনা জ্ঞানী ভক্ত।

সমস্ত প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ঈশ্বরবিদ্বেষী হইতেছেন একমাত্র হিরণ্যকশিপু। পূর্বজন্মের কোন স্মৃতি মনের মধ্যে উঠিয়া তাহাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে নাই। তাঁহার দৃঢ়তা ও আচরণের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। দক্ষচরিত্রও একরোখা ও অহংকার উদ্দীপ্ত।

কাশ্যপ সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি। কাশ্যপ নারদ সংবাদের মধ্যে সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থের যাবতীয় দুর্বলতা চমৎকার ফুটিয়াছে।[১]

পাঁচালীতে নারদের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত নারদ চরিত্রের স্পষ্ট দিক দুইটি। একটি ভিতরের দিক, যেখানে নারদ ভক্তাগ্রগণ্য ও পরমজ্ঞানী, অন্যটি বাহিরের দিক যেখানে ঢেঁকিবাহন নারদ দোকাঠি বাজাইয়া মূর্তিমান কলহের মত সর্বত্র অবাধগতি। কিন্তু নারদ কখনো সাধারণ কলহ সৃষ্টি করেন না। ভক্তিরসকে বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিবার জন্যই তাঁহার কলহরূপ ব্যঞ্জন সৃষ্টির প্রয়াস। সত্যভামার দর্পচূর্ণ করিতে, বা দক্ষের দাম্ভিকতা নাশ করিতে, কাশ্যপের ভ্রান্তি দূর করিতে নারদের কোন শ্রান্তি নাই। শুধু বহু ঘটনার নহে, বহু বিবাহেরও মুখ্য ঘটক নারদ। শিব-পার্বতী পরিণয়ে বা রুক্মিণীর উদ্বাহের শাশ্বত ঘটকালি নারদ ছাড়া আর কে করিবেন? এই সমস্তই নারদের পুরাণসম্মত রূপ ও কার্য। তাঁহাকে

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, বামনভিক্ষা (১), পৃঃ ৫৯২ এবং বামনভিক্ষা (২), পৃঃ ৬০৭।

রক্তমাংসের মানুষ না বলিয়া একটি সংহতভাব বলিলেই যেন সঙ্গত হয়। নারদ যেন রহস্যনিপুণ বিধাতার একটি প্রাণখোলা অট্টহাস। দাশরথির নারদ নিজের আচরণের চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "যেখানে সেখানে রই দেখতে পাইনে খেলা বই।" জগতের ক্রীড়ারঙ্গভূমে নারদ একজন দর্শক মাত্র। তিনি দেখেন:

জগতের ভূতপঞ্চ খেলিছেন সতরঞ্চ
নাচেন করিয়া ঊর্ধ্ব বাহু।
ভোর হয়ে যায় বাজী ঘরে থাকতে গজবাজী
জিনিতে না পারিলেন কেহ ॥[১]

দাশরথির নারদ কৃষ্ণদ্বেষীকে শাস্তি দিতে ও নাকাল করিতে কি রকম উৎসাহী তাহার একটি দৃষ্টান্ত হাস্যরসের আলোচনার সময়ে উল্লেখ করিয়াছি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না।[২]

পুরাণে নারদের মত দুর্বাসারও একটি বিশেষ রূপ আছে। তিনি মূর্তিমান অভিশাপ, বিধাতার ক্ষমাহীন রুদ্ররূপ। দাশরথির দুর্বাসা কিন্তু পরম ভক্ত।

ষাটি হাজার শিষ্য সঙ্গে হরিগুণানুপ্রসঙ্গে
সমর্পিয়ে মন।
ভাবি হৃদে রূপ চিন্তামণির মুনির নয়নে নীর।[৩]

এই দুর্বাসা অত্যন্ত কোমলহৃদয়। পাণ্ডবের প্রতি অতিদরদী সহানুভূতিতে তাঁহার "বারিধার চক্ষে।" কিন্তু দাশরথির দুর্বাসার ইহাই শেষ পরিচয় নহে। এই দুর্বাসা রসিক ও রহস্যপ্রিয়। তিনি "পথমাঝে নারদে দেখে ব্যঙ্গ করি কন" এবং রসিক জনের মত রঙ্গব্যঙ্গ উপভোগ করেন। ইহা দেখিয়া দাশরথির দুঃসাহসকে বাহবা না দিয়া পারা যায় না। এমন প্রচলিত পুরাণ-বিরুদ্ধ কার্য করা বোধহয় সেযুগে অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হইত।

দাশরথির পাঁচালীতে কতগুলি দম্পতি চরিত্র আছে, শিবপার্বতী তাহাদের অন্যতম। দাশরথির গানের মধ্যে শিব ও পার্বতীর যে পরমপুরুষ ও পরমা

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পৃঃ ২৮৭।

২। এই অধ্যায়ের 'ঙ' অংশ হাস্যরস দ্রষ্টব্য।

৩। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং,দুর্বাসার পারণ, পৃ. ২৮৯।

প্রকৃতির চিত্র পাওয়া যায়, পাঁচালী পালার মধ্যে তাহা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার পাঁচালীর শিব মহাযোগী ও মহাদেব নহেন, একজন বাঙ্গালী দরিদ্র গৃহস্থ মাত্র। দাশরথির শিবের দারিদ্র্য হইতে কৃপণতা বেশি। ইহা লইয়া দরিদ্র বধূ পার্বতীর সহিত কলহের আর শেষ নাই। গঙ্গা নামে দ্বিতীয়া স্ত্রীকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন শিব, প্রথমা দাঁড়াইয়াছেন বুকের উপর পা দিয়া। অভাব ঘুচিবার উপায় কি? শিব একলা আনেন আর "দশ হাতে খায় ডোকলা মাগী।"

তদুপরি আছেন দুইটি নন্দন, একজনের ছয় মুখ, অন্যজনের গজমুখ। কাজেই দাশরথির শিবের দুঃখের আর শেষ নাই।

"অন্ন বিনা শুকায় চর্ম, বস্ত্রবিনা ব্যাঘ্রচর্ম, স্থান বিনে শ্মশানে পড়ে থাকি।
ভস্ম কপাল অশ্ব নাই, বল কি বলদে যাই, তৈল বিনা গায়ে ভস্ম মাখি॥[১]

পার্বতীও চুপ করিয়া থাকেন না :—

তুমি তো সদা নিঃশঙ্ক হাতে নাই গুটি বই শংখ
কেমন করে লোকের কাছে দাঁড়াই।
পতি বড় ভাগ্যবন্ত এক বস্ত্র শত গ্রন্থ
দিয়ে পরেছি বছর দুই আড়াই॥
আবার বল সদানন্দ গৌরি তোমার পয় মন্দ
জলে অঙ্গ বলি জলে ডুবি।
কপালেতে আগুন জেলে আপনি হয়েছ পোড়াকপালে
তা কেন দেখ না মনে ভাবি?
চাই রাগে পাষাণ ভাঙ্গতে শিরে প্রতিবাদী হয় প্রতিবাসীরে
ধরে তারা তবে করিব কি।
বলে ভাং খায় ধুতুরা খায় ওর কথা তোর গায় মাথায়
কাজ কি বাছা হেমন্তের ঝি।[২]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃ. ২৯৯। আলোচ্য প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।

২। দাশরথির পাঁচালী বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃ. ৩০৪।

দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের এমন দুঃখের নিখুঁত চিত্র বিরল। শিব ও পার্বতীর পরস্পরের অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের মধ্যে দাশরথির মুন্সিয়ানা ও বাক্‌চাতুর্যের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের অভিযোগ: "পতিব্রতা নাম লয়ে, সমরে উলঙ্গী হয়ে, পতি-বক্ষে পদ দিয়ে নেচেছ।" তাহাতে "দেবগণে ঘৃণা করে রমণীর লাথিখেগো বলে।" এইজন্যই "লোকালয় ত্যাজ্য করি লজ্জা পেয়ে শ্মশানে রয়েছি," আর "ভেবে ভেবে পাগল হয়েছি।"[১] পার্বতীর অভিযোগ:

"আপনি মাখহ ছাই, আমারে বলহ তাই, চিরস্থায়ী এক দশা জানি।
কে আছে হেন জঞ্জালী, অন্নাভাবে অঙ্গকালী, বস্ত্রাভাবে হইলাম উলঙ্গিনী ॥
দেখিয়া দরিদ্রঘর, ঘুচাইলাম দশকর, চারি হস্ত এক্ষণেতে ধরি।
হয়ে কুলের কুলবালা, ঘুচাতে জঠরজ্বালা, দৈত্য কেটে রক্তপান করি ॥"[২]

দশভুজা দুর্গার চতুর্ভুজা কালী হইবার ব্যাখ্যাটি চমৎকার।

রাজকন্যা উমা কিন্তু বাঙ্গালী ঘরের ধনীদুলালীর মত দরিদ্র ও অক্ষম স্বামীকে পিতৃকুলের আভিজাত্যের কথা তুলিয়া খোঁটা দিতে ভোলেন না: "রাজকন্যা আমি দুর্গে পড়ে তব কুসংসর্গে, বন্ধুবর্গ না দেখি নিকটে!" বলিলে পতিনিন্দা হয়, কিন্তু না বলিয়াও পারা যায় না। অন্য লোক হইলে দেশান্তরী হইত! তবে যে দুর্গা সব সহ্য করেন তাহার কারণ, "কি জানি হে মহাকাল, দুঃখে গেল ইহকাল, পরকাল মন্দ পাছে হয়।"

কিন্তু হরপার্বতীর দাম্পত্য প্রেমের আরও একটি দিক আছে—যেখানে উমা কোন কারণেই স্বামীকে ছাড়িয়া তিন দিনের বেশি পিতৃগৃহে থাকিতে চাহেন না। এমন কি পিতার সঙ্গে রওনা হইবার কালেও পত্নীপ্রাণ শিবের ব্যাকুল নিষেধে উমার পিতৃগৃহগমন সঙ্কল্প চ্যুত হইয়া যায়। "যাব না যাব না বাণী ভবেরে বলে ভবানী।" সপত্নীর প্রতি ঈর্ষার জ্বালা, বসনভূষণের প্রতি লোভ, সংসারের দৈনন্দিন টানাটানির কোন মেঘ বা কুয়াসাই এই ভাস্বর প্রেমসূর্যকে আড়াল করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাও একান্তভাবে দাম্পত্য প্রেমেরই

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, আগমনী (১), পৃ. ৬১৯।

২। ঐ ঐ ঐ ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল, পৃ. ৪৯০।

ঘনীভূত রূপ, দেবত্ব নহে। ইহার মধ্যে কোথাও "জগতঃ পিতরৌ পার্বতী পরমেশ্বরৌ" নাই সত্য—কিন্তু মানুষের দাম্পত্যপ্রেমের যে পবিত্র স্নিগ্ধ জ্যোতি আছে, তাহা অনন্যসাধারণ মাধুর্যে ভরা।

দাশরথির শিব সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। এই শিব পরম বৈষ্ণব ; হরি তাঁহার গুরু। আর এই শিব কদাচ গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করেন না। পরম ভক্ত রাবণকে তিনি রামের জন্য যত সহজে ত্যাগ করিলেন, দুর্গা কিন্তু তত সহজে পারেন নাই। পৌরাণিক শিব কিন্তু ভক্তের জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত করিয়াছেন। দাশরথির শিবের কাছে ইহা একটি অকল্পনীয় দুর্ঘটনা।

নন্দ যশোদা বাঙ্গালী ঘরের পিতামাতার সার্থক ফটোগ্রাফ। এই দম্পতির মধ্যেও স্বামীস্ত্রীর কলহের চিত্রটি উপভোগ্য। অভাব নাই অথচ স্বভাবকৃপণ নন্দের প্রতি যশোদার অনুযোগ এবং নন্দের প্রত্যুত্তর বেশ রসাল। পুত্র-স্নেহাতুরা যশোদার যে চিত্রটি দাশরথি চিত্রণ করিয়াছেন, তাহাতে শিশু কৃষ্ণকে কোলে বসাইয়া নবনী খাওয়ানরত যশোদার যে পটে আঁকা ছবিটি দেখা যায়, অবিকল সেই স্মৃতি মনে আসে। কলহ তখনও আছে পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া। যশোদা চাহেন কৃষ্ণকে লেখাপড়া শিখাইতে, কুলের যাজন করাইবেন, আর নন্দ চাহেন পুত্রকে জাতির ব্যবসায়ের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে, গোধন পালন শিখাইতে। পৈতৃক ব্যবসায়ের প্রতি পিতার স্বাভাবিক দুর্বলতা, আর সমসাময়িক সম্মানার্হ পদের প্রতি মাতার চিরন্তন অভীপ্সার মনোভাবটি এইখানে খুব চমৎকার ফুটিয়াছে। হিমালয়-মেনকা, দশরথ-কৌশল্যা প্রমুখ দম্পতি-চরিত্রগুলি অনেকটা নন্দ যশোদা চিত্রের রূপান্তর।

দম্পতি-চরিত্রের মধ্যে পিতা হইতে মাতার চরিত্র সমধিক প্রাধান্য পাইয়াছে। সন্তানের প্রতি স্নেহের আকর্ষণ, বাৎসল্য রসের উন্মাদনা যে কত ব্যাকুল ও গভীর হইতে পারে, তাহা এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়াছে। যশোদা কৃষ্ণকে চোখের আড়াল করিতেই অচেতন হইয়া পড়েন।

ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় ক্ষণেকে চৈতন্য পায়
উঠে নয়ন-সিন্ধু উথলিয়ে।[১]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, গোষ্ঠলীলা (১), পৃ. ৩৩।

গিরিজায়া মেনকা গৌরীকে দরিদ্র ও বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়া কন্যার দুঃখের জন্য নিজেকে বার বার ধিক্‌তা করিতেছেন, তাঁহাকে নিজের কাছে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন।

গিরি হে গিরিশপুরে যাও।
বড় ব্যাকুল পরাণী উমা পরাণনন্দিনী
হরঘরণীকে নিজ ঘরেতে মিলাও।[১]

জামাতা কন্যাকে নিতে আসিয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে দুঃখিনী কন্যাকে কোলে পাইয়া কেমন করিয়া মেনকা তিন দিন পরে ফিরাইয়া দিবেন?

মা, প্রাণ উমা, মাকে কোন প্রাণে মা,
বললি আমায় বিদায় দে মা।
পারি প্রাণকে বিদায় দিতে তোয় নারি পাঠাতে
প্রাণ উমার কাছে কি প্রাণের উপমা॥[২]

চিত্রগুলি একান্তভাবেই যে মানবী মাতার নিবিড় স্নেহের অমৃত খণ্ড, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দাশরথি এই চিত্রগুলিকে ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা পুটিত করিয়া দিতে ভুলেন নাই। যথা,

একদিন যশোদার কোলে ছলে স্তনপানের কালে
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান মাকে মায়া করি।[৩]

অন্যত্র:

মানসে হেরিয়া গিরি মানস চঞ্চল।
দেখেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার উমারই সকল॥
উদরস্থ সমস্ত, মেয়ে ত মেয়ে নয়।
তনয়া তনয়া নয়, ইনি জগন্ময়॥[৪]

অবশ্য কৃষ্ণ বা উমার বিশ্বরূপ মূর্তিটি পুরাণ হইতে গৃহীত, দাশুর মৌলিক

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, আগমনী (১), পৃ. ৫১৬।
২। ঐ ঐ ঐ কাশীখণ্ড, পৃ. ৫৩৯।
৩। ঐ ঐ ঐ ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ, পৃ. ৫০।
৪। ঐ ঐ ঐ আগমনী(১) পৃ. ৫২৬।

কল্পনা নহে। দাশরথি পাঁচালীর বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়া বিচিত্র উপায়ে পরিচিত উক্তিকে সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দাশরথির সীতাচরিত্র নিষ্প্রভ। অনেকখানি স্থান জুড়িয়া থাকিয়াও ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অভাবে দাশরথির সীতা নেপথ্যের নিশ্চল দৃশ্যপটের মতই রহিয়া গিয়াছেন, প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠেন নাই। আনন্দে বেদনায়, বিপর্যয়ে বিড়ম্বনায় সীতা চরিত্রের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা ছিল, পাঁচালীকারের সৃষ্টি-প্রতিভা তাহা একেবারেই স্পর্শ করে নাই।

রুক্মিণী, সত্যভামা, দ্রৌপদী প্রমুখ চরিত্রগুলিও একান্ত গতানুগতিক। রুক্মিণী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, সত্যভামা স্থূলবুদ্ধি ও কোপনা এবং দ্রৌপদী গলদশ্রুলোচনা বৈষ্ণবী।

দাশরথির সর্বশ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র শ্রীরাধা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দাশরথির পাঁচালীর অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। দীননাথ সান্যাল মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন: "এই বিরাট পাঁচালী গ্রন্থের অর্ধেকের উপর কৃষ্ণলীলার নানা চিত্রপট এবং উহার প্রত্যেকটি এমন রসাল কবিত্বের সহিত চিত্রিত যে, মনে হয়, কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণ প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাশীরাম যেমন মহাভারত প্রচারের জন্য, তেমনি দাশরথি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বঙ্গে কৃষ্ণলীলা প্রচারের জন্য।"[১] এই কৃষ্ণলীলাতে যে রাধার স্থান মুখ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীরাধা বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্বপ্রধান চরিত্র। অধ্যাত্ম সাধনার তাপে ও কবি প্রতিভার আলোকে প্রেমসরসীতে কমলিনী রাই কমলের মতই সহস্র দলে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্তাগণ সকলেই শ্রীমতীকে এক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখেন নাই, দ্রষ্টা ও দৃষ্টি ভেদে দৃশ্যও বিভিন্ন হইয়াছে। এই কারণেই বিদ্যাপতির রাধা নবীনা, চতুরা, নিপুণা, অভিসারিকা, দেহ-গন্ধে মুগ্ধা, মিলনে উচ্ছল, আর চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমে প্রবীণা, প্রগাঢ় আবেগে বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত সান্দ্র, পূর্ণ যোগিনী, বিরহে উজ্জ্বল। দাশরথির রাধারও এমন বিশেষ একটি দিক আছে। এই রাধা মূলতঃ মানিনী অভিমানিনী। মুগ্ধতা, চাতুর্য, প্রগল্‌ভতা, বিরহবেদনা, ব্যাকুলতা, আর্তি

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, সমালোচনা, পৃ. ১৬

প্রমুখ যাবতীয় ভাবের মধ্যে যেমন কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাধিকার মুখ্য রূপ হইল প্রেমোন্মাদিনী; তেমনি দাশরথির রাধার প্রধানতম রূপ হইতেছে অভিমানিনী। সম্পূর্ণ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করি।

বৃষভানু রাজকন্যা রাধার তখন "দশম বরষ অথবা নয়", একদা সখী সঙ্গে যমুনার ঘাটে গিয়া দেখিয়া মোহিত হইলেন। বলিলেন—

"সই লো ডুবিলাম ঐ রূপসাগরে।
এই গোকুলনগরে কে আছে সুহৃদ হেন তরঙ্গে রাধারে ধরে "॥[১]

রাধা এই যে ডুবিলেন আর উঠিতে পারিলেন না। রূপমুগ্ধা রাধা সখীর গলা ধরিয়া বলিলেন :

আমি একা কোথা রাখি, কিছু ধরগো ধরগো সখি,
রূপ আমার আঁখিতে না ধরে।
কোটি আঁখি দিলে বিধি, কিছু কাল ঐ কালনিধি
হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে ॥[২]

এই নব সঞ্চারিত অনুরাগ লইয়া শ্রীরাধা বড়াইর পরামর্শে সখীগণের সহিত কাত্যায়নী ব্রত করিয়া কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার বর পাইলেন। তারপর বস্ত্রহরণের ব্যাপার। কুটিলা কৃষ্ণ নিন্দা করিল :

ও জ্ঞানবান, কি গুণবান, ধনবান, কি বলবান
বল দেখি কোন বান কানাই।

শ্রীরাধার জবাব :

ও নয় যদি কোন বান আমরা তবে ত পেলেম নির্বাণ
আমাদের কপাল বলবান ॥[৩]

তারপর কুটিলাকে স্পষ্টবাদিনী ও বিদ্রোহিণী রাধা একেবারে চরম কথা শুনাইয়া দিলেন :

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃ. ৭০ এবং পরিশিষ্ট ক।

২। ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ,।

৩। ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ৮২।

নন‍দিনী বল নাগরে।
ডুবেছে রাই কমলিনী কৃষ্ণকলঙ্কসাগরে ॥[১]

শুধু রূপ দেখিয়া নহে, বাঁশরী শুনিয়াও শ্রীমতী ব্যাকুল হইয়া পড়েন। একদা "দিবসে বিবশা শুনি বংশীধ্বনি।"

বিবশা রাধার কি অবস্থা হইল?

শুনিতে মোহন বাঁশী তনুমন হরে।
মনে হয় মনোমধ্যে বাঁধি মনোহরে ॥[২]

কিন্তু মনোহরের মন পাইবার উপায় কি? রাধা তো আগেই মন বিকাইয়া দিয়া সর্বহারা হইয়াছেন।

মন দিয়া মন পাব বলি মন সঁপিলাম আগে।
এখন মনমরা হয়েছি, মরি মনের অনুরাগে ॥[২]

তীব্র অভিমান ও দুর্বার ব্যাকুলতায় একই সঙ্গে শ্রীরাধার চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। "মনে হয় মানে বসি, হেরব না আর কালশশী", কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ, "কাল হইল মোহন বাঁশী না হেরিলে মরি প্রাণে"। কাজেই দিবা অভিসারেই চলিলেন শ্রীমতী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই একটি মাত্র অভিসার ছাড়া অন্য কোন অভিসারের চিত্র পাঁচালীতে নাই।

দাশরথির রাধার মান খুব তীব্র, কিন্তু যেমন তীব্র তেমনি ক্ষণস্থায়ী। মান করিলে কখনো কৃষ্ণ তাঁহার পায়ে ধরিয়াও ভাঙ্গাইতে পারেন না, আবার তাহা হয়ত সামান্য কারণে কিংবা অকারণেই ভাঙ্গিয়া যায়। তখন যোগস্থ হইয়া তিনি কৃষ্ণের সন্ধান করিতে বসেন, কিংবা সখীরা কৃষ্ণকে আনিয়া মিলন ঘটাইয়া দেয়। বিরহের বিলাপ গতানুগতিক, রসগাঢ় আর্তি দাশরথির রাধার বিলাপে বড় একটা পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণের সঙ্গে রসালাপ করিবার সময়ে রাধার রূপ আবার অন্য প্রকার। তখন বাক্‌চাতুর্যে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, শ্লেষে, বক্রোক্তিতে, তীব্রতায় শ্রীরাধা একেবারে রৌদ্রকরোজ্জ্বল শাণিত তরবারির মত প্রভাময়ী।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃ. ৮৩

২। ঐ, ঐ, ঐ, কৃষ্ণকালী, পৃ. ৫৫।

মুগ্ধা, বিরহিণী ও অভিমানিনী এই তিনটি রূপের মধ্যে দাশরথির রাধার মুখ্য রূপ, পূর্বে বলিয়াছি, অভিমানিনী। এই অভিমান বা মান ঈর্ষার জ্বালায় উজ্জ্বল, বিরহের অশ্রুতে মধুর। শতবর্ষ বিরহ যাপনের পর কৃষ্ণ সাক্ষাতের তীব্র ব্যাকুলতা লইয়া রাধা প্রভাসে ছুটিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে কৃষ্ণ তাঁহার দিকে না তাকাইয়া চন্দ্রাবলীর দিকে তাকাইলেন, অমনি তাঁহার মনে দুর্জয় মান আসিয়া দেখা দিল, তিনি "কানকাটা সোনা" পরিবেন না বলিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আর একবার রাধার মান ভাঙ্গাইতে শ্রীকৃষ্ণকে পায়ে ধরিতে হইল।

"ধরিয়ে প্যারীর চরণ সাধনের ধন সাধে।

করেছি দোষ পায় পায়, অনুপায় ধরেছি পায়,
আজি আমায় রক্ষ কৃপায় অপরাধে রাধে।
শুনে বাক্য সুমধুর দুর্জয় অভিমান দূর
সুখে মগ্ন সুরাসুর যুগল দর্শনে[১] ॥

টাইপ চরিত্র আলোচনার পূর্বে আর একটি চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়, তাহা বৃন্দের। বৃন্দে নারদের বিপরীত দিক। নারদ কলহ ঘটাইতে ব্যস্ত, বৃন্দে মিলন ঘটাইবার অগ্রদূতী। বৃন্দে হইতেছেন রাধাকৃষ্ণের বিরহমিলন ব্যাপারে একটি জীবন্ত অনুকূল পরিবেশ। প্রেম যেখানে আবর্ত সৃষ্টি করে, সেখানে বৃন্দে ছাড়া একদিকে কৃষ্ণজীও যেমন অচল, অন্যদিকে শ্রীরাধাও তেমনি পথ খুঁজিয়া পান না। রাধার দুর্জয় মান ভাঙ্গাইতে হইবে, কৃষ্ণের একমাত্র সহায় বৃন্দে; আবার মথুরায় দুষ্কর দৌত্য কার্যে শ্রীরাধা বৃন্দে ছাড়া আর কাহাকে পাঠাইবেন? বাক্‌নিপুণা, সুচতুরা, সুরসিকা, সাহসিনী, সমপ্রাণা, এবং একান্তভাবে নিষ্কাম ভক্তিমতী বৃন্দে চরিত্রকে দাশরথি যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগুলিতে কতখানি স্থান দিয়াছেন, তাহা যেন প্রথমে আলাদা করিয়া চোখে পড়িতেই চাহে না; বায়ুপরিমণ্ডলের মত তাহা রাধাকৃষ্ণের প্রেমজগৎকে যেন অলক্ষ্যে পরিবৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। একটু অবহিত হইলেই দেখা যায় যে বৃন্দেকে বাদ দিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা যথাযথ

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃ. ৩১৩।

ভাবিবার কোন অবকাশই নাই। বড়াইকে দাশরথি আনিয়াছেন বটে কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের মত কোন প্রাধান্য দিয়া নহে, উপরন্তু তাহার মধ্যে ভ্রষ্টা বৃদ্ধা নারীর একটি টাইপের আভাস আছে। যাহা হউক, বৃন্দেকে কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র বলা চলে না। আবার টাইপের মত সে একটা ঢংও মাত্র নহে। বৃন্দে যেন রাধাকৃষ্ণ লীলাতরণীর একটি অনুকূল পরিবেশ, একটুখানি স্রোত, খানিকটা ঢেউ, কিছুটা হাওয়া—বিচিত্র নৃত্যভঙ্গীতে প্রেমতরণীকে বাহিয়া লইয়া চলিয়াছে, আর কিছু তাহার কামনা নাই, আর কিছু সে নিজেও নহে।

•

দাশরথির পুরুষ টাইপ চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ। অতিদরিদ্র, অতিলোভী ও মহা মূর্খ এই বিশেষ শ্রেণীটির বর্ণনা দাশরথি এমন নিপুণ ভাবে করিয়াছেন যে ছায়াচিত্রের মত উহাকে সচল প্রাণচঞ্চল বলিয়া মনে হয়। কয়েকটি উদাহরণ ধরা যাউক। প্রথমে ভৃগুর চিত্র। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন, বীরভদ্রের ভূতসৈন্য আসিয়া পড়িবে এই আশঙ্কাসঙ্কুল মুহূর্তে ভৃগুর চিত্রটি এই প্রকার :

ভয়েতে ব্যাকুল চিত্ত কলামূলাটা ঘৃতপাত্র,
বন্ধন করিতে গাত্র মার্জনী বিছায় রে।
শীঘ্র পালাবার চিন্তে, তাড়াতাড়ি করি বান্‌তে
এক টেনে আর আনতে আরদিকে এড়ায় রে ॥[১]

আর একটি চিত্র। রামের বিবাহের পুরোহিত বশিষ্ঠ সিধে দেখিয়া চটিয়াছেন।

বশিষ্ঠ বলে নে যা বেটা, কি হবে আর চালকলাটা।
খেসারি দাল গোটা গোটা মালসাটাও যে ফুটো।
দাঁড়া বেটা জনককে চিনি কণামাত্র দিয়েছেন চিনি
কোন বেটা সিধে বাছনি করে দিয়েছে, উঠ ॥[২]

রাজবাড়ীর সিধের বর্ণনা এবং রাজপুরোহিতের উক্তি শোনা গেল। এবার নন্দ গোপের বাড়ীর পুরোহিতের কথা। আসিয়াই তিনি প্রাপ্য জিনিসপত্রের তদন্ত করিতেছেন।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, দক্ষযজ্ঞ, পৃ. ৪৮৩।
২। ঐ ঐ ঐ রামচন্দ্রের বিবাহ, পৃ. ৩৪৩।

বরণের যেটা বড় ষোড় চোদ্দ পোয়া হদ্দ জোর
কোঁচা করতে কুলায় নাকো কাছা।
কি দিব আর পরিচয় ভেঙ্গে বলা উচিত নয়
তারি উপযুক্ত খাদি কাঁচা॥
ঘড়াগাড়ু সব নালুক জল থাকে না মাঝে ভুলুক
থাল রেকাবি ফুঁ দিলে যায় উড়ে।

এইবার তাহার বিদ্যার পরিচয়ঃ

মুখে মুখে করাই শ্রাদ্ধ মিনিট পাঁচছয় লাগে হদ্দ
ভুজ্যির চাল বাঁধতে যতক্ষণ।
দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা, তাতে যায় পণ্ডিত বুঝা,
চণ্ডীপাঠে আমি একজন॥[১]

স্থানাভাবে অধিক উৎকলন করা গেল না। দেবগুরু বৃহস্পতি, দক্ষের ঋত্বিক ভগবান ভৃগু, সূর্যবংশের আচার্য বশিষ্ঠ, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য, জনকের পুরোহিত শতানন্দ আর নন্দ ঘোষের পুরোহিত মাণিক শর্মা—ইহাদের মধ্যে আচারে-ব্যবহারে, ভাবে-ভাষায়, পাওয়া-চাওয়ায় কোন ইতরবিশেষ নাই। ব্যক্তি চরিত্রের মহিমা ও সম্ভ্রমের কোন মর্যাদা নাই, ইহাদের একমাত্র পরিচয় ইহারা আমাদের সমাজের পুরোহিত নামধেয় একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক।

পুরোহিত ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরও দাশরথির নজর এড়ায় নাই।

ঘৃণা হয় না একটুক, ওদের বাড়ীর মাগীগুলো ভাই এমন পেটুক,
তাদের ইচ্ছা যুটুক পুটুক পাকা ফলার।
মাগীদের ছেলে থাকে সম্মুখে, পাছু ফিরে লুচি তুলে মুখে,
আড়ে গেলে গোড়ার মুখে; শব্দ হয় না গলার॥
যদি ছেলেটা দেখতে পেলে, লুকিয়ে রাখে পাতের তলে,
বলে দূর হ পোড়াকপালে, ছেলে একা ফেলে গেল জা।
বলে তোর বাপ এনেছে লুচি আছে তোলা, খাইও এখন সন্ধ্যেবেলা,
নাওগে একটা পাকা কলা আছে মজা মজা॥[২]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, নন্দোৎসব, পৃ. ২২।
২। ঐ ঐ ঐ রামচন্দ্রের বিবাহ, পৃ. ৩৪৪।

প্রভাসযাত্রী রবাহুত ব্রাহ্মণদের নক্সা :

বেরুবো রাত্রি হলে ভোর থলের মধ্যে থালিটে পোর
নে কয়লা চকমকি আর হুঁকো।
পীঠে বুঁচকী হাতে হুঁকো অমনি হল পশ্চিমমুখো
বৈদ্যনাথের বনের কাছে গিয়ে ॥[১]

তাহারা পরামর্শ করিতে লাগিল যে যাইতে লাগিবে চারিমাস এবং এত হাঁটিয়া যদি "শয়েক দেড়শ" না পাওয়া যায়, তবে কোন লাভ নাই। তাহা ছাড়া আর একটা খুব বড় ভয় আছে।

আর একটা ভারি ভয় তিলি তামলীর বাড়ী নয়
ভদ্রলোক বিদায় করিবে তথা।
আমি বললাম তখন দেখো, ভারি মুস্কিল ভেকো
শুধায় যদি সন্ধ্যা গায়ত্রীর কথা ॥[২]

টীকা নিষ্প্রয়োজন। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণদের দৌত্য, পণ্ডিতগিরি, ভোজনবিলাস ইত্যাদি নানা চিত্র আছে পাঁচালীতে এবং ইহাদের সবগুলিই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তোলা দরিদ্র, লোভী, ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণদের চমৎকার ফটোগ্রাফ। শুধু ব্রাহ্মণ কেন, দারোয়ান, মাঝি, গণক, রজক প্রভৃতিরও চমৎকার সব টাইপ চিত্র আছে।

স্ত্রী টাইপ চরিত্রের মধ্যে প্রধান কুটিলা। জটিলা-কুটিলা জাঁদরেল শাশুড়ী ননদের শাশ্বত প্রতীক। তাহাদের পরশ্রীকাতর কুটিল মনোবৃত্তিটি দাশরথির হাতে চমৎকার ফুটিয়াছে। রাধার কৃষ্ণ-অপবাদ হইবার জন্যই যে দুই মায়েঝিয়ে কৃষ্ণবিদ্বেষী বা নন্দযশোদার উপর বিরূপ তাহা নহে, আসলে পরের আনন্দ ও সুখ তাহারা সহ্য করিতে পারে না। জটিলা নবজাত কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়া মন্তব্য করিল, "পোড়া কাঠ", "মেয়ে হলে কেউ ছুঁতো না, বিকানো হতো ভার।" কুটিলা চরিত্র আরও জটিল। সদ্যজাত কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়া সে যশোদাকে বলিল :

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, কুরুক্ষেত্র মিলন, পৃ. ৩০৫
২। ঐ ঐ

"দেখি মা কেমন হয়েছে ছেলে, অনেক যত্নে রত্ন পেলে,
যশোমতী কয় আশীর্বাদ কর।
করে তুলে নীলমণি কুটিলের কোলে নেয় অমনি
বলে, মা লও নীলমণিকে ধর ॥
কুটিলে বলে ঘুচিল দুঃখু এই যে বাছার পদ্মচক্ষু
হদ্দ ছেলে আহা মরি মরি।
কিবা হাতপা, কিবা গঠন. একটু কেবল কালোবরণ
যা হয়েছে বাঁচিয়ে রাখুন হরি ॥[১]

তারপর কুটিলা চলিল বাড়ীর দিকে। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের ডেকে যেচে কয় নন্দের ছেলে দেখিয়া আসিলাম।

"ঘোর কালো অন্ধকার এমন ছেলে কদাকার
ছোটলোকের ঘরে দেখতে পাই নে।
মরি বিধাতার কি সৃষ্টি, এমন ছেলে কালোকষ্টি
সাত জন্ম না হলেও চাই নে ॥[১]

পরে অবশ্য রাধাসংক্রান্ত ব্যাপারে কৃষ্ণ এবং সেই সঙ্গে নন্দ যশোদার সম্বন্ধে একটা কঠিন মনোভাব হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আসল বীজ যে পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষা সেটা চরিত্রের মধ্যেই ছিল। কৃষ্ণ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, অদূরে পাড়ার মেয়েদের বৈঠক বসিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে জটিলার উক্তি :

জটিলা বলে শুন গো সই, একটি ধর্ম কথা কই
যশোদা মাগীর দেখেছিস প্রতাপ।
ছেলে আর নাইলো কার অভাগীর কি অহংকার
মনের গুণেতে মনস্তাপ ॥[২]

আর একটি চিত্র। কৃষ্ণ কালীদহে ডুবিয়াছেন শুনিয়া "মায়েঝিয়ে" আনন্দ :

"কি আমোদ এসে জুটলো, আহ্লাদে পেট ফেটে উঠলো
আহ্লাদ ধরে না মা আর অঙ্গে।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, নন্দোৎসব, পৃ. ২৭।
২। ঐ, ঐ, ঐ কলঙ্কভঞ্জন (২) পৃ. ১৪।

এত আহ্লাদ কোথায় ছিল, আহ্লাদে গা শিউরে উঠল
আহ্লাদ ঘুরিছে সঙ্গে সঙ্গে ॥
আহ্লাদে প্রাণ কেমন করে, এত আহ্লাদ কব কারে
যশোদা মাগীর গৌরব ঘুচে গেল।
বলা যায় কি দুঃখের কথা, নন্দ গাঁয়ের হর্তা কর্তা
দই বেচে যার মাথায় টাক হলো ॥[১]

এবার রাধার প্রতি মনোভাব বিচার করা যাউক। "সাধ করে দিয়েছি বিয়ে, ঘর করি নাই বউ নিয়ে, মনের দুঃখে হয়ে আছি মাটি।" আশা এই কৃষ্ণ মথুরায় গেলে কংস তাঁহাকে নিশ্চয় বধ করিবেন ; তখন "নন্দের বেটা মলে পরে, পাপ গেল প্রায়শ্চিত্ত করে সোনার বউকে নিয়ে করব ঘর।" তাই কুটিলবুদ্ধি কুটিলা কৃষ্ণের মথুরাগমন কালে রাধাকে সহানুভূতি দেখাইয়া মুখে দুটো আলগা প্রবোধ বলিতেছে। "বলে আহা মরে যাই, আঙ্গুল দিয়ে ভাসল চোখের জলে।" তারপর এক দফা কৃষ্ণের গুণবর্ণনা করিল কুটিলা, যেমন কৃষ্ণ থাকায় বৃন্দাবনে কোন ভয় ছিল না, মনটি ভাল ছিল ছেলেটির ইত্যাদি। কিন্তু হাজার হউক পরের ছেলে তো, থাকিবে কেন ?

তুই যা করিস সে যা করুক যা হবার হয়েছে মরুক
কোঁচড়ের আগুন ফেলব তোকে কোথা।
কাঁদিসনে আর ঘরে আয় ঘরকন্না কর বজায়
পরকে যতন করা কেবল বৃথা ॥[২]

কুটিলা ও রাধার মধ্যে কৃষ্ণকে লইয়া কলহগুলি খুব রসাল এবং অনেক স্থানে কবিগানের আমেজপূর্ণ। রাধা বলিলেন যে কৃষ্ণ ভগবান। এই সম্বন্ধে কুটিলার মন্তব্য : ভগবান কি কংসের ভয়ে যমুনা পার হন না, ভগবান কি গরু চরান, রাধা বলিয়া বাঁশী বাজান ও রাধার পায়ে ধরেন, যশোদার বন্ধন স্বীকার করেন, বা রাখালদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। তবে কথা আছে :

নন্দের বেটা ব্রহ্ম নয় জেনেছি তার মর্ম।
যার পানে যার মন পড়ে রাই, সে যেন তার ব্রহ্ম ॥[৩]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী ৪র্থ সং, কালীয়দমন, পৃ. ৪৬।
২। ঐ ঐ ঐ অক্রুর সংবাদ (২), পৃ. ১৭৭।
৩। ঐ ঐ ঐ কৃষ্ণকালী, পৃ. ৬১।

এমন সরস টিপ্পনীর অভাব নাই। কিন্তু এ হেন টাইপ কুটিলার মধ্যেও দাশরথি ভক্তি সংক্রামিত করিয়াছেন। অবশ্য ক্ষণকালের জন্য। রাধার মুখে "কৃষ্ণের গুণকথায়, কুটিলে চৈতন্য পায়, পাষাণ শরীরে প্রেমোৎপত্তি।"[১]

জটিলাকুটিলা ছাড়া নারীচরিত্রের কতগুলি দিককে তুলির দুই একটি টানে দক্ষ নক্সাকারের মতই দাশরথি খুব চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মেয়েদের গহনার প্রতি লোলুপতা, প্রতিবেশীর প্রতি বিচিত্র ব্যবহার, কোন গোপন কথা চাপিয়া রাখিবার অক্ষমতা, ধনী গৃহিণীর অন্য সালঙ্কারা নারীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা, গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের কমিটি ইত্যাদি বর্ণনার কোন সুযোগই দাশরথি ছাড়িয়া দেন নাই। মৌলিক পাঁচালী কি অমৌলিক পালা সর্বত্রই ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। দুই একটি মাত্র উৎকলিত হইল।

রামলক্ষ্মণকে পাতালে নিয়া গিয়া মহীরাবণ ঘটনাটি গোপন রাখিবার জন্য কেবল পুরোহিত মশাইকে বলিলেন এবং সাবধান করিয়া দিলেন যে কেহ যেন একথা না জানে। রাত্রে পুরোহিত কথাটি গৃহিণীকে জানাইয়া বলিলেন, খবরদার কাহাকেও বলিও না। স্ত্রী কহিলেন: "পোড়াকপাল, কারে বলিব তুমি করিলে মানা।" কিন্তু ব্রাহ্মণীর আসল অবস্থাটা দাঁড়াইল এই রকম,

রাত্রে না পেয়ে ফাঁক পেট ফুলে হইল ঢাক
গুমরে গুমরে ব'লে ওমা মলাম।
একি পোড়া ছি মলো মলো, আজি কি রাত্রি দুটো হলো
কখন পোহাবে পেট ফেটে যে গেলাম॥[২]

সকাল হইতেই পুকুরঘাটে রামমণির কাছে বলার পর, ব্রাহ্মণী কহিল:

রাজবাড়ীর এই গুপ্তবাণী, কালি বলিলেন আমাদের তিনি
দেখো দিদি বল না কারো কাছে॥
রামমণি কয়, হরি হরি ধিক ধিক মোর গলায় দড়ি
বলিলে কথা তোর হবে সংকট লো।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, কৃষ্ণকালী, পৃ. ৬১।
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, মহীরাবণ বধ, পৃ. ৪২৩।

কথাগুলি রামমণির পেটে, উদরীর সমান ফুলে উঠে
জলের ঘাটে জানায় গিয়ে ত্বরা।[১]

জানাইল বটে কিন্তু সেও কম সাবধানী নয়; সকলকে সমঝাইয়া বলিল:

কেবল বলছি কথা লুকায়ে ঘাটে, তোরা পাছে বলিস হাটে
তোদের পেটে কথা জীর্ণ যায় না।
আমাদের মত নহিস যে পেটে বারশ জন্মের কথা পেটে
জীর্ণ করি গিন্নী হয়েছি বাছা॥[১]

কোন ব্যক্তিবিশেষে নহে, একেবারে একটি শ্রেণীর টাইপ।

আর একটি চিত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইব। কৃষ্ণের মূর্ছা হইয়াছে তাহাতে অন্তঃপুরের অবস্থা: "যাতায়াতে ভাঙ্গে কপাট, অন্তঃপুরে যেন হাট, পুরুষ হতে নারীর ভাগ ষোল।"[২] তারপর চলিল মেয়েদের পরামর্শ দেওয়া। "বাঁচাবে ছেলে ভুতুরে ডেকে আন।" "ভয় নাই মা, জলপড়া দে ছেলেকে দিয়েছে ডাইনে টান।" পরের পর্ব; "ত্যজিয়ে নন্দের পুর, রমণী গিয়ে কিছু দূর, মণ্ডলী করিয়া সবে কয়। কি নীলরতন পেয়ে হারালে, মাগী এমন পোড়াকপালে—" ইত্যাদি। নিখুঁত চিত্র।

অন্যান্য চরিত্রের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। কারণ কয়েকটি প্রধান ও টাইপ চরিত্রের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যেই দাশরথির চরিত্রসৃষ্টির মূল রহস্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। চরিত্র আলোচনার প্রারম্ভে আমরা যে সূত্র ধরিয়াছিলাম, সিদ্ধান্তে আসিয়াও তাহাই পাইতেছি। দেবতা ও মানুষের পূর্ণাঙ্গ, জীবন্ত ও সুসমঞ্জস চরিত্র চিত্রণে দাশরথি খুব সার্থকতা দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তির অঞ্জন না লাগাইলে ইহাদের মধ্যে মহিমা পরিদৃশ্য হয় না। কিন্তু টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে দাশরথি বিশেষ কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। নক্সাকারের সুদক্ষ তুলির টানের মত যথোপযুক্ত ও নিপুণ শব্দযোজনার ফলে টাইপ চরিত্রগুলি নিখুঁত ও জীবন্ত হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর চিত্রকরের প্রতিভা দাশরথির না থাকিলেও প্রথম শ্রেণীর নক্সাকারের বা কার্টুনিস্টের প্রতিভা যে তাঁহার ছিল, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কম।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, মহীরাবণবধ, পৃ. ৪২৩।

২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃ. ১১৩।

ট

পাঁচালীপালার উৎস ও সমসাময়িকদের সহিত সম্পর্ক

দীননাথ সান্যাল মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন : "পুরাণাদির উর্বর ক্ষেত্রেই দাশরথির পাঁচালীর উদ্যানভূমি।"[১] দাশরথির অমৌলিক বিশেষতঃ পৌরাণিক পাঁচালীপালাগুলির উৎস যে পুরাণ তাহাতে আর সংশয় কি? মুখ্যতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই দাশরথি তাঁহার পাঁচালীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু মূল সংস্কৃত হইতে অথবা বঙ্গানুবাদ হইতে কিংবা কথকতা শ্রবণ করিয়া এই সব কাহিনী তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে।

সমালোচক দীননাথ সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন : "দাশরথি বিদ্বান ছিলেন না, সামান্য লেখাপড়া করিয়াছেন মাত্র। সংস্কৃত ভাষা অল্পমাত্রও জানিতেন কিনা সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। তবু যে পুরাণাদি অবলম্বনে এমন একটা লোকপ্রিয় ধর্ম সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাবলে।"[২] সুরসিক সমালোচক চন্দ্রশেখর কর কাব্যবিনোদ মহাশয়ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।[৩] দাশরথির জীবনীকার শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : "দাশরথি কোন টোলে চতুষ্পাঠীতে, অথবা কলেজে স্কুলে অধ্যয়ন করেন নাই, কেবল চিন্তা ও আলোচনাই তাঁহার রচনা শিক্ষার অধ্যাপক হইয়াছিল।"[৪]

কিন্তু দাশরথির পাঁচালীর সুযোগ্য সম্পাদক হরিমোহনের মত ঠিক বিপরীত। তিনি লিখিয়াছেন : "কোন কোন প্রবীণ পণ্ডিত লোকের মুখেও শুনিতে পাই, দাশু রায়ের গ্রন্থাধ্যয়নলব্ধ বিদ্যা অতি অল্পই ছিল, অর্থাৎ তিনি কিতাবতী লেখাপড়ামাত্রই শিখিয়াছিলেন, উত্তমরূপ বিদ্যার্জনের অবসর পান

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, সমালোচনা, পৃ. ২।
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, সমালোচনা, পৃ. ২৬।
৩। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ. ৭।
৪। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, পৃ. ৩২।

নাই, সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ দর্শন প্রভৃতি উত্তমোত্তম গ্রন্থসমূহ পাঠে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। কাশীরাম দাস যেমন কথকের মুখে শুনিয়াই ভারতবিখ্যাত মহাভারত রচনা করেন, দাশু রায়ও তেমনি কথকের মুখে শুনিয়াই এবং প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই, তাঁহার পাঁচালীর পালাসমূহ রচনা করিতেন। আমরা কিন্তু একথা মানিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার রচিত দেবদেবী বিষয়ক পালাসমূহ পাঠ করিলেই বুঝা যায়, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, রাধাতন্ত্র, হরিবংশ, বাল্মীকি রামায়ণ, বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, মনুপরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র এবং চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। পাঁচালীর পালাসমূহে পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃতি উপলক্ষে তিনি যেমন অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, কেবলমাত্র লোক প্রমুখাৎ শ্রুত উপদেশে সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে না।”[১]

কিন্তু হরিমোহনের অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া মনে হয় না। দাশরথি যে সংস্কৃত জানিতেন না, তাহা শুধু তাঁহার সমসাময়িক বন্ধুস্থানীয় জীবনীকার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবৃতি হইতেই বুঝা যায় না, পাঁচালী পাঠ করিলেই বুঝা যায়। কবির দলের গাঁথনদার ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রচলিত পুরাণাদি সাধ্যমত পাঠ করিতে হইত এবং সে সম্বন্ধে নানা খোঁজখবর রাখিতে হইত। কবি, কীর্তন, রামায়ণ, কথকতা প্রভৃতি প্রচলিত গীতাদি হইতেও তিনি ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর নিজের প্রতিভায় বিভিন্ন কাহিনী মিলাইয়া একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভাগবতাদির সহিত তাঁহার কাহিনীগুলি সর্বাংশে এক নহে। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি বিভিন্ন মতের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়া সিদ্ধান্ত করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিভিন্ন মতগুলি কথকতা, পুরাণশ্রবণ প্রভৃতির ফলে জনসাধারণের চিত্তাকাশে বায়ুপ্রবাহবৎ সঞ্চরণশীল ছিল, দাশরথি নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে এই জ্ঞান টানিয়া লইয়াছেন। তিনি জ্ঞাতসারে হয়ত কোন আদর্শকে অনুসরণ করেন নাই।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, প্রস্তাবনা, পৃ. ৭

নানাস্থান হইতে যথেচ্ছ চয়ন করিয়া তিনি তাঁহার পাঁচালী মালিকা সাজাইয়াছেন। বিষয়-বিস্তার ও ঘটনা-বিন্যাসের বিচার করিলেই খানিকটা বুঝিতে পারা যায়। এক এক করিয়া এই বার মোটামুটি ভাবে পুরাণগুলির ঘটনাবিন্যাসের সহিত দাশরথির পাঁচালীর কাহিনীর তুলনা করা যাউক।

দাশরথির কৃষ্ণচরিত মোটামুটিভাবে ভাগবতানুগ। হরিবংশের সহিত পাঁচালীর মিল অমিল দুই আছে। পাঁচালীর কালীয়দমন পালাতে আছে, রাখালগণকে জীবনদান করিয়া পরে কালীয়কে দমন করিবার জন্য কৃষ্ণ কালীদহে ঝাঁপ দিলেন।[১] ইহা ভাগবতসম্মত।[২] কিন্তু হরিবংশ মতে কালীদহকে বিষমুক্ত করিবার বাসনায়ই কৃষ্ণ কালীয়কে দমন করিতে অগ্রণী হইলেন।[৩] অন্য কোন কারণে নহে। পাঁচালীতে আর একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে কালীয়নাগের যে বিক্রমাদির কথা ভাগবতে ও হরিবংশে আছে, তাহার আভাস পর্যন্ত দাশরথি দেন নাই, কালীয়ের বা তাহার পত্নীদের মুখে একটা কথাও দেন নাই দাশরথি। অক্রূরসংবাদ পালা দুইটিতে যমুনা হ্রদে অক্রূরের কৃষ্ণদর্শন সম্বন্ধে দুই রকম বর্ণনা দিয়াছেন দাশরথি। প্রথম পালাতে আছে,—

দেখে জীবনে জীবের জীবনে
চতুর্ভুজ অনন্ত গুণধারী অনন্তাসনে ॥[৪]

অক্রূরসংবাদ দ্বিতীয় পালাতে :

জলমধ্যে গিয়ে হরি ত্রিভঙ্গ মাধুরী ধরি
অক্রূরে সদয় পীতবাস।[৫]

হরিবংশে কেবল নাগলোকের কথাই আছে, ভাগবতে নাগলোকের কথার পূর্বেই রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন অক্রূর এমন কথা আছে। সত্যভামার ব্রতকে দাশরথি পুণ্যক ব্রত বলিয়াছেন। কিন্তু হরিবংশ মতে পুণ্যক ব্রত

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, কালীয়দমন, পৃঃ ৪৪।

২। ভাগবত ১০।১৫।৪৩-৫২।

৩। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৮ম অধ্যায়।

৪। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৮।

৫। ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ১৮০।

আলাদা, তাহাতে স্বামীদানের বিধি নাই। স্বামী দান করিতে হয় পারিজাত ব্রতে স্বামীকে পারিজাত বৃক্ষে বাঁধিয়া। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পুণ্যক ব্রতে স্বামী-দানের বিধি আছে। কাজেই দাশরথির মিল এইখানে ব্রহ্মবৈবর্তের সঙ্গে।

সত্যভামার ব্রত সম্বন্ধে কাশীরাম দাসেরও অমিল দেখা যায়। কাশীরাম অবশ্য ব্রতের নাম করেন নাই, "ব্রতরাজ" বলিয়াছেন। কিন্তু স্বামীকে দান না করিয়া সে পরিমাণ অর্থ বা স্বামীর ওজনে স্বর্ণদান করা চলিবে এমন ব্যবস্থা কাশীদাসী মহাভারতে নাই। কৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া সত্যভামা মুনির চরণে লুটাইয়া পড়েন এবং তখন নারদ বলেন :

গোবিন্দ তৌলিয়া দেহ আমারে রতন।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রেতে যেমন ॥[১]

সুবর্ণ সংগ্রহের জন্য কুবেরের ভাণ্ডার লুটের কথাও কাশীদাস বলেন নাই। রুক্মিণী আসিয়া যে কৃষ্ণের বিপরীত পাল্লায় তুলসীপত্র দিয়া ওজন করিবার বুদ্ধি দেন, এমন কথারও সমর্থন কাশীদাসে নাই। উপরন্তু কাশীদাস রুক্মিণীকে নারদের পশ্চাদ্‌গামী শ্রীকৃষ্ণের অনুগামিনী করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে তুলসীপাতার কথা বলিয়াছেন উদ্ধব। এই জাতীয় ছোটখাট অমিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দুর্বাসার পারণ প্রভৃতি পালার মধ্যেও আছে।

মনে হয় প্রহ্লাদচরিত্র ও বামনভিক্ষা পালা মূলতঃ ভাগবত হইতে গৃহীত। কিন্তু প্রহ্লাদচরিত্রে প্রহ্লাদের শাস্তির তালিকায় ও ক্রমে দাশরথি শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণ করেন নাই। বোধ হয় কথকের মুখে শোনা কাহিনীই এক্ষেত্রে দাশরথিকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ও কাশীদাসী মহাভারতের সহিতও বধের উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনা নাই, "দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈঃ" ইত্যাদি উল্লেখমাত্র আছে।[২] বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা এই প্রকার,—

…তে সর্পাঃ কুহকাস্তক্ষকান্ধকাঃ।
অদশন্ত সমস্তেষু গাত্রেষ্বতিবিষোলনাঃ ॥[৩]

১। মহাভারত, আদিপর্ব।

২। ভাগবত ৭।৫।৪৩।

৩। বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।১৩৮।

কাশীরামের বর্ণনা :

রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দেয় করিতে দংশন॥
পরম বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে সর্পের বিষ কি করিতে পারে॥[১]

দাশরথির রচনা :

চতুর্ভুজের কৃপায় ভুজঙ্গ না দংশে গায়
ভুজঙ্গ ভূষণ অঙ্গে হল॥[২]

পুনশ্চ, বিষ্ণুপুরাণ :

ততঃ স দিগ্‌গজৈর্বালো ভূভৃচ্ছিখরসন্নিভৈঃ।
পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বিষাণৈরবিপীড়িতঃ॥[৩]

কাশীরামের বর্ণনা :

অংকুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তীগুলো।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলো॥[৪]

দাশরথির রচনা :

ভক্তে না বধিল হস্তী কৃষ্ণের কৃপায়।
নিজ শিশুজ্ঞানে শুণ্ড বুলাইয়া গায়॥[৫]

লক্ষণীয় যে দাশরথির ভক্তির মহিমা অধিকতর। ভগবানের প্রসাদে পশুও স্বভাবধর্ম ভুলিয়া যায়।

বামনভিক্ষা পালাতেও দাশরথির বৈশিষ্ট্য আছে। একটি ক্ষেত্র মাত্র উল্লেখ করি। বামনকে ত্রিপাদভূমি দিতে শুক্রাচার্যের বিরোধিতা প্রবলতর হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলিরাজ পরামর্শ করিবার জন্য স্ত্রীর কাছে ছুটিলেন,

১। মহাভারত, বনপর্ব।
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫৭৯।
৩। বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৭।৪২।
৪। মহাভারত, বনপর্ব।
৫। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬৭৯।

অন্দরের হুকুম না হইলে তিনি কর্তব্য স্থির করিতে পারেন না। "যেথায় আছে বৃন্দাবলী, তথাকারে গিয়া বলি ভার্যারে এ বারতা জানান।"[১]

দাশরথি যে ভাগবতানুগ হইয়া কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহার মূল তাৎপর্য হইতেছে এই যে কথকগণ যে ভাবে ভাগবতের কাহিনী ও বাণী প্রচার করিতেন দাশরথির কৃষ্ণবিষয়ক বর্ণনায় মুখ্যতঃ তাহারই অনুক্রমণ করা হইয়াছে, এবং কৃষ্ণবিষয়ক অন্যান্য কাহিনী দাশরথি গ্রহণ করেন নাই। দানখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, নৌকাখণ্ড পালা বহুদিন হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম লীলা বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। বিষয়ের কিছু বিস্তার বা নামের কিছু পরিবর্তন হইতে পারে, যেমন নৌকাখণ্ড স্থলে নৌকাবিলাস, কিন্তু মূল ধারাটি লোপ পায় নাই। অথচ দাশরথির পাঁচালীতে এই ধারা গৃহীত হয় নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধার নাম নাই, কিন্তু কথকগণ শ্রীরাধার নাম করেন, কারণ রাধাহীন কৃষ্ণের কোন অস্তিত্ব বাঙ্গালাদেশে থাকা সম্ভব নহে। কাজেই রাধার নাম থাকায় দাশরথির পাঁচালী ভাগবতানুগ হয় নাই, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে।

শুধু কাহিনীতে নহে, ক্ষেত্রবিশেষে দাশরথির পাঁচালীর সহিত ভাগবতের সম্বন্ধ-নৈকট্য অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। গোপীগণের বস্ত্রহরণ পালাতে গোপীগণ কৃষ্ণকে শাসাইয়াছে যে তাহারা রাজার নিকট নালিশ করিবে, "সম্ভ্রমের দাবী"[২] অর্থাৎ কিনা মানহানির মামলা দায়ের করিবে। "নোচেৎ রাজ্ঞে ব্রুবামহে"[৩]—এই ধরণের শাসানি ভাগবতেও আছে। বৃন্দেদূতীর কথা ভাগবতে থাকা সম্ভব নহে; কিন্তু উদ্ধবসংবাদ পালা দাশরথি ভাগবত হইতে নিয়াছেন। অক্রূরসংবাদে দাশরথি লিখিত "করে কাটে রজকের শির"[৪]—কথাটি মূল ভাগবতেও দেখা যায়, "রজকস্য করাগ্রেণ শির কায়াদপাতয়ৎ"[৫]। প্রভাসযজ্ঞ পালাতে গৌড় দেশে এক দ্বিজ থাকে

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬১২।

২। দাশথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭৫।

৩। ভাগবত, ১০।২২।১৫।

৪। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৮।

৫। ভাগবত, ১০।৪১।৩৭।

বলিয়া দাশরথি যে গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মূল হয়ত ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮০তম অধ্যায়ের শ্রীদাম উপাখ্যান হইতে বিকৃত ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থল এমন আছে যে তাহা ভাগবতের সরল অনুবাদ বলিয়া মনে হয়।

রমণীগণের মন কামরূপী নারায়ণ
ঋষিগণে দেখে যজ্ঞেশ্বর।
ভোজবংশ দেখে হরি কুলের দেবতা করি
ভক্ত দেখে বিষ্ণু পরাৎপর ॥
ব্রজ রাখালের চিত্র আমাদের রাখাল মিত্র
নন্দ দেখে আমার গোপাল।
পণ্ডিতে বিরাট ভাবে পুত্র ভাবে বসুদেবে
কংস দেখে আইল মোর কাল ॥[১]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক :

মল্লানামশনির্নৃণান্নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড্‌ বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥[২]

দাশরথির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলির সহিত বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীর সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। অনেক পালার মূলও দাশরথি চণ্ডীদাস-প্রমুখদের পদাবলী ও দ্বিজ বিশ্বনাথ প্রমুখ কবিগণ কর্তৃক রচিত "বিদেশিনী হইয়া মিলন", "কৃষ্ণকালী বর্ণন", "কলঙ্কভঞ্জন" প্রভৃতি হইতে নিয়াছেন। অক্রূরসংবাদ পালার একস্থানে পদাংক দূতের প্রভাবও পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।[৩]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮৫।

২। ভাগবত, ১০।৪৩।১৭।

৩। "দৈবে কৃষ্ণের পদচিহ্ন পথমধ্যে দেখিবারে পায়। ধরি সেই চিহ্ন পদে, বলে ফেলিস কি বিপদে—" ইত্যাদি, দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ১১৭।

বাক্যবিন্যাসে, প্রকাশভঙ্গীতে, উপমাদির প্রয়োগে দাশরথি বৈষ্ণবপদকর্তা-দিগের নিকটে স্বাভাবিকভাবেই ঋণগ্রহণ করিয়াছেন। বিরহবিধুরা রাধার বর্ণনার দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিদ্যাপতির পদ :

শরদক শশধর মুখরুচি সোপলক, হরিণক লোচনলীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীক সোপল, পায়ে মনোভব পীলা॥
দশনদশা দাড়িবক সোপলক, বন্ধুকে অধররুচি দেলি।
দেহদশা সৌদামিনী সোপলক, কাজর সম সখি ভেলি॥

দাশরথি লিখিলেন :

নয়নে এসেছি দেখে, নয়নের ভঙ্গী রাধিকে হরিণীকে দিয়েছেন হরি।
গমনের গৌরব অংশ, কিছু পেয়েছে রাজহংস, কিছু দিয়েছেন করীকে
কৃপা করি॥
কণ্ঠের মধুরধ্বনী কোকিলকে দিয়েছেন ধনী, শতদলে দিয়েছেন সৌরভ।
চন্দ্রকে অঙ্গের জ্যোতি দিয়েছেন গুণবতী, গণপতিকে দিয়েছেন গৌরব॥[১]

চণ্ডীদাসের পদ :

নীলকমল ঝামরু হয়েছে মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি নিঙ্গারি নিয়েছে লেহ॥

দাশরথির পদ :

"এমন দরিদ্র নারী ছিল ক্ষুধাভরে। নিঙ্গুরে খেয়েছে সুধা শ্যামসুধাকরে॥"[২] লোচনদাসের : "সবে দুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা রূপ নিরখিব কি ?"[৩] অথবা গোবিন্দদাসের : "দেখিতে দেখিতে এমন মনে লয় ? সমস্ত অঙ্গে যদি নয়ান হয়॥"[৪] প্রভৃতি পদের সহিত দাশরথির : "কোটি আঁখি দিলে বিধি, কিছুকাল ঐ কালনিধি, হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে।"[৫] ইত্যাদি পদের মূল সুর এক।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ২০৮।
২। " " " মানভঞ্জন (১), পৃঃ ১৩১
৩। পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, ১০৫।
৪। ঐ ঐ ঐ ।
৫। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭০।

জ্ঞানদাসের : "রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল"[১]—এই পদের সহিত দাশরথির : "সইলো ডুবিলাম ঐ রূপসাগরে"[২]—এই পদের ভাবসাদৃশ্য পরিষ্কার। এমন অনেক আছে।

রাধা নামটিই দাশরথি বৈষ্ণব পদকর্তাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই রাধার ভাব ও রূপের জন্য যে ঋণ থাকিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। পুরাণের মধ্যে রাধা প্রথম আবির্ভূতা হইলেন ব্রহ্মবৈবর্তে। শ্রীদামের শাপে রাধার জন্ম, শতবর্ষবিরহ, বৃষভানুর কন্যারূপে আবির্ভাব প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্তসম্মত বিষয়। কিন্তু দাশরথি বোধহয় সরাসরি ব্রহ্মবৈবর্ত হইতে গ্রহণ করেন নাই, পদাবলীর মাধ্যমে নিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি সম্বন্ধে প্রচলিত মতানৈক্যের কথাও দাশরথি উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই :

"মতান্তরে এই বাণী যশোদার গর্ভে ভবানী আর গোলকনাথ জন্মিল।
বৈকুণ্ঠের নাথ কোলে, বসুদেব যান যেই কালে, উভয় অঙ্গ একত্র হইল ॥"[৩]

কিন্তু শুধু উল্লেখমাত্র নহে; প্রয়োজনমত বিচার এবং সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন দাশরথি। যথা—

"অংশ যায় দ্বারকায় পূর্ণব্রহ্ম শ্যামকায়
বামে লয়ে রাধিকায় বিরাজেন গোকুলে ॥"[৪]

অথবা,

"নন্দালয়ে জন্মিলেন গোস্বামীদের মতে।
তার কিছু আভাস ব্যাস লিখেন ভাগবতে ॥" ইত্যাদি

লিখিয়া "শাস্ত্রেতে দুই মত ব্যাখ্যা, কোনটা ইহার করি রক্ষা, পরমার্থ তত্ত্ব কিসে রয়" এই সংশয় তুলিয়া শেষে গোস্বামীদের অনুগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। পদামৃতমাধুরী, ১ম, পৃঃ ১০৯।
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৩।
৩। ঐ ঐ ঐ, পৃঃ ১৩।
৪। ঐ ঐ ঐ, পৃঃ ৩২৩।

"কাজ নাই আর কথা অন্য গোকুলেতে নন্দ ধন্য
পূর্ণ রূপে অবতীর্ণ হরি।"[১]

শ্রীচৈতন্যাবতার সম্বন্ধেও দাশরথি গোস্বামীদের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। দাশরথির

শ্রীমতীর যে কত ভাব সে যে ভাব ভবের ভাব
কত যে ভাব কে বলিতে পারে ॥
সেই রাধার ভাবে হয়ে ঋণী শ্রীগৌরাঙ্গ চিন্তামণি
নবদ্বীপে অবতীর্ণ সঙ্গে পরিবার।[২]

এই কথাটি রূপ গোস্বামীর বিখ্যাত শ্লোক : "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদির ছায়া মাত্র। অক্রূরসংবাদে পদাঙ্কদূতের ছায়ার কথা একটু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

রামচরিত বর্ণনায় দাশরথির মূল আদর্শ কৃত্তিবাস হইলেও বিষয় বিস্তারে, চরিত্ররচনায়, বর্ণনানৈপুণ্যে দাশরথির মৌলিকত্ব সুস্পষ্ট। কৃত্তিবাস বর্ণিত কোন কোন ঘটনা তিনি একেবারে বাদ দিয়াছেন, বা বিশদ ঘটনাকে নামমাত্র উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কখনো বা কৃত্তিবাস বর্ণিত কোন সামান্য ঘটনাকে অসামান্য গুরুত্ব দিয়া সবিস্তারে বা নূতনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তিরসের তীব্রতা সঞ্চার করিতে বা হাস্যরস জমাইয়া তুলিতে মধ্যে মধ্যে তিনি নূতন বিষয় যোজনা করিয়াছেন। ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্তিবাসের বিপরীত ঘটনাও দাশরথিতে দেখা যায়। সাধারণভাবে সব রকমের দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিতেছি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভরতমিলন একটি অপূর্ব আবেগ-ঘন-করুণ অধ্যায়। কিন্তু দাশরথি ঘটনাটিকে পরিষ্কার করিয়া বলা তো দূরের কথা, কেবল : "সৈন্যসহ ভরত উন্মাদপ্রায় মন। রাম অন্বেষণে দ্রুত কাননে গমন ॥"[৩] এই একটি শ্লোকে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া গিয়াছেন। পুনশ্চ, হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন কালে কৃত্তিবাস সুরসা সাপিনী ও সিংহিকা রাক্ষসীর কথা বিশদভাবে বর্ণনা

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৫।
২। ঐ ঐ ঐ, পৃঃ ৬২৫।
৩। ঐ ঐ ঐ, পৃঃ ৩৫৯।

করিয়াছেন, কিন্তু এই ঘটনাটিও দাশরথি সমাপ্ত করিয়াছেন একটি মাত্র শ্লোকে।

যায় বীর অতি বেগে, সুরসা সাপিনী আগে
পথিমধ্যে আগুলিল আসি।
তারে করি পরাজয় মুখে বলি রাম জয়
বিনাশিল সিংহিকা রাক্ষসী ॥[১]

অকালবোধন ব্যাপারে কৃত্তিবাস হনুমানের নীলকমল আনয়নের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু দাশরথিঃ "নীলকমল অষ্টোত্তর শত দুর্গাপদে করিয়া প্রদান"[২]—মাত্র এই শ্লোকার্ধ লিখিয়াছেন, দেবীর একটি কমল হরণ এবং শ্রীরামের কমললোচন উৎপাটনের চেষ্টার কথা ইত্যাদির উল্লেখ নাই।

কৃত্তিবাসের দশরথ জানিয়া শুনিয়াই বিশ্বামিত্রের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে রাম, "ধনুর্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ।"[৩] কারণ উক্ত ঘটনার পূর্বেই ইন্দ্র ভরদ্বাজের মারফৎ ধনুক ও অক্ষয় তূণ রামকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর—

মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত।
আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ ॥[৪]

দাশরথি কিন্তু দশরথকে মিথ্যাছলনাদুষ্ট করেন নাই। তিনি যথার্থই জানিতেন যে রাম ধনুষ্পাণি নহেন। তাই নিঃসংশয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। "রাজা কন যদি ধনুর্বাণ ধারণ, আমার দূর্বাদল শ্যামবরণ করে থাকেন দিব এই ক্ষণে।"[৫] কিন্তু নিয়তির, তথা রামেরই চক্রান্তে ঠিক সেই সময়েই কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুইজনে মিলিয়া রাম লক্ষ্মণকে রণবেশে সাজাইলেন। "শুনে হাসেন মনে মনে ভগবান, সুমিত্রে আনি ধনুর্বাণ রাম

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৭৩।
২। ঐ ঐ ঐ, পৃঃ ৪৩৭।
৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।
৪। ঐ ঐ, ।
৫। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩২৮।

লক্ষ্মণের করে আনি দিল।"[১] এইখানে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাবও সুস্পষ্ট। ধনুকধারী রামকে—

কেউ দেখিছে বিশ্বরূপ কেউ দেখিছে কালস্বরূপ
কেউ দেখিছে শান্তরূপ শ্রীরাম।
কেউ দেখিছে বাল্যরূপ কেউ দেখিছে ব্রহ্মরূপ
কেউ দেখিছে অনন্তরূপ অনন্ত গুণধাম ॥[১]

এই শ্লোকটি পূর্বে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের "মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ"—ইত্যাদি শ্লোকের ছায়ামাত্র।[২]

বিবাহবাসরে রমণীগণের রহস্যালাপের প্রাধান্য কৃত্তিবাস হইতে দাশরথি যে বেশি দিবেন তাহাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু রামচন্দ্রের মিথিলাগমনপথে প্রচ্ছন্ন ভক্তিমিশ্রিত হাস্যরসঘন একটি কাঠুরিয়া প্রসঙ্গ দাশরথি জুড়িয়া দিতে ভুলেন নাই।[৩] সীতার সঙ্গে অশোকবনে সাক্ষাৎকালে হনুমানকে সীতা পাঁচটি আম দিয়াছিলেন এবং লোভে পড়িয়া পাঁচটিই খাইতে গিয়া হনুমানের যে কি দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহার বিশদ বর্ণনা দাশরথি করিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস এই সব সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, কেবল কৃত্তিবাসের সীতা "অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ"—বলিয়া হনুকে কিছু ফল খাইতে দিয়াছিলেন।[৪]

কৃত্তিবাসের চিত্রপটে এক-আধটি তুলির টান এদিক ওদিক করিয়া মধ্যে মধ্যে দাশরথি অফুরন্ত হাসির যোগান দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের মতে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কান দুই-ই কাটিয়াছিলেন, কিন্তু দাশরথি স্বৈরিণী শূর্পনখার কান দুইটি বাঁচাইয়া দিয়াছেন। তাই শূর্পনখার শোক: "অল্পেয়ে যদি কান কাটতো, তবু বিধাতা মান রাখতো, কে বা দেখতো, চুলে ঢাকতো, কাটলি কেন নাক রে।[৫]

কৃত্তিবাস কোন কোন কাহিনী যে সব স্থানে শেষ করিয়াছেন, ঘটনা

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩২৯।
২। এই গ্রন্থের ৩৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৩। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৩৬।
৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড।
৫। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৬১।

বিশেষে বিশেষ করিয়া অত্যুক্তি ব্যাপারে, দাশরথি আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া বিচিত্র কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। হনুমান লঙ্কাতে ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহার লেজে আগুন দেওয়া হইবে। কৃত্তিবাসের মতে, প্রথমতঃ ত্রিশ মণ কাপড় জড়াইবার পর হনুমানের ক্রমবর্ধমান লাঙ্গুলকে "লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়। ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবর॥"[১] কিন্তু দাশরথির হনুর লেজে লঙ্কার সকল কাপড়েও কুলাইল না, অধিকন্তু ক্রমশঃ তাহা আরও বড় হইতেছে দেখিয়া নিরুপায় রাবণ বলিলেন :

সীতা যে বসন পরি, আন তাহা পরিহরি, তাহাতে পূরিবে মনোরথ।
হনু এ বচন শুনি, মনে মহাভয় মানি, চিন্তিতে লাগিল নিজ পথ॥[২]

লেজ আর বড় হইল না; চট করিয়া ছোট হইয়া গেল।

এইবার কৃত্তিবাস ও দাশরথির মতানৈক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। রামের বনগমন ব্যাপারে কৈকেয়ীর বুদ্ধিনাশ প্রসঙ্গে দাশরথির মত এই যে কৈকেয়ীর স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাস বলেন : "কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হৈল নাশ॥" এইখানে তুলসীদাসী রামায়ণের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়।

আর একটি চমৎকার কথা আছে দাশরথির মধ্যে। দেবগণ স্তব করিতেছেন :

দশজন্মার্জিত দশবিধ পাপ নিবারণে, দশ অবতার মধ্যে দশানন উদ্ধারণে
দশরথসুত রূপ ধরেছো আপনি।[৩]

দশ জন্মের দশ রকম পাপ নিবারণের জন্য রাম অবতার। ইহার মূল ও তাৎপর্য কি? অবশ্য দশ শব্দটির ব্যবহারে অনুপ্রাসযমকপ্রিয়তার প্রভাবও লক্ষণীয়।

লবকুশের জন্ম সম্বন্ধেও উভয়ের বর্ণনায় অনৈক্য আছে। কৃত্তিবাসের মত : "প্রসব করিল সীতা যমজ নন্দন" এবং "লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে। লবণ মেখে লব হইল, কুশ কুশ মেখে।"[৪] দাশরথির মত : "প্রসব হল পুত্র

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড।
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৮৫।
৩। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৫২।
৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড।

এক পূর্ণচন্দ্রোদয়।" এবং "মনের সুখে মুনি নাম রাখিলেন লব।" পাঁচ বৎসর পর একদা লব মুনির কাছে খেলিতে খেলিতে মুনির অজ্ঞাতে সীতার সঙ্গে জলের ঘাটে চলিয়া যান। ইহাতে লবকে বাঘে খাইয়াছে মনে করিয়া বাল্মীকি "লবাকৃতি করেন এক কুশেতে নির্মাণ"; এবং "কুশায় নির্মিত জন্য নাম রাখেন কুশী।"[১] অবশ্য ইহার কিছুই দাশরথির মৌলিক রচনা নহে; দাশরথি যে সর্বত্রই কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেন নাই, তাহাই বক্তব্য। যে সব স্থলে কৃত্তিবাস বাল্মীকির অনুগমন করেন নাই সে সব স্থলে লিখিয়াছেন: "এসব গাহিল গীত জৈমিনী ভারত।"[২] দাশরথির মধ্যেও এতজ্জাতীয় কথা আছে: "নহে বাল্মীকির কথন, রঘুনাথের রণে পতন, এ বচন জৈমিনীর মতে।"[৩] ছোটখাট মতানৈক্যও আছে। যেমন কৃত্তিবাস মায়াসীতা নির্মাণ করাইয়াছেন বিদ্যুৎজিহ্বকে দিয়া আর দাশরথি করাইয়াছেন বিশ্বকর্মাকে দিয়া। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

ভক্তির অতিপ্রাচুর্য, বিশেষ করিয়া শিবের ঐকান্তিক রামভক্তি বিষয়ে দাশরথির রচনায় অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রামচরিতমানস গ্রন্থের প্রভাব অনুভূত হয়। ভক্তিকে যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিতে পারা যায়, দাশরথি ততদূর পর্যন্ত, বোধ হয় ততোধিক করিয়াছেন। তরণীসেনের কথা কৃত্তিবাসসম্মত। রাবণের প্রচ্ছন্ন ভক্তি দাশরথি প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন। কৃত্তিবাসের কঠিনহৃদয় রাক্ষস মহীরাবণের গলায়ও দাশরথি ভক্তের কণ্ঠী পরাইয়া দিয়াছেন। অন্যে পরে কা কথা, এমন যে তাড়কা রাক্ষসী তাহার মুখেও দাশরথি এই কথা দিয়াছেন: "...হারায়েছি বুদ্ধি বলে নিরখিয়ে ও চাঁদবদন। আর দেখেছি চমৎকার, দূর হলো মনের বিকার...।"[৪] নিঃসংশয়ে ইহা ঈশ্বরদর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু কৃত্তিবাস এতদূর যাইতে পারিতেন কি? অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাব ও বাল্মীকির সরল অনুবাদও আছে স্থানে স্থানে। যেমন যথাক্রমে: "শতস্কন্ধ সংগ্রামে, তুমি বাঁচাইলে রামে, অসিধরা তারামূর্তি

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৬৩।

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড।

৩। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৭২।

৪। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৩১।

হয়ে।"[১] এবং "ভার্যা গেলে ভার্যা হয়, রাজ্য গেলে রাজ্য হয়, সহোদর মেলে না তিন লোকে।"[২]

শিবশক্তিমূলক পালার মধ্যে দক্ষযজ্ঞ পালার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের দক্ষযজ্ঞ পালার আশ্চর্য মিল আছে। দাশরথির মৌলিক ও typical অংশগুলি যথা, সতীর ভগ্নীদের কৈলাসে গমন ও শিবের সহিত সাক্ষাৎ, কুবেরের উপাখ্যান, ভূতের ভাঁড়ামি প্রভৃতি বাদ দিলে দাশরথির দক্ষযজ্ঞ পালার গঠন ও বিন্যাস মোটামুটি ভাগবতানুগ। কোন কোন স্থানকে একেবারে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। যথা ভাগবতের সতী বলিতেছেন: "অনাহূতা অপ্যভিযন্তি সৌহৃদং ভর্তুর্গুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্।"[৩] দাশরথির সতীর উক্তি: "ভৃত্যগুরু শ্বশ্রূপিতা, নিকটেতে অনাহূতা, গমনে নাহিক প্রতিবন্ধ।"[৪] অথবা দক্ষের প্রতি সতীবাক্য: "...তদ্ব্যহং ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্।"[৫] ইত্যাদির সহিত—"না রাখিব তোমার উৎপত্তি কলেবর।"[৬] ইত্যাদির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বৈসাদৃশ্যও আছে। কাহার অভিশাপে দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল সে সম্বন্ধে দাশরথির মত: "যে মুখে করিল শিবনিন্দা প্রজাপতি। সে মুখ হইবে অজ শাপ দিলেন সতী।"[৭] ভাগবতের মত: "...নন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ। দক্ষায় শাপং বিসসর্জ দারুণম্"[৮]—ইত্যাদি। পালার শেষ আবার একপ্রকার। দাশরথি লিখিতেছেন:

> "হেথা হেমগিরি ঘরে জন্ম নিলা সতী।
> শিবধ্যান ভঙ্গ করি দিলা রতিপতি ॥

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৯৭।
২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৪১২।
৩। ভাগবত, ৪।৩।১৩।
৪। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৭৮।
৫। ভাগবত, ৪।৪।২৩।
৬। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৮২।
৭। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৪৮৫।
৮। ভাগবত, ৪।২।২০।

নারদ দিলেন শিব বিভা সতী সঙ্গে।
সতী লয়ে কৈলাসে গেলেন ভব রঙ্গে ॥"[১]

ভাগবতে :

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্বকলেবরম্।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম ॥
তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙক্তে পতিমম্বিকা।
অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পুরুষম্ ॥[২]

দাশরথির কাশীখণ্ডাদি পালার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য স্কন্ধপুরাণের সহিত ততটা নাই, যতটা আছে লৌকিক ও প্রচলিত ধারণার সহিত। পার্বতী-পরিণয়ে মদনভস্ম, উমার তপস্যা প্রভৃতি ঘটনার আভাস পর্যন্ত দাশরথি দেন নাই। দক্ষযজ্ঞ পালাতে শিব তপস্যা ভঙ্গের কথা মাত্র একটি লাইনে আছে : "শিব-ধ্যান ভঙ্গ করি দিলা রতিপতি।" কুমারসম্ভবের কাহিনী কালিদাস পুরাণ হইতে নিয়াছেন এবং তারপর সকলেই মূলতঃ কালিদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু দাশরথির রচনাতে তাহার আভাস পর্যন্ত নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে কুমারসম্ভব ও তারকাসুরবধ দাশরথির প্রতিপাদ্য নহে, তাঁহার বক্তব্য হইতেছে হরপার্বতীর মিলন ঘটান এবং এই মিলনের পটভূমি হইতেছে আমাদের সমাজ। কাজেই ঘটকের আগমন, মেয়ে দেখা প্রভৃতির দরকার হইয়াছে।

আগমনী প্রভৃতি পালাতে রামপ্রসাদের প্রভাব স্পষ্ট। মেনকার স্বপ্নদর্শন মামুলী পালার অনুস্থতি মাত্র। কবিগানের আগমনী সঙ্গীতের সহিত দাশরথির আগমনী গানের ভাব ও ভাষার মিল আছে। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে আগমনীর বিষয়-বস্তু ও তাহার ঢং অনেকটা একঘেয়ে ও মামুলী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আবেগের গভীরতার তারতম্য আছে।

লৌকিক শিবঠাকুরের সহিত দাশরথির শিবের পার্থক্য সুস্পষ্ট। "কৃষি দেবতা" শিবের প্রসঙ্গ একেবারেই দাশরথি উল্লেখ করেন নাই। সমগ্র

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৮৫

২। ভাগবত, ৪।৭।৫৮-৫৯।

পাঁচালীর মধ্যে: "লয়ে কুচনী যুবতী ভোলা হয়ে থাক ভোলা"[১]—ইত্যাদি মাত্র একটি ক্ষেত্রে কুচনী প্রসঙ্গ আছে; আর কুত্রাপি নাই। দাশরথির শিব দরিদ্র বটে, কিন্তু ভদ্র গৃহস্থ। গঙ্গা ও দুর্গা দুইটি স্ত্রী লইয়া তাঁহার বিড়ম্বনার অন্ত নাই কিন্তু অন্য নারীর প্রতি তিনি কোন আকর্ষণ বোধ করেন না।

হরগৌরী প্রসঙ্গে দাশরথি কয়েকটি ক্ষেত্রে চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছেন। পুনরুক্তি হইলেও উল্লেখ করিলাম। দুর্গার দশভুজা হইবার কারণ কি? না,

পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বরমালা।
গিরিপুরে দশভুজা হন দুর্গে গিরিবালা॥[২]

কালী চতুর্ভুজা ও উলঙ্গিনী কেন?

কে আছে হেন জঞ্জালি, অন্নাভাবে অঙ্গ কালী, বস্ত্রাভাবে হইলাম উলঙ্গিনী।
দেখিয়া দরিদ্রঘর, ঘুচাইলাম দশ কর, চারি হস্ত এক্ষণেতে ধরি।
হয়ে কুলের কুলবালা, ঘুচাতে জঠরজ্বালা, দৈত্য কেটে রক্ত পান করি॥[৩]

কমলেকামিনী পালা যে দাশরথি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাহিনী হইতে নিয়াছেন, তাহা প্রারম্ভেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তবে বর্ণনার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

শুম্ভনিশুম্ভ বধ ও মহিষাসুর বধের শেষাংশ মূলতঃ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে লওয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেকটা একেবারে অনুবাদেরই মত। একটু উল্লেখ করি।

ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥
সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ॥
কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা॥

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৮৭।
২। ঐ ঐ ঐ, পৃঃ ৫১৩।
৩। ঐ ঐ ঐ, পৃঃ ৪৯০।

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥[১]

দাশরথি লিখিয়াছেন :

দুর্গা ভগবতী ভদ্রা শুনে এই বাণী।
ত্রিলোক জননী তিনি জগদুদ্ধারিণী ॥
অন্তরে ঈষৎ হাস্য করি কন দূতে।
যে কহিলে সত্য সত্য বুঝিলাম চিতে ॥
পূর্বে এক প্রতিজ্ঞা করেছি নারী বুদ্ধে।
যে জন জগতে মোরে জিনিবেক যুদ্ধে ॥
বলক্ষয় পরাজয় পাব যার কাছে।
সেই ভর্তা ভবিষ্যতি এই পণ আছে।[২]

কিন্তু মহিষাসুর বধের প্রথম অংশ পুরাণান্তরের যোজনা। দাশরথি মহিষাসুরের পিতার নাম লিখিয়াছেন জম্ভাসুর। কিন্তু কালিকাপুরাণ মতে নামটি রম্ভাসুর। ঘটনাবিস্তারও অন্য রকম।

দাশরথির মৌলিক রচনা "অপর প্রসঙ্গ" মুখ্যতঃ "রসিক রঞ্জন রস রঙ্গ"—হইলেও বিবৃতি ও ফলশ্রুতির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে খানিকটা প্রভেদ আছে। এক শ্রেণীর মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ভাব লইয়া বিচার : বিধবাবিবাহ, কর্তাভজা, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণী মূলতঃ রসরচনা, যেমন বিরহ, নলিনীভ্রমর প্রভৃতি পালা।

"বিধবাবিবাহ" ও "কর্তাভজা" এই দুইটি সমসাময়িক বিষয়ের মধ্যে একদিকে রক্ষণশীল মনের কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যদিকে "শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব" পালার মধ্যে তৎকালীন হিন্দুসমাজের সমন্বয়মুখিতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্বক্ষেত্রে যে সবই এক ও অদ্বৈত এই কথা আমাদের দেশে নূতন নহে। বহু দেবতার আরাধনা ও কালক্রমে শৈবাদি পঞ্চধর্মশাখার মধ্যে কলহ ও প্রতিযোগিতার ইতিহাসও অনেক দিনের। বাঙ্গালা দেশে শিব শক্তি ও

১। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৫।১১৫-২০।

২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫৫৮।

বিষ্ণু এই তিনটি দেবতাই প্রধান স্থান নিয়াছিলেন।[১] লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তত্ত্বের এই উচ্চ আকাশের সহিত সাধারণ বিশ্বাসের নিম্নভূমির একটি আশ্চর্য মিল ছিল। সাধারণ মানুষ অতি সহজে এই ঐক্য ও অদ্বৈতকে মানিয়া নিত। "একে তিন, তিনে এক"—এই ধরণের কথা বা হরিহর, হরগৌরী প্রমুখ মূর্তি কল্পনার মধ্যে এই সমন্বয় ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে সাধু, ফকির, বাউল, দরবেশ, শিবতলা, দরগাখোলা প্রভৃতির উপর ইহা সমদৃষ্টিতে প্রসারিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদে যেই কালী সেই কৃষ্ণের কথা আছে। কবিগানে পালার গঠনে দেবী বিষয়ক ও সখী সংবাদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সমন্বয়মুখিতা সুস্পষ্ট। দাশরথির শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মধ্যে এই মনোভাবটিই সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

রসরঙ্গের মধ্যে নলিনী-ভ্রমর পাঁচালী বিখ্যাত তথা কুখ্যাত। ভ্রমর ও নলিনীকে নায়কনায়িকা রূপে বর্ণনা করা সংস্কৃত কাব্যের প্রাচীন রীতি। হয়ত ইহার মূলে উপমা অলঙ্কার থাকিবে। এইপ্রসঙ্গে ভট্টিকাব্যের এই শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য :

প্রভাতবাতাহতকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাসভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীসংসহতেঽন্যসঙ্গমম্॥ ২।৬

কবিগানের মধ্যেও নলিনী-ভ্রমরের কথা আছে ব্যর্থপ্রেমের, বিশেষতঃ পুরুষের প্রতারণা সম্বন্ধে। রাম বসুর একটি গীত এই প্রকার :

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ।
কহ অলিরাজ সবিশেষ, কেতকী সৌরভ অঙ্গে অশেষ॥
রজ লেগেছে কাল গায়, হয়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি, রূপের না দেখি শেষ॥[২]

নলিনী-ভ্রমরের কাহিনীর ইঙ্গিত এইখানে পরিষ্কার মনে হয়।

নিধুবাবুর টপ্পা গানে নলিনী-ভ্রমর সম্বন্ধে অনেকগুলি পদ আছে।

১। এই সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা আছে।

২। সঙ্গীতসার সংগ্রহ, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬৩।

কোনটি ভ্রমরের প্রতি ধিক্কার, কোনটি কেতকী সম্বন্ধে শ্লেষ, কোনটি আবার নলিনীর প্রেমনিষ্ঠাসূচক। আর একটি বিষয় আছে। নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়িকা প্রেমের এই ত্রিকোণ সূত্রটি কবিগানে, টপ্পাগানে, এমন কি সংস্কৃত শ্লোকেও দেখা যায়। ভ্রমর নায়ক, নলিনী নায়িকা, প্রতিনায়িকা কেতকী। যথা—

অপসর মধুকর দূরং পরিমলবহুলেঽপি কেতকীকুসুমে।
ইহ নহি মধুলবলাভো ভবতি পরং ধূলিধূসরং বদনম্‌॥[১]

পূর্বে রাম বসুর গীতে "কেতকীসৌরভ অঙ্গে অশেষ" উল্লেখ করা হইয়াছে। নিধুবাবুর টপ্পায়ও "কেমনে এলে অলিরাজ, এলে ত্যজিয়ে কেতকিনী"—এমন পদ আছে।[২] দাশরথির পাঁচালীতে এই সূত্র পূরাপূরি অনুসৃত হয় নাই। ভ্রমর এইখানে লম্পট, বহু ফুলের মধুর পিয়াসী। কেতকীর উল্লেখ আছে বটে কিন্তু বিশিষ্ট প্রতিনায়িকা সম্বন্ধে তাহার কোন মর্যাদা পাঁচালীতে নাই।

পুরুষ ও নারীর দ্বন্দ্ব, চার ইয়ারী কথা বা কলিরাজার উপাখ্যান প্রমুখ পালাগুলিতে পুরুষ ও নারীর কথা লইয়া মুখ্যতঃ তর্জা গাওয়া হইয়াছে। বিরহ পালাগুলিতেও কবিগানের বিরহ বিষয়ের চিরাচরিত প্রয়োগ পদ্ধতি অনেকখানি অনুসৃত হইয়াছে। বসন্তের পটভূমিকায় বিরহজ্বালার বিচিত্র বর্ণনা ইহার মুখ্য বস্তু। বসন্ত ঋতুর নানা অবস্থা, কোকিল প্রভৃতি ইহার অপরিহার্য অঙ্গ। ইহার মধ্যে নানা টাইপ ও বিচিত্র নকসা আছে, কলিকাতার একধরণের বাবুদের ও বৈরাগীবোষ্টমদের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ আছে।

দাশরথির সমসাময়িকদের মধ্যে মোটামুটিভাবে রাম বসু, সাতু রায়, ভোলা ময়রা, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিওয়ালা; নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, কালীপ্রসাদ ঘোষ, আশুতোষ দেব প্রভৃতি টপ্পাকারগণ; গোবিন্দ অধিকারী, ব্রজ রায়, রূপচাঁদ পক্ষী, গোপাল উড়ে প্রমুখ যাত্রাওয়ালা; ঢপওয়ালা মধুসূদন কিন্নর; ঠাকুরদাস দত্ত, রসিক রায়, ব্রজ রায় প্রভৃতি পাঁচালীকারগণ এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১। উদ্ভট, তৃতীয় প্রবাহ, ১৯১ শ্লোক।

২। সঙ্গীতসার সংগ্রহ, ২য় ভাগ পৃঃ ১৪৫।

কবিগানের সহিত পাঁচালীর বিশেষতঃ দাশরথির যোগসূত্র কোথায় তাহা পূর্বে সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। নিধুবাবু ও অন্যান্য টপ্পাকারগণের সহিত দাশরথির মূল পাঁচালীর কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। নিধুবাবুর টপ্পাকে দাশরথি যে খুব সুনজরে দেখিতেন না, তাহার প্রমাণ পাঁচালীতে আছে। কিন্তু রসরঙ্গমূলক বিরহ, নলিনী-ভ্রমর প্রমুখ মৌলিক পালার কোন কোন গানে টপ্পার প্রভাব সুস্পষ্ট। একটি উদাহরণ দিতেছি।

সখি রে সহিব কত বিরহ যাতন।
হব হত জানিয়াছি মনে এখন॥

প্রেমিক প্রণয় ধনে,	জীবনের সার গনে
মীন বারি বিহনে	প্রাণেতে বাঁচে কখন।
গিয়েছি জন্মের তরে	দারুণ জ্বালা অন্তরে
হৃদয় সদা বিদরে	মরি এখন॥[১]

ভাবে ও রূপে দাশরথির এই গীতটি চমৎকার একটি টপ্পা।

যাত্রাগানের চাল আলাদা। তবে পাঁচালীর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালায়, বিশেষতঃ মাথুর পালায় বৃন্দেসখীর যে অসাধারণ প্রাধান্য দেখা যায়, উহার সহিত কৃষ্ণ যাত্রার সখীর প্রাধান্য তুলনীয়। মধুসূদন কিন্নরের ঢপ কীর্তনের চারিটি পালা মুদ্রিত হইয়াছে—কলঙ্কভঞ্জন, অক্রূরসংবাদ, মাথুর, প্রভাস। দাশরথির পাঁচালীতে এই সবগুলি পালাই উক্ত হইয়াছে। ঢপ ও পাঁচালীর গঠনরীতি আলাদা কিন্তু ভাব ও বিষয়-বিস্তারের মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কলঙ্কভঞ্জন পালায় ছিদ্রকুম্ভে জল আনিবার সময় শ্রীমতীর গীত: মধু কানের ঢপকীর্তনে

এই কি তোমার মনে ছিল দয়াময়।
একে কলঙ্কিনী, আজ না জানি কপালে কি হয়॥
গেছে কুল তায় হয়েছি ব্যাকুল,
হেসেছে নারীর কুল গোকুল

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, বিরহ (২), পৃঃ ১৬৩৮

আরও যায় যে একুল ওকুল
বল হে দাঁড়াব কোথায় ॥
অই কুম্ভ করিলাম কক্ষে কর রক্ষা দাসীর পক্ষে
কৃপা করে হের চক্ষে এ দুঃখের সময় ।
যদি দয়া না হয় ভাগ্যে আসিব না তোমার অগ্রে
করিলাম এই প্রতিজ্ঞে, জন্মের মত হলেম বিদায় ॥[১]

দাশরথির পাঁচালীতে :—

এখন যা করহে ভগবান ।
ছিদ্র ঘটে বুঝি বিপদ ঘটে হরি
কিন্তু আনতে যদি নারি এই বারি
তবে এইবারই ওহে দুঃখহরি
বারিতে ত্যাজিব প্রাণ ॥
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব
প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব
দাসীরে প্রসন্ন হও হে মাধব
কুম্ভে হও অধিষ্ঠান ॥
শংকা এই কৃষ্ণ নামে হয় নিন্দে
ভাসাইলে দুঃখিনীরে নিরানন্দে
করলে বুঝি নাথ চরণারবিন্দে
স্থান দিয়ে অপমান ॥[২]

পুনশ্চ : ঢপ কীর্তনে অক্রুরসংবাদ পালাতে রাধার প্রতি ললিতা :—
রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে ।
মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না জানি কার সনে ॥
কেন গাঁথা চিকনমালা, ছেড়ে যাবে চিকনকালা
শেষে কেবল ওই মালা, জপমালা হবে মনে ॥

১ । পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত মধুসূদন কিন্নরের ঢপকীর্তন, ১৩৪৩, পৃঃ ৫০ ।
২ । দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১২৫ ।

মালা হেরে হবে জ্বালা, মরবি প্রাণ জলে
শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে,
কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হবে বনে মালা
মথুরায় সব চাঁদের মালা, মতির মালা দিবে এনে ॥[১]

দাশরথির পাঁচালীতে অক্রূরসংবাদে রাধার প্রতি বৃন্দা :—

প্যারি কার তরে আর গাঁথ হার যতনে।
গলার হার কিশোরি আরাধনের ধন তোমার চিন্তামণি
সে হার হারালে, হা রাই, কি শুন নাই শ্রবণে।
এক জন অক্রূর নামে সে যে সাধুর মূর্তি সেজে
কংসের দূত এসেছে বৃন্দাবনে।
দস্যুবৃত্তি করে হরে লয়ে যায় তোমার সর্বস্ব ধন
আমরা দেখে এলাম রথে তুলেছে রতনে ॥[২]

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাস প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রার শ্রেণীতে পড়ে। কীর্তন গানের ঢং হইলেও বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে উহা গীত হয়। কাজেই রীতির দিক দিয়া দাশরথির পাঁচালী পদ্ধতির সহিত উহার সাদৃশ্য কম। কিন্তু অনুপ্রাস যমকাদির বাহুল্য, ভক্তির প্রাধান্য বর্ণনা প্রভৃতি ব্যাপারে দাশরথির পাঁচালীর সহিত উহার একটা রূপগত ও ধর্মগত মিল আছে। কৃষ্ণকমল নিজে বৈষ্ণব গোস্বামী ও পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাধা ক্ষণে ক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদকে স্মরণ করাইয়া দেয়, সখীরাও চৈতন্য-পার্ষদগণের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠেন। কৃষ্ণকমলের রচনা অধিকতর বিদগ্ধ এবং শব্দের চয়ন ও যোজনা অধিকতর সতর্ক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কৃষ্ণকমলের দিব্যোন্মাদে মথুরায় দূতী হইয়া গিয়াছেন বৃন্দা নহে, চন্দ্রা। চন্দ্রা ৪০টি চরণযুক্ত সুদীর্ঘ একটি গীতে রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তাহার খানিকটা উদ্ধার করিতেছি :—

সুধা সুধা সুধামুখী রাধার কথা সুধাও কি
আর ব্রজ সুধাকর আমায়।

১। শ্রীপাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত মধুসূদন কিন্নরের ঢপকীর্তন, ১৩৪৩, পৃঃ ৮৫।
২। দাশরথির উক্ত পাঁচালী, পৃঃ ১৬৩।

কইতে তার দুখ, মুখ হয় মূক
মনে হলে রাধার বিমুখ,
বঁধু বলব কি আর দুঃখে বুক ফেটে যায়।
হেমকমলিনী হয়েছে মলিনী
দিনমণি বিনে যেন কমলিনী
সে যে নিরপরাধিনী চিরপরাধিনী
প্রেমে পরাধিনী, বঁধু হে
তবে কি অপরাধিনী হত তব পায়॥ ইত্যাদি[১]

দাশরথির বৃন্দের উক্তি:

হরি প্যারী পড়ে ধরাসনে।
ওহে ব্রজরাজ, কি সুখে বিরাজ কর তুমি রাজসিংহাসনে॥
সুবর্ণবরণী রাজকুমারীর
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবরণ শরীর
কব কি যাতনা তব কিশোরীর
আছ কি শরীর বেঁধে পাষাণে॥
নব নব নারী করিছ সোহাগ
রাগে মরি তব দেখে অনুরাগ
কিসের অঙ্গরাগ, কিসের অনুরাগ
সকলি বিরাগ কিশোরী বিনে॥[২]

দাশরথি ও ঈশ্বর গুপ্ত দুইজনের মধ্যে অনেকখানি মিল আছে। দুই জনই আদর্শের দিক দিয়া রক্ষণশীল, প্রকাশভঙ্গি দুইজনেরই শ্লেষাত্মক, দুইজনের রচনাতেই প্রধাণতঃ অনুপ্রাস যমকাদির প্রাধান্য। উভয়ের প্রতিভাই মুখ্যতঃ সাংবাদিকের, প্রচারধর্মী, অসহিষ্ণু এবং কাজেই ক্ষেত্রবিশেষে আক্রমণাত্মক। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দাশরথির প্রধান পার্থক্য মেজাজের দিক দিয়া; ঈশ্বর-গুপ্ত যুক্তিবাদী, আবেগবিগলিত নহেন। দাশরথির যুক্তি আবেগের

১। কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী, ডাঃ দীনেশ সেন সম্পাদিত, ১৩৩৫, পৃঃ ১৫৭।
২। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ২১৪।

অধীন, ঈশ্বর গুপ্তের যুক্তি আবেগ-নিরপেক্ষ। ঈশ্বর গুপ্ত জ্ঞানপ্রধান, দাশরথি ভক্তিপ্রধান।

পাঁচালীকারদিগের মধ্যে রসিক রায় ছিলেন দাশরথির চৌদ্দ পনর বৎসরের ছোট ও সমসাময়িক সুহৃদ। রসিক রায়ের এগার খণ্ড পাঁচালী প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পাঁচালী ছাড়াও তিনি অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাঁচালীর ঢং অধিকতর সতর্ক, লেখায় শুদ্ধতা ও পাণ্ডিত্য অধিক। রসিক রায়ের বিষয়বস্তুর সীমাও দাশরথির পাঁচালীর বিষয় হইতে খানিকটা বিস্তৃত।

ব্রজমোহন রায় ছিলেন দাশরথির প্রায় পঁচিশ বৎসরের ছোট। দাশরথির মৃত্যুকালে ব্রজমোহন ২৬।২৭ বৎসরের যুবক। কাজেই তাঁহাকেও সমসাময়িক বলাতে বাধা নাই। ব্রজমোহন পাঁচালী ও যাত্রা দুইই লিখিয়াছেন এবং নিজে দল চালাইয়াছেন। পাঁচালী রচনার ঢং দাশরথির ছাঁচে হইলেও ব্রজমোহনের রচনায় ছন্দের স্খলন ও পদব্যবহারের ত্রুটি অনেক কম, ভাষারীতিও অনেকখানি সাধু-ঘেঁষা এবং প্রকাশভঙ্গী অধিকতর সতর্ক। বিষয়বস্তুও বিচিত্র। নকসা ও রসরচনার দিকে ব্রজ রায়ের আগ্রহ লক্ষণীয়। তাঁহার প্রকাশিত মোট ৩২ খানি পাঁচালীর মধ্যে ১৯ খানি পুরাণাদিসম্মত, একখানি গৌরাঙ্গচরিত, ১২টি নকসা ও রসরঙ্গ। নকসার মধ্যে বাবুদের কীর্তি, কুলীনের কীর্তি, ইয়ং বেঙ্গল, ডিউক আগমন প্রভৃতি নূতনত্বের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুরদাস দত্ত দাশরথির সমসাময়িক; দাশরথি মাত্র চার-পাঁচ বৎসরের ছোট। তিনিও যাত্রা ও পাঁচালী দুইই রচনা ও গাহনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুরদাস রচিত কোন মুদ্রিত পালা পাওয়া যায় নাই।

ইহা ছাড়া নন্দ রায়, কৃষ্ণধন দে, সীতারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যাঁহাদের মুদ্রিত পাঁচালী পাওয়া যায়, সকলেই দাশরথির পরবর্তী।

ঠ

উপসংহার

এইবার আলোচনার উপসংহারে আসা যাউক। এই সুদীর্ঘ অধ্যায়ে দাশরথির ভাষা, ছন্দ, অলংকার, রস, অশ্লীলতা, বিষয়বস্তু-বিন্যাস ও প্রয়োগ-পদ্ধতি, ছড়া, গান, পালার চরিত্রসমূহ, কাহিনীর উৎস ও সমসাময়িকদের সহিত সম্পর্ক বিচার এই কয়েকটি শিরোনামায় মোটামুটি দাশরথির পাঁচালী আলোচনা করিয়াছি। স্থানকালপাত্রের পটভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন থাকার যে সতর্কবাণী অধ্যায়ের উপক্রমণিকায় উচ্চারণ করিয়াছিলাম, উপসংহারেও তাহাই স্মরণ করিয়া শেষ কথা বলিব।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে এই যে, আমাদের মধ্যে সাহিত্য বিচার ও বিশ্লেষণের কয়েকটা দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, একান্ত ভাবে সেগুলিকে ত্যাগ করা যেন সম্ভব হইতে চাহে না। দাশরথিকে বিচার করিতে গিয়া আমরা যেন অনেকটা অজ্ঞাতেই সাহিত্য সংস্কারের মানদণ্ড কিছু পরিমাণে ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছি; ছন্দ, অলংকার, রস, অশ্লীলতা প্রভৃতির আলোচনা অনেক খানি তাহারই নিদর্শন। পুরাণরসপয়োধি, ধর্মপ্রচারধৃত ব্রত-পাঁচালীর বিচার যে উহার সামগ্রিক রস আবেদনের সার্থকতার মধ্যেই করিতে হইবে তাহা বার বার স্মরণ করিয়াও বিশ্লেষণাত্মক বিচারে আমাদের জানা সংস্কারলব্ধ সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতি কিছুটা ব্যবহার না করিয়া যেন পারি নাই।

মধুসূদনের কাব্যরাজির বিখ্যাত সমালোচক দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন: "১২৬৭ সালে নূতন ছন্দে, নূতন তালে বজ্রগম্ভীর নিনাদে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনী পতাকা উড়াইয়া মধুসূদন এই নবযুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ইহারই ঠিক তিন বৎসর পূর্বে দাশরথির মৃত্যু হয়, সুতরাং তিনিই খাঁটি বাঙ্গালী শেষ কবি।"[১] 'খাঁটি' কথাটির তাৎপর্য বোধ হয় ইংরেজী-প্রভাববর্জিত। কাজেই যে বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরেজী প্রভাব সংস্পৃষ্ট বা পুষ্ট নহে; তাহারই আলোকে দাশরথির পাঁচালী বিচার করা সঙ্গত।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, সমালোচনা পৃঃ ২০

পাঁচালী প্রচারপ্রধান সাহিত্য। প্রচার এক্ষেত্রে হইতেছে প্রচলিত ধর্ম-মহিমা কীর্তন ও ধর্মাচরণমূলক কর্মের প্রতি লোকের চিত্তাকর্ষণ করা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন ছিল ধর্ম। লোকশিক্ষা ছিল ধর্ম-শিক্ষার নামান্তর মাত্র। তাই দাশরথি লোকশিক্ষার কবি।

দাশরথি কোন শ্রেণীবিশেষের কবি ছিলেন না, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই তাঁহার উৎসাহী শ্রোতা ছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ জনকবি। অনুপ্রাসাদির অলংকারমণ্ডিত শ্রুতিমধুর সুনির্বাচিত শব্দ আহরণ করিয়া সম্পূর্ণ স্বদেশী পাঁচালীর সাতনরী হার গাঁথিয়া, তিনি বঙ্গভারতীর গলায় পরাইয়াছেন। সরস, সরল, প্রসাদগুণযুক্ত তাঁহার রচনা একই সঙ্গে মূর্খ চাষী ও নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায়দিগকে তৃপ্ত করিয়াছে। অলংকৃত হইলেও তাঁহার পাঁচালী কোথাও ভারাক্রান্ত, দুর্বোধ্য ও কুটিল হইয়া উঠে নাই। এই জন্যই উত্তর কালে খানিকটা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইলেও তাঁহার সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কিন্তু দাশরথির পাঁচালীর অনাদর করেন নাই।

দাশরথির বহুমুখী অভিজ্ঞতা বিস্ময় উৎপাদন করে। সম্পাদক হরিমোহন যথার্থই বলিয়াছেন: "পাঁচালীর পালায় তিনি (দাশরথি) যখন কবিরাজী কথা বলিতেছেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি একজন অভিজ্ঞ কবিরাজ; তিনি যখন জমিদারী সেরেস্তার কথা বলিতেছেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় একজন পরিপক্ক নায়েব; যখন তিনি অন্দর মহলের কথা বলিতেছেন, তখন মনে হয় তিনি একজন বর্ষীয়সী গৃহিণী"।[১]

শুধু বর্তমান সাহিত্যের বিচারেই নহে, প্রাচীন সাহিত্যের বিচারেও দাশরথির পাঁচালী সর্বাংশে ত্রুটিহীন বলা যায় না। হওয়া সম্ভবও নহে। বিশেষতঃ নূতন পদ্ধতির পাঁচালী একটি বিশিষ্ট ধরণের সাহিত্য এবং এ সম্বন্ধে পূর্বে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। কাব্যবিনোদ চন্দ্রশেখর কর মহাশয় দাশরথির প্রতিভা বিচার করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন: "বস্তুতঃ দাশরথি অসামান্য প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি গ্রাম্যকবি ছিলেন। বিদ্যার অভাবে, সময়ের প্রভাবে তাঁহার

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৭।

সমস্ত কবিতা মার্জিত অথবা মার্জিতরুচির অনুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে সর্বত্রই রসে পরিপূর্ণ এবং বহুস্থলেই যে উহাতে শব্দের মাধুর্য, অর্থের চমৎকারিত্ব, উভয়ই আছে; তাহা অস্বীকার করা যায় না। শব্দচয়ননৈপুণ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই"।[১]

এই মন্তব্যটির মধ্যে জনকবি দাশরথির কবিপ্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ, অপকর্ষের হেতু ও উৎকর্ষের সীমা অতি সংক্ষেপে ও নিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দাশরথি প্রথম শ্রেণীর কবি ও চরিত্রস্রষ্টা নহেন কিন্তু অতি উচ্চ স্তরের নক্সাকার। তাঁহার প্রতিভা খাঁটি বাঙ্গালীর প্রতিভা। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন: "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইঁহারা সকলেই কবিত্বে তাঁহার (ঈশ্বর গুপ্তের) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও শ্রেষ্ঠ। ... ... কিন্তু তাঁহার (ঈশ্বর গুপ্তের) যাহা আছে, তাহা আর কাহারো নাই। আপন অধিকারের ভিতরে তিনি রাজা।"[২]

দাশরথির সম্বন্ধেও এই মন্তব্যটি প্রযোজ্য। পাঁচালীর পরিবেশে খাঁটি বাঙ্গালী জনকবি রূপে দাশরথির যে প্রতিষ্ঠা ও অধিকার অর্জন করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। সমালোচক চন্দ্রশেখর কর মহাশয় লিখিয়াছেন: "দাশরথির রচনা উত্তম ধানের টাটকা মুড়কী। উহার সর্বাঙ্গ খাঁটি গুড় রূপ রসে মাখা। কিন্তু উহা লুচী নহে।"[৩] এই দৃষ্টিকোণ হইতেই দাশরথির পাঁচালী বিচার্য ও আস্বাদ্য।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, অভিমত সংগ্রহ, পৃঃ ৮।
২। ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব প্রবন্ধ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
৩। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, অভিমত সংগ্রহ, পৃঃ ৮।

পঞ্চম অধ্যায়

পাঁচালীতে উনবিংশ শতকের পরিচয়

দাশরথি একশত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। পাঁচালীতে তিনি নিজের দেশের ও কালের নানা বিবরণ এবং বস্তু, আচার আচরণ প্রভৃতির বিচিত্র পরিচয় প্রচুরভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতকের বস্তুপরিচয় ও সমাজচিত্র আমরা নানা সাহিত্য ও অন্যান্য উৎস হইতে পাইয়া থাকি। পাঁচালীও যে এই জাতীয় সংগ্রহের একটি মূল্যবান ভাণ্ডার এবং দাশরথি যে একজন সম্পদশালী ভাণ্ডারী তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আমাদের সামাজিক আচার আচরণ-গুলি, বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে, ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। এখন হিন্দুসমাজের আচার আচরণ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সুদূর গ্রামের দিকে উহার খানিকটা হয়ত এখনও অনুসৃত হয়, কিন্তু সহরে মুখ্যতঃ কলিকাতার পরিবেশে উহার অধিকাংশই বর্জিত ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাঁচালীর দশকর্মের চিত্রগুলির মধ্যে আমরা শত বৎসর পূর্বের হিন্দুসমাজের প্রায় নিখুঁত একটি ফটোগ্রাফ পাইব।

তখন অন্তরাপত্য অবস্থায় পুত্র প্রসব করিবেন এই আশায় প্রসূতিগণ "ভাজাপোড়া" খাইতেন। কন্যাপ্রসব করিয়া মাতারা সুখী হইতেন না। পিতা অবশ্য পুত্রকন্যা যাহাই হউক, অবস্থানুসারে ধনাদি বিতরণ করিয়া উৎসব করিতেন। অবশ্য এই উৎসব ধনী ও জমিদার গৃহেই বেশি হইত। পঞ্চম দিবসে প্রসূতি সন্তানসহ সূতিকাগার হইতে বাহিরে আসিতেন, এবং জাতকের গায়ে হরিদ্রা লেপিয়া ও চোখে কাজল পরাইয়া দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণদের পদধূলি জাতকের অঙ্গে দেওয়ার প্রথা ছিল। এই রাত্রে বিধাতা ললাটলিপি লিখিতেন, এইজন্য "মস্যাধারাদি" প্রস্তুত রাখা হইত। বোধ হয় এইদিনই, কখনো বা জন্মদিনে, গণক আসিয়া "রিষ্ট গণনা" করিত এবং গ্রহশান্তি করিয়া দুই চার পয়সা রোজগার করিত।

ইহার পর সপ্তম মাসে অন্নপ্রাশন হইত। অন্নপ্রাশনে বড় বাড়ীতে খুব ধুমধাম হইবার বর্ণনা আছে। পঞ্চম বর্ষে প্রথম হাতেখড়ি হইত ছেলেদের। গুরু মশাইর পদ একচেটিয়া ছিল পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের। "গণেশ আঁকুড়ি ষড়ক্ষর" মাটিতে লিখিয়া দিয়া শিক্ষার প্রারম্ভে গুরুমশাই সরস্বতীকে প্রণাম করাইতেন। সটকে, কড়া, গণ্ডা, পণ, মণকসা, কালি ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হইত।

অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণনন্দনদের উপনয়ন হইত। ইহার একটি সাধারণ বিবরণ বামনভিক্ষা পালাতে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অধিবাস। তারপর "বসুধারা দিয়ে দ্বারে" বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ হইত। তারপর নাপিত আসিয়া পুরোহিতের অনুমতি লইয়া কর্ণবেধ ও কেশমুণ্ডন করিত। ইহার পূর্বেই অগ্নিস্থাপনার ব্যবস্থা হইত। তারপর তৈলহরিদ্রা মাখিয়া স্নানান্তে "ক্ষৌম কৌপিন বাস পরিধান" এবং "মঞ্জুমেখলা দিয়ে কৃষ্ণাজিন" স্কন্ধে ধারণ। তদনন্তর গায়ত্রী উপদেশ লাভান্তে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীফলের দণ্ড ধারণ। তারপর ব্রহ্মচারী বেশ গ্রহণ, ভিক্ষাঝুলি ধারণ ও ভিক্ষা। তিন দিবস অবরুদ্ধ ঘরে বাস করিবার প্রথা ছিল।

মেয়েদের বিবাহ বয়স আট, নয় বড় জোর দশ বৎসর। বিবাহে ঘটক আসিয়া সম্বন্ধ স্থির করিত। কন্যা দেখিবার প্রথা ছিল, তবে দেখা ও কথাবার্তা ঠিক করিবার ভার বোধ হয় ঘটকের উপরই থাকিত। মেয়েদের শুভাশুভ লক্ষণের বিবরণ আছে।

"...দিব্য নাসা, দিব্য বর্ণ, দিব্য কর্ণ স্বর্ণ প্রতিমা ত্রিলোক ধন্যা। কোমল কক্ষ, কোমল বক্ষ, দীর্ঘকেশী কমলাক্ষ, লক্ষ্মীর উপমা বটে কন্যা। লোমশী উঁচকপালী মেয়ে, খড়্গনাসা, খড়মপেয়ে, হলে পতির অমঙ্গল ঘটে।"[১]

বরপণ, যৌতুক এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটক বিদায়ের হারও নির্ধারিত ছিল। "পাত্র যেমন পাবেন পণ, ঘটকের আছে নিরূপণ, দশ অংশের এক অংশ পাবে।"[২] সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে, পরদিন প্রভাতে মা কন্যাকে "আইবুড় ভাত" দিতেন এবং তারপর প্রতিবাসীরা ডাকিয়া নিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াইত।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, চতুর্থ সং, পৃঃ ২৩৬

২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৩৭।

রাত্রে মেয়েদের দধিমঙ্গল হইত। ইহার খরচ বোধহয় বরপক্ষকে দিতে হইত।[১] বরপক্ষ কন্যাকে আশীর্বাদ পাঠাইত। বরযাত্রার সঙ্গে বহু বাদ্য বাজিবোম ইত্যাদি সমারোহ হইত। কন্যাপক্ষ হইতে পাত্র দেখিবার কোন প্রথা ছিল না। ঘটকই ভালমন্দের দায়িত্ব বহন করিত। পাত্র যদি বৃদ্ধ বা অন্য কোন দিক দিয়া খারাপ হইত, তবে ঝড়ঝাপটাটাও যাইত ঘটকের উপর দিয়াই। কিন্তু পাত্রের ভালমন্দের দোষে বিবাহ বন্ধ হইত না, "প্রজাপতির ভবিতব্য" বলিয়া কন্যার মাতা শোকশয্যা হইতে উঠিয়া চোখের জল মুছিয়া কাজে লাগিয়া যাইতেন। উদ্যত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া সকলে এই কামনা করিত: "হয়ে থাকুক অক্ষয় হাতের লোহা।"[২]

প্রধান বরচিহ্ন ছিল মাথার মৌর। অদ্যাপি হিন্দুবিবাহে গোটা বঙ্গদেশে বরের টোপরের উপর ময়ূর দেখা যায়। বিবাহের পূর্বে পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সিধা লইয়া মন কসাকসি, রাগারাগি চলিত। তাঁহারা পক্বান্ন গ্রহণ করিতেন না। বরপক্ষের পুরোহিত কন্যাপক্ষ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিধা না পাইলে অত্যন্ত চটিয়া মেয়ের পক্ষের কুৎসা তুলিয়া বিবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। কন্যাপক্ষের পুরোহিতও ছাড়িয়া দিতেন না। ছোটখাট একটা কবির লড়াই হইয়া যাইত। শেষে পুরোহিতকে "সিধেতে সিধে" করা হইত।[৩] কুশণ্ডিকার পর নাপিত আসিয়া বরকে কোলে করিয়া ছাদনা তলায় লইয়া যাইত। কন্যাদানের পূর্বে ঘটক বংশপরিচয় আবৃত্তি করিত। "গললগ্ন-কৃতবাসে" কন্যার পিতা বা কন্যাদাতা সম্প্রদানের অনুমতি ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেন। শংখধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বরকে জলধারা দিয়া বাসরঘরে লইয়া যাওয়া হইত। কুলকামিনীরা বরকে বরণ করিত কুলা মাথায় করিয়া। কন্যার মাতা পানসুপারি হাতে করিয়া বরকে বরণ করিতেন এবং পরে বরের কণ্ঠে মেয়ে মাল্যদান করিতেন।

উলুধ্বনি দিয়া কাপড় বিছাইয়া বরকে লইয়া বাসরে বসিত রমণীরা। নানা স্ত্রী-আচার ও রসিকতা হইত। একটি শিলা বা শিলনোড়া দেখাইয়া

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫০৬।

২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০৯।

৩। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৪৪।

রমণীরা বলিত: "এই ষষ্ঠী ইহাকে প্রণাম করিয়া সন্তানের বর মাগ।" চালাক বর প্রণাম না করিয়া নোড়াটি ফেলিয়া দিত, আর বোকা বর প্রণাম করিয়া ঠকিয়া যাইত। রসালাপ যে কেবল শ্যালীসম্বন্ধের মেয়েরাই করিত তাহা নহে, সকলেই ইহাতে যোগ দিত। "কি শাশুড়ী, কি পিসেশ সম্বন্ধের নাই বিশেষ, একত্রে এক গোত্র সমুদয়।" বাসরঘরে মেয়েদের প্রতাপ ছিল সীমাহীন। ভীমের মত বর পর্যন্ত ভয়ে কেঁচো হইয়া যাইত। নিরীহ কুলবধূরা পর্যন্ত সে রাতে বাচাল হইয়া উঠিত, নিধুর টপ্পা গাহিত। শেষে বরকে ঠকাইবার জন্য নানা প্রশ্ন ও ধাঁধা ধরা হইত। বর ও মেয়েরা গান গাহিয়া বাসর যাপন করিত। নববধূ লইয়া বর নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে রমণীরা পান, গুয়া, কলা লইয়া বধূবরণ করিত। পিঁড়িতে আতপ চাউল দিয়া মেলানি দিত।

শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না পাঁচালীতে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া পিণ্ডদান চলিত না। বৃহৎ কর্মের কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যায় দক্ষযজ্ঞ, প্রভাসযজ্ঞ, বলির যজ্ঞ, নন্দোৎসব প্রভৃতির মধ্যে। খাবার আয়োজন প্রচুর হইত। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা করিতেন। মল্লদের ব্যায়াম ও কৌতুক যুদ্ধ দেখান হইত। নানা নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হইত। একটি ঘটনার কয়েকটি খণ্ডিত বর্ণনা উল্লেখ করিতেছি, ইহার মধ্যে অনেকের একটা চেনা চিত্র ফুটিয়া উঠিবে মনে করি।

"স্থানে স্থানে কতজন, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, করিতেছে শাস্ত্র আলাপন॥
…রত্নবেদী কতশত, নির্মাণ করেছে কত, ঘৃতের কলস সারি সারি।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি রাখিয়াছে নৃপমণি, হ্রদে হ্রদে পরিপূর্ণ করি॥
…কত কুস্তিগির মাল, বাহুতে ধরয়ে ভাল, পাথরে আছাড়ে নিজ মুণ্ড।
…চোপদার, জমাদার হাতে সেঙ্গা তলোয়ার, সম্মুখে সর্বদা আছে খাড়া।
নৃত্যগীতবাদ্য কত, হইতেছে অবিরত, দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন তারা॥"[১]

ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু যজনযাজন ব্যবসায় বোধহয় ক্ষেত্রবিশেষে সম্প্রদায়গতও ছিল। অধুনা যোগী সম্প্রদায় যেমন নিজেদের মধ্য হইতে পুরোহিত নির্বাচন করে; তখন গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যেও বোধহয়

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৪৮।

এমন সম্প্রদায়গত যাজন পদ্ধতি চালু ছিল। যথা, কৃষ্ণপ্রতি যশোদা বাক্য : "তোরে আমি পড়াব ধন, করে বিদ্যা আরাধন, তুমি আমার কুলের যাজন কর।" অন্যান্য জাতের বিশেষ কথা নাই। রজক, তাঁতী, নাপিত, মালীদের কাজ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। নাপিতের স্ত্রী আসিয়া বাড়ী বাড়ী পুরনারীদের পায়ে আলতা দিয়া যাইত। "ভোজন ছত্রিশ জেতে" বলিয়া কর্তাভজার যেখানে নিন্দা করা হইয়াছে, সেখানে ধোবা, কলু, মুচি, বাগদী, হাড়ি, বামুন, কায়স্থ, ডোম, কোটাল এই নামগুলি আছে।

টাইপ চরিত্র আলোচনায় ও পরিশিষ্টে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অনেকগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। তখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের লক্ষণ দাশরথির মতে, "তাকেই বলি ব্রাহ্মণ, নাই শূদ্রের দান গ্রহণ, সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ তপ সদাই।" কিন্তু সন্ধ্যা-গায়ত্রী-বিস্মৃত নিমন্ত্রণপ্রার্থী ব্রাহ্মণের সংখ্যা-ও কম ছিল না। দক্ষিণ দেশের (রাঢ়ের) ব্রাহ্মণগণ বোধহয় কিছুটা পণ্ডিত ছিলেন। পৌরোহিত্য ব্যবসায় তখন হইতেই অনেকখানি মূর্খ ও অশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। খাতির ও প্রীতিভোজনে সামাজিক বন্ধন ও শ্রেণীর প্রশ্ন বড় ছিল না। লুচিটা বোধহয় খুবই প্রিয় খাদ্য ছিল। টাকা ব্যয় করিলে মুদ্দফরাস পর্যন্ত ব্রাহ্মণদিগকে বাড়ী আনিতে পারিত। মোটকথা পুরোহিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তখনও অত্যন্ত দরিদ্র ও হীনাবস্থায় ছিলেন।

পার্বণে পুরোহিতের প্রাপ্য ছিল পাঁচপোয়া চাউল। দুর্গোৎসবে তিনটি উপবাস করিবার পর দক্ষিণা ছিল তিন টাকা। কালীপূজায় আট আনা, কার্তিক পূজায় চার আনা দক্ষিণা ছিল।

তদানীন্তন তরুণদের মধ্যে যে কেহ কেহ পিতামাতার উপর অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত, তাহার কয়েকটি উদ্ধৃতি পরিশিষ্টে উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের স্ত্রৈণতা, লোভ, অমানুষিকতার বর্ণনার মধ্যে কোন কাব্যরস নাই বটে কিন্তু বাক্যশর মর্মভেদী। তদানীন্তন হালফ্যাসানের বর্ণনা : "এখন টেরিকাটা, কাটা পোষাক, চুরুটেতে চলে তামাক, আবকারী আর উইলসনের খানা ভিন্ন খায় না।"

কলিকালের অর্থাৎ সমসাময়িক নারী সম্বন্ধে দাশরথি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়েও পরিশিষ্টে কিছু উদ্ধৃতি ও পূর্ব অধ্যায়ে কিছু আলোচনা আছে। দাশরথির সতীর সংজ্ঞা :

"পতি যার অতি হীন, অন্নহীন, মান্যহীন, ছিন্নভিন্ন পরণে শীর্ণ ধুতি।
দুঃখের শেষ হেন ব্যক্তি, তার নারীর যে পতিভক্তি, তাকেই বলি পতিব্রতাসতী॥"[১]

তাহা না হইলে বিত্তশালী স্বামীর প্রতি নারীর যে যত্ন দেখা যায়, তাহা অর্থমূল, কাজেই তাহাকে পাতিব্রাত্য বা সতীত্ব বলা যায় না। কারণ অর্থই যদি সেবাযত্নের মূল কারণ হয় তবে—"বেশ্যা কেন সতী না হন, তারাও তো পেলে ধন, উপপতির চরণ সেবা করে।

তদানীন্তন মেয়েদের হাবভাব-পোষাকপরিচ্ছদের নক্সা :

আমাদের সে এক কাল ছিল এখনকার অভাগীগুলো
লজ্জা নাই সজ্জা নিয়েই কথা॥
হয়ে কুলের কুলবতী নক্‌সাপেড়ে চিকন ধুাত
ঠোঁট রাঙিয়ে সর্বদা মুখ তেলা।
মিছি মিছি যায় মুখ লুকিয়ে বারে বারে আড়চোখে চেয়ে
মুখ দেখিয়ে বুকচিতিয়ে চলা॥
হাতে গহনা সোনার চিপ ভ্রূতে খয়েরের টিপ
সিঁতেয় সিন্দুর পরা গিয়েছে উঠে।
করেন না অন্য কারবার দিনের মধ্যে ষোলবার
ভালবাসেন যেতে জলের ঘাটে॥
মাথায় আরমানী খোঁপা চারিদিকে তার বেড়া চাঁপা
ঝাপটা কাটা কান ঢাকা সব চুল।
পথে যেন ছবি নাচায় ছোঁড়ারা ফিরে ফিরে চায়
এতে কি থাকে কুলকামিনীর কুল॥[২]

বাসরঘরে মেয়েদের দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যাপারটি দাশরথির মন্তব্যসহ উদ্ধার করি :

নারীরা লম্পটশীলে যেমন ফল্গু নদী অন্তঃসিলে
বিয়ে যদি হয় প্রতিবাসীদের বাড়ী।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৫৫।
২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১২২।

ঘোমটা খুলে বাসরঘরে নূতন জামাই গেলে পরে
ছুঁড়িদের কত আমোদ বাড়াবাড়ি ॥
যিনি মুখ দেখান না কুলের বধূ তিনি সে রাত্রে গান টপ্পা নিধু
রসের ছড়ায় খৈ ফুটে যায় মুখে।
যদি ভীমের মতন হন পাত্র তথাপি দুর্বল গাত্র
বিয়ের রাতে বাসরঘরে ঢুকে ॥
শুনে ঘৃণা হয় বড় বারবছরী আইবুড়
হচ্ছে কেবল বিয়ের উপলক্ষী।
বীরসিংহ রাজার সুতা বিদ্যার কি শুন নাই কথা
লোকে বলিত মেয়েটি বড় লক্ষ্মী ॥[১]

বাসর ঘরের চিত্র ছাড়াও দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। নিধুর টপ্পা রক্ষণশীলদের মতে খুব শালীন ছিল না। শুধু মেয়েদের সম্বন্ধেই নহে, পুরুষদের ক্ষেত্রেও টপ্পা গান প্রশংসনীয় ছিল না। "সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপা, পুড়িয়ে খেয়ে সে সব দফা, নিধুর টপ্পা গেয়ে বেড়ান পথে।" সোরি মিয়ার টপ্পা সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য আছে। দ্বিতীয় কথাটা বিবাহের বয়স। বার বৎসর বয়সটা একেবারে অরক্ষণীয় বয়স বলিয়া মনে হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন দাশরথি। তাঁহার মতে "মেয়েরা যদি লেখাপড়া শিখিত, তবে গোপনে পত্র লিখিত, খাটতো ভাল পীরিতের পন্থা"।

মেয়েদের দুঃখদুর্দশা দুর্ভাগ্যেরও অনেক টুকরা ছবি আছে। দশ বৎসর বয়সে ঘোমটা টানিয়া "পক্ষী যেমন পিঞ্জরে বদ্ধ" তেমনি অবস্থায় শ্বশুর বাড়ী থাকা। তারপর—

কারো পতি কানাখোঁড়া কারু বা সতীন পোড়া
কারু পতি বা নয় বশীভূত।
কারো পতি অম্নছড় কোন যুবতীর পতি বুড়
মনাগুনে মন পোড়ে তার কত ॥

ইহার পর আছে কুলীনের নারীর দুঃখ ও কালো মেয়ের দুরদৃষ্টের কথা।[২]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৫৭।
২। পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।

বিধবাবিবাহ, কর্তাভজা, বৈরাগী বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দাশরথি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। শ্লেষ, বিদ্রূপ, কটাক্ষযুক্ত রচনাবলীর নমুনা ক পরিশিষ্টে ও পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে পুনরুক্তি করিব না।

চোর ও চুরির মামলার একটি নকসা চিত্র দিতেছি :

এক্ষণেতে মহাশয়, চোরের বৃদ্ধি অতিশয়
পূর্বে রাজা শূলে দিতেন চোরে।
এখন ধরলে কিসের দায় পরম সুখে খেতে পায়
বালাখানায় শুতে পায়, দিতে পারলে জরিমানা, খাটুনি মানা করে॥
অমাবস্থে দুপুর রেতে চুরি করে চোর জেতে
যোগে যাগে যদি ধরতে পারি।
হাকিম বলে সাক্ষী কই তখন সাক্ষী কারে কই
ফৈরাদীর হয় উল্টা কসুর চোরের বাড়ে জারী॥
চোর বেটারা ফুকিয়ে বাটী লয়ে যায় ঘটি বাটি
ভয়ে ভয়ে থাকি ছাপিয়ে সে কথাটি।
ছাপালে কিছু রেয়াতি বটে না ছাপালেই ছাপিয়ে উঠে
দারোগা গিয়ে কাঁপিয়ে দেন মাটি।
একে তো হল দফা রফা আবার দারোগার সঙ্গে কর রফা
কড়ি দিয়ে, নইলে দ্বিগুণ ফন্দী।
ফৈরাদীকে ফেলে ফেরে মূলটো ছিঁড়ে তুলটো করে
লিখিয়ে দেয় উল্টো জবানবন্দী॥
চোর জরির জুতো দিয়ে পায় শাটিনের আংরাখা গায়
গাঁয়ে বেড়ায় চলে।
লোকের এখন এমনি ভয় চোরকে দেখলেই বলতে হয়
দাদা মহাশয় কোথায় গিয়েছিলে॥[১]

পাঁচালীতে দাশরথির কবিরাজী জ্ঞানের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ কবিরাজী শাস্ত্রের বিধান বলিয়া ইহার সহিত উনবিংশ শতকের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু দাশরথি-উক্ত কিছু মুষ্টিযোগের কথা বলিতেছি। এগুলি

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৫।

হয়ত তখন গ্রামাঞ্চলে বহুল প্রচারিত ছিল যা উপকারী বোধে দাশরথি প্রচার করিতেন।

মুষ্টিযোগ জানি কটা পাঁচড়ায় আকন্দের আটা
মরিচ বাঁটা দিবে বিস্ফোটকে।
ফুলে উঠিলে কুঁচকিটি গন্ধবিরাজের পটি
রক্তবদ্ধ বেদনা যায় জোঁকে॥
বাল্‌সেতে বনপুঁয়ের মূল ছুলিতে হলুদের ফুল
দূর থেকে মারবে রোগীর গায়।
জাম খেলে পাক পায় চুল পুরানো চুনে বুকশূল
কাপড় ছাড়ায় দিকভুল যায়॥[১]

প্রবাদ ও ছড়ার মধ্যে সেকালের অনেক বিচিত্র খবর পাওয়া যায়। তখন ওলাউঠা, সান্নিপাত, জরবিকার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। যেমন, "অতিশীঘ্র যেমন ধারা ভেদের রোগী মরে।"[২] "নূতন জরে বিকার হলে, বাঁচে না ধন্বন্তরী এলে।"[৩] "ঝোলা কিংবা ওলাওঠো, সেই বাড়ীতে গিয়ে যুটো।"[৪] অথবা "যেথায় সান্নিপাত, সেই রোগীটি করগে হাত।"[৪]

বিক্ষিপ্ত শ্লোকার্ধ, প্রবাদ, ছড়া, অলংকারাদির মধ্যেও তখনকার স্থানের রীতিনীতির, সংস্কারের নানা খবর পাওয়া যায়। কিছু উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। দিনাজপুরের জল তখন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল, ("অতিশীঘ্র পরমায়ু যায় দিনাজপুরের জলে")[৫] তিনচক্ষু মাছ মানুষে খাইত না, ("তিনচক্ষু মৎস্য মনুষ্যে খায় না")[৫] তিনটি দ্রব্য দিতে নাই তাহাতে শত্রুতা বাড়ে ("তিনদ্রব্য লোকে শত্রু বলে নেয় না")[৫]: মৃতবৎসার পুত্রের নাম হইত তিনকড়ি (তিন কড়ে নাম হইলে, মরাঞ্চে বই কয় না)[৫]: ছোটদের রক্ষাবন্ধন

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ১১৯।
২। " " " পৃঃ ৮০।
৩। " " " পৃঃ ১৯২।
৪। " " " পৃঃ ১৬।
৫। " " " পৃঃ ৬১১।

করা হইত চুলে (দুটি নন্দনের কেশে রক্ষাবন্ধন করি শেষে)[১] : দাঁতে মিশি ছিল সৌন্দর্যের পরিচায়ক (দাঁতের শোভা মিশির রেখা)[২] : বড় বড় চিকিৎসক পালকীতে বা হাতীতে চড়িয়া যাইতেন (বিশেষ গণ্য বৈদ্য হলে, নরস্কন্ধে প্রায় চলে, কেউবা যায় গজ আরোহণে)[৩] : গাজুনে সন্ন্যাসীর প্রতি ধর্মরাজের ভরকে অনেকে ফাঁকি মনে করিত (যেন গাজুনে সন্ন্যাসীর প্রতি ধর্মরাজের ভর)[৪] : হিন্দুয়ানীর বিচারে পানপানির প্রাধান্য ছিল (গেল সকল হিন্দুয়ানী, বিচার নাই আর পানপানি)[৫] : মুসলমানের ঘরের ঘৃতে যজ্ঞ হইত না (যবনালয়ে থাকলে ঘৃত লয়ে কে করে যজ্ঞ ব্রত)[৬] : ধাত্রীকার্য করিত হাড়িঝি (হাড়িঝির আদর যেমন প্রসবের সময়)[৭] : বৈরাগীকে নুন মাটি দিয়া কবর দিত (শাক্ত হইলে গঙ্গা দিও বৈরাগীকে নুনমাটি)[৮] : বারাসতের পথটি দেখিতে খুব সুন্দর ছিল (পথের শোভা বারাসত)[৯] : সীতা নাম রাখা দুঃখের হেতু বলিয়া মনে হইত (সেই অবধি সীতানাম রাখে না কেহ সংসার মধ্যে)[১০] : পছন্দসই গহনা দক্ষিণ দেশের শাঁখা (টোপতোলা বাই দখিনে শাঁখা, দাম কোথা তার আড়াই টাকা)[১১] : এবং জোনারের বালার বিশেষ খ্যাতি ছিল (একগাছ জোনারে বালা আজই গড়ুক সেকরাকে দাও ডেকে)[১১]। তখনকার কারাগার সম্বন্ধে হরিণবাড়ী[১২] ও পুলিপোলাওর[১৩] নাম আছে (করিস যদি

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৭০।
২। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬০৬।
৩। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১১৭।
৪। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১১৬।
৫। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৪।
৬। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২০৬।
৭। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬৮১।
৮। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬।
৯। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬৮৩।
১০। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬৫৪।
১১। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩২০।
১২। যেখানে আলিপুর জেল, পূর্বে সেখানে হরিণ রাখিবার বাগান ছিল।
১৩। আন্দামান, Port Blair.

বাড়াবাড়ি তবে দিব হরিণবাড়ী, না হয় তো পুলিপোলাও পাঠাব)[১]। সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তির নাম আছে : রাজকিশোর দত্ত (চুপিচুপি কোম্পানীর নোট জাল করে। রাজকিশোর দত্ত জন্মাবধি গেলেন জিঞ্জিরে ॥)[২] : প্রতাপচন্দ্র (চুপে চুপে প্রতাপচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে গিয়ে। এখন আর দখল পান না, আছেন ভেকো হয়ে ॥)[২] : ক্রোসাহেব (সে সব দলিলের কর্ম নয় ক্রো সাহেবের ছাড় দেখাতে পার।)[৩] : উইলসন (স্বধর্ম ত্যজে উইলসনের খানা খেতো।)[৪]।

সেকালের গঙ্গার নূতন খাত কাটা সম্বন্ধে চমৎকার একটি রসাল বর্ণনা আছে। পরিশিষ্ট ক-অংশে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছি বলিয়া আর এইখানে পুনরুক্তি করিলাম না।

তখনকার মেয়েদের নামের একটা তালিকা দিতেছি : রাসমণি, রাজমণি, রামমণি, রঙ্গিণী। রাজকুমারী, রাজেশ্বরী, রক্ষে, রতনমণি, রামা, রাসকে, রসপায়িকে, রসমঞ্জরী, রতি। রঞ্জনী, রজনী, রঙ্গমতী, রসবতী ॥[৫]

শামী, বামী, বিমলী, ভগী, তিলকি, গুলকি, জয়া, যোগী
নবি, ভবি, শিবি, সবি, আয়লো তোরা হেথায়।
পাঁচী, পক্ষী, পদ্মী, পরাণী, হৈমী, হরি, হীরে, হারাণী,
মুংলি, মানকী, মুঞ্জুরী, মল্লিকে আয়।
দিগ্মিদের দই দিনী গণশী সই গৌরমণি
রত্নী, যত্নী, ধুনী, বদনী পুটী বেনেনী কোথায়।
আয় লো কোথায় গঙ্গাজল কামিনী কোথা বলব বল
যামিনী কোথা যামিনী যে হল।
আয়লো গোলাপ আয়লো আতর, এখন মাখন হয়না তোর ইত্যাদি।[৬]

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬৪৫।
২। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৪৪৫।
৩। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩।
৪। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৩।
৫। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩২।
৬। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৪৫।

এই জাতীয় আরও নাম আছে। পরিশিষ্টে তরুণীদের কাশীযাত্রা সংগ্রহে এই ধরণের অনেকগুলি নাম দেওয়া হইল। সখীদের পাতান ডাক আছে কয়েকটি "গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ, বকুলফুল, দেখনহাসি, মকর" ইত্যাদি।

তখনকার দিনের শাড়ির একটি তালিকা পরিশিষ্টে দিয়াছি। এইখানে আর একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

কেউ পরে শান্তিপুরে ধুতি শিমলের কোন যুবতী
কেউ পরেছেন বারানসী শাড়ি।
কেউ পরেছেন জামদানী কেউ বা কালো ধুতিখানি
কালা পাড় মিহিতে খাপ ভাল।
কেউ পরেছে পটাপটি কেউ জন্ম এয়স্ত্রী শাটি
কোন সুন্দরী নীলাম্বরী পরে করেছেন আলো॥
কেউ পরেছেন বুটোদারি কেরেপ পরেছেন যার আদর ভারি
কেউ সুইসের ডালিমফুলের রং।
পরেছেন কোন কোন নারী লালবাগানে লালকিনারী।[১]—ইত্যাদি

ফরাসডাঙ্গার লালবাগান সেই সময়ে মিহি শাড়ির জন্য বিখ্যাত ছিল। এ সব ছাড়া কস্তা শাড়ি, মেঘডম্বুর শাড়ি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

তখনকার দিনের গহনার একটা তালিকাও পরিশিষ্টে উদ্ধার করিয়াছি। এইখানে আর একটি উদ্ধৃত করিলাম। দুইটিতে অনেক গহনা এক হইলেও বৈশিষ্ট্যের অভাব নাই।

এখনকার যত অলঙ্কার চরণে কত চমৎকার
পাঁয়জোরেতে বাজনঘুন্টি বাজে।
মাঝখানেতে চরণপদ্ম চরণ শোভা করে হদ্দ
বাজননূপুর পাতা সাজে॥
অঙ্গুলি কিবা শোভিছে দুই পাশেতে আটনর বিছে
মাঝের আঙ্গুলে চুটকি দেখি।
উপরে ঘুংঘুর ঘণ্টা পঞ্চমেতে কলস আঁটা
কলস না থাকিলে বলে বেঁকী॥

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৪৫

বাঁক হয়েছে নানা রঙ্গী হীরাকাটা জলতরঙ্গী
কাটামুখ রাণাঘেটে পুঁটে।
কোমরেতে চন্দ্রহার চন্দ্র দেখে মানে হার
কি শোভা চাবির শিকলি গোটে॥
হাতে সাজে খাসাখাসা কাটা পঁইছে রসুনকোসা
কাকনি গজরা মর্দনা তেথরি।
থয়ে জনারে লোহাবালা তার মধ্যে কাঁটী পলা
দক্ষিণে বাই শঙ্খ বাউটি চুড়ি॥
নূতন তাবিজ মুস্থুরে কোঁড়া নকাসি বাজু থোপনা যোড়া
যোড়া ঝাঁপা আর বকুলে পুটে।
গলার সাজ কতগুলা চাঁপা কলি থড়কি মালা
চিকণমালা তেনরি আটপিঠে॥
হাঁসলিতে জিঞ্জির যোড়া গলা বেড়া কবজ পোরা
শোভা করে স্বুবর্ণ মাদুলী।
কানের সাজ কানবালা বীরবৌলী পুঁতিমালা
গোখুরা চাঁপা ক্রমে সব বলি॥
ঢেঁড়িতে জড়াও ঝুমকা গাঁথা খাসা পাশা পিপুলপাতা
যোড়া যোড়া মুক্তা ঝুপি ঝোলে।
নাকের সাজটা সাজের মূল ময়ুরে বেশর কর্ণফুল
মূলুক যুড়ে নলক মাঝে দোলে॥
নঙ্গ নলক দাড়িনখে যোড়ামতি বিবিয়ানাতে
নলকে ঝুরি তেথরি তার দানা।
শিরে সাজ স্বর্ণ সঁীতি এত অলঙ্কার দিলে পতি
মাগীদের তো মাটিতে পা পড়ে না॥[১]

এই রকম আরো গহনার কথা আছে। শুধু গহনার নাম বলিলে হয়ত ব্যবহারের স্থান বুঝা যাইবে না বলিয়া দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম।

জলপানি খাবারের একটি তালিকাও পরিশিষ্টে বিবিধ সংগ্রহে দেওয়া

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫২৫।

হইয়াছে। পুনরুক্তি করিলাম না। ইহা ছাড়া কচুর ঘণ্ট, শাক, মোচার ঝোল, গুড় অম্বল প্রভৃতির কথা ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে। কতগুলি ফল-মূল ও আনাজের নামও পাওয়া যায়। যথা কাঁচকলা, মোচা, বাঁধাকপি, বেগুন, গৌড়ে আম্র, বকুল, কুল, শশা, দাড়িম্ব, আনারস, লেবু পাতি কাগজি, জামির ইত্যাদি।[১]

তদানীন্তন বাদ্যবাজনার মধ্যে মোটামুটি এই নামগুলি পাওয়া যায়ঃ জয়ঢাক, ঢোল, কাড়া, টিকাড়া, দগড়, দম্ফ, বাঘলেঙ্গুরে ঢাক, ঝমঝমী, জগঝম্প, মাদল, শিঙ্গা, বাঁক, দামামা, ভেরী, ডবলা বাঁশী, ইংরাজী বাদ্য, তবলা, করতাল প্রভৃতি।[১]

এতজ্জাতীয় আরও বিক্ষিপ্ত, বিভিন্ন সংবাদ পাঁচালী হইতে সংগ্রহ করা যায়। যেগুলি সংগৃহীত হইল তাহাও যে একেবারে পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত তেমন দাবী করা যায় না। মোটামুটি একটা প্রামাণ্য ধারণা ইহা দ্বারা পাঠকের কাছে ধরা পড়িবে, এই আশায় কেবল এইগুলির সংকলন দিলাম।

১। দাশরথির পাঁচালী, বঙ্গবাসী, ৪র্থ সং পৃঃ ২৫১।

পরিশিষ্ট—ক

দাশরথির পাঁচালী-বিচিত্রা

পাঁচালী-পালার অন্ততঃ দুই তিনটি সম্পূর্ণ নমুনা পরিশিষ্টে দেখান উচিত ছিল কিন্তু গ্রন্থের আকার-আয়তন বিবেচনা করিয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। তৎপরিবর্তে সমগ্র পাঁচালী মন্থন করিয়া দাশরথির বৈশিষ্ট্যসূচক বিচিত্র অংশগুলির একটি প্রদর্শনী সাজাইয়া দিলাম। তাঁহার রচিত শিব-চণ্ডী-নারদ-জটিলা-কুটিলার চরিত্র, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-নারী-পুরুষের টাইপ, ছড়া, বর্ণনা ও বিবিধ সংগ্রহ, সর্বোপরি সঙ্গীতসমূহ—দাশরথির বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার উজ্জ্বল উদাহরণ। সঙ্গীত মাত্র ৫০টি নির্বাচিত হইলেও তাহারই মধ্যে দাশরথির সঙ্গীতের সমগ্র পরিমণ্ডলটির প্রতি আলোকপাত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পালার নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা, পাঠ—সব কিছুই শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দাশরথির পাঁচালী, চতুর্থ সংস্করণ হইতে গৃহীত।

শিব ও চণ্ডী

১

ব্রাহ্মণ প্রার্থনা জানাইলেন :

সংসারে শুনি যে ভব কুবের ভাণ্ডারী তব
জীবে ধন প্রাপ্ত হয় তব গুণে।
আমি বড় অনর্থযোগী কিঞ্চিৎ হও মনোযোগী
মহাযোগী মম দুঃখ শুনে ॥
দেখি দ্বিজের যোড়পাণি হেসে কন শূলপাণি
হাসালে আমায় তুমি দুঃখে।
তব দারিদ্র্য ধিক ধিক আমার জেনো ততোধিক
আমিও ঐ ভিক্ষা মন্ত্রে দীক্ষে ॥

অন্ন বিনা শুকায় চর্ম বস্ত্র বিনে ব্যাঘ্রচর্ম
স্থান বিনে শ্মশানে পড়ে থাকি।
ভস্ম কপাল অশ্ব নাই বলব কি বলদে যাই
তৈল বিনে গায়ে ভস্ম মাখি॥
এমনি দুঃখ নিরবধি ভিক্ষা করি সন্ধ্যাবধি
তারা উঠিলে তারা দেন রেঁধে।
কি গুণের ভার্যা চণ্ডী রেঁধে বলেন, এই খাও পিণ্ডি,
মনের দুঃখেতে মরি কেঁদে॥
দেখছ হরকে পুরুষটি গোটা, কফো ধাতু তেঁই উদর মোটা
দুঃখে সুখে সদানন্দে থাকি।
যেমন কর্ম তেমনি ফল দেখছি ভেবে কি ফল
ধুতুরা খাই আর মথুরানাথকে ডাকি॥
ঘরে অচল দেখিয়ে অচল নন্দিনী প্রিয়ে
আত্মা পুরুষ শুকায় তার রবে।
থাকিত যদি বৈভব তবে কি ভাবিত ভব
ভবানীর কি বাণী সইতাম তবে॥
থাকিলে ঘর সম্পত্ত সিদ্ধ হয় সার পথ্য
দরিদ্র করেছেন গোলোক স্বামী।
সাধের ভার্যা গিরিবালা তার গর্ভে দুটি বালা
রাং বালা দিতে পারি না আমি॥
গণেশের গর্ভধারিণী কথায় কথায় ইঁনি
বুকে চড়েন দুঃখে বুক ফাটে।
আর এক ভার্যা সুরধনী শিরে চড়ে করেন ধ্বনি
বিষয় থাকলে এমন বিপদ কি ঘটে॥
পূর্বে কিঞ্চিৎ ছিলাম যুতে খেয়েছে আমায় বার ভূতে
ভূতে সুখ করেছে বহির্ভূত।
সিদ্ধেশ্বরী ঘরে বণিতা তাঁর পেটের ছেলে সিদ্ধিদাতা
সিদ্ধিরস্তু তার পেটেতে হত॥

পাঁচ জনে খায় একলা মাগি দশ হাতে খায় ভোকলা মাগী
কিবে আমার সুখের ঘরকন্না।
পরকে দিব কি স্বয়মসিদ্ধ হবে কি তোমার কার্য সিদ্ধ
দিয়ে ফলহীন বৃক্ষ কাছে ধন্না॥

—কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃঃ ২৯৯

২

পেয়ে যজ্ঞ নিমন্তন্ন আপনারে মানি ধন্য
আনন্দে নাচেন শূলপাণি।
হয়ে অতি চঞ্চল বলেন শীঘ্র চল চল
কোথা গেলে হে অচলনন্দিনী॥
ডাকো ষড়ানন হেরম্বে নিমন্ত্রণ সর্বারম্ভে
প্রভুর সঙ্গে আমার বড় হৃদ্য।
সেইখানে হবে ভোজন রন্ধনের প্রয়োজন
এখানে নাই আবশ্যক অন্য॥
কোথা গেলিরে বীরভদ্র শীঘ্র করি যাও ভদ্র
রৌদ্র বড় শিশু লয়ে চলা।
এস আমরা শুভঙ্করি ঊষাযাত্রায় যাত্রা করি
প্রভাত হলে শনিবারের বারবেলা॥
মনে কিঞ্চিৎ সন্ধ রয়েছে বৃষটা কিছু কৃশ হয়েছে
পূর্বে যেমন ছিল সেভাব নাই।
স্নানাদি করিয়া পথে যেমত হউক কোন মতে
আহারের পূর্বে যাওয়া চাই॥
শুনিয়ে শিবের বাণী উষ্ম করি কন ভবানী
কারে ডাকছ আপনি যাও তথা।
এসেছিলে এ সংসার উদর করেছ সার
তোমার কি আর আছে লোকলৌকতা॥
লোকে বলিবে ধন্যা ধন্যা যত যাবে কুলকন্যা
অগ্রে তারা করে বেশভূষা।

বস্ত্র আভরণ ভিন্ন কুৎসিত অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন
হয়ে যাব ছার কপালে দশা ॥
তোমা হইতে কে নয় বা সুখী পাতাল হতে আসিবে বাসুকী
সুসজ্জা করিয়া ভার্য্যা সঙ্গে।
ইন্দ্র আসিবে ঐরাবতে সাজিয়ে ভার্য্যা নানা মতে
মণিময় ভূষণ দিয়ে অঙ্গে ॥
হংসোপরি ব্রহ্মানী সজ্জায় আসিবে সম্মানী
বিধি মতে সাজায়ে দিবেন বিধি।
বলদে বসে যাব তথা হংস মধ্যে বক যথা
বলি তোমার লজ্জা থাকে যদি ॥
তুমি ত সদা নিঃশঙ্ক হাতে নাই তুটি বই শঙ্খ
কেমন করে লোকের মাঝে দাঁড়াই।
পতি বড় ভাগ্যবন্ত এক বস্ত্র শত গ্রন্থ
দিয়ে পরেছি বছর তুই আড়াই ॥
আবার সদা বল সদানন্দ গৌরি তোমার পয় মন্দ
জ্বলে অঙ্গ বলি জলে ডুবি।
কপালেতে আগুন জ্বেলে আপনি হয়েছ পোড়াকপালে
তা কেন দেখনা মনে ভাবি ॥
চাই রাগে পাষাণ ভাঙ্গতে শিরে প্রতিবাদী হয় প্রতিবাসীরে
ধরে তারা তবে করিব কি।
বলে ভাং খায় ধুতুরা খায় ওর কথা তোর গায় মাথায়
কাজ কি বাছা হেমন্তের ঝি ॥
জানি হে জানি শূলপাণি তোমার গুণ কেবল আমিই জানি
আর কে জানে ত্রিভুবন মধ্যে।
যাকে লয়ে যে ঘর করে তার পরিচয় তার করে
প্রকাশ করে দিতে পারি বিদ্যে ॥
আবার সদাই আমায় দেও আশা পুরুষের হয় দশ দশা
চিরদিন সমান থাকে নাকি।

*

কইও না ওসব ভুয়ো কথা রসহীনের রসিকতা
কৌষিকী ও সুখে হয় না সুখী ॥
অনায়াসে কও অনাসৃষ্টি সৃষ্টির যখন ছিলনা সৃষ্টি
তব ঘরে এই দিগ্‌বাসার বাসা।
গেল সত্য ত্রেতা দ্বাপর হবে সুখ তার পর
ভাব একি হে অসম্ভব আশা ॥
আহা মরি কি দুর্দশা প্রবীণ দশায় কি হবে দশা
আবার কি আমার কালে সুখ হবে।
হলো নব্য বয়সে লভ্য ভারি ত্রিকাল ঘুচিয়ে ত্রিপুরারি
পাকিয়ে দাড়ি ঝাঁকিয়ে ঘর দিবে ॥

—কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃঃ ৩০৫

৩

কহেন গণেশমাতা মাথা আর দেখব মাথা
ঘুচাইলে কৈলাসের বাস।
আমারে ভাসায়ে নীরে শিরে রাখ সপত্নীরে
কি কীর্তি করেছ কীর্তিবাস ॥
পুত্র হেতু করে ভার্যে এই মত সর্বরাজ্যে
সর্ব লোকে সর্ব শাস্ত্রে বলে।
আমি পুত্রবতী নারী কি জন্যে হে ত্রিপুরারি
অসম্মান আমার করিলে ॥
আমি যে দুঃখে হে দিগ্‌বাস তব ঘরে করি বাস
উপবাস বার মাস করি।
যে দুঃখেতে করি যেবা হেন শক্তি ধরে কেবা
স্বয়ং শক্তি সেই শক্তি ধরি ॥
অন্ন চিন্তা বার মাস অন্ত সুখের অভিলাষ
কোনকালে নাহিক আমার।

জানি হে জানি শঙ্কর শঙ্খ দিতে শঙ্কা ধর
দূরে থাকুক অন্ত অলঙ্কার ॥
রাজকন্যা আমি দুর্গে পড়ে তব কুসংসর্গে
বন্ধুবর্গ না দেখি নিকটে।
আমি সিদ্ধেশ্বরী নাম ধরি লোকের বাঞ্ছা সিদ্ধি করি
তোমার ঘরে মরি সিদ্ধি বেটে ॥
আপনি মাখহ ছাই আমাকে বলহ তাই
চিরস্থায়ী এক দশা জানি।
কে আছে হেন জঞ্জালী অন্নাভাবে অঙ্গকালী
বস্ত্রাভাবে হইলাম উলঙ্গিনী ॥
দেখিয়া দরিদ্র ঘর ঘুচাইতাম দশ কর
চারি হস্ত এক্ষণেতে ধরি।
হয়ে কুলের কুলবালা ঘুচাতে জঠর জ্বালা
দৈত্য কেটে রক্ত পান করি ॥

—ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল, পৃঃ ৪৯০

৪

যাইতে পিতার বাস, শঙ্করী পরেন বাস,
কৃত্তিবাস না দেন অনুমতি।
দেখিয়া গমনোদ্‌যোগী মহাদুঃখে মহাযোগী
অনুযোগ করেন গৌরী প্রতি ॥
তুমি সদয় অচলে আমার কি রূপে চলে,
চলাচল শক্তি নাই ঈশানি।
বয়স হয়েছে অশীতিপর হ্রাস হচ্ছে পর পর,
এর পর কি হয় না জানি ॥
নাম ধরিয়াছি কাল দুঃখে গেল তিন কাল
দিনে অন্ন পাইনে সকাল কালে।

ভার্যা হৈলে গুণবতী দুখে সুখে পায় পতি,
তা হলো না এ পোড়া কপালে ॥
মাসী পিসী ভগ্নী নাই অচল কালে কারে আনাই,
অচলনন্দিনী তা তো জান।
বলিছ যাব তিন দিবা, আমায় কেবল দুখ দিবা,
তিন দিবা তিন যুগ যেন ॥
কেমন গ্রহ বিগুণ বিধি, দিলেন না অন্ন গুণনিধি,
ভিক্ষা করে এ কাল কাটাই।
ঐ দুখে আমি দুখী তুমি হলে না দুখের দুখী,
পতিভক্তি কিছু মাত্র নাই ॥
না ভেবে নিজ অদৃষ্ট আমায় সদা কোপদৃষ্ট,
মনের কথা ভাবে যায় জানা।
তুচ্ছ কথায় কর তুল, সর্বদা বল বাতুল,
প্রতুল বিহনে এ যাতনা ॥
এসেছ যে বিয়ের বেলা সেই হতে করিছ হেলা,
ঘর কন্না হয়েছে ভার বোঝা।
সর্বদা উতলা রও বাঁকা মুখে কথা কও,
কখনও দেখিনে মুখ সোজা ॥
বিধি করেছেন দণ্ড বাঁচিতে ইচ্ছা একদণ্ড
হয় না আর এই দণ্ডে মরি।
মৃত্যু জন্য বিষ খাই কপালে যে মৃত্যু নাই,
দায়ে পড়ে ঘর কন্না করি ॥
আমি ত প্রাণী একজন কত করিব উপার্জন,
ভোজন কালে মিলে পঞ্চজন।
উপযুক্ত ছেলে দুটি আহারেতে নাই ত্রুটি,
বড়টি গজমুখ, ছোটটি ষড়ানন ॥
জানিয়া দরিদ্র পতি, তুমি ত তুচ্ছ কর অতি
এটা তোমার তুচ্ছ বুদ্ধি বটে।

পূর্বাপর আছে সূত্র পুরুষের ভাগ্যে পুত্র
রমণীর ভাগ্যে ধন ঘটে ॥
মোর ভাগ্য মন্দ নয় হল যুগল তনয়,
সুসন্তান রূপে গুণে ধন্য।
দেখ দুর্গা মনে গুণে তোমার কপাল গুণে,
বিষয় হইল সব শূন্য ॥
সুলক্ষণা হলে পরে সুমঙ্গল হতো ঘরে,
কমলার হতো শুভদৃষ্টি।
উচিত কথায় কর রাগ, ভয়ে করি অনুরাগ,
তিক্ত খাই তবু বলি মিষ্টি ॥
শুনি হরপ্রতি অতি ক্রোধে কন হৈমবতী,
আর না পোড়াও ক্ষমা কর।
যাহার ক্ষমতা রয় দিয়ে নাহি কথা কয়,
অক্ষমের বাক্যজালা বড় ॥
বল, অলক্ষণা নারী এ দুঃখ সইতে নারি,
পূর্বেতে ঐশ্বর্য ছিল বুঝি।
সেই শিঙ্গা বাঘছাল ডম্বুর হাড়ের মাল,
সেই বুড়া বলদ আছে পুঁজি ॥
ভূতে করি বরযাত্র গিয়েছিলে বুড়া পাত্র,
বিবাহ করিতে হিমালয়।
মোর জন্য কত ধন করেছিলে বিতরণ,
বুঝে কথা কহিলে ভাল হয় ॥
বললে পতিনিন্দা হয় না বলিয়া কত সয়,
রাগে হয় ধর্ম কর্ম হত।
যে দুঃখে হে দিগম্বর এ ঘরেতে করি ঘর
অন্য হলে দেশান্তরী হত ॥
পতি তুমি কৃত্তিবাস, ভূত সঙ্গে সহবাস,
এ বাসে কি সুখ আছে বল।

পরণে নাহিক বাস ভোজনেতে উপবাস,
এ বাস হতে বনবাস ভাল ॥
যে দেখি পতির আকার সকলি কর স্বীকার,
অন্তরে বিকার কিছু নয়।
কি জানি হে মহাকাল দুঃখে গেল ইহকাল,
পরকাল মন্দ পাছে হয় ॥
শঙ্কর কহেন বাণী জানি হে জানি ভবানি,
চিরকাল পরবাস ভেবেছ।
পতিব্রতা নাম লয়ে সমরে উলঙ্গী হয়ে
পতিবক্ষে পদ দিয়া নেচেছ ॥
সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ গমন যথায় মন,
তব জ্বালায় সদা অঙ্গ জ্বলে।
তোমার জন্য মান হরে দেবগণে ঘৃণা করে
রমণীর লাথিখেগো বলে ॥
তোমার ব্যাভারে গৌরি লোকালয় ত্যাজ্য করি
লজ্জা পেয়ে শ্মশানে রয়েছি।
কারে জানাইব তথ্য বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাপত্ত,
ভেবে ভেবে পাগল হয়েছি ॥
বিষ খেয়ে জীর্ণ করি সৃষ্টি বিনাশিতে পারি,
তোমারে দেখিয়া শঙ্কা লাগে।
যথার্থ কহিলাম মর্ম তব দেহে নাহি ধর্ম
যা হয় না হয় কর রাগে ॥
ক্রোধে কন ব্রহ্মময়ী ধর্মহীনা যদি হই
তবে কেন ধর্ম পানে চাই।
কে কার অনুমতি লবে আপনার ইচ্ছায় তবে
পিতাসঙ্গে হিমালয়ে যাই ॥

—আগমনী (১), পৃঃ ৫১৮

নারদ

নারদের বীণা শুনে কশ্যপ ভাবেন মনে
ঘটাইল বিধি এনে যা ভেবেছি এখনি।
যদি এ সকল শ্রুত হন মুনি, ত্রিজগত
জানাজানি গতমাত্র করিবেন এখনি ॥
পাইয়াছি পরিচয় কথা নহি পেটে রয়
খুড়া মহাশয়কে হয় ঠকের মধ্যে ধরিতে।
চড়িয়ে বেড়ান ঢেঁকি লাগালাগি ঠগাঠগি
ইহা ভিন্ন নাহি দেখি অন্য কর্ম করিতে ॥
উনি এক মহাধন, ইহা বলি তপোধন
রাখিয়াছেন আয়োজন বসনেতে ঢাকিয়ে।
হেন কালে দেবঋষি তথা উপণীত আসি
কি কর কশ্যপ বসি জিজ্ঞাসেন ডাকিয়ে ॥
কহেন অদিতিনাথ এস এস খুল্লতাত
ভাগ্যোদয়ে সাক্ষাৎ আপনার সহিতে।
মহাশয়ের শ্রীচরণ করি আজ সন্দর্শন
যে তুষ্ট হইল মন নাহি পারি কহিতে ॥
এক্ষণে কোথায় যান বীণাতে মিশায়ে তান
করিয়া মধুর গান সুমধুর স্বরেতে।
দেব ঋষি জিজ্ঞাসিল কশ্যপ আছে তো ভাল
এবার সাক্ষাৎ হল বহুদিন পরেতে ॥
বাপু একটা কথা বলি উঠ দেখি দোঁহে মিলি
একবার কোলাকুলি তব সঙ্গে করিব।
শুনিয়া কশ্যপ বলে দিল বেটা পেঁচে ফেলে
এখান হতে উঠে গেলে অমনি ধরা পড়িব ॥
এমত অন্তরে ভেবে মুনি কন বৈস এবে
আপনকার সঙ্গে হবে কোলাকুলি পরেতে।

ঋষি কন বিলক্ষণ   এস করি আলিঙ্গন
ইহা বলি তপোবন   কর ধরেন করেতে ॥
কশ্যপেরে উঠাইল   খোলাকুশ পড়ে গেল
হাসি ঋষি জিজ্ঞাসিল   ঢেকে কেন রেখেছ।
লজ্জা পেয়ে মুনি কয়   কি করিব মহাশয়
দিতে হৈল পরিচয়   আপনি যদি দেখেছ ॥
সঙ্গতি নাহিক ঘরে   ছেলেগুলো দুঃখে মরে
এ জন্যেতে অন্য কারে   না পারিলাম কহিতে।
কহিলাম আপনার আগে   আপনি কল্য যোগেযাগে
সেরে দেব ঘর যোগে   বামনের পৈতে ॥
শুনিয়া নারদ বলে   আরে বাপু খেপা ছেলে
খোলাকুশ ঢেকে ছিলে   এই কথার কারণে।
আমি ত তেমন নই   কার কথা কারে কই
সকলের ভাল বই   মন্দ কিছু করিনে ॥
বামনের পৈতে হবে   কে বা কারে কইতে.যাবে
ইহা বলি মুনি তবে   মৃদু মৃদু হাসিয়ে।
করিলেন গমন   যথায় চতুরানন
উপনীত তপোধন   শীঘ্র তথা আসিয়ে ॥
বন্দিয়া চরণপদ্ম   পদ্মযোনির সান্নিধ্য
হইতে নারদ কৈল যাত্রা।
মনে মনে ঐকান্তে   শ্রীকান্তে করিয়ে চিন্তে
চলেন পুরোহিতে দিতে বার্তা ॥

*   *   *

এই মত দেবঋষি পথে যেতে যেতে
নিমন্ত্রণ করিছেন নানা বর্ণ জেতে ॥
অতি দূরে দৃষ্ট যারে হয় দুই পাশে।
শীঘ্র উপনীত হয়ে কন তার পাশে ॥
বামন দেবের কল্য হবে যজ্ঞ সূত্র।
যে যাবে সে পাবে কিছু হয়েছে তার সূত্র ॥

মহাঘোরতর ঘটা করেছেন মুনি।
দ্বিজেরে দেবেন দান কত শত মনি॥
বাস্ত করে কন যেয়ো কশ্যপের বাস।
খাবে আর পাবে কত যোড়া যোড়া বাস॥
এই মত ভূতলে করিয়া তন্ন তন্ন।
মুনিগণ আদি মুনি কৈল নিমন্তন্ন॥

*　　*　　*

ভয়ান্বিত হয়ে অতি ভাবিছেন মনে।
একর্ম সম্পূর্ণ তবে করিব কেমনে॥

*　　*　　*

মনে মনে মন্ত্রণা করে　　মহামুনি ধীরে ধীরে
কৈলাস শিখরের পরে যাচ্ছেন।
বাজে বীণা সুমধুর　　তাহে মিলাইয়া স্বর
শ্রীহরির গুণবাদ গাচ্ছেন॥

*　　*　　*

দৃষ্টি করি নারদেরে　গানভঙ্গ করি পরে
জিজ্ঞাসেন সমাদরে　দেবের দেবতা।
কহ মুনি বিবরণ　কি জন্যেতে আগমন
শুনিয়ে নারদ কন　আছয়ে বারতা॥
শুন প্রভু ত্রিপুরারি　কশ্যপ ভবনে হরি
হয়েছেন অবতরি　বামন রূপেতে।
আইলাম তথা হইতে　নিমন্ত্রণ বার্তা কইতে
প্রভুর কল্য হবে পৈতে　রজনী প্রভাতে॥
নিজগণ সঙ্গে লয়ে　অধিষ্ঠান হবে গিয়ে
এই কথা হরে কয়ে　চলিলেন মুনি।
অন্নপূর্ণা সন্নিধানে　গিয়ে আনন্দিত মনে
প্রণমিয়ে শ্রীচরণে　কহেন মিষ্ট বাণী॥
শুন শিবে শিবদারা　ত্বং ত্রিপুরে পরাৎপরা
তব শুভদৃষ্টে তারা　মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

তুমি সংসারের সার দিলাম শ্রীপদে ভার
আমায় কর মা এবার অভয়ে নির্ভয় ॥
নারদের স্তুতিবাণী শুনি কন দাক্ষায়ণী
কি কহিবে কহ মুনি নিজ প্রয়োজন ॥
বিনয় করিয়া অতি ঋষি কন শুন সতী
হয়েছেন কমলাপতি অদিতিনন্দন ॥
তাঁর যজ্ঞসূত্র হবে এই কথা শুনি সবে
ত্রিলোকনিবাসী সবে করিলাম নিমন্তন্ন।
কশ্যপ অজ্ঞাতসারে আপনি এ কর্ম করে
তাই ভাবি কি প্রকারে হইবে সম্পন্ন ॥
দয়াময়ি দয়া করে বারেক কশ্যপপুরে
যেতে হবে মা তোমারে আজি নিশি অন্তে
অন্নপূর্ণায় ইহা বলি হয়ে মহাকুতূহলি
দেবঋষি যান চলি ভাবিয়া শ্রীকান্তে ॥

নিমন্ত্রণ সবে হৈল নারদ স্বস্থানে গেল
ক্রমে নিশি পোহাইল রবির উদয়।
স্নান করি শীঘ্রগতি লয়ে ভবদেব পুঁথি
চলিলেন বৃহস্পতি কশ্যপ আলয় ॥
হয়ে তথা উপনীত কহেন মুনি মহাক্রুত
কোথা কে কশ্যপ কত এ দিকের দেরী।
কশ্যপ কহেন আন কহ মুনি মতিমান
এত প্রাতে কোথা যান পুঁথি সঙ্গে করি ॥
শুনি বৃহস্পতি কন কোথায় যান সে কেমন
বামনের উপনয়ন হইবেক অদ্য।
স্বর্গ মর্ত্য আদি সব ত্রিলোক হয়েছে রব
শুনিলাম অসম্ভব করেছ বরাদ্দ ॥

কশ্যপ এ কথা শুনি মুখে নাহি সরে বাণী
হেন কালে কত মুনি আইল ব্রাহ্মণ।
সুর সঙ্গে সুরপতি অগ্রে আসি শীঘ্রগতি
করিল আশ্চর্য অতি সভার রচন॥

সুন্দর সভার ছটা বসেছে দ্বিজের ঘটা
কপালেতে ঊর্ধ্ব ফোঁটা কারুর শিরে লম্বা জটা
কশ্যপ বলেন লেটা ঘটালে নারুদে বেটা
তখন বুঝেছি সেটা সমূলেতে করলে খোটা
ভাল কি করেছে এটা নেহাৎ তার বুদ্ধি মোটা
পরের মন্দ হবে যেটা সেই কর্মে বড় আঁটা
ঋষির মধ্যে বড় ঠেঁটা কে কোথা দেখেছে কটা
নীচে লাউ উপরে সোঁটা হাতে করে সদাই সেটা
বেড়ায় যেন হাবা বেটা চাল চুলো নাই নির্লজ্জেটা
কি সাউখুড়ি করেন একটা মিথ্যে কথার ধুকড়ি ওটা
সত্য কয় না একটি ফোঁটা গণ্ডগোলের একটি গোটা
বিষম দেখি বুকের পাটা মাগ ছেলে নাই ন্যাংটা ওটা
কিছুতেই যায়না আঁটা বেটা সব দুয়ারের ফেন চাটা।
নারদের নাম দেখ তিন অক্ষরে হল।
তিনটে অক্ষরের মধ্যে উহার একটাও নয় ভাল॥

না'য়ের দোষ কি ?

নাঞ্ছনা, নাফানাফি, নানানেঠা, নাকরা,
নাজেহাল, নাগানাগি, নাঠানাঠি, নরাধম,
নাড়াসাই, নাথখোয়ারে, নানাস্থানী,
নাফাডগরে, নাককাটা, নাশকরা,
নাচার নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার॥

'র'য়ের দোষ কি ?

রোদন, রণ, রোকারুকি, রোগ, রক্তপাত,
রগটানা, রগড়ারগড়ি, রসাভাস, রঙ্গ করা, রসপড়া॥

'দ'য়ের দোষ কি ?

দলাদলি, দ্বন্দ্ব, দৌরাত্ম্য, দরবার, দস্যুবৃত্তি, দয়াহীন,
দ্বন্দ্ব করা, দলবর্তী, দরিদ্র, দণ্ড, দশাহীন, দরদ, দৈন্য,
দকে পড়া, দর্প করা, দৌড়াদৌড়ি, দর্পহারী ॥

—বাসন ভিক্ষা কবি

জটিলা কুটিলা

কৃষ্ণের যাত্রা শুনি মথুরায় আহ্লাদে প্রফুল্ল কায়
কুটিলে গিয়ে জটিলারে কয়।
বলে গোকুলে হৈল কিসের গোল শুনিস নাই সুমঙ্গল
নন্দের বেটা গোকুল ছাড়া হয় ॥
কংস রাজার এসে দূত লয়ে যায় নন্দসুত
যজ্ঞচ্ছলে করিবে দর্প চুর।
ভালই হইল ঘুচিল দায় ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়
বৃন্দাবনের বালাই হইল দূর ॥
হেসে হেসে কুটিলে কয় এমন আহ্লাদ হবার নয়
আজি কি আহ্লাদের দিন মরি।
একি আহ্লাদ বল মা ফুটে আহ্লাদে গা শিউরে উঠে
আহ্লাদের ভারেতে হইলাম ভারি ॥
কোথা থেকে আহ্লাদ জুটিল আহ্লাদে পেট ফেটে উঠিল
আহ্লাদ যে ধরে না আর ঘরে।
ঘিরেছে আহ্লাদ গাটা ময় এত আহ্লাদ ভাল নয়
সামলাতে না পারলে পরে আহ্লাদে লোক মরে॥
জটিলে বলে মরি মরি আয় মা একবার কোলে করি
ফিরে বল কি কথা শুনালি।
খুব খুব খুব হয়েছে চারিযুগ যে ধর্ম আছে
কালুটে আমার কুলে দিয়েছে কালি ॥

কংস রাজা আছে খাপা যাবা মাত্র সারবে দফা
দস্যু কেবল দশ দিন কাল বাঁচে।
সেই মরিবে অলপ্ পেয়ে কেবল আমার মাথাটা খেয়ে
রাখিল খোঁটা যত শত্রুর কাছে॥
হে কুটিলে সত্য বটে তোর কথায় যে সন্দ ঘটে
বলি ঠাটকী মেয়ে ঠাট করিয়া কয়।
কুটিলে বলে আমর মাগী মিথ্যা বলব কিসের লাগি
আমার কথা তোর কথাই যেন নয়॥
খন বয়স কাঁচা কথা কাঁচা বয়স কালে নাই সে সব ধাঁচা
এখন আমি দেখে এসেছি পথে।
কি বলিস মা আই আই দুটি চক্ষের মাথা খাই
দুটি ভাই উঠেছে গিয়া রথে॥
তখন জটিলা বলে যা মা তবে দেখগে পাছে প্রমাদ হবে
তোদের কমলিনী সঙ্গে পাছে যায়।
ভিন্ন গাঁয়ে জানে না কেউ গাঁয়ে মরে গাঁয়ের ঢেউ
গেলে রাষ্ট্র হবে মথুরায়॥
নন্দের বেটা মলে পরে পাপ গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে
সোনার বউকে নিয়ে করিব ঘর।
গঙ্গা নাওয়ার করাব দিব্য খাওয়ায়ে দিব্য পঞ্চ গব্য
রাম বল মন ঘাম দিয়ে গেল জ্বর॥
সাধ করে দিয়েছি বিয়ে ঘর করি নাই বউকে নিয়ে
মনের দুঃখে হইয়াছি মাটি।
ফিরে করিব সতী সাধ্বী মন্দ বলে কার সাধ্যি
পুড়িয়ে সোণা ফিরে করব খাঁটি॥

—অক্রূর সংবাদ (২), পৃঃ ১৭৫

পরে প্রভু চিন্তামণি মন্ত্রণার শিরোমণি
আনি এক মৃত্তিকার ঘট।
নহে স্থূল নহে ক্ষুদ্র সহস্র করেন ছিদ্র
কহিছেন বচন দুর্ঘট ॥
ব্রজে যদি থাকে কেউ সতী নারী এই কলসে আনি বারি
অসতীর কক্ষে না আসিবে।
দেখিব কেমন বৈদ্য বটি সেই জলে বাঁটিয়ে বটি
দিলে গোপাল চৈতন্য পাবে ॥
কুটিলে ছিল নন্দপুরে অমনি এসে তারপরে
বলে, জল আনিগে দাও মোরে।
আমি সতী আর মাকে জানি আর গোকুলে কুলমজান
ঢাক-বাজানী প্রায় ঘরে ঘরে ॥
লোককে বলি জায় বেজায় ঘট লয়ে কুটিলে যায়
ডুবিয়ে কুম্ভ যমুনার জলে।
যত বার কক্ষে তোলা রক্ষে হয় না এক তোলা
দুঃখে চক্ষে ধারা বেয়ে চলে ॥
চলিতে কাঁপে কাঁকালি তাপে তনু হয়েছে কালি
যায় লজ্জায় বসনে মুখ ঢেকে ॥
শুনিয়া লজ্জার কথা জটিলে জুটিয়ে তথা
কুপিয়ে কয় কুটিলেকে ডেকে ॥
কি করিলি ছি লো ছি লো গর্ভে মরণ ছিলো ভাল
জানিলে মারিতাম সূতিকা ঘরে টিপে।
দিলি নির্মল কুলে টিকে টিক্ টিক্ করিবে লোকে
টিকতে পারিব না কোন রূপে ॥
আমি জানি লক্ষ্মী মেয়ে অভাগীর সঙ্গ পেয়ে
খেয়ে বুঝি ফেলেছিস মোর মাথা।

আমাদের সে এক কাল ছিল এখনকার অভাগীগুলো
লজ্জা নাই সজ্জা নিয়েই কথা ॥
হয়ে কুলের কুলবতী নিকশি পেড়ে চিকণ ধুতি
ঠোঁট রাঙ্গিয়ে সর্বদা মুখ তোলা।
মিছে মিছে যায় মুখ লুকিয়ে আড়ে আড়ে আড়চোখে চেয়ে
মুখ দেখিয়ে বুক চিতিয়ে চলা ॥
হাতে গহনা সোনার চিপ ভ্রূতে খয়েরের টিপ
সিঁতেয় সিঁদুর পরা গিয়েছে উঠে।
করে না অন্য কারবার দিনের মধ্যে ষোল বার
ভালবাসেন যেতে জলের ঘাটে ॥
মাথায় আরমানী খোঁপা চারদিকে তার বেড়া চাঁপা
ঝাঁপটা কাটা কান ঢাকা সব চুল।
পথে যেন ছবি নাচায় ছোঁড়ারা সব ফিরে ফিরে চায়
এতে কি থাকে কুলকামিনীর কুল ॥
যেতে তোকে বামুনপাড়া নিত্যি আমি দেই লো তাড়া
মান না সাড়া, থাকলো বেটি থাক।
যেমন সত্যপীরের ঘোড়া করিব খোঁড়া রসের গোড়া
পা কেটে দিয়ে ঘুচাব সকল জাঁক ॥

জটিলা নানা ছলে বলে বলে চললাম আমি জলে
ঘট দাও হে বৈদ্য গুণসিন্ধু।
বলে গিয়ে মহাতুলে জলে ডুবিয়ে দেখে তুলে
ঘটে জল থাকিল না এক বিন্দু ॥
লাজে হয়ে জড়সড় ঘাগী মাগীদের চালাকি বড়
কোপ করে কহিছে বৈদ্যপ্রতি।
কোথাকার এক অলপ্পেয়ে বসেছে এক রঙ্গ পেয়ে
আই মা হলাম সতী হয়ে অসতী ॥

হতভাগার ভোগার ভুলে ভাঙ্গা ঘাটে জল তুলে
ঘটে কলঙ্ক মিছে কই কারে।
যাউন বৈদ্য যমের বাড়ী ছিদ্র যাতে চৌদ্দ বুড়ি
তাতে কেউ কি জল আনতে পারে॥
আঁচল পেতে রৌদ্র ধরা পাষাণের সত্ত্ব করা
বসনে আগুন বেঁধে আনা।
কান দিয়ে বাজায় শিঙ্গে ডেঙ্গায় চালায় ডিঙ্গে
সাধ্য হেন করে কোন জনা॥
কার সাধ্য কোন কালে জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালে
জলে আগুন কে দেয় কোন দেশে।
হতভাগার কথা শুনে মায়ে ঝিয়ে মরি মনাগুণে
জলে মলাম জল আনতে এসে॥

—কলঙ্ক ভঞ্জন (২), পৃঃ ১২২

৩

কুটিলে বলে ঘুরায়ে আঁখি থাক থাক লো দাদাকে ডাকি
বাধালি লেটা ঘটা করে শেষকালে।
ঘটাবি একটা দুর্যোগ তারি কচ্ছিস উদ্যোগ
যোগ করেছিস আবার সবাই মেলে॥
আছিস ধরা শয়নে পড়ে বাসে শত বৎসর উপবাসে
কেমন কঠিন তোর প্রাণী।
অস্থি চর্ম দেহ মলিনে কি আশ্চর্য তবু মলিনে
অদ্যাপি তোর কালা কালা বাণী॥
পর পুরুষ তো অনেকে ভজে চিরকাল নয় আবার ত্যজে
অঙ্গে বঙ্গে আছে তো অনেক লোক লো।
অনেকের তো ভাঙ্গে কুরীত বাপ রে বাপ এ কি বিপরীত
সামলাতে পারিলিনে শ্যামের শোক লো॥
কি চক্ষে দেখেছিস তাকে পোড়া-কপালে ধরা-পরাকে
রূপ আছে কি গুণ আছে তার লো।

মাথায় করে বয় বাধা কোন্ ঠাঁই তার ভাল রাধা
তিন ঠাঁই শরীরে বাঁকা যার লো ॥
কি রূপ নন্দের কৃষ্ণ ছোঁড়া যেন পোড়া কাষ্ঠ
অপকৃষ্ট কর্ম চরায় গাই লো।
মাথায় চূড়া করে পাঁচনি নিগু'ণের চূড়ামণি
কালার পেটে কালির অক্ষর নাই লো ॥
বলিতে কথা ঘৃণা করে চুরি করে খায় লোকের ঘরে
বারো বৎসর বয়সে এমন লো।
গোকুলের গোপকে দিয়া কষ্ট কত করেছে ভাঁড় নষ্ট
উচ্ছিষ্ট করে দেবের অগ্রভাগ লো ॥
মানে না মান্ত লোকের মানা কদম গাছে করে থানা
জন্ম জ্বালা জল আনতে জানি লো।
ছুঁয়ে অঙ্গ সর্বনেশে সতীর সতীত্ব নাশে
নন্দের ভয়ে কেউ বলে না বাণী লো ॥
স্ত্রী হত্যে গো হত্যে কিছু ভয় করে না মর্ত্যে
বৎসাসুর পুতনা মাগিকে মারে।
হয়ে কপট নেয়ে যমুনার ঘাটে অবলা মেয়ের পয়সা লোটে
মথুরার হাট বন্ধ করে ॥
ঘর জ্বালানে ঘর-মজানে কুমন্ত্র কুতন্ত্র জানে
লয়ে যায় নির্জন নিবিড় বনে।
ছিদ্র করে বাঁশের পাবে ফুঁ দিয়ে মজিয়ে ভাবে
কুলবতীকে কুল মজাতে টানে ॥
মর মর তোর গলায় দড়ি তারি জন্যে দৌড়াদৌড়ি
ক্ষেপলি এ জন্ম হারালি, ক্ষেপালি লো।
আবার চাইতে এলি অনুমতি আরে মোলো কি দুর্মতি
আমায় বুঝি ঘটকালির ভার দিলি লো ॥
তবে আমিও তোদের সঙ্গী হই শ্যাম কলঙ্কের বোঝা বই
যোগে যাগে ফিরি তোদের পাছে লো।

দাদার মনের হতে যাই নন্দের বেটার গুণ গাই
কত বা কপালে আছে লেখা লো ॥
জড়াতে পারলে আমাকে শুদ্ধ তবেই হয় অঙ্গ শুদ্ধ
শক্র গেলে শ্যাম কলঙ্ক ঢাকে লো।
ভার্যে ডুবিল শ্যাম সাগরে বুন তাতে ঝাঁপ দিলে পরে
আয়ান দাদার মুখটা বড় থাকে লো ॥
ওলো পোড়ামুখি তাই কই তেমন মায়ের মেয়ে নই
বাঁশী শুনে ভাসিব কুল ভাসিয়ে।
কালার কথা বিষ বর্ষণ যে করে তার মুখ দর্শন
করি না, প্রতিজ্ঞা মায়ে ঝিয়ে লো ॥
সতী লক্ষ্মীর পেটের ছেলে কভু চলিনে মন্দ চেলে
তোদের কাছে দাঁড়াতে মরি ত্রাসে।
তোদের বাতাস লাগলে গায় কলঙ্কিনী হতে হয়
সঙ্গ দোষে সৎ গুণ যে নাশে।
সকালে তোর ছিল রীতি সঙ্গোপনে শ্যাম পিরীতি
ধরলে ভয়ে হতিস জড় সড়।
আজ্ঞা নিতে এলি মোর বলে কয়ে ডাকাতি তোর
ইদানি তোর বুক বেড়েছে বড় ॥

—কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃঃ ৩০৯

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণের মহিমা

প্রণমামি দ্বিজবর দ্বিজরূপে পীতাম্বর
অভেদ আত্মা বিরাজেন ভূতলে।
আরাধিলে দ্বিজবরে কি না হয় দ্বিজ বরে
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে ॥

যেখানেতে দ্বিজ বিশ্রাম স্বগ্রামেতে স্বর্গধাম
ভাবিলে জীব অনায়াসে পায়।
হরি মন যার জ্ঞান হরি সেই তো গৃহ পরিহরি
হরি দেখতে বৃন্দাবন যায়॥
শিবমুখে সর্বদা বাণী সদা শুনেন শর্বাণী
সর্বতীর্থ ব্রাহ্মণচরণে।
কর্মভূমি পৃথিবীতে দ্বিজ হয়েছেন বীজ ইহাতে
সর্ব কর্ম বিফল দ্বিজ বিনে॥
যেমন ধর্ম বিনা বিফল সত্য ঔষধ বিফল বিনা পথ্য
গৃহ বিফল অতিথি নাই যার।
নয়ন বিফল দৃষ্টি বিনে দৃষ্টি বিফল ইষ্ট পানে
দৃষ্টি নাই ভবে যে জনার॥
হরি বলেছেন নিজ মুখে ভোজন আমার দ্বিজমুখে
চতুর্মুখের মুখে ঐ কথাই।
এখন অনেক পাষণ্ডগণে এরা এখন মনে গণে
কলির ব্রাহ্মণের বস্তু নাই॥
করি দ্বিজের অপমান পায় না ফল বর্তমান
বিষ নাই বলে অনায়াসে বিষধরে ধরে।
কিন্তু অমোঘ দ্বিজবাক্য নরের নরক মোক্ষ
কালে ফলে সেটা মনে না করে॥
পাপ করে যেই দণ্ডে তখনি কি যম দণ্ডে
পুণ্য করলে বাঞ্ছা পূর্ণ তখনি কি হয়।
বৃক্ষ রোপন যেই দিবে সেই দিনেই কি ফল দিবে
কিন্তু ফল ফলিবে নিশ্চয়॥
যে দিনে কুপথ্য যোগ সেই দিনে কি হয় রোগ
কুপথ্য রোগের মূল বটে।
যেদিন ধাত্রী কাটে নাড়ী সেই দিনে কি উঠে দাড়ি
কাল পেয়ে যৌবনে দাড়ি উঠে॥

যেদিন দেয় খড়ি হাতে সেদিনই কি হাতে হাতে
পাঠ হয় চণ্ডী।
যেদিন সন্তান পড়ে ভূমে সেই দিনে কি গয়াভূমে
গিয়ে পিতার দিয়ে আসে পিণ্ডি॥
অতএব ব্রহ্মমন্যু আশীর্বাদ কালে ফলে হয় না বাদ
বেদ মিথ্যা কখনো কি হয়।
দ্বিজ সকলের পূজ্য দ্বিজ রূপে চন্দ্র সূর্য
ব্রহ্মতেজ তাতেই জ্যোতির্ময়॥

দ্বিজপূজ্য বেদের ধ্বনি কলি যুগে কোন কোন ধনী
এসব কথায় নাহি দেন কান।
না মেনে বেদের অর্থ সদাই কেবল অর্থ অর্থ
অর্থলোভে অনর্থ ঘটান॥
হারাইয়া জ্ঞান ধন ধনের জন্য দ্বিজ-নিধন
তার সাক্ষী নূতন তালুক কিনে।
ব্রহ্মত্রে দিয়ে টান দ্বিজের বিপদ আগে ঘটান
মহাপুণ্যের পুণ্যে করেন সেই দিনে।
আমিন পাঠান ধায় সে বেটা পাঠান প্রায়
যমদূত অপেক্ষা গুণ বেশি।
বার করে এক বকেয়া চিঠে অগ্রেতে ব্রাহ্মণের ভিটে
ফেলেন গিয়ে রসি॥
যার বিষয় নহে তস্য আগে গিয়ে করে তপুতস্য
ভট্টাচার্য এ যে হচ্ছে মাল।
এগার বিঘা হল কালি খাজনা দিতে হবে কালই
দ্বিজ অমনি শুকায়ে কালি বলে মা কি করলি কালি
একেবারে পয়মাল॥
আটক জমি এগার বন্দ এগার জনের আহার বন্ধ
কেঁদে দ্বিজ জমিদার গোচরে।

বলে, আমার উপজীবিকা মাত্র আর অন্য নাহি যোত্র
আছে তায়দাদ দলিলপত্র ঘরে ॥
জমিদার কন মহাশয় সে দলিলের কর্ম নয়
ক্রো সাহেবের ছাড় দেখাতে পার।
তবে দিতে পারি ছাড় নচেৎ বিষয় পাওয়া ভার
এক্ষণেতে ওসব কথা ছাড় ॥

—জন্মাষ্টমী, পৃঃ ২

২

শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি

তুমি তো ব্রাহ্মণের মান বাড়ায়েছ ভগবান
দিয়ে দান কৃপানিধান হবে দত্তাপহারী।
পূজিলে ব্রাহ্মণের পদ হয় তার মোক্ষ পদ
কোন তুচ্ছ ব্রহ্মপদ হাঁ হে ভৃগুপদহৃদেধারি ॥
ব্রাহ্মণ নন সামান্য ব্রাহ্মণের কত মান্য
ব্রাহ্মণ করলে অমান্য শূন্য হয় বংশ।
ব্রহ্মণ্যদেব বলেছ তুমি নরের মধ্যে ব্রাহ্মণ আমি
ব্রাহ্মণ পেলেই পাই আমি অন্যেতে নাই অংশ ॥
ব্রাহ্মণের করে কোপ সগর হল বংশ লোপ
জয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল।
কয়েছিল কটু ভাষা মহামুনি দুর্বাসা
শাপ দিলেন তাই অবনীতে এল ॥
কেবল ব্রাহ্মণের কোপে রঘুবর ভগীরথের হয় শাপে বর
মাংস-পিণ্ড অস্থি নাস্তি ছিল।
হলো দেহ সুন্দর ব্রহ্মশাপে ইন্দ্রের
সহস্র চিহ্ন অঙ্গময় হলো ॥

কলির ব্রাহ্মণ

পুনরায় লক্ষ্মণ কন বাক্য অতি সুচিক্কণ
কলি আগমন হবে যখন দ্বিজ হারাবেন মান।
সইতে নারিবে ভূ-ভার দ্বিজের থাকবে না দ্বিজের ব্যাভার
সবার কাছে হবে অপমান ॥
ত্যাগ করেন ত্রিসন্ধ্যে কুকর্মেতে ত্রিসন্ধ্যে
যাগ যজ্ঞ সকলি হবে হত।
এখন দিলে রাজ্য একটি পাই কি নিষ্ঠ দ্বিজ
একটি পাই করিলে দান কলিতে সেইখানে শত শত ॥
আছে ব্রাহ্মণের যে আচার কলিতে হবে অনাচার
হবে অবিচার যাবে জেতে বেজেতে।
লবে দান হবে কুরীত আহার দিলেই বড় পিরীত
চণ্ডাল হইলেও পারে খেতে যেতে ॥
পকান্ন যদি শোনেন সেধে গিয়ে আপনি বলেন
পিরীত ভোজন সকল বাড়ীতেই আছে।
যখন কিনে বাজারের দ্রব্য খাওয়া যায়, হাড়ি হলেও যাওয়া যায়
প্রণয়েতে জাত কোথা আছে ॥
আমরা যদিও যাই কে কি করে, সেদিন শিরোমণি খুড়ো কেমন করে
ছেলেকে পাঠালেন জেলের বাড়ী।
ন্যায়বাগীশ সন্ধ্যাকালে লয়ে গেছিলেন ভাইপোর ছেলে
লুচি নিয়ে আসতে তাড়াতাড়ি ॥
আমাদের অত নাই কি বলহে নাতজামাই
মূর্খ বটে ধর্মভয়টা আছে।
খেতে যাওয়া উচিত নয় থাক না কেন প্রণয়
বিদেশে কে তত্ত্ব লয় যা করবে মনে আছে ॥
কিন্তু আজ পাকা ফলারের শুনলে কথা ব্রাহ্মণী খেয়ে ফেলবে মাথা
গণ্ডা দশেক ছেলে দেবেন ছেড়ে।

যদি বলি যাব না আছে দলাদলি সে বলে ভাব গলাগলি
দিবে মাগী গালাগালি তাড়কার মত খেতে আসবে তেড়ে॥
আমি বলি সে হয় জেতে তবু মাগী চাবে যেতে
কর্মকর্তার ভাজেতে আমাতে গঙ্গাজল।
এবার গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম ধর্ম স্ববাদ করে এলাম
আমি না হয় খেতে গেলাম তোর তাতে কি বল॥
ছেলেগুলো মরে কেঁদে খাবে দশখান আনবে বেঁধে
দিনরাত্রি মরি বেঁধে একদিন যায় সে ভাল।
আমরা বরং যেতে ভাবি মাগীগুলো ভাই বড় লোভী
ছেলের নামে পোয়াতী বর্তায় চিরকাল॥

যজমেনে বামুন পরিবার

এখনকার যজমেনে বামুনের রীত পেলেথুলেই বড় প্রীত
হয়ে বসেন এমন সুহৃদ এক মরণে মরেছে।
বলে এ আমার বড় যজমান এ হতে কি পান জজ মান
সুপ্রীম কোর্টের জজ মান পান না এর কাছে॥
শুনেন যদি দুর্গোৎসব মনে হয় ভারি মহোৎসব
ভার ভার আনেন সব সামগ্রী বাঁধিয়ে।
জ্ঞান নাই শুচি অশুচি ধন্য ধন্য ধন্য রুচি
দই মাখান পাতের লুচি নিয়ে দেন ব্রাহ্মণীকে গিয়ে॥
ঘৃণা হয় না এতটুক ওদের বাড়ীর মাগীগুলো ভাই এত পেটুক
তাদের ইচ্ছা জুটুক পটুক পাকা ফলার।
মাগীদের ছেলে থাকে সম্মুখে পাছু ফিরে লুচি তুলে মুখে
আড়ে গেলে পোড়ার মুখে শব্দ হয় না গলার।
যদি ছেলেটা দেখতে পেলে লুকিয়ে রাখে পাতার তলে
বলে দূর হ পোড়াকপালে ছেলে একা ফেলে গেল যা।
বলে তোর বাপ এনেছে লুচি আছে তোলা, খাইও এখন সন্ধ্যাবেলা
নাওসে একটা পাকা কলা আছে মজা মজা॥

—শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ, পৃঃ ৩৪৪

পুরোহিত বামুন

১

নন্দের করিতে হিত অগ্রে এলেন পুরোহিত
রীতি নীতি দেখে ভাবেন মনে ॥
বরণের যেটা বড় যোড় চোদ্দ পোয়া হল জোর
কোঁচা করতে কুলায় নাকো কাছা।
কি দিব আর পরিচয় ভেঙ্গে বলা উচিত নয়
তারি উপযুক্ত খাদি কাচা ॥
ঘড়া গাড়ু সব নালুক জল থাকে না মাঝে ভুলুক
থাল রেকাবি ফুঁ দিলে যায় উড়ে।
পুরোহিত দেখে হন রুক্ষ কপালের উপর তোলেন চক্ষু
দেখে মরেন মাথামুণ্ডু খুঁড়ে ॥
যজ্ঞ দান সামগ্রী যত পুরোহিত করেন হস্তগত
বলেন লেহ্য মত পাব ইহার সিকি ॥
আমি হোতা আমি ব্রহ্মা সকলে আমি কৃতকর্মা
নাম আমার মানিক শর্মা আমি কারু শেখান কথা কি শিখি ॥
আছেন বড় বড় অধ্যাপক ধর্মশাস্ত্রে অতিব্যাপক
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি করে যত।
তর্কবাগীশ সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িক বিদ্যাবন্ত
এরা সকল আমার হস্তগত ॥
বিদ্যাবাগীশ বিদ্যানিধি আমার কাছে লন বিধি
পড়ো আমার যত বঙ্গদেশী।
আমা হতে কে বিদ্যাবান আসুক আমার বিদ্যমান
কোন বেটা জ্ঞানবান মান্যমান বেশি ॥
মুখে মুখে করাই শ্রাদ্ধ মিনিট পাঁচ ছয় লাগে হদ্দ
ভুজ্জির চাল বাঁধতে যতক্ষণ।
দুর্গোৎসব শ্যামা পূজা তাতে যায় পণ্ডিত বুঝা
চণ্ডী পাঠে আমি একজন ॥ —নন্দোৎসব, পৃঃ ২৩

ষণ্ডামার্ক পুরোহিত সম্বন্ধে হিরণ্যকশিপুর উক্তি :

বুকে চাপাইয়া গিরি ঘুচাব বেটার পুরুতগিরি
অন্নদাস জন্ম মোর ঘরে।
ওরে বেটা খোলাকাটা হয়ে বসেছ গলাকাটা
গলাটা কাটিলে রাগ পড়ে॥
বেটাদের বিদ্যা যত সকলি আমি জানি ত
ঘটে শূন্য চোটে ভট্টাচার্য।
দেখেছি বেটারা বিয়ের কালে বলিদানের মন্ত্র বলে
রাজ পুরোহিত নাম ধরেন আচার্য॥
চাষার কাছে চটকে চলে মানুষ দেখলেই মানসে বলে
গণেশের ধ্যানে মনসা পূজা করে।
ধরে যদি কেউ শব্দ দুষ্ট তবেই বলে শ্রীবিষ্ণু
ভুলেছি ওটা বলে ভয়ে মরে॥
চুপড়িতে সাজায়ে ভোজ্য ও বিদ্যায় ও বড় পূজ্য
দক্ষিণার বিষয়ে খুব খর।
সভা দেখিলেই ঝাড়েন থালি জেলে খাদিতে আলো চালি
বাঁধতে বেটাদের ব্যুৎপত্তি বড়॥

—প্রহ্লাদ চরিত্র, পৃঃ ৫৭৪

* * *

রবাহূত ব্রাহ্মণ

বীরভূঞে সব বামুন জুটে পরামর্শ করচে ঘাটে
বলে ভাই চলিবার কর ধার্য।
বৃন্দাবনের নন্দের ছেলে ভারি সম্পদ ভারি কপালে
দ্বারকায় পেতেছে সোনার রাজ্য।
সর্বাংশে পুরুষযোগ্য কুরুক্ষেত্রে করিবেন যজ্ঞ
নিমন্ত্রণ গিয়েছে নাগাদ লঙ্কা।
কর্ম শুনিলাম হদ্দ কাঙ্গালিদের বরাদ্দ
ফি ফি জন এক এক শত তঙ্কা

রবে যাচ্ছেন রবাহূত যে যাবে সে পাবে বহুৎ
বহু দূর যাই কি না যাই ভাবি।
ঘোষালের পো কোথা রামা দেখ দেখি কি করেন শ্যামা
মানকে মামা কি বলিস গো যাবি॥
কোথা গেলিরে সাতকড়ে শীঘ্র নে রে সাইত করে
বাঁধা ছাঁদা রেতের মধ্যে চুকো।
বেরুব রাত্রি হলে ভোর থোলের মধ্যে থালিটে পোর
নে কয়লা চকমকি আর হুঁকো॥
পীঠে বুঁচকি হাতে হুঁকো অমনি হল পশ্চিম মুখো
বৈদ্যনাথের বনের কাছে গিয়ে।
কারু কারু হয় না মত বলে ভাই সে অনেক পথ
বহ্বারম্ভে হয় না লঘু ক্রিয়ে॥
কথা শুনে হচ্ছি ভীতু পথে কেবল বিকায় ছাতু
তা হলে তো আমাদের চলে না।
না জেনে শুনে পথে চল্লি শুনেছি বড় কুপল্লী
কোন গাঁয়ে গুড় মুড়ি মেলে না॥
কি হবে ভাই লেখা যোখা যাওয়া হচ্ছে কপাল টোকা
শয়েক দেড় শ আশা করছি বড়।
পথ চারি মাস কাল মরিব হেঁটে দেবে পাছে পয়সা বেঁটে
এই খানে তার বিবেচনা কর॥
আর একটা ভারি ভয় তিলি তামলীর বাড়ী নয়
ভদ্রলোকে বিদায় করিবে তথা।
আমি বলিলাম তখন দেখো ভারি মুস্কিল হবে ভেকো
শুধায় যদি সন্ধ্যা গায়ত্রীর কথা॥
একা জানলেই করিব জয় কি বলিস রে ধনঞ্জয়
সন্ধ্যা গায়ত্রী জানিস থোড়াথুড়ি।
শালকে আর শেওড়াফুলি তোর বাপ তো রাম গাঙ্গুলী
দক্ষিণ দেশে থাকত গোড়াগুড়ি॥

রামজয় কয় একি জালা গায়ত্রী জানে কোন শালা
আমি যেন সবারি মধ্যে চোর।
সবাই মেলে খোঁয়াড়ে ঢুকে আমাকে ফেলে কাঠগড়া মুখে
পয়সা নিয়ে মারিবে বুঝি দৌড়॥

—শ্রীমতীর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃঃ ৩০৬

* * *

বৈষ্ণব

বৈষ্ণব কাহাকে বলে ?

সদাশিব গুণমণি বৈষ্ণবের শিরোমণি
বৈষ্ণবী ভামিনী ঘরে যার।
শুনে কত জন্ম সুখ বৈষ্ণব নারদ শুক
কলিতে গৌরাঙ্গ অবতার॥
উদ্ধারিতে পরিণাম জীবকে দিয়ে হরিনাম
তিনি বলেন হতে সর্বত্যাগী।
সেই প্রেমে হয়ে মত্ত ত্যজে সংসার সম্পত্ত্য
রূপ সনাতন হয়েছেন বৈরাগী॥
এখনকার কোন কোন বৈষ্ণবের ধারা, যত বেটারা ধুমড়ি ধরা
ভজন নাহিক ভোজন ছত্রিশ জেতে।
বামুনের সঙ্গে করেন গোল রামের সঙ্গে রাম ছাগল
কত নেড়া যায় তুলনা দিতে॥
জারি দেখে লাগে দেক হাড়ি বেটা লয়ে ভেক
প্রণাম করে না দ্বিজবরে।
গৌর বলে কোটাল বেটা কপনি পরে আপনি মোটা
রেতে চুরি দিনে ভিক্ষা করে॥
যিনি মাস্থল চোর, জন্ম দাগী ভেক লয়ে হন ভণ্ড যোগী
এবে বৈরাগী আগে ছিল ডোম।
জেতের বাড়ী খান না ভাত পাঁঠা বললেই কানে হাত
জন্ম বেটা শুয়োর খাবার যম॥

—নবীন চাঁদ ও সোনামণি, পৃঃ ৬৫৫

ভণ্ড বৈষ্ণব নিন্দা

গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেড়া অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।
বলে গৌর বলে ডাক রসনা গৌর মন্ত্রে উপাসনা
নিতাই বলে নৃত্য করে ধূলায় গড়াগড়ি ॥
গৌর বলে আনন্দে মেতে একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে
বাগ্দী কোটাল ধোবা কলুতে একত্র সমস্ত।
বিল্বপত্র জবার ফুল দেখতে নারে চক্ষের শূল
কালী নাম শুনিলে কানে হস্ত ॥
দোয়াতের কালিকে সেহাই বলা কালীতলার পথে না চলা
হাট করে না কালীগঞ্জের হাটে।
হাঁড়ির কালিকে বলে ভূষা ভেড়েরা কি কালমুখা
কালভঞ্জিনী কালীর সঙ্গে বাদ করে কাল কাটে ॥
দক্ষসুতা মোক্ষদা মা সংসার জননী শ্যামা
শঙ্কর শরণাগত যে শ্যামাপদতলে।
কত ক্ষুদির বেটা রাম শম্মা শ্যামা মায়ের নাম সন না
শাক্ত বামুনের ভাত খান না বলি দিয়েছে বলে ॥
এদিকে কেউ ডোম কোটালকে করে শিষ্য, তার প্রতি নাই উষ্ম
শূয়োর বলিতে নাই দূষ্য আনন্দে ভোজন হয় বসে তাদের বাড়ী।
শাক্ত বামুনকে দয়া হয় না পাঁঠা উহাদের পেটে সয় না
ঐ বিষয়টায় মন্দাগ্নি ভারি ॥
কি বা ভক্তি কি বা তপস্বী জপের মালা সেবাদাসী
ভজন কুঠুরি আইরি কাঠের বেড়া।
গোসাঁইকে পাঁচ সিকে দিয়ে ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে
জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া ॥
ভজ হরি শ্রীনিবাস বিদ্যাপতি নিতাই দাস
শাস্ত্র অনেকের অগোচর নাহি কিছু।

এক এক জন বিদ্যাবন্ত করেন কিবা সিদ্ধান্ত
বদরিকাকে ব্যাখ্যা করে কচু ॥
না হবে যদি এত বিদ্যা কালী তারা মহাবিদ্যা
সঙ্গে সদা থাকে দ্বেষ করি।
যারা ভিন্ন ভাবে তারা থাকিতে তারা অন্ধ তারা
তারা বিমুখ হইলে বিমুখ হরি ॥

—শ্রীমতীর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃঃ ৩০২

২

বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা যত বেটা ধুমড়ি ধরা
জাতি কুল মজাইলে ইদানি।
লোককে জানান পরমার্থ অর্থ করতে নাই সামর্থ্য
খুলে বসে চরিতামৃত খানি ॥
সেবাদাসী সীমন্তিনী বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী
তাদের হাতে থোপ দেওয়া খঞ্জনী।
দেখে শুনে তাদের ভাব ভাবুকের হয় প্রাদুর্ভাব
ভাবিতে ভাবিতে ভাব ঘটে তখনি ॥
বলে চৈতন্যের চারি খুট এত বলি পাড়ে খুঁট
মাগীদিগে কার সাধ্য আঁটে।
আছে মাগীদের আবার শিক্ষে, বলে হরি বল মন দাও ভিক্ষে
এমনি দীক্ষে শতধারে কাটে ॥
নাকে তিলক রসকলি হাতে লয়ে পানের থিলি
এমনি গলি বার করেছে ভাই।
গেল সকল হিন্দুয়ানী বিচার নাই পান পানী
অবাক হয়ে ভাবছি বসে তাই ॥
কংস জেনে মর্মার্থ উঠিয়েছিল পরমার্থ
এখন অনর্থ ঘটাচ্ছে পদে পদে।

গৌর বলে মাগীরে কেঁদে লোককে ফেলবে বলে ফাঁদে
দেখো যেন কেউ পড়ো না আপদে ॥

—নন্দোৎসব, পৃঃ ২৪

৩

ভণ্ড বৈষ্ণবদের কালীদ্বেষ

কৃষ্ণ প্রতি গোপীর চিত্ত কালী কৃষ্ণেতে মিলিত
ইদানী বিপদ উপস্থিত নাহি মানে বেদ।
ভেড়াকান্ত নেড়াগুলো ভেড়েদের লেগেছে ভুলো
কালী কৃষ্ণ সদাই করে ভেদ ॥
বাছাদের কালীতে দ্বেষ চিরকালই ত্যাগ করা কই হয়েছে কালী
কথায় কথায় মুখে কালি লোকে দেয় সদাই।
গালি খেয়ে বরণ কালি মুখে কালি গালে কালি
অন্তরেতে সদা কালি কেবল দক্ষিণে কালী নাই।
ভেকধারী ভেড়েরা যত কালীতে না হয় না হক রত
কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা কোন আছে।
নদের মাঝে পেতে ফাঁদ ওদের মাথা খেয়েছে নিতাইচাঁদ
বুদ্ধি খেয়েছে অদ্বৈতচাঁদ গোরায় জাত নিয়েছে ॥
কায়স্থ, কলু, কোটালপুত্র কপ্‌নি মেরে এক গোত্র
ঘৃণা নাই কিছু মাত্র যেন জগন্নাথ ক্ষেত্র
সকল অন্নেই রুচি।
গৌরাঙ্গের কিবে দোহাই ভাতার মলে বিধবা নাই
এক মেয়ে শত জামাই বাবা মলে অশৌচ নাই
কেবল খোল বাজালেই শুচি ॥
যারা মুখে বলে গৌরাং গৌরাং কিন্তু উপরে রূপা ভিতরে রাং
জুটিয়ে আখড়ায় গাঁজা ভাং মজিয়েছেন ভুবন।
পুরাণের মত চলে না কোরাণের কথা তোলেন না
নূতন জাতি গৌর খ্রীষ্টান, না হিন্দু, না যবন ॥

বাছাদের ধর্মপথটা বড় আঁটা   পাকামো করে খান না পাঁঠা
হেঁসেলে উহাদের হয় না রান্না   জাতি মাংস বলে।
যদি বল ওদের জাতি কিসে   আকার প্রকার পাঁঠাতে মেশে
সব আছে ঐ নেড়া বেটাদের দলে ॥
পাঁঠার ভক্ষণ কুলের পাতা   ওদের ভক্ষণ কুলের মাথা
পাঁঠাও পশু ওরাও পশু   ভাবলে সমুদাই।
পাঁঠার যেমন লম্বা দাড়ি   বেটাদেরও সেই প্রকারই
পাঁঠাকে কালীর কাটতে হুকুম   উহাদিগকেও তাই ॥
পাঁঠাকে যেমন বোকা বলি   নেড়ারাও তাই সকলি
ভিন্ন ভাবে পাষণ্ড বৈরাগী।
জাতকুল সব করে ধ্বংস   যেন কত পরমহংস
লোক দেখান হয়েছে সর্বত্যাগী ॥

—গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৭৩

* * *

নারী

১

নারী জন্মের দুঃখ

বৃন্দার উক্তি :

ওহে ব্রজনারীর জীবন   নারীর দুঃখ কর শ্রবণ
যত যাতনা দেখেছি নিজ চক্ষে।
বঁধু হে জগতের নরে   পুত্র জন্য কামনা করে
কন্যা হলে মরে মনোদুঃখে ॥
বাল্য হতে পরবাসে   প্রাণ দগ্ধ পর বশে
রমণীর যাতনা বঁধু হদ্দ।
দুঃখের দশা দশ বৎসরে   ঘোমটা দিয়ে শ্বশুর ঘরে
পক্ষী যেন পিঞ্জরেতে বদ্ধ ॥
কারু পতি কাণা খোঁড়া   কারু বা সতীন পোড়া
কারু পতি নয় বা বশীভূত।

কারো পতি অম্নছড় কোন যুবতীর পতি বুড়ো

মনাগুনে মন পোড়ে তার কত ॥

কেউ বিধবা হলে বাল্যদশায়, ছাই পড়ে সব সুখের আশায়

পরের লাগিয়ে পরম দুঃখ।

রমণ বিনে ঘরে বাস মাসে দুটো উপবাস

পোড়া কপালে নারীর এই ত সুখ ॥

নারীকে বিধি নারে দেখতে পুরুষের পিতা থাকতে

মায়ের পিণ্ড গয়ায় দিতে নাই।

নারীর মান্য আছে কোথায় পরশুরাম বাপের কথায়

মায়ের মুণ্ড কেটেছে কানাই ॥

আবার কুলীন ব্রাহ্মণের যত নারী, এদের দুঃখ দেখতে নারি

যদি বিয়ে হয় পুনঃ বিয়ের পরে।

সে উদ্দেশ নাই কোন দেশ পতি যেন সন্দেশ

দৈবে যদি এসেন দয়া করে॥

আবার শ্বশুরের কসুর পেলে ষোড়শী যুবতী ফেলে

রাত্রে এসে প্রভাতে যান চলে।

কুলীনের যুবতীগণ তারা যমের জন্য যৌবন

ধারণ করেন হৃদয় কমলে ॥

মিথ্যা নারীর কাল গত চিনির বলদের মত

বুকে বোঝা বইতে হয় হে শ্যাম।

অন্যকে দান করলে পরে কলঙ্ক হয় ঘরে পরে

রটে কুলকলঙ্কিনী নাম॥

—মানভঞ্জন (২), পৃঃ ১৫১

২

কালো মেয়ের দুঃখ

শ্যামা সখীর উক্তি :

যে নারীদের কালো বরণ তাদের কেন হয় না মরণ
সংসারেতে কি সুখেতে থাকে।
তাদের মা বাপে মরে ভাবিয়ে কালো মেয়ে কেউ করে না বিয়ে
ঘুষ না দিলে ভাগ্যবন্ত লোকে॥
কেউ লয় না সমাদরে অল্প দরে অনাদরে
কলে কৌশলে বিকায় কালো।
ঘৃণা করে কেউ দেখে না চক্ষে এই ভূলোকে কালোগুলোকে
কাল হয়ে বিধাতা গড়েছিল॥
তবে যারা জাতে হীন হীন গোত্র অথবা প্রাচীন পাত্র
তারাই মাত্র কালো মেয়ে লয়।
তারা যায় না সুখের পক্ষে কোন রূপে বংশ রক্ষে
কালো গৌর একটা হলেই হয়॥
দুঃখের কথা বলব কায় দেখিলে নারীর কালো গায়
মুখ বাঁকায়ে সবাই ব্যঙ্গ করি।
কালো মেয়েটা করলে বরণ অপমানটা অসাধারণ
আমার হয়েছে তেমন শুন গো সহচরি॥

—মানভঞ্জন (২), পৃঃ ১৪৩

৩

নারীর সুখ

কহিছেন চিন্তামণি পুরুষের সারধন রমণী
রমণী দুঃখিনী নয় জেনো।
পুরুষেতে যেমন সুখী আমায় দিয়ে দেখ না সখি
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন॥

নারীর নাই কোন ভার ভারের মধ্যে বদন ভার
দেখলে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়।
আমল করেন ঘরকন্না দেনাপাওনায় কথা কন না
জ্বলার মূল হয়ে জ্বালা সন না যত জ্বালা পুরুষের মাথায়॥
পুরুষ করলে দান কি যাগ নারী পান তার পুণ্য ভাগ
পাপ করলে সে ভাগ এড়ান।
পুরুষের ভারি মরণ অপকর্ম অপহরণ
নারীর কেবল কথায় কথায় মান॥
সখি হে নারীর সুখ জানাই ঋণ নাই প্রবাস নাই
দ্বিগুণ আহার ছয় গুণ শক্তি বলে।
বুদ্ধি নারীর চারি গুণ পুরুষের মুখে আগুন
পড়ে শুনে শেষে নারীর বুদ্ধিতে চলে॥
যে পুরুষ বয়স ভেটিয়ে বুড়ো বয়সে করে বিয়ে
সে নারীর সুখ নারি হে কহিতে।
পতির ঘরে আসেন তিনি যেন পতিতপাবনী
গতিহীনের বংশ উদ্ধারিতে॥
গা খানি তার আদর মাখা রোদন কিংবা বদন বাঁকা
দেখলে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়।
মাটিতে তিনি দেন না চরণ শাশুড়ী ননদের মরণ
চিরকাল মন যুগিয়ে কাল কাটায়॥
করেন না কোন গৃহকাজ আধ ঘোমটা দিয়ে লাজ
বললে রেগে হন খরতর।
স্বামীকে সেজে দেন না পান সন্ধ্যাবেলা নিদ্রা যান
ডাকিলে বলে ডেকরা কেন মর॥

—মানভঞ্জন (২), পৃঃ ১৫২

৪

বেহায়া নারী

হেসে বলে নবীনচাঁদ ও কর্ম্মেতে তোমরা ফাঁদ
সকলি জানি সতীত্বতা ছাড় ।
চক্ষের কাছে দিয়ে ঢাল স্বামী থাকেন চিরকাল
নৈলে কাল হয়ে বসিতে পার ॥
পরম সুন্দর পতি ঘরে যদি পরম যত্ন করে
তবু দৃষ্টি পরপুরুষের প্রতি ।
গাছে চড়িতে আছে মন পাছে পাছে অন্বেষণ
করে তেঁই বাঁচে পুরুষ জাতি ॥
পরের তরে মন উচাটন যোগাযোগের অনটন
অঘটন ঘটাতে চেষ্টা পাও ।
দৈবে কলঙ্কিনী হও না স্থান পাও না ক্ষণ পাও না
ফিকির পেলেই ফকির করে দাও ॥
বাল্য হতে বন্দীশালে মেয়ে মানুষকে পাঠশালে
লিখতে দেয় না, কেন জান কান্তা ।
যদি লেখাপড়া শিখতে লুকিয়ে লুকিয়ে পত্র লিখতে
ঘটত ভাল পিরীতের পন্থা ॥
নারী কেবল পরে ঘরে লজ্জায় পড়ে লজ্জা করে
উপরে ক্ষীর ভিতরে বিষময় ।
দশ যুবতী গিয়ে বিরলে বিদেশী পুরুষ পেলে
ঘোমটা খুলে কবির লড়াই হয় ॥
অবলা কিছু জানিনে বলে সদরে ডুবেন এক হাত জলে
লুকিয়ে গিয়ে নদীতে দেন সাঁতার ।
অগোচরে ভারি জোর ঘরে এসে করেন ভোর
চাতুরীতে ভেকিয়ে যান ভাতার ॥
নারীরা লম্পট শীলে যেমন ফল্গু নদী অন্তঃসিলে
বিয়ে যদি হয় প্রতিবেশীর বাড়ী ।

ঘোমটা খুলে বাসর ঘরে নূতন জামাই পেলে পরে
ছুঁড়িদের কত আমোদ বাড়াবাড়ি ॥
যিনি মুখ দেখান না কুলের বধূ তিনি সে রাত্রে গান নিধু
রসের ছড়ার খৈ ফুটে যায় মুখে।
যদি ভীমের মতন হন পাত্র তথাপি দুর্বল গাত্র
বিয়ের রাতে বাসর ঘরে ঢুকে ॥
ঘৃণা হয় শুনে বড় বার বছরী আইবুড়ো
হচ্ছে কেবল বিয়ের উপলক্ষি।
বীরসিংহ রাজার সুতা বিদ্যার কি শুন নাই কথা
লোকে বলিত মেয়েটি বড় লক্ষ্মী ॥
বাপ করলে স্বয়ংবর দেবে বিয়ে এলে বর
বরদাস্ত হল না দুই এক মাস।
কি কর্ম সে করে লুকিয়ে সিঁদেল চোরকে ঘরে ঢুকিয়ে
অদ্যাপি লোক করে উপহাস ॥

—নবীনচাঁদ ও সোনামণির দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৬৫৮

পাঁচালীর ছড়া-সংগ্রহ

১

সকলি মিথ্যা

মন, কর ভাই মনোযোগ মনের কথা বলি।
সংসারের সুখ সজ্জা মিথ্যা রে সকলি ॥
যেমন স্বপ্নের রাজ্যপদ মিথ্যা জেনো ভাই।
বালকের ধূলার ঘর, এ ঘর জেনো ভাই ॥
ব্যবসাদারের সত্যকথা মিথ্যা তাকে ধরো।
সতীনে সতীনে পিরীত মিথ্যা জ্ঞান করো ॥
বাজিকরের ভেল্‌কি যেমন মিথ্যা জানা আছে।
দৈবজ্ঞের গণনা যেমন স্ত্রীলোকের কাছে ॥
দস্তখত বিনা যেমন মিথ্যা খত পাটা।
দুর্বলের দাঁতখামুটি মিথ্যা জেনো সেটা ॥

মৃত্যুকালে সবলা নাড়ী মিথ্যা তাকে ধরি।
চোরের যেমন ভক্তি প্রকাশ মিথ্যা জ্ঞান করি॥
ছোটলোকের বুজরুগি জেনো মিথ্যা নিরন্তর।
যেন গাজুনে সন্ন্যাসীর প্রতি ধর্মঠাকুরের ভর॥
মিথ্যা যেমন জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তে।
স্ত্রীর কাছে আত্মশ্লাঘা সেটা জেনো মিথ্যে॥
যেমন শতরঞ্চের হাতী ঘোড়া মন্ত্রী লয়ে খেলি।
দারাসুত ধনজন ভাই মিথ্যা জেনো সকলি॥

—কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১১৬

কৃষ্ণশূন্য গোকুল

যেমন বিষয়শূন্য নরবর বারিশূন্য সরোবর
বস্ত্রশূন্য বেশ।
দেবীশূন্য মণ্ডপ কৃষ্ণশূন্য পাণ্ডব
গঙ্গাশূন্য দেশ॥
জলশূন্য ঘট শিবশূন্য মঠ
ব্যয়শূন্য কাণ্ড।
নাড়ীশূন্য দেহ নারীশূন্য গেহ
কর্পূরশূন্য ভাণ্ড॥
শিকলশূন্য তালা ভজনশূন্য মালা
দৃষ্টিশূন্য নয়ন।
ভূমিশূন্য রাজার রাজ্য বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য
নিদ্রাশূন্য শয়ন॥
পুত্রশূন্য কুল মধুশূন্য ফুল
মধুমালতী বকুল।
নিরখিলা মুনি বিনে চিন্তামণি
তাই হয়েছে গোকুল॥

—কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন, পৃঃ ২৯৮

৩

মন্দকথা শীঘ্র রটে

অতিশীঘ্র যেমন ধারা নূতন চোরকে ধরে।
অতিশীঘ্র যেমন ধারা ভেদের রোগী মরে॥
বেলে মাটিতে বৃষ্টি যেমন অতিশীঘ্র শোষে।
কফো খেতে নিদ্রা যেমন অতিশীঘ্র এসে॥
ক্ষুদ্র গাছে ফল যেমন অতিশীঘ্র ফলে।
অতিশীঘ্র পরমায়ু যায় দিনাজপুরের জেলে॥
বঙ্গদেশী লোক যেমন অতিশীঘ্র রাগে।
নিদ্রাকালে কুকুর যেমন অতিশীঘ্র জাগে॥
অতিশীঘ্র ধরে যেমন মনিমন্ত্রের গুণ।
অতিশীঘ্র ধরে যেমন বারুদে আগুন॥
সুজনে সুজনে যেমন অতিশীঘ্র ঐক্যি।
ঘর বিবাদে যান যেমন অতিশীঘ্র লক্ষ্মী॥
অতিশীঘ্র যেমন ধারা ধনুকে বান ছোটে।
পশুপতির দয়া যেমন অতিশীঘ্র ঘটে॥
খলে খলে পিরীত যেমন অতিশীঘ্র চটে।
তেমনি ধারা মন্দকথা অতিশীঘ্র রটে॥

—গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৮০

৪

চুপে চুপে কর্ম করার দোষ

দেখ চুপে চুপে রাবণ করলে রামের সীতা হরণ।
একবারে হইল তার সবংশে মরণ॥
চুপে চুপে ইন্দ্র গিয়া গৌতমের স্ত্রী হরে॥
সহস্র লোচন হইল কত দুঃখের পরে॥
চুপে চুপে চন্দ্র হতে বুধঠাকুরের জন্ম।
দেশ জুড়ে কলঙ্ক হইল করিয়া কুকর্ম॥

চুপে চুপে রামের ফল খেয়ে হনুমান।
গলায় আঁটি লেগে রইল যায় যায় প্রাণ॥
চুপে চুপে অনিরুদ্ধ উষা হরণ করে।
বন্ধন দশায় ছিলেন পড়ে বানের কারাগারে॥
চুপে চুপে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কেটে।
অশ্বত্থামা অপমান হইল অর্জুন নিকটে॥
চুপে চুপে রঘুনাথ বালিরাজারে বধে।
নিজ বধের বর শেষে দিলেন অঙ্গদে॥
চুপে চুপে সূর্যদেবে দিয়া আলিঙ্গন।
কুন্তীদেবী দিয়াছেন পুত্র বিসর্জন॥
চুপে চুপে রাবণের মূর্তি লিখে ভূমে।
জানকী গেলেন বনে বঞ্চিত হয়ে রামে॥
চুপে চুপে কচ গেলেন বিদ্যা শিক্ষা করতে।
মেরে তার মাংস খেল মিলি সব দৈত্যে॥
চুপি চুপি কোম্পানীর নোট জাল করে।
রাজ কিশোর দত্ত জন্মাবধি গেলেন জিঞ্জিরে॥
চুপে চুপে প্রতাপচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে গিয়ে।
শেষে আর দখল পান না আছেন ভেকো হয়ে॥

—বামনভিক্ষা (২) পৃঃ ৬০৮

৫

তিনের দোষ

শুক্রাচার্য বলে বলি ত্রিপাদ ভূমি দিও না।
তিন কথা বড় মন্দ তিনের দিকে যেও না॥
দেখ ত্রিবঙ্কেতে কৃষ্ণচন্দ্রে, বাঁকা বই বলে না।
তিন কান হলে পরে মন্ত্রৌষধি ফলে না॥
তিন বামুনে একত্রেতে যাত্রা করে যায় না।
তিন চক্ষু মৎস্য হলে মনুষ্যেতে খায় না॥

তিন দ্রব্য দিলে লোকে শত্রু বলে লয় না।
তিন নকলে খাস্ত হয় আসল ঠিক রয় না॥
তেমাথা পথ ভিন্ন কভু ঠিক করা যায় না।
তিন কড়ি নাম হলে মরাঞ্চে বই কয় না॥
তিন তিথিতে ত্র্যহস্পর্শ শুভকর্ম করে না।
ত্রিপাপের বৎসর হইলে যমের হাতে তরে না॥
উত্তম মধ্যম অধম এই তিনটে আছে ঘোষণা।
তার মধ্যে অধম বলে ত্রিলোক করিলে গণনা॥
ত্রিদোষের ক্ষেত্র হলে যমের হাতে তরে না।
এক পুরুষের দুই স্ত্রী তিন জনেতে বনে না॥
ত্রিশঙ্কু রাজার দেখ স্বর্গে যাওয়া হল না।
তেঁই বলি ওরে বলি ত্রিপাদ ভূমি দিও না॥

—বামনভিক্ষা (২), পৃঃ ৬১১

৬

মূর্খের দোষ

মূর্খের অশেষ দোষ সর্বদা করয়ে রোষ
মূর্খের নাহিক কোন জ্ঞান।
আপন দেমাকে ফেরে মূর্খ জনা মনে করে
মমসম নাহি বুদ্ধিমান॥
মূর্খের সঙ্গে সখ্যভাব তাহে কেবল দুঃখ লাভ
মূর্খের নাহিক চক্ষের শীলতা।
যার খায় যার পরে তারি মন্দ চেষ্টা করে
মূর্খ সঙ্গে কোরো না মিত্রতা॥
নাহি তার ধর্ম ভয় বিষম গোঁয়ার হয়
মূর্খের মরণ মাঠেঘাটে।
কিঞ্চিৎ হইলে ক্রোধ নাহি থাকে বোধাবোধ
অনায়াসে বাপের মাথা কাটে॥

কিসে কার হবে মন্দ কার সঙ্গে হবে দ্বন্দ্ব
মূর্খের সর্বদা এই চেষ্টা।
মূর্খের যেবা স্তব করে উল্‌টে তারে চেপে ধরে
মূর্খের জ্বালায় জ্বলে দেশটা॥
নাহিক দয়ার লেশ সকলেরে করে দ্বেষ
ইহার কথাটি কয় ওরে।
মূর্খে যদি বলে হিত হিতে হয় বিপরীত
হঠাৎ মানীর মান হরে॥
দেখিয়া পরের সুখ মূর্খের বাড়য়ে দুখ
মূর্খ অতি বিদূষক হয়।
মূর্খের সঙ্গে সংসর্গে প্রয়োজন নাহি স্বর্গে
এ আজ্ঞা কোরো না দয়াময়॥

—বামনভিক্ষা (২), পৃঃ ৬১৪

৭

ভ্রমরের সঙ্গে নলিনীর মিলন কিরূপ ?

তোমার আমার যে ভিন্নতা
সেটা কেবল কথার কথা।
তুমি পর্বত আমি লতা॥
আমি তোমার চরণের লাগি
তুমি চণ্ডী আমি সিদ্ধি॥
তোমাতে আমাতে ছাড়া নাই
তুমি সন্ন্যাসী আমি ছাই॥
তুমি চাল আমি খুঁটি
তুমি বেদনা আমি পটি
তুমি রোগী আমি পাটি॥

তুমি বাঁশ আমি কোঁড়া
তুমি দরগা আমি ঘোড়া
তুমি শীল আমি নোড়া ॥
তুমি জমি আমি কৃষাণ
তুমি ভাঁড় আমি দশান ॥
তুমি খোঁপা আমি চাঁপা
তুমি তাবিজ আমি ঝাঁপা ॥
তুমি মঠ আমি ত্রিশূল
তুমি উদূখল আমি মুষল ॥
তুমি আকাশ আমি তারা
তুমি আয়না আমি পারা ॥
তুমি মালা আমি সূত
তুমি শ্মশান আমি ভূত ॥
তুমি দাড়ি আমি ক্ষুর
তুমি মশক আমি গুড়
তুমি মড়া আমি খাটুলি
তুমি জন্তু আমি এঁটুলি ॥

—নলিনী-ভ্রমর (২), পৃঃ ৬৮৩

৮

প্রেমচাঁদের সঙ্গে প্রেমমণির পিরীত ছিল কি প্রকার ?

যেমন মাটি আর পাটে। লোহা আর কাঠে ॥
দেবতা আর কুসুমে। জরি আর পশমে ॥
গুড়ে আর ছানায়। মুক্ত আর সোনায় ॥
সতী আর সুকান্তে। মিশি আর দন্তে ॥
মরিচ আর জিরে। কাঁটাল আর ক্ষীরে ॥
বাজনা আর গানে। চুনে আর পানে ॥
বাণে আর তূনে। মাস্তুল আর গুণে ॥

দাতা আর দানে। জলে আর মীনে,
নারদ আর বীণে॥
হাঁড়ি আর সরায়। গন্ধক আর পারায়॥
নয়ন আর অঞ্জনে। অন্ন আর ব্যঞ্জনে॥
পিতায় আর সুপুত্রে। মালা আর সূত্রে॥
ভূষণ আর পাত্রে। পণ্ডিত আর ছাত্রে॥
চাষা আর ক্ষেত্রে। চশমা আর নেত্রে॥
সরোবর আর হংসে। ধনে আর ভাজা মাংসে॥

—প্রেমচাঁদ ও প্রেমমণি, পৃঃ ৬৬৪

৯

বিচ্ছেদের গুণ

বসনের ময়লা যেমন কেটে দেয় সাবানে।
মনের ময়লা কাটে যেমন সুরধনীতে স্নানে॥
ফটকিরিতে জলের ময়লা কাটে জগৎ জানে।
গুড়ের ময়লা শেওলায় কাটে, ক্ষুরের ময়লা শানে॥
জেতের ময়লা কাটে যেমন সমন্বয়ের গুণে।
ধেতের ময়লা কাটে যেমন ঔষধ সেবনে॥
নয়নের ময়লা যেমন কেটে দেয় অঞ্জনে।
দাঁতের ময়লা কাটে যেমন হুগলীর মঞ্জনে॥
চুলের ময়লা কাটে যেমন দিলে আমলা বেঁটে।
উত্তম করণে যেমন কুলের ময়লা কাটে॥
যেমন আগুনে সোনার ময়লা কেটে করে খাঁটি।
আমি বিচ্ছেদ সেইরূপ পিরীতের ময়লা কাটি॥

—প্রেমচাঁদ ও প্রেমমণি, পৃঃ ৬৬৮

১০

অন্ত ফুলের কাছে ভ্রমরের আদর কিরূপ ?
আর আর ফুলের কাছে, আমার এমনি আদর আছে।
যেমন একজেতে পুরুতের আদর যজমানের কাছে॥

রোগী যেমন যত্ন করি বৈদ্যের আদর রাখে।
চাকুরে ডাক্তারের আদর যেমন মেগের কাছে থাকে ॥
ষষ্ঠীর আদর যেমন পোয়াতীর নিকটে।
বব্বলের আদর যেমন ফরিয়াদির কাছে ঘটে ॥
লোচ্চার কাছেতে যেমন কুটনী আদর পায়।
গোঁসাইয়ের আদর যেমন বৈরাগীর আখড়ায় ॥
গুণবোদ্ধার নিকট যেমন গুণীর সমাদর।
চাষার নিকটে যেমন বলদের আদর ॥
হাড়ি ঝির আদর যেমন নারীপ্রসবের সময়।
পাঁঠা বিক্রয় আদর যেমন আশ্বিন মাসে হয় ॥

—নলিনী-ভ্রমর (২), পৃঃ ৬৮১

১১

পাপড়িগুলি পদ্মের কি প্রকার শোভা ছিল ?

যেমন কালীর শোভা করে অসি
শিবের শোভা শিরে শশী ॥
কৃষ্ণের শোভা চূড়া বাঁশী আর ময়ূর পাখা।
বৃক্ষের শোভা শাখা, পাখীর শোভা পাখা।
সন্ন্যাসীর শোভা যেমন ছাইভস্ম মাখা ॥
দালানের শোভা দেয়ালগিরি
নারীর শোভা কুচগিরি
গানের শোভা খোটখিরি ॥
হাটের শোভা পসারি
খাটের শোভা মশারি ॥
বাগানের শোভা ফুল
মাথার শোভা চুল ॥
কপালের শোভা তিলক
নাকের শোভা নোলক ॥

পথের শোভা বারাশত
গ্রামের শোভা ইমারৎ ॥
দালান শোভা বাড়ী
মোল্লার শোভা দাড়ি ॥
গ্রন্থের শোভা টিপ্পনী
বৈরাগীর শোভা কপনি ॥
বিয়ের শোভা বাদ্যভাণ্ড হাউই চরকি বোম।
ভেড়ার শোভা লোম, রাজার শোভা ভোম ॥
ভূমির শোভা ফসল
ঢেঁকির শোভা মুষল ॥
মুহুরির শোভা খোসনবিশী মিলন জুলন খুট।
পল্টনের শোভা যেমন হাতী ঘোড়া উট।
বলদের দলের মধ্যে এঁড়ের শোভা ঝুঁট ॥
সতীর শোভা নাথ
হাতীর শোভা দাঁত ॥
পেয়াদার শোভা পাগড়ি
ভেকধারী নেড়াদের শোভা হরিবুলি আর ধুকুড়ি।
তেমনি পদ্মিনী ছিল তোমার শোভা পাপড়ি ॥

—নলিনী-ভ্রমর (২), পৃঃ ৬৮২

১২

সন্তানের তুল্য মায়া নাই

যেমন শশীর তুল্য রূপ নাই, কাশীর তুল্য ধাম।
প্রেমের তুল্য সুখ নাই, রামের তুল্য নাম ॥
রোগের তুল্য শত্রু নাই, যোগের তুল্য বল।
ভক্তির তুল্য ধন নাই, মুক্তির তুল্য ফল ॥
ভজন তুল্য কর্ম নাই, গঙ্গা তুল্য জল।
বিপ্র তুল্য জাতি নাই, সর্প তুল্য খল ॥

পবন তুল্য গমন নাই রাবণ তুল্য দাপ।
মরণ তুল্য শঙ্কা নাই হরণ তুল্য পাপ॥
গরুড় তুল্য পক্ষী নাই শুকের তুল্য মুনি।
বখিল তুল্য অধম নাই কোকিল তুল্য ধ্বনি॥
স্বর্ণ তুল্য ধাতু নাই কর্ণ তুল্য দাতা।
ইষ্ট তুল্য দেব নাই কৃষ্ণ তুল্য কথা॥
তরী তুল্য বাহন নাই করী তুল্য দন্ত।
মানব তুল্য জনম নাই প্রণব তুল্য মন্ত্র॥
ভজন তুল্য কর্ম নাই সুজন তুল্য জন।
দৈন্য তুল্য বিপদ নাই পুণ্য তুল্য ধন॥
পদ্ম তুল্য পুষ্প নাই শঙ্খ তুল্য নাদ।
মরণ তুল্য গালি নাই চোরের তুল্য বাদ॥
অযশ তুল্য অসুখ নাই পীযূষ তুল্য রস।
মায়ের তুল্য আপন নাই দাতার তুল্য যশ॥
শঠ তুল্য কুজন নাই বট তুল্য ছায়া।
সাত্ত্বিক তুল্য কর্ম নাই কার্তিক তুল্য কায়া।
তেমনি সন্তানের তুল্য মায়া নাই মা মহামায়া॥

—কাশীখণ্ড, পৃঃ ৫৩৯

১৩

দক্ষ ও শিবের কেমন ভাব ?

শিবের উক্তি :

আমাদের ভাব কেমন জামাই আর শ্বশুরে ?
যেমন দেবতা আর অসুরে॥
যেমন রাবণ আর রামে। যেমন কংস আর শ্যামে॥
যেমন স্রোত আর বাঁধে। যেমন রাহু আর চাঁদে॥
যেমন যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনে। যেমন গিরগিটি আর মুসলমানে॥
যেমন জল আর আগুনে। যেমন তৈল আর বেগুনে॥
যেমন পক্ষী আর সাতনলা। যেমন আদা আর কাঁচকলা॥

যেমন ঋষি আর জপে। যেমন নেউল আর সাপে॥
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে। যেমন গৃহস্থ আর চোরে॥
যেমন কাক আর পেঁচকে। যেমন ভীম আর কীচকে॥
যেমন শরীরে আর রোগে।
যেমন দিন কতক হয়েছিল ইংরাজে আর মগে॥

—দক্ষযজ্ঞ, পৃঃ ৪৭৮

১৪

দুঃখের বাড়া

মূর্খের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ দুঃখের প্রধান মানি।
দুঃখীর সঙ্গে আমোদ করা তার বাড়া দুঃখ জানি॥
তার বাড়া দুঃখ কানার সঙ্গে চলা।
তার অধিক দুঃখ রাগী লোকের সঙ্গে খেলা॥
তার বাড়া দুঃখ অবুঝের সঙ্গে কথা বলা।
তাহার অধিক দুঃখ কালার সঙ্গে চলা॥
তার বাড়া দুঃখ নাবুঝের সঙ্গে ব্যবসা যদি ঘটে।
তার বাড়া দুঃখ ফতো বাবুর সঙ্গে এয়ারকি বটে॥
তার বাড়া দুঃখ বালকের সঙ্গে কাজিয়ে।
তার বাড়া দুঃখ তালকানার সঙ্গে বাজিয়ে॥
দুঃখ আছে নানা মত কিন্তু নহে দুঃখ এত।
অরসিকের সঙ্গে প্রেম আলাপ দুঃখ যত॥

—শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতাহরণ, পৃঃ ৩৬০

১৫

ভালবাসা কাহাকে বলি

আশার অধিক দেয় যদি তাকেই বলি দান।
পণ্ডিতে যাতে মান্য করে তাকেই বলি মান॥
দরিদ্র দুর্বলে দয়া তাকেই বলি পুণ্য।
অনায়ে বিক্রীত হয় তাকেই বলি ধন্য॥

দেবতায় করে বশীভূত তাকেই বলি সাধ্য।
ভোজনে অমৃতগুণ তাকেই বলি খাদ্য ॥
ব্যাধির রাখেনা শেষ তাকেই বলি ঔষধি।
সর্বত্র সম্মত হয় তাকেই বলি বিধি ॥
ঋণ প্রবাস রোগ বর্জিত তাকেই বলি সুখী।
নিত্য ভিক্ষে প্রাণ রক্ষে তাকেই বলি দুখী ॥
বাহুবলে করে যুদ্ধ তাকেই বলি বীর।
আখের ভেবে কর্ম করে তাকেই বলি ধীর ॥
ইশারায় করে কার্য তাকেই বলি বশ।
মফস্বলে ব্যাখ্যা করে তাকেই বলি যশ ॥
দশের কাছে দুষ্য হয় না তাকেই বলি ভাষা।
অন্তরেতে ভালবাসে সেই তো ভালবাসা ॥

—শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতাহরণ, পৃঃ ৩৫৬

১৬

নূতনের গুণ

বৃন্দার উক্তি :

নূতন পিরীত ভাল হে বঁধু অতি মিষ্ট নূতন মধু
শুনতে ভাল নিত্য নূতন কথা।
পরিতে ভাল নূতন বস্ত্র কর্মে ভাল নূতন অস্ত্র
দেখতে ভাল নূতন ছত্র বৃক্ষের নূতন পাতা ॥
ভাল নূতন কুটুম্বিতে আদর থাকে নূতন স্ত্রীতে
নূতন জিনিষ ভাল হয় দেখতে।
অতি উত্তম নূতন বর নূতন বরের হয় আদর
নূতন সরিষের তৈল ভাল মাখতে ॥
শয়নে ভাল নূতন শয্যা মন খুসি হয় নূতন ভার্যা
নূতন দ্রব্য খেতে লাগে মিষ্ট।
তাইতে এখন নূতন প্রেমে মজেছ হে কৃষ্ণ ॥

—মাথুর (১), পৃঃ ১৭৮

১৭

নূতনের অনেক দোষ

ছলে কয় বৃন্দে ধনী কৃষ্ণ তুমি নূতন ধনী
তাইতে উচিত বলতে ভয় হয়।
নূতন ধনীর বিদ্যমান কভু রয়না মানীর মান
নূতন কিছুই প্রশংসিত নয়॥
নূতন চালে অগ্নি নষ্ট নূতন রাজ্যে শাসন কষ্ট
নূতন ভার্যে পতির বশ হয় না।
নূতন বয়সে ধরে না জপ নূতন জলে ধরে কফ
নূতন হাঁড়িতে তৈল সয় না॥
গুণ করে না নূতন সিদ্ধি নূতন গুড়ে পিত্ত বৃদ্ধি
নূতন বালকে কথা কয় না।
নূতন চোর পড়ে ধরা নূতন বৈরাগী মুখচোরা
সদর হতে চেয়ে ভিক্ষা লয় না॥
নূতন শোক প্রাণনাশক নূতন বৈদ্য ভয়ানক
নূতন গৃহস্থের সকল দ্রব্য রয় না।
নূতন ধ'নে দুর্গন্ধ নূতন জ্বরে আহার বন্ধ
নূতন পিরীত ভাঙ্গিলে প্রাণে সয় না॥
নূতন ইক্ষুর নাই মিষ্টি নূতন মেঘে শিলা বৃষ্টি
নূতন হাটে যত যায় বিকায় না।
ওহে নিদয় কৃষ্ণধন যে পায় নূতন ধন
অহঙ্কারে সে চোখে দেখতে পায় না॥

—মাথুর (২), পৃঃ ২০১

১৮

পুরাতন জিনিষের সুখ

বৃন্দার উক্তি :

অতেব সব ভাল হয় পুরাণ হলে পুরাতন কথাকে পুরাণ বলে
পুরাতন পুরুষ তুমি হে ভগবান।

পুরাতন লোকের কথা মান্ত পুরাতন চালে বাড়ে অন্ন
পুরাতন কুষ্মাণ্ড খণ্ড অমৃত সমান ॥
পুরাতন জ্বরে পায় পথ্য বিশ্বাসী হয় পুরাতন ভৃত্য
পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষ নষ্ট করে।
পুরাতন গুড়ে পিত্তি নাশে পুরাতন তেঁতুল কাস নাশে
পুরাতন সিদ্ধি অগ্নিমান্দ্য হরে ॥
পুরাতন রতন পরিপাটি পুরাতন টাকায় রূপা খাঁটি
পুরাতন বুনিয়াদির বড় নাম।
পুরাতন সোনা মাথার মণি পুরাতন বাস্তুসাপের মাথায় মণি
পুরাতন প্রেম স্বরীত হয় হে শ্যাম ॥
পুরাতন প্রেম পরশ তুল্য পুরাতনের কি আছে মূল্য
পুরাতন পিরীত ভাঙ্গিলে যায় হে গড়া।
দেখ হে শ্যাম মন বুঝে পুরাতন পিরীত মেলে না খুঁজে
পিরীত আছে কি পুরাতনের বাড়া ॥
ঔষধে লাগে পুরাতন কাঁজি দরকারি হয় পুরাতন পাঁজি
পুরাতন দ্রব্যের গুণ লিখেছেন অতি।

—মাথুর (১), পৃঃ ১৯৩

১৯

উভয় সংকটের জ্বালা

গুরু পুরোহিতে দ্বন্দ্ব কেবা ভাল কেবা মন্দ
উভয়েতে সমান সম্বন্ধ।
বাত শ্লেষ্মায় ক্রূরা নাড়ী রাজবৈদ্য হয় আনাড়ি
চিকিৎসা করিতে ঘোর ধন্দ ॥
বাতিকে ব্যবস্থা চিনি ডাব তাতে হৈল প্রাদুর্ভাব
কণ্ঠ রোধ করে গিয়া কফে।
কফের দমন করতে গেলে শুঁঠপিপুল মরিচ খেলে
বাতিক বৃদ্ধি হয়ে উঠে ক্ষেপে ॥

পরপুরুষে নারীর গর্ভ রাখিলে গর্ভ জেতে খর্ব
না রাখিলে জীবন নষ্ট ঘটে।
পড়িলে জীব অগাধ জলে মরিতে হয় ধরিতে গেলে
না ধরিলে পাপ উভয় সংকট বটে॥

—শ্রীকৃষ্ণবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃঃ ৩০১

ঊর্ধ্বসংখ্যা

শ্রাদ্ধের ঊর্ধ্বসংখ্যা যেমন বিলক্ষণ দান।
কফের চিকিৎসা সংখ্যা হলাহল পান॥
প্রতিজ্ঞার ঊর্ধ্বসংখ্যা প্রাণ দিতে উদ্যত।
পুরুষের ক্ষমতা সংখ্যা ত্রিশ হলে গত॥
নারীর সন্তান আশা সংখ্যা পঁচিশ বৎসর।
বরষার ভরসার সংখ্যা ভাদ্র গেলে পর॥
প্রায়শ্চিত্তের সংখ্যা যেমন পোড়ে তুষানলে।
রাগের ঊর্ধ্বসংখ্যা দড়ি দেয় নিজ গলে॥
নেশার ঊর্ধ্বসংখ্যা যেমন শুণ্ডিকার মদ।
পাপের ঊর্ধ্বসংখ্যা যেমন করে ব্রহ্মবধ॥
গালির ঊর্ধ্বসংখ্যা যেমন মর বাক্য বলে।
ফলের ঊর্ধ্বসংখ্যা জীবের যদি মোক্ষ ফল ফলে॥
দুঃখের ঊর্ধ্বসংখ্যা চিরদিন মানহীন পৃথিবীতে।
উপায়ের ঊর্ধ্বসংখ্যা মোর প্রহ্লাদ বধিতে॥

—প্রহ্লাদ চরিত্র, পৃঃ ৫৮১

বর্ণনা

১

কৈলাস বর্ণনা

পুলকিত অন্তরে প্রবেশি কৈলাসপুরে
দেবঋষি চারিদিকে চাচ্ছেন।
দেখেন মুনি কোনস্থানে ভূত প্রেত দানাগণে
শিবনামে মগ্ন হয়ে নাচ্ছেন॥
কোথায় যোগিনী সব করিছে চীৎকার রব
কেহ বা শ্রীদুর্গা বলি ডাকিছে।
কোথাও করেন দৃশ্য কেহ আনি চিতাভস্ম
আনন্দে আপন অঙ্গে মাখিছে॥
কোথাও দিব্য সরোবর তাহে কিবা মনোহর
জলচর পক্ষী রব করিছে।
ফুটেছে কমল ফুল তাহে কিবা অলিকুল
মধু আশে উড়ে উড়ে পড়িছে॥
ময়ুর ময়ুরী কত নৃত্য করে অবিরত
মলয় মারুত মন্দ বহিছে।
ডালে বসি পিকবর হানিছে পঞ্চম স্বর
ফলেফুলে বৃক্ষ শোভা হয়েছে॥

—বামনভিক্ষা (২), পৃঃ ৬০৫

দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনা

দক্ষের বিনাশ জন্য দিবাকর আচ্ছন্ন
করিয়া শিবের সৈন্য মহানন্দে যায় রে।
পদভরে কম্পে পৃথ্বী হইল নিকটবর্ত্তী
মহারাজ চক্রবর্ত্তী দক্ষের আলয় রে॥

দিনে যেন সূর্য রাহুগ্রস্ত দেখিয়া যত সভাস্থ
সবে হয়ে শশব্যস্ত চারিদিকে চায় রে।
কহে সব ঋষিবর্গে না জানি কি আছে ভাগ্যে
আসিয়া দক্ষের যজ্ঞে বুঝি প্রাণ যায় রে॥
সকলে করয়ে তর্ক হও সবে সতর্ক
নন্দী অমঙ্গল তর্ক বুঝি বা ঘটায় রে।
ভৃগু কয় ভট্টাচার্য থাকুক সকল কার্য
বুঝিলাম নির্ধার্য পড়িলাম লেঠায় রে॥
ভয়েতে ব্যাকুল চিত্ত কলা মুলা ঘৃতপাত্র
বন্ধন করিতে গাত্র মার্জনী বিছায় রে।
শীঘ্র পালাবার চিন্তে তাড়াতাড়ি করে বাঁধতে
এক টেনে আর আনতে আর দিকে এড়ায় রে॥
পুনঃ শুন বৃত্তান্ত যত শিব সামন্ত
দক্ষ যজ্ঞ করে অন্ত আসিয়া ত্বরায় রে।
শব্দ শুনি হুম হাম করে মহা ধুমধাম
মারে কিল গুমগাম সবার মাথায় রে॥
সবে করে যজ্ঞ দৃষ্ট কেবা করে যজ্ঞ নষ্ট
কেহ কারে সুস্পষ্ট দেখিতে না পায় রে॥
বাড়িল বিষম দ্বন্দ্ব দেখিয়া গতিক মন্দ
ভয় পেয়ে ইন্দ্র চন্দ্র সকলে পলায় রে॥
দ্বিজ ক্ষত্রি শূদ্র বৈশ্য পলাইছে করি দৃশ্য
ভূতগণ মহাদস্যু তেড়ে ধরে তায় রে।
ভগের উপরে চক্ষু মুনি বলে একি দুঃখু
ছার বেটা গণ্ডমূর্খ প্রাণ বাহিরায় রে॥
বীরভদ্র বলবন্ত অনেকের করিল অন্ত
ভাস্কর ভাঙ্গিয়া দন্ত ভূমিতে ফেলায় রে।
কাহারো ভাঙ্গিল তুণ্ড কারো হস্ত কারো মুণ্ড
অবশেষে যজ্ঞকুণ্ড মুতিয়া ভাসায় রে॥

কেহ বলে বীরভদ্র আপনি বট হে ভদ্র
মোরা হই দ্বিজ ছদ্ম মেরো না আমায় রে।
দক্ষ কন একি কাণ্ড বেটারা কি দুর্দণ্ড
যজ্ঞটা করিল পণ্ড হায় হায় হায় রে॥
অষ্ট দিক অধঃ উর্ধ্ব সকলি করিল রুদ্ধ
বীরভদ্র করে যুদ্ধ কোথা কে এড়ায় রে।
পাইয়া শিবের আজ্ঞে নাশিতে দক্ষের যজ্ঞে
মহানন্দে ভূতবর্গে নাচিয়া বেড়ায় রে॥

* * *

বীরভদ্র বলে ধর রাগে করে গরগর
ভৃগুর ধরিয়া কর দাড়ি ছেঁড়ে পড়পড়
বহিয়া তার কলেবর রক্ত পড়ে ঝর ঝর
মুখে নাহি সরে স্বর গলা করে ঘড় ঘড়
ভূমে পড়ি মুনিবর করিতেছে ধড়ফড়
অন্য যত শিবচর দন্ত করি কড়মড়
আঁচড় কামড় চড় মারিতেছে ধড়াধড়
ভয়ে মুনির অন্তর কাঁপিতেছে থর থর
পিন্ধন বসনোপর মুতে ফেলে ঝর ঝর
বলে বাপু রক্ষা কর তনু হৈল জর জর
পলাই রে আপন ঘর তবে তোরা সরসর
দক্ষেরে যাইয়া ধর সেই বেটাতো বর্ব্বর
তোমাদের যজ্ঞেশ্বর নিন্দা করে নিরন্তর
কিছু মাত্র ডর নাহি মনে
এই মত মহাবীরে ভৃগু মুনি ধীরে ধীরে
বিধিমতে স্তব করে বলে আমায় বধিও না জীবনে।

—দক্ষযজ্ঞ, পৃঃ ৪৮৩

* *

যোগমায়ার রূপ বর্ণনা

যেমন তীর্থের সেরা কাশী ধাম কর্মের সেরা নিষ্কাম
নামের সেরা রাম নাম তারক ব্রহ্ম জানি।
খাদ্যের সেরা ঘৃত ক্ষীর দেশের সেরা গঙ্গাতীর
বেশের সেরা শ্রীপতির গোষ্ঠ বেশখানি॥
বলের সেরা যোগবল ফলের সেরা মোক্ষফল
জলের সেরা গঙ্গাজল থলের সেরা ফণী।
পুরাণের সেরা ভারত রথের সেরা পুষ্পক রথ
পুত্রের সেরা ভগীরথ বংশ চূড়ামণি॥
মুনির সেরা নারদ মুনি ফণীর সেরা অনন্ত ফণী
নদীর সেরা মন্দাকিনী পতিতপাবনী।
পূজার সেরা আশ্বিনে পূজা মূর্তির সেরা দশভুজা
মুক্তির সেরা শেষ থাকে যার সেই যুক্তি শুনি॥
চুলের সেরা চাঁচর চুল কুলের সেরা ব্রহ্মকুল
ফুলের সেরা কমল ফুল করেন কমলযোনি।
তন্ত্রের সেরা নির্বাণ তন্ত্র মন্ত্রের সেরা হরিমন্ত্র
যন্ত্রের সেরা বীণা যন্ত্র বাজান নারদ মুনি॥
তিথির সেরা পূর্ণিমা তিথি ব্রতীর সেরা যজ্ঞে ব্রতী
স্মৃতির সেরা হরিস্মৃতি বিপদ নাশিনী।
মেঘের রৌদ্র ধূপের সেরা রামচন্দ্র ভূপের সেরা
তেমনি দেখেন রূপের সেরা হরমনোমোহিনী॥

—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, পৃঃ ১২

*

কুব্জার রূপ বর্ণনা

ক

রূপ দেখে বিশ্বরূপি লজ্জায় পালায় রূপী
বদন দেখে ভেক ভেকিয়ে যায় ॥
নাক দেখে লুকায় পেঁচা নয়নের দেখে ধাঁচা
বিড়াল বিরলে কাঁদে বসে।
ধনীর ধ্বনি শ্রবণ করি গাধা হল দেশান্তরী
মেঘের সঙ্গেতে ধ্বনি মেশে ॥
দুটি কান দেখে কানাই হাতীর খাতির নাই
কাননে লুকায় মনোদুঃখে।
জো নাই করিতে জোড় চরণ দেখি মানিক জোড়
উড়ে গিয়েছে উড়ের মুলুকে ॥
কিবা অঙ্গের হাব ভাব পেটে পিঠে একটি ভাব
এই ভাবি কি এত ভাব ঘটে।
দেখি ভাবশুদ্ধ ভাব একি ভাবের প্রাদুর্ভাব
ভাব দেখে যে ভাব ভক্তি চটে ॥

—মাথুর (২), পৃঃ ২০৪

অঙ্গে পৃষ্ঠে ঢিপিঢাপা আট দিকে তার বেঁক।
পেটটি ডোঙ্গা শতেক ভাঙ্গা যেন গাঙ্গের টেঁক ॥
ঠিক তালপারটি বড় ঠেঁটা দেখিলে ভয় লাগে।
তায় ভীষণ ভাষা বৃদ্ধ দশা নব অনুরাগে ॥
তাতে কোটরে চক্ষু অতি সূক্ষ্ম করিছে মিটি মিটি।
হঠাৎ তারে দেখিলে পরে সন্ত দাঁত কপাটি ॥
নাই নারীর চিহ্ন স্তন বিভিন্ন কি বিধাতার গতি।

ভুরুরই ভঙ্গে না নাকের সঙ্গে ফারখতা ফারখতি ॥
দেখিতে শুলুক কদর্য মুখ বুকময় খাল ডোবা।
তাকে দৃষ্ট করি বলেন হরি এটা কে রে বাবা ॥

—অক্রুর সংবাদ (২), পৃঃ ১৮৪

৫

শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা

তরুণ অরুণ জিনি জিনি রক্ত সরোজিনী
কেশব মনোরঞ্জিনী কত শোভা চরণে।
সরোজ নিন্দিত কর সুধামুখীর শোভাকর
সলজ্জিত সুধাকর পদনখ কিরণে ॥
কিশোরীর কি মধ্যদেশ কেশরী তায় করি দ্বেষ
বনে যায় ছাড়ি দেশ বলে লাজে মরি রে।
কিবা নাভি গভীর কিশোরীর কি শরীর
মদনের গেল শরীর পেয়ে তাপ শরীরে ॥
তিল ফুল জিনি নাসা খগপতির দর্পনাশা
পূরাইতে কৃষ্ণের আশা বিধি রূপ গড়িলে।
চক্ষে হেরি পেয়ে তাপ হরিণীর হরিল দাপ
থাকে না চক্ষের পাপ চক্ষে চক্ষু হেরিলে ॥

ী, পৃঃ ৫৭

৬

কমলেকামিনী বর্ণনা

কালীদহে কমলেকামিনী উপবিষ্ট।
উপমা নাই কোন রূপে রূপের গরিষ্ঠ ॥
অনঙ্গ হইতে অঙ্গ কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ।

কটি দেখে কেশরী পলায় পেয়ে কষ্ট ॥
বিম্ব ফল বিফল মানিল হেরে ওষ্ঠ।
নয়নে করিছে ধনী মৃগমদ নষ্ট ॥
কালফণী হতে বেণী গৌরববিশিষ্ট।
বদন চাঁদের কাছে চাঁদ অপকৃষ্ট ॥

—কমলেকামিনী (১), ৫৮৫

বিবিধ সংগ্রহ

১

কংসের কাল ও কলিকাল

শ্রবণ কর মহাশয়, আশ্চর্য এক বিষয় তখন পুণ্যবান সমুদয়
এক পাপী কংস মথুরাতে ছিল।
তার ভার না পেরে ধরতে পৃথিবী যান নালিশ করতে
ভার সহ্য কোনরূপে না হলো ॥
এখন বাংলাটা করিলে দশ অংশ একাংশে দশ হাজার কংস
অন্যদেশ লক্ষ্য হলে লক্ষ হতে পারে।
কি রূপে ভার ধরেন পৃথ্বী পৃথিবীর ঘৃণা পিত্তি
লোপাপত্তি হয়েছে একেবারে ॥

* * *

শুনেছি পৃথিবী কলিতে গিয়াছিলেন বলিতে
কাশীধামে কাশীনাথের নিকটে।
শুনে কন পশুপতি বস বস বসুমতি
ভোগ শুন আমার ললাটে ॥
আমি মৃত্যুকে করিয়া জয় নাম ধরেছি মৃত্যুঞ্জয়
মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু এখন ভাল।
আমি লব কি তোমার ভার আমারি মুখ দেখান ভার
কাশীতে আমার ভূমিকম্প হলো

আমি গুণ আর কিসে প্রকাশি ত্রিশূলের উপর ছিল কাশী
কলি বেটা ক্রমে নড়িয়ে দিলে।
দৈত্যনাশিনী ঘরে নারী তিনি বলেন আমি কলিকে নারি
অবাক হয়ে আছেন ছুটি ছেলে॥
শুন শুন ভূতল যাও তুমি উৎকল
জানাও গিয়ে জগন্নাথের স্থানে।
শুনি কাশী পরিহরি করিলেন শ্রীহরি
সিন্ধুকূলে শ্রীহরি যেখানে॥
মনের যত বেদন অভয় পদে নিবেদন
করিলে ধরা অভয় পদ ভাবি।
গতমাত্রে হল ব্যাঘাত জবাব দিলেন জগন্নাথ
বললেন আমার হাত নাই পৃথিবী॥
একে আমার নাই কো হাত তাতে আমি অনাথ
অকূল সমুদ্র কূলে আছি।
ছল কয়জন প্রিয়পাত্র কলির অধিকার মাত্র
পাণ্ডব আদি স্বর্গে পাঠিয়েছি॥
কতকগুলি ভোগ গ্রহণ করতে আছি দশ হাজার বর্ষ মর্ত্যে
এই কথা শুনে বসুমতী।
প্রণাম করে বিদায় লয়ে মেদিনী বেদনা পেয়ে
জানায় গিয়ে যথা ভাগীরথী॥

* * *

গঙ্গা কন শুন পৃথ্বী ঘুচিল ভগীরথের কীর্তি
গঙ্গার এখন গঙ্গালাভ গণ্য।
গেছে সে তরঙ্গ প্রবল মহাপ্রাণীটে আছে কেবল
পাঁচ হাজার বর্ষ নিয়ম জন্য॥
আমার সে জোর নাই, কি বল জোয়ার আছে তাইতে কেবল
যোগে যাগে যেতেছি।
ক্রমে এলাম হয়ে ক্ষীণ বাড়িছে দুঃখ দিন দিন
গণতির দিন কটা মর্ত্যে আছি॥

আমার সর্বাঙ্গে ঘেরেছে চড়া সাধ্য নাই আর নড়াচড়া
যেমন চড়া তেমনি পড়া বলিব দুঃখ কাকে।
তোমার ভার কি লব ধরণি এলে একশত মনের তরণী
চালাতে নারি, চড়ায় আটকে থাকে॥
(যদি বল কিছু পাপ ছিল)
আমার পরম গুরু কৃত্তিবাস তাঁর শিরে করেছি বাস
সতীনের দ্বেষ করেছি সদাই।
সতীন কি সামান্য নিধি তিনি দুর্গতিহারিণী দিদি
তাইতে এত মনস্তাপ পাই॥
সতীনের উপর করি দ্বেষ স্বামীকে দিয়েছি ক্লেশ
সেই ফল মোর ফলিল এতদিনে।
স্বামী আমার সদানন্দ কত শত বলেছি মন্দ
একটি কথা রাখেন নাই কো মনে॥
বুঝি সেই পাপেতে শূলপাণি এখন দলে মিশে হন কোম্পানি
যবনে বলে গঙ্গাপানী লজ্জা দেয় আমাকে।
নৈলে কাটি গঙ্গা করে তারা ফিরিয়ে দেয় আমার ধারা
এ লজ্জা মলে কি আমার ঢাকে॥
নরে করে এত মন্দ কালীঘাট দিয়ে পথ বন্ধ
দিনে দিনে সন্দ বাড়ছে মনে।
মানে না কেউ গঙ্গা বলে মল মূত্র দেয় ফেলে
মর্ত্যলোকে তত্ত্বকথা কে শোনে॥

—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, পৃঃ ৫

২

কলিকালের মাতৃভক্তি

মায়ের তুল্য করিতে স্নেহ ভারতে দেখিনে কেহ
অমন স্নেহ কে করে ভুবনে।
কিন্তু এখনকার কলিযুগের অনেক ব্যক্তি তাদের দেখে মাতৃভক্তি
যায় হরি ভক্তি উক্তি করতে যুক্তি হয় না মনে॥

কিন্তু না বলেও থাকা যায় না করে না মাগকে নিয়ে ঘর কন্না
মা ডাকলে কথা কন না সন না মাগী বলে।
একে মরছি আপনার জ্বালায় বুড় মাগী আবার কেন জ্বালায়
আমার জলায় মজুর বসে আছে সকলে॥
খেতে খামারে হয়নি ধান তুই মাগী বজ্জাতের প্রধান
সংসারে অনুসন্ধান নাই ত কিছু তোর।
কেবল বসে বসে নিচ্ছ আহার এখন গোটা কত হয় প্রহার
তবে মনের দুঃখ ঘোচে মোর॥
একলা খেটে মরে ছুঁড়ী চক্ষের মাথা খেয়েছিস বুড়ি
গুঁড়িয়ে মুড়ি খাচ্চ কাটা কাটা।
পরের মেয়ে সইবে কত অন্যের মত ও যদি হতো
হাত ধরে বার করে দিত মেরে সাত ঝাঁটা॥
তুই মাগী থাকতে কাছে ও ছেলের ন্যাকড়া কাচে
বেড়াস কেবল কাছে কাছে কত কথা কয়ে।
আমার সংসারটা করলে শূন্য মাগি কবে যাবি উচ্ছন্ন
আপদ শূন্য হই ফেলে দিয়ে॥
এমনি মায়ের সঙ্গে শীতলতার কথা আহারের আবার শুন কথা
উত্তম ব্যঞ্জন কাঁঠাল আর ক্ষীরে।
আপনারা খান সমুদয় বৃদ্ধ মাকে নিত্য দেয়
পুঁয়ের ডাঁটা অলবণ ভাতে ভাঙ্গা পাথরে বেড়ে॥

—তরণীসেন বধ, পৃঃ ৩৯১

৩

কলিকালের পিতৃভক্তি

হলো কি আশ্চর্য কলির সৃষ্টি সৃষ্টি ছাড়া এদের সৃষ্টি
সৃষ্টিকর্তা অবাক হয়েছেন দেখে।
তাঁর আর সরেনা বাণী বাণীহারা হয়েছেন বাণী
জ্ঞানশূন্য ভবানী বাণী নাই তাঁর মুখে॥

এদের দেখে শুনে অভক্তি শুনলে যেমন মাতৃভক্তি
পিতৃভক্তি ততোধিক আবার।
বাপ থাকে বাহিরে দরজার উপর তৃণ কাষ্ঠহীন ছাপ্পর
তালপত্র ঘেরা দুই ধার॥
আপনাদের শয়ন পালং খাটে বাপের শয়ন ছেঁড়া চটে
কপ্নি এতটুকু কটিতটে ঘটে না সব দিন।
আপনারা খান খাসা মোণ্ডা ক্ষীর দুধ বাপকে খাওয়ান আকাঁড়া খুদ
দিবসান্তর ডাল ব্যঞ্জনহীন॥
যদি দিবানিশি মিন্‌সে চেঁচায় ফিরে কেহ নাহি চায়
বলে কেবল বেটা খেতে চায় ভীমরতি হয়েছে।
বলে দেখে শুনে মেনেছি হার যোগাই কোথা এত আহার
এত রাত্রে কে যাবে তোর কাছে॥
যে দেখি তোর বাড়াবাড়ি ফেলে রেখে ঘর বাড়ী
কার বাড়ী শুইগে না হয় গিয়ে।
এমন কলেরাতে এত লোক মঁলো আরে মলো বুড় না মঁলো
চিত্রগুপ্ত ভুলে গেল খাতা না দেখিয়ে॥

—তরণীসেন বধ, পৃঃ ৩৭২

৪

বিশ্বনিন্দুক

বিশ্বনিন্দুক একজন গিরিপুরে করি ভোজন
বিরাশী সিক্কার ওজন মতে।
এক মোট বস্ত্রে বাঁধিয়ে ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে
ব্যস্ত হয়ে গমন হয় পথে॥
তারে দেখি যত্ন করে একজন জিজ্ঞাসা করে
ভোজনের কেমন পারিপাট্য।
শুনলেম ভোজনের ভারি যশ দ্রব্য নাকি নানা রস
বস্ত্র নাকি দান কচ্ছেন পট্ট॥

বিশ্বনিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয়
তারই কর্মে তারিপ, ও মোর দশা।
সংসারটা ভারি আঁটা মহাপ্রেত সে গিরি বেটা
মিন্‌সে হতে মাগী দ্বিগুণ কসা॥
করেছে একটা কর্ম সারা বামুনকে দেন সোনার ঘড়া
লাক দুই তিন সেই বা কটা টাকা।
আঠার পোয়া করে ওজন গড়ে তাতে ক সের বা জল ধরে
সুপড়ো সেনা, তাই বা কোন পাকা॥
বাহিরে চটক খরচ হাল্‌কি ভোজেও বেটার ভোজের ভেল্‌কি
যে খেয়েছে সেই পেয়েছে টের।
পাকী হন বড় মান্য পাক করেছেন পরমান্ন
আধ পোয়া চাল দুগ্ধ ষোল সের॥
ফলার করেছেন পাকা কলাগুলা তার আধ পাকা
একটা নাই মর্তমান সবগুলো কুলবুত।
তিন পোয়া বেড় করেছে লুচি না করিলে ত্রিশ কুচি
আহার করিতে নাই যুত॥
সন্দেশগুলো সব মিছরি পাকে তাতে কখন মিষ্টি থাকে
দলো না দিলে দলো হয়ে যায়।
চিনিগুলো সব ফুটসাদা বড়ি মিশান বুঝি আধা
এত ফরসা চিনি কোথায় পায়॥
মোণ্ডাগুলো সব ফাটা ফাটা ক্ষীরগুলো সব আটা বাটা
খিরকিচ বাধায় ক্ষীর খেতে।
সকল দ্রব্যই ফাঁকিতে কেনা ধেনো গরুর দুধের ছানা
বড় দুঃখ পেয়েছি পাত পেতে॥
দেখিলাম বেটার সকলি ফক্কি বামুন বড় যাটি লক্ষি
ইহার বাড়া হয় যদি কান কাটি।
সকল বিষয়ে ন্যূনকল্প কেবল পাহাড়ে গল্প
মেটে জাঁকে ফেটে যাচ্ছে মাটি॥

এই রূপ গিরি রাজায় নিন্দা করি দ্বিজ যায়
গিরি ধন্য বলিছে অন্য লোকে।
দশে পৌরুষ যাকে একজন নিন্দিলে তাকে
সে নিন্দে ঢাকের গোলে ঢাকে॥
—শিব বিবাহ, পৃঃ ৫০২

তরুণীদের কাশীযাত্রা

দৈবে এক রাত্রে নৌকা যাচ্ছে গঙ্গা বেয়ে।
যাচ্ছে কাশী দক্ষিণ দেশী যত ছেনাল মেয়ে॥
কলুটোলার রূপা কলুনী কাঞ্চনী আর কুমুদী।
খিদিরপুরের ক্ষেপা খানকি, খড়মপেয়ে খুদী॥
গোঁদলপাড়ার গোদা কমলী গেঁদা গোলবদনী।
ঘুস্কীপাড়ার ঘুষখাকী ঘোষাল ঘোল বেচুনী।
উম্দ রাঁড়ী উজ্জ্বলী উষা খানকীর বাঁদী।
চোরবাগানের চাঁপার বেটী চোপরা কাটা চাঁদী॥
ছোলা দাঁতী ছুকরি ছেনাল ছদ্ম ছুতরের বেটী।
যোড়াসাঁকোর জয় যুগিনী যমুনা রাঁড়ীর জেঠী॥
ঝড়ুর নাতনী ঝোড়ঝেঁটেনী ঝাড়ুওয়ালীর ঝি।
ইন্দুর নাতনী ইচ্ছামতী ইতর বলব কি॥
টেপুশালী টোপন গালী টেরী বসে টেরে।
ঠাকরোর বেটী নামটি ঠেঁটী ঠনঠনের বাজারে॥
ডুমুরদয়ের ডাকসাইটে ডউরে রাঁড়ী ডুমনী।
ঢাকাপটীর ঢাকবাজানী ঢাকাই বাবুর ঢেমনী॥
আন্দুলবেড়ের আন্দিরাঁড়ী আহিরীটোলার হীরা।
তুলোপটীর তেনা তাঁতিনী তুলসী বাগানের তারা॥
থানা মাকুল থোকপড়ুনি থুকড় থাক বামনী।
দুলোর বেটী প্রেমদুলালী দুলাল ঘোষের ঢেমনী॥

ধর্মতলার ধানী ধোপানী ধীরেমনি দাঁতিনী।
নাথের বাগানের নবি নাপ্তিনী নেকুড়ে নটীর নাতিনী॥
প্রেমানন্দে যায় তীর্থে প্রেমার বেটী পদী।
তরণী ভরা তরুণী লয়ে বয়ে যায় নদী॥

—নলিনী ভ্রমর (১), পৃঃ ৬৭৫

* * *

৬

গহনার তালিকা

ছাবা চুটকী পায়জোর গুজরি ঘুংঘুর বোর
গোল মল হীরাকাটা যায়।
হাতমাছুলি চন্দ্রহার চৌনরগোট চমৎকার
চাবি শিকলি চাবি গাঁথা তায়॥
গোখরি বালা পরিপাটী হাতমাছুলি পলাকাটী
তিলে লোহা হীরের অঙ্গুরী।
তিন থাক মর্দনা কাটা পৈঁছে রোসনা
স্বর্ণ তাড় দমদম ফুলঝুরি॥
মহিষ শিঙ্গের শাঁখা দুই দিকে তায় রেখা রেখা
মধ্য খানে স্বর্ণের মোড়া।
বাউটির কোলে কত বন্ধ বাহুমূলে বাজুবন্ধ
তাড় আর তাবিজ এক কোঁড়া॥
গলে দোলে সাত থাকী প্রতি থাকে ধুকধুকী
সর্বদা করয়ে ঝিকমিক।
পদক মোহন মালা উজ্জ্বল করয়ে গলা
তদুপরে শোভা করে চিক॥
চাঁপাকলি মটর মালা কর্ণে শোভে কানবালা
চেড়ি ঝুমকা পিপুলপাতা আর।
বিবিয়ানা কর্ণফুল আড়ানি মীনের দুল
ঝুমকাতে ঘুনুটির বাহার॥

নাকে নথ হিন্দুস্থানী তাহে শোভে মতিচুনি
নাক চোনা ঝুমকা নলক।
দক্ষিণ নাসায় কিবে ময়ূর কেশর শোভে
জ্ঞান হয় দামিনী ঝলক ॥
মস্তকে জড়োয়া সিঁথি তার মাঝে গাঁথা মতি
কত শোভা ধন্য পয়সাকে।
এ সব গহনা পেলে যক্ষরাজ কুতূহলে
বিধিমত সাজাইত যাকে ॥

—দক্ষযজ্ঞ, পৃঃ ৪৭৯

*　　*　　*

৭

জলপানির তালিকা

জলপানি দ্রব্য সব আনয়ন করি কেশব
দ্বিজেরে দিলেন গুণনিধি।
বৃক্ষফল নানা রস মধুর আম্র আনারস
কুলপুত কদলী কাঁটালাদি ॥
কাঁকুড় তরমুজ শসা নানা রস তিক্ত কসা
বাতাবি দাড়িম্ব নারিকেল।
মর্তমান রম্ভা নাম খর্জুর গোলাপ জাম
বাদাম বকুল জাম কুল ॥
দিলেন ভিজে বরবটি বুট খাসা দাড়িম্ব ফুটি
সকর কন্দ আলু আদা মুলো।
দেশের সন্দেশ যত সে নাম করি কত
যতনে দিলেন কতগুলো ॥
পকান্ন পানিতুয়া মণ্ডা মতিচুর মেওয়া
শর্করা সরবৎ সরভাজা।
ওলা মিছরি কদমা পেড়া বরফি ছাবা ছেনাবড়া
ক্ষীর তক্তী ক্ষীর পুলি খাজা ॥

জিলেপি গোল্লা নবাৎ খাসা কাটা ফেনি ফুলবাতাসা
নিখুঁত এলাজ দানা সাকোর গোলা ॥
দিয়া ছানা শর্করা সখের সন্দেশ পাক কড়া
দেখে দ্বিজ আহ্লাদে উতলা ॥
—শ্রীমতীর কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন, পৃঃ ৩১৯

শাড়ির তালিকা

কেঁদে বলে এক নারী দিদিলো দুঃখ সইতে নারি
আমি কাল কিনেছি কালোকিনারী ষোল টাকা দামে।
কেউ বলে মোর নীলবসন ভূষণকে করে ভূষণ
শত টাকায় গত সন কিনেছি ব্রজ ধামে ॥
কেউ বলে মোর মলমল স্থত অতি স্থকোমল
পরিলে করে ঝলমল অঙ্গখানি হয় লো।
কেউ বলে মোর বুটতোলা স্থতো তার টাকা তোলা
রেখেছিলাম করে তোলা আট পহরে নয় লো ॥
কেউ বলে মোর জামদানি এ দেশে নাই ইদানী
আর তেমন আমদানী এখানেতে নাই লো।
কেউ বলে মোর গোটাদার হায় হায় তার কি বাহার
দেখতে অতি চমৎকার আঁচলা সমুদয় লো ॥
কেউ বলে মোর টেরচা ঢাকাই সদাই তোলা থাকত ঢাকাই
মুটোয় কিংবা কৌটোয় পোরা যায় লো।
কেউ বলে মোর গুলদার তার কথা কি বলব আর
শোকে কান্না পায় আমার সিপাইপেড়ে বড় কষ্কা তায় লো॥
কেউ বলে মোর বালুচরে কিনেছিলাম কত করে
কেউ বলে মোর বারানসী চেলি।
কেউ বলে মোর ভাল তসর দেখিতে অতি স্থন্দর
এই রূপেতে পরস্পর করে বলাবলি।
—গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৭৪

১

শ্রীরাধার কৃষ্ণস্তব

ওহে কৃষ্ণ কংসারি কৃতান্তভয়ান্তকারি
করপুটে কাঁদে কিশোরী করুণার প্রয়াসী।
কঠিন কিসের তরে কৃপা নাই কি কলেবরে
কক্ষে দেও কেমন করে কলঙ্ক কলসী॥
খর খর বচন বলে খল খল হাসিবে খলে
ক্ষুদ্রগণের খেদ পূরালে ওহে ক্ষীরোদবাসি।
কি খেলা নাথ খেলাইলে ক্ষিতি হতে খেদাইলে
খুনপ্রায় ক্ষতি করিলে এই বড় খেদ বাসি॥
গোবিন্দ গোলোকের পতি গতিহীনগণের গতি
জ্ঞানহীনে গায় কি সঙ্গতি গুণের গরিমে।
গোপগণ কাঁদে গোপনে গোধন কাঁদে গোবর্ধনে
গোপাল কি মনে গণে গা ঢেলেছ ভূমে॥
দেখে ঘন মিদ্রে ঘনশ্যাম ঘোর ভয়েতে ঘামিলাম
ঘটে তোমার অবিশ্রাম কত ঘটনাই ঘটে।
কি ঘটার ঘটক হয়ে ঘটে ছিদ্র ঘটাইয়ে
ঘোর শত্রু ঘাটাইয়ে কেন ফেল দুর্ঘটে॥
ওহে উৎকট ভঞ্জন উমাপতি আরাধ্য ধন
নাই শক্তি উত্থায়ন উপায় করি কি।
উত্তাপে দেহ নিপাত উত্তরি কিসে উৎপাত
উদ্ধারহ দীননাথ উর্ধ্ব করে ডাকি॥
তুমি চরমের চিন্তাহরণ চরাচরে চাহে চরণ
চন্দ্রচূড়ের চিরধন তুমি হে চিন্তামণি।
ওহে চিন্তাময় হরি দুঃখে চক্ষের জল নিবারি
ওহে চক্রি তোমার চক্র দেখে চমকে পরাণী॥
ছলগ্রাহি ছল দেখি ছল ছল করিছে আঁখি
ছয় করা ছন্দ একি ছাড় ছাড় ছলনা।

ছিদ্র ঘটে জল না এলে ছোট লোকে ছিদ্র পেলে
ছি ছি কান্ত ছি ছি বলে করিবে হে লাঞ্ছনা ॥
ওহে জলধর বর্ণ জ্বালাবে জলের জন্য
জীবন করিবে জীর্ণ বাকি তা কি জানতে।
যায় যাবে জীবন জাতি যন্ত্রণা পান যশোমতী
যা কর হে জগতপতি যাই জল আনতে ॥

—কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১২৪

*　　　*　　　*

১০

শ্রীরামের দুর্গাস্তব

কঙ্কালি কালবারিণি কালে কৃতার্থকারিণি
কৃশকরা কটাক্ষে কৃতান্ত।
খরশান খড়্গাধরা খলে খণ্ড খণ্ড করা
ক্ষেমঙ্করি ক্ষণে হও মা ক্ষান্ত ॥
গৌরি গজাননমাতা গতিদা গায়ত্রি গীতা
গঙ্গাধর জ্ঞানে গুণ গান তো।
ঘণ্টানাদ বিলাসিনি ঘটনায় ঘটরূপিণি
ঘনরূপিণি কর মা ঘোরান্ত ॥
উমে ত্বং উমেশরাণি উৎকট পাপ উদ্ধারিণি
উদ্দেশে আছেন উমাকান্ত।
চিদানন্দ স্বরূপিণি চিত্ত চৈতন্যকারিণি
চণ্ডি চরাচর জন্য চিন্ত ॥
ছলরূপ ছাড়ি ছলে পদছায়া দাও ছাওয়ালে
ছন্দরূপিণি ঘুচাও মা ছন্দ।
আমার করিবে কি জননি জয়া জয়ন্তি যোগেশ জায়া
জানকী বিচ্ছেদে জীবনান্ত ॥

—রাবণ বধ, পৃঃ ৪৩৭

১১

শ্রীমন্তের কালীস্তব

তুমি কালবারিণী কাল হর মা কাল পরে।
কুলকুণ্ডলিনী রূপে কমলে বাস কলেবরে॥
তুমি কালাকালে কলুষ কায় কর মুক্ত কালকরে।
কৃতার্থ কারণে কালি কাল তৎকামনা করে॥
তুমি কৌমারী কামারিকামিনী কামাদিপ্রদায়িনী নরে।
কৈবল্যকর্ত্রী কুলদাত্রী মা কাশীশ্বরে॥
দেখি কি ক্ষণে কালি কালীদহে কামিনী গিলে করিবরে।
কাল হয়ে কুপিয়ে ভূপতি করে বন্ধন করে করে॥
কি করি কুজন কপটে কষ্টে মা কুমার মরে।
কাতরোহং কালকান্তে কুরু করুণা কিঙ্করে॥
করিতে করুণা কব ক্রন্দন করিয়া কারে।
কালী বই ঘুচাতে কালি কারে ডাকি মা কারাগারে॥

—কমলে কামিনী, পৃঃ ৫৮৬

পরিশিষ্ট—খ

বিশিষ্ট সঙ্গীত-পঞ্চাশৎ

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক

১

ঝিঁঝিট—যৎ

ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ।
কালো রতন রমণী রঞ্জন॥
মোহন করে মোহন বাঁশী, বিধুমুখে মধুর হাসি, সই
আবার কটাক্ষে চায় নাচায় দুটি নয়ন-খঞ্জন॥
নিরখিয়ে বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে চাঁদ বদনখানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো,
বিধি যদি সদয় হতো, কুলের শঙ্কা না থাকিত, সই
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধুবদন॥ ১॥

—ব্রজনারীগণ, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা (১), পৃঃ ৩৪

সিন্ধুভৈরবী—পোস্তা

যাব না করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।
বাঁশীতে মন উদাসী, হই গো দাসী শ্রীচরণে॥
মনে হয় মানে বসি, হেরব না আর কালশশী,
কাল হল মোহন বাঁশী, না হেরিলে মরি প্রাণে॥
পারিস কেহ সহচরি, রাখতে মোর মনকে ধরি,
কালাচাঁদ প্রেমডুরি, বেঁধে মনে বনে টানে॥ ২॥

—শ্রীরাধা, কৃষ্ণকালী, পৃঃ ৫৫

৩

স্থরট মল্লার—কাওয়ালী

সই গো ডুবিলাম ঐ রূপ সাগরে।
গোকুল নগরে, ঐ রূপ সাগরে,
আছে কে হেন সুহৃদ, আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে॥
মরি কি রূপমাধুরী, নীলোৎপল বল হরি
নিল, দিল লাজ নীল গিরি বরে।
কত দেখি লো কালো, সখি লো একি কালো,
দেখি অখিল ভুবন আলো করে॥
ভবে এ নীল ধন কে আনিলে, বিনি মূলে তরু মূলে,
ও নীলবরণ কিনিল মোরে।
আমি একা কোথা রাখি, ধরো গো ধরো গো সখি,
ও রূপ আমার আঁখিতে না ধরে।
কোটি আঁখি দিলে বিধি, কিছু কাল ঐ কাল নিধি,
হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে।
ঐ কালো রূপ বিশ্বরূপের রূপ, দাশরথি কয় শ্রীমতি,
দেখ নয়ন মুদে অন্তরে॥ ৩॥

—শ্রীরাধা, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৭০

৪

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

ননদি গো, বলো নগরে সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে॥
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয় বাসে, ওলো সেকি বাসে বাস করে।
কাজ কি গো কুল, কাজ কি গোকুল, প্রতিকূল সব হোক গোপকুল,
আমি তো সঁপেছি গো কুল, সেই অকূলকাণ্ডারীর করে॥ ৪॥

—শ্রীরাধা, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, পৃঃ ৮৩

৫

সুরট—খৎ

ওগো তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে।
সেই রাধার নয়নাঞ্জন নবজলদ বরণে॥
তার পরিধান পীতবসন, করে বংশী নিদর্শন,
আসি বলে অদর্শন হল বৃন্দাবনে॥
শুন গো সজনি শুন, না পেলে তার অন্বেষণ,
জীবন ত্যজিবে রাধে যমুনার জীবনে।
তার কমল যুগল কর, কমলিনী মধুকর,
নিন্দে কোটি সুধাকর চরণ কিরণে।
যে কৃষ্ণ পাণ্ডব সারথি, যে চরণে ভাগীরথী,
বঞ্চিত হয় দাশরথি, সে হরির চরণে॥ ৫॥

—বৃন্দাসখী, মাথুর (৩), পৃঃ ২১৪

৬

বিভাস—ঝাঁপতাল

আয় রে কানাই আয় রে গোঠে রজনী পোহাইল।
ডাকিছে ঐ সঘনে ধেনু, গগনে ভানু উঠিল॥
এস রে রাখালের রাজা, শ্রীনন্দের নন্দন,
আর, করেতে কর মুরলী, কটিতে ধটী বন্ধন,
রাখাল মণ্ডলী মাঝে নেচে নেচে চল॥
ও ভাই মায়ে বল বুঝাইয়ে, দিবে তোরে সাজাইয়ে,
অলকা আবৃত করি বদন কমল।
মোহন চুড়ে বকুল মালা মদনের মনোহারী,
শিরোপরি শিখি পুচ্ছ ওরে বঙ্ক মাধুরি,
গলে গুঞ্জ মালা যাতে ভুবন করে আলো॥ ৬॥

—রাখালগণ, গোষ্ঠলীলা (১), পৃঃ ৩০

৭

বিভাস—ঝাঁপতাল

আয়রে গোষ্ঠে যাইরে কানাই, গগনে উঠেছে ভানু।
চঞ্চল চরণে চল ভাই, চঞ্চল হয়েছে ধেনু॥
অঞ্চল ছাড়িয়া মায়ের শিরে পর মোহন চূড়া,
মুরলীধর মুরলী ধর, কটিতে পর পীত ধড়া,
অলকা তিলকা অঙ্গে পর নীলতনু॥ ৭॥

—শ্রীদাম, কালিয়দমন, পৃঃ ৪০

৮

ঝিঁঝিট—যৎ

বলরাম রে আজি মোর নীলমণি ধনে
গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারব না।
তোমরা এমন করে রাখাল মিলে ডাকতে এসো না॥
কুস্বপ্ন দেখেছি কালি, না জানি কি করেন কালী রে,
যেন কালীদহে ডুবেছে মোর কালিয়ে সোনা।
ইথে যদি দ্বন্দ্ব করে নন্দ মন্দ কয় আমারে,
এ পাপ সংসারে রব না রে,
গোপালকে লয়ে ঘরে ঘরে, রাখিব প্রাণ ভিক্ষা করে,
তবু গোপালের মা যশোদা নাম থাকবে ঘোষণা॥ ৮॥

—যশোদা, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা (৩),পৃঃ ৩১

৯

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল

হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধাসতী॥
মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥

আমার ধর ধর জনার্দন, পাপগিরি গোবর্ধন,
কামাদি ছয় কংস চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মনধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি ॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা কূলে, আশাবংশীবটমূলে,
সদয় ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল প্রেমে বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, হবে এই দাশরথি ॥ ৯ ॥

—নারদ, কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১১৬

১০

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে।
কলুষগর্বখর্বকারী, কুরু করুণা কংসারে ॥
যদি হে গতিবিহীন জনে, তার তারে তুস্তারে
তবে ত্বং মাহাত্ম্য-গুণ বিস্তার হে মুরারে।
ছজন কুজন সঙ্গে, ভ্রমণ সদা কুপ্রসঙ্গে,
মগ্ন সংসার তরঙ্গে, আসি ফিরে বারে বারে,
ক্রিয়াহীন কুমতি দীন দাশরথি দাসেরে,
দেহি ত্বং চরণে স্থান, শমনশাসন সংহারে ॥ ১০ ॥

—দুর্বাসা, দুর্বাসার পারণ, পৃঃ ২৮৯

১১

ঝিঁঝিট—ঠেকা

অপরূপ রূপ কেশবে।
দেখরে তারা এমন ধারা কালো রূপ কি আছে ভবে ॥
আ মরি কি প্রেমভরে সদানন্দ হৃদে ধরে,
ঐ রমণীর মন হরে, যে ভজে সে মুক্ত ভবে।

মা-বারি মৃত্তিকা মাখ, মাধবে দাঁড়ায়ে দেখ,
দিন সব হরিতে থাক, নইলে মা দুঃখ আবার দিবে ॥ ১১ ॥

—অক্রূর, অক্রূর সংবাদ (১), পৃঃ ১৫৯

১২

সুরট—ঝাঁপতাল

কিং ভবে কমলাকান্ত, কালান্তে কালকরে।
কুরু করুণা কাতর কিঙ্করে কৃষ্ণ কংসারে ॥
ক্রিয়াবিহীন কুমতিকৃতপাতককুলনিস্তারে।
কেশব করুণাসিন্ধু, কলিকলুষ সংহারে ॥
ওহে কুলবিহীনকুল, কুলকামিনীকুলহরকান্তে,
কালিয়ফণিকাল, কালবরণ, কালনিবারে।
কম্পে কায়া কামাদি কজন কুজন ব্যবহারে।
কাতরোহং রক্ষ কমলাক্ষ, দাশরথিরে ॥ ১২ ॥

—নারদ, রুক্মিণী হরণ, পৃঃ ২৩৫

শ্রীরাম বিষয়ক

১

বিভাস—একতালা

কি দিব তুলনা, জগতে মেলে না, তোমার তুলনা তুমি হে হরি।
আছেন নাভিপদ্মে বিধি তোমার গুণনিধি, তুমি বিধির বিধি সর্বোপরি ॥
ভজে তোমার পদদ্বয়, মৃত্যু করে জয়, মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি।
ঐ চরণে জাহ্নবী, পাষাণ মানবী, স্বর্ণ হলো কাষ্ঠতরী ॥
ওহে তোমার অভয় পায় জীবে মুক্তি পায়, ভবের উপায় পারের তরী,
বলির বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথায় পদ. দিলে ইন্দ্রপদ স্বর্গোপরি।
দীনের দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু, ত্রাণ কর ভবসিন্ধুবারি।
হলে পূর্ণ অবতার হরিতে ভূভার, রাবণ বধিতে রামরূপ ধরি ॥ ১৩ ॥

—হনুমান, সীতা অন্বেষণ, পৃঃ ৩৬৮

২

খট ভৈরবী—একতালা

যদি করেন পার ভবকর্ণধার, তবে কে করে পারের চিন্তে।
সেই অচিন্ত্য অব্যয় জগতের মূলাধার, নিত্য নির্বিকার,
তিনি সাকার কি নিরাকার কে পারে জানতে ॥
সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মসনাতন, পরম পদার্থ পরম কারণ,
পরমাত্মা রূপে জীবে অধিষ্ঠান, পুরুষ কি নারী নারি রে চিনতে ॥
দয়াময় নাম শুনি চিরদিন, দেখে দীনহীন দেন যদি দিন,
আমি দুরাচার ভজনবিহীন, স্থান কি পাব না সে পদপ্রান্তে ॥ ১৪ ॥

—হনুমান, সীতা অন্বেষণ, পৃঃ ৩৭২

শ্যামা বিষয়ক

১

খাম্বাজ—যৎ

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী।
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীলনলিনী ॥
প্রভাতের ভানু প্রভা, চরণকিরণ শোভা,
রণশোভা করেছে ঐ রণমত্তা রঙ্গিণী ॥
দ্বিজ দাশরথি কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়,
করে ধরে নরশির হরঘর ঘরণী ॥ ১৫ ॥

—অসুরসৈন্যগণ, ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল, পৃঃ ৪৮৬

২

আলিয়া—কাওয়ালী

কি অপরূপ রূপ বিমোহিনী।
মা আমার জগমনমোহিনী ॥
জগতে নাম জগদ্ধাত্রী, বিশ্বমাঝে বিশ্বকর্ত্রী
আর নাম কালী কালবারিণী ॥

নখরেতে কোটি শশী, অষ্টভুজা করে অসি,
মুখে অট্ট অট্ট হাসি, দশন তড়িত শ্রেণী ॥
রূপে আলো ত্রিভুবন, যোগীর আরাধ্যধন,
পরশে যার চরণ, ধন্য হন ধরণী।
হের গো হৈমবতি, আদ্যাশক্তি ভগবতি,
কহে দ্বিজ দাশরথি, গতি বিন্ধ্যবাসিনী ॥ ১৬ ॥

—যোগমায়ার রূপবর্ণনা, নন্দোৎসব, পৃঃ ২৫

৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী

কে রমণী মহাকালের ঘরে।
অসিখণ্ড বামার বাম করে ॥
পরবাসে, স্ববাসে, কি কাননবাসে, লাজ নাহি বাসে,
বামা তেয়াগিয়া বাসে, কৃত্তিবাসের হৃদে বাস করে ॥
শিরে তরঙ্গিণী কত তরঙ্গ, তাই শিবের রসরঙ্গ,
সপত্নী সহিত দ্বন্দ্ব, নিরখিয়ে সদানন্দ,
ভাসিছেন সদানন্দ সাগরে ॥ ১৭ ॥

—বৃন্দে, মাথুর (২), পৃঃ ২১০

৪

খাম্বাজ—একতালা

আমি কি হেরিলাম নয়নে।
মম সাধ্য নয় সে রূপ বর্ণনে ॥
আসন করি অরিপৃষ্ঠে, নিরখিলাম দৃষ্টে হাস্যাননে ॥
কি বা শোভা করে, ভালে আধ সুধাকরে,
অসিপাশাদি সহস্র করে, কম্পিতা ধরণী চরণের ভরে,
করে মাভৈ রব সঘনে ॥

ত্রিনয়নী এলোকেশী জ্ঞান হয়, পলকে করিতে পারে সৃষ্টি লয়,
হেন মনে লয় হবে সব লয়
সে প্রলয়কারিণীর রণে।
নৈলে কেন তাঁর পদাম্বুজদলে, চন্দনাক্ত বিল্বদলে শতদলে,
পূজে অমরদলে, শুনে দাশরথি বলে,
কি ভয় তার রণে মরণে ॥ ১৮ ॥

—দূত, মহিষাসুরের যুদ্ধ, পৃঃ ৫৭০

৫

স্বরট মল্লার—একতালা

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দম্ভিতা ধনী মুখ করাল
কম্পিতা ভয়ে মেদিনী।
দিগ্বসনী চন্দ্রভাল আলুয়ে পড়েছে কেশজাল,
শোভিত-অসি, করে কপাল, প্রখরা শিখরিনন্দিনী ॥
চারিদিকে যত দিকপাল, ভৈরবী শিবে তাল বেতাল
একি অপরূপ রূপ বিশাল, কালী-কলুষখণ্ডিনী ॥ ১৮ ॥

—বিবিধ-সঙ্গীত, পৃঃ ৬৯১

৬

আলিয়া—একতালা

কর কর নৃত্য নৃত্যকালী একবার মনসাধে
রণক্ষেত্রে মা মোর হৃদয় মাঝে।
দেহের ভেদী ছজন কুজন, এরা বাদী ভজন পূজন কাজে ॥
জ্ঞান-অসিতে তার কর ছেদন, নিবেদন চরণ সরোজে,
আগে বধ মা ব্রহ্মময়ি মোর কুমতি রক্তবীজে।
ও তোর ভক্ত দাশরথি, অনুরক্ত ঐ পদাম্বুজে ॥ ১৯ ॥

—বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৬৯৯

৭

মূলতান—একতালা

দোষ কারো নয় গো মা

আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ
সে কূপ ব্যাপিল, কালরূপ জল, কাল মনোরমা॥
আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণ ধারিণি, বিগুণ করেছি স্বগুণে,
কিসে এ বারি নিবারি ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,
বারি ছিল কক্ষে ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে
তবে তরি, দিলে চরণতরী ক্ষেমঙ্করি, করি ক্ষমা॥ ২০॥

—বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৬৯৫

খাম্বাজ—ষৎ

দনুজদলনি, সুরপালিনী শিবে।
আমার দেহাসুরের পাপাসুরে কবে বিনাশিবে॥
কামাদি সেই দৈত্যসেনা, তায় বধে লোলরসনা,
মা, তোমার করুণা ইন্দ্রত্বপদ কবে বিলাবে॥
শমনের শমন হলে, পড়ে থাকিব বিহ্বলে,
তখন যেন তোর ঐ চরণে শরণ দাশরথি লভে॥ ২১॥

—কিন্নরগণ, মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী, পৃঃ ৫৬২

৯

খাম্বাজ—পোস্তা

যে ভাবে তারাপদ, ঘটে কি তার আপদ,
সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ প্রদায়িনী।
কি আর করিবে কালে মহাকাল যাঁর পদতলে,
ডাকিলে জয় কালী বলে, কাল ভয়ে পলায় অমনি॥

মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত
কালহরা কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণধারিণী ॥
মা আমার দক্ষিণে কালী কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী ॥ ২২ ॥

—নন্দ, নন্দোৎসব, পৃঃ ২০

১০

মূলতান—একতালা

জাগ জাগ জননি ।
মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনি ॥
স্বকার্য-সাধনে চল শিরোমধ্যে, পরমশিব যথা সহস্রদলপদ্মে,
করে ষট্‌চক্রভেদ, শঙ্করি পূরাও মনের খেদ চৈতন্যরূপিণী ॥
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, চিন্তে নারি এ তিন নাড়ী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
শিবারূপে দেবতারা নিয়ম জপে তারা যে অপেক্ষা তারা গো তোমার,
অধিষ্ঠান হয়ে স্বাধিষ্ঠান পরে, চিন্তাহরা চল চিন্তামণি পুরে
জীবাত্মা যে স্থলে, দীপশিখার ন্যায় জলে দিবা রজনী ॥
এই দেহবিশ্বচক্রে যে বিশুদ্ধ চক্র ষোলদলে কমল শোভা পায়
কিবা অর্ধনাভিসরে, সদা সেবা করে, শাকিনী নামে শক্তি তথায়
ওগো কুণ্ডলিনি করগো গমন, আজ্ঞাখ্য চক্রেতে দ্বিদল-পদ্মে মন,
করে ষট্‌চক্র ভ্রমণ দাশরথির সাধন করাও শর্বাণি ॥ ২৩ ॥

—বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৬৯৪

১১

ভৈরবী—একতালা

মা, সেদিন কবে প্রভাত হবে ।
পুরাতে বাসনা ওমা শবাসনা, রসনা লোলরসনা জপিবে ॥
কলুষান্ধকারে ইষ্টপ্রতি দৃষ্টিহারা হয়ে আছি সব যেন রিষ্টি
হৃদয় আকাশে তারা কবে এসে পুণ্যের বিপাক তিমির নাশিবে ।

দেহ মুক্ত হব দেহ যাবে ত্বরা, এ দীনে সেদিনে হে দীনতারা
প্রকাশিও করুণা নয়নতারা, এ ক্রিয়াবিহীন জীবে।
মিছে কাজে দিন গত প্রতিদিন, সেদিন দীনের কি হবে,
দীনদৈন্য গণি যেদিন জননী, দ্বিজ দাশরথি দীনে দিন দিবে ॥ ২৪ ॥

—বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৬৯৭

১২

সুরট—একতালা

গিরিশরাণি পরমেশানি সম্প্রতি মা হের।
দীনদয়াময়ী, হের মরি দীনে, দিনগত দিন দেহি মা সুদিনে
দিনমণিসুত এল দিন গুণে নিগুণে নিস্তার ॥
মা তুমি যা কর শিখর-তনয়া, প্রখর কলুষে দহে মন কায়া
গুণহীন দোষ নিজগুণে নিবার।
স্মরণ-মনন সাধন না জানি, দাশরথি অতিভীত মা ভবানি
শঙ্কাবারিণী, শঙ্কররাণি, সঙ্কটে উদ্ধার ॥ ২৫ ॥

—বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৭০০

আগমনী

১

খট ভৈরবী—একতালা

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল।
কহিছে শিখরী কি করি অচল, নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল, অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল ॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার, মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার
আধার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার, পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হল ২৬ ॥

—আগমনী (১), মেনকা, পৃঃ ৫১৫

২

অহংসিন্ধু—একতালা

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণি তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে মা কৈ, মা কৈ বলে,
ডাকছে মা তোর শশধরবদনী ॥
মা গো ত্রিভুবন মান্যে ত্রিভুবনে ধন্যে
তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি।
আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে,
উনি নাকি ভবের ভয়হারিণী ॥
ধরলি যে রত্ন উদরে তোর মত সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী।
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়দারা,
চন্দ্র দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কার হরে মনের অন্ধকার
মা তোর হরমনোমোহিনী ॥ ২৭ ॥

—আগমনী (২), নারীগণ, পৃঃ ৫২৮

৩

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এল রণরঙ্গিণী ॥
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে লয়ে গজানন গমন গজগামিনী
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী ॥
এ যে করি-অরিতে করি ভর, করে করে রিপু সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী।

প্রবলা প্রখরা কন্যা তন্থ কাঁপে দরশনে
অস্থরে নাশিছে তাঁর বুকে বর্শা বরষণে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোকজননী ॥২৮॥

—আগমনী (১), মেনকা, পৃঃ ৫২৩

বিজয়া

১

বিভাস—ঝাঁপতাল

গিরি যায় হে লয়ে হর প্রাণকন্যা গিরিজায়।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী, বাঁচে পাষাণী, গিরি যায় ॥
রবে কুমারী, হবে গিরি, আশু পূর্ণ মানস,
দিয়ে বিল্বদল যদি, আশুতোষে আশু তোষ,
হবে যাতনা দূর দুঃখ-হর হর কৃপায় ॥
নাথ হরচরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর,
চরণে ধরে তুমি হে নাথ, দিলে কন্যা যায়।
ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ,
মোর বচন ধর হে নাথ ধর গঙ্গাধর পদ,
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধরায় ॥
নাথ কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর আরাধন,
রাখিতে ঘরে তারাধন নাই অন্য উপায়।
মজে অসার সম্পদে হরপদে না সঁপে মতি,
কেন মুক্তি কন্যা তুমি হারা হও দাশরথি,
কি হবে কাল এলে, আজি কি কালনিশি পোহায় ॥ ২৯ ॥

—কাশীখণ্ড, মেনকা, পৃঃ ৫৪০

২

ললিত ভঁয়রো—একতালা

ওরে রজনি, তুই আজ পোহালে এ প্রাণান্ত।
বধে আমায় প্রাণের উমায় লয়ে যাবেন উমাকান্ত ॥

রবির উদয় হলে নিদয় হর করেন সর্ব্বস্বান্ত,
নিদয়া মহামায়া মায়ের মায়ায় হবেন ক্ষান্ত ॥
দেখে কান্ত ত্রিলোচনে, ধারা উমার ত্রিলোচনে,
ত্রিলোচনী আমার ত্রিলোচনের নিতান্ত,
উমা আমার আমি উমার, সে তো আমার মনোভ্রান্ত।
কিন্তু মনে যদি মানেরে, না মানে দু নয়ন ত ॥৩০ ॥

—কাশীখণ্ড, মেনকা, পৃঃ ৫৪১

৩

মঙ্গলবিভাস—একতালা

মা প্রাণ উমা, মাকে কোন প্রাণে মা,
বললি আমায় বিদায় দে মা।
পারি প্রাণকে বিদায় দিতে, তোয় নারি পাঠাতে,
প্রাণ উমার কাছে কি প্রাণের উপমা ॥
সেদিন করি কত রোদন হরের ঘরের বেদন,
তুই যে আমায় কত জানালি মা।
তাকি নাই মা মনে, হেরি নয়নে তোমার ত্রিনয়নে,
সে ভাব ভুলেছ, ভুলেছ হর-মনোরমা ॥৪২॥

—কাশীখণ্ড, মেনকা, পৃঃ ৫৩৭

শিব বিষয়ক

১

আলিয়া—তেওড়া বা রূপক

শিখরনাথ, হে শিখরনাথ, শঙ্কর অপার পার মহিমে।
আত্ত বন্ধু হে অনাত্ত, পাদপদ্ম দেহি মে ॥
লট্ট পট্ট জটা জুট শূল হস্ত ধারিণে।
দেব উক্ত পঞ্চ বক্ত্র, ভক্ত মুক্ত কারিণে ॥

ভালে ভাল শোভা সিন্ধুসুত ইন্দুকিরণে।
দেবাদিদেব সর্ব-গর্ব-খর্ব-কারিণে
বিশ্বনাথ, শ্রীঅঙ্গ ভূষণ ভস্ম ভূষণে,
সর্বত্রাতা মোক্ষদাতা কর্তা তো ত্রিভুবনে ॥
রঙ্গে ভঙ্গে ভূত সঙ্গে যজ্ঞভঙ্গ কারিণে
ব্যোমকেশ ভীম ঈশ পতিত প্রদায়িনে।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভু পতিত পাবনে,
দুঃখে রক্ষ বিরূপাক্ষ ত্রৈলোক্যপোষিণে ॥৩২॥

—দক্ষযজ্ঞ, দেবগণ, পৃঃ ৪৮৫

২

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল

শিব শঙ্কর, শশধরধর হে গঙ্গাধর,
অশেষ গুণধর শেষবিষধরধারি।
গিরিশ গৌরীশ, অশেষ কলুষ
কৃশকর, ত্রিপুরহর, আশুতোষ এ শিশু দোষ,
বিনাশ করিয়ে তোষ হে মহেশ, আশু দুখহারি ॥
কালভয়ে শরণাগত, প্রণত কিঙ্কর ভীত,
রক্ষাং কুরু, ওহে কাল কালবারি,
ও পদে মতিহীন মূঢ় গতিবিহীন আমি অতি হে,
স্বগৃহে গুণহীন দীন দাশরথিকে
তুমি ত্রাণ কর যদি হে ভবভয়হারি ॥৩৩॥

—শিব বিবাহ, ভূতগণ, পৃঃ ৫০৭

মূলতান—একতালা

কৃপাং কুরু কৈলাসপতি, কুমতি পতিত দীনে
আমি পাতকীকুল উদ্ভব ভব, কিসে তরি তব করুণা বিনে

কভু করি নাই ভজন পূজন ভুলায় ছ জন কুজন,
যদি কর দুঃখ ভঞ্জন পেয়েছি দেখা বিজনে।
ওহে মম মন মত্ত করী বল তার কি উপায় করি,
দয়া করি বন্ধন করি রাখ যদি দীনে নিজ গুণে॥
ত্রিগুণযুক্ত ভক্ত অনুরক্ত ব্যক্ত জগজ্জনে,
তবে কেন দাশরথিরে রাখ ভব, ভববন্ধনে॥৩৪॥

—মহিষাসুরের যুদ্ধ, জম্ভাসুর, পৃঃ ৫৬৩

গঙ্গাবিষয়ক সঙ্গীত

১

ভৈরবী—যৎ

মা গো কোথা গেলে সুরধুনি।
অকৃতী সন্তান বলে ত্যজিলে কেন জননি॥
যদি কুসন্তান হই তবু তোমার পুত্র বই
আর কেহ নই শুন গো জগৎতারিণি।
আমি বড় দুরাশয় হারাইলাম গো তোমায়,
কি করিব হায় হায়, ভেবে মরি দিবা রজনী॥ ৩৫॥

—ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন, ভগীরথ, পৃঃ ৫৫৪

আত্মতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত

১

সুরট মল্লার—কাওয়ালী

চলরে মানস, রস শ্রীবৃন্দাবনে।
অনন্ত ভয় এড়াবে, কৃতান্ত দূরে যাবে,
নিতান্ত স্থান পাবে শ্রীকান্তচরণে॥
সতত কলুষকংস করে জ্বালাতন, চল ওরে মন তার করিতে দমন,
আনগে হৃদয়-মধুপুরে মধুসূদনে॥

তোমার বুদ্ধি যে কুরূপা, বাঁকা কুব্জা স্বরূপা
বুদ্ধিকুব্জারে রাখ কেন শ্রীহীনে, শ্রীপায় সে শ্রীনাথ আগমনে,
কুমতিরজক নাশ হবে ত্বরায়, হৃদয়মথুরায় আনগে শ্যামরায়,
জীবাত্মা দেবকীরে কর মুক্ত বন্ধনে ॥ ৩৬ ॥
—নারদ, অক্রূর সংবাদ (১), পৃঃ ১৫৯

২

মল্লার—কাওয়ালী

কি কর রে মন অনিত্য ভাবনা।
শমন সঙ্কটার্ণবে অনায়াসে পার হয়ে যাবে,
যে নাম ভাবিলে জীবের যায় ভাবনা ॥
ওরে কুমতে কুপথে সদা করনা ভ্রমণ, চলরে চরণ শ্রীরামের শ্রীচরণ,
দরশন করিলে ভবে হবে সিদ্ধ কামনা।
ওরে পদ কর সে পদ সম্পদ, আপদের আপদ,
এ সম্পদ মিছে আর ভেবো না, কর হৃদয়পদ্মেতে সে পদস্থাপনা,
অবশ্য কলুষ হবেরে নিধন হরের হৃদয়ের ধন করিলে আরাধন
ঘুচাবেন দাশরথি দাসের জঠর যন্ত্রণা ॥ ৩৭ ॥
—বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম বিবাহ, পৃঃ ৩২৬

৩

টোরী—কাওয়ালী

হরিপদ পঙ্কজে মজ।
মনভৃঙ্গ রে বিষয়কিংশুকে, বিহর কি সুখে, সুখ সরোবরে সাজ ॥
বিষয়বিষ-ত্যজি বিশালকাল সামাল
কি কর কালমতে কাল গেল গেল,
নিকটে চরমকাল, আর কেন কর কালব্যাজ ॥
ওরে মূঢ়মতি ত্যজ যত অসার সংসার
যদি সুসার বাসনা কর কর সারাৎসার,
সেই ব্রজরাজ।

জন্মাবধি কর মম ধন মম গৃহ, জনমে নীলদেহচরণে না মন দেহ,
ধিক দাশরথি দেহ ধরিয়ে কি করিলে কাজ ॥ ৩৮ ॥

—নারদ, কমলেকামিনী, পৃঃ ৫৮৭

ভৈরবী—আড় খেমটা

কেন ভাবলি নে ভাই শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ভাল ব্যাপার করলি এবার ভবের হাটে উঠি ॥
ভবে জন্ম আর কি হতো, জলে জল মিশায়ে যেতো,
মনে ভাবলে তারা জগত তারা মা দিত তোয় ছুটি ॥
মায়ের চরণ ভাবলে পরে, ঘরের ছেলে যেতিস ঘরে,
ও তুই ঘর না বুঝে বসতে পেরে কাঁচালি কি পাকা ঘুঁটি ॥ ৩৯ ॥

—শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৬১৬

খাম্বাজ—একতালা

গেল দিন ভবের হাটে।
ও কি হবে রবি বসিল পাটে ॥
আসা যাওয়া সার, হল বারে বার,
কিসে হব পার, ভবের ঘাটে।
না ফলিল আমার আশাবৃক্ষের ফল, কর্মফলে বনে খেয়ে বেড়াই ফল,
নাইক পুণ্যফল, কর্মসূত্র ফল, জানি না বুঝি না কি ফলে কাটে ॥
গুরুদত্ত তত্ত্ব মনে করি যদি, ভুলাইয়া রাখে ছ-জন প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি স্বীয় গুণে রাখ সঙ্কটে ॥ ৪০ ॥

—হনুমান, সীতাঅন্বেষণ, পৃঃ ৩৮১

৬

আলিয়া—একতালা

গেলরে দিন গেল একান্ত, কি কররে মম মানস ভ্রান্ত।
নিন্দি রূপ নীলকমল, হৃৎ কমলে ভাব সে কমলাকান্ত॥
মুদিলে নয়ন সব নৈরেকার, কেহ নয় আমার আমি নই রে কার,
কর সেবা কার, ঘরে কেবা কার হয় রে জায়া সুত।
না শুন শ্রবণ সুজন ভারতী ভবনিস্তারণ তোমার ভার অতি,
কেন চিন্ত না রে দাশরথি, শিয়রে অসুর ভাবে কৃতান্ত॥ ৪১॥

—নারদ, কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন, পৃঃ ২৯৭

৭

সুরট মল্লার—কাওয়ালী

ও মোর পামর মন, এখনও বল না কালী।
কোরো না রে মন আর আজি-কালি॥
আজি কালি করে কি কাটাবি চিরকাল-ই,
কি হবে রে কাল এলে, কেন কালীপদে না বিকালি॥
ত্যজে মিছে কাজ ভজো না রে কালী,—
মিছে কাজে থেকো না, রেখো না মনে কালি।
অঙ্গেতে লিখিয়া কালী কর কালী নামাবলি
না লিখিয়া কালী কেন বিষয়-কালি মাখালি॥
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে প্রতিজ্ঞা সেকাল-ই
এবার কালীপদ ভজিব ত্রিকাল-ই।
সে বচনে দিয়া কালি দাশরথি কি আকালি,
বলিব বলিয়া কালী, কেন বদন বাঁকালি॥ ৪২॥

—বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৬৯৫

৮

কল্যাণ—মধ্যমান

রাগ চণ্ডালেরে আগে প্রাণে কর নিধন।
ভূত হবে বশীভূত সব রিপু পরাভূত
গুরুদত্ত মহামন্ত্র তত্ত্বমসি কর আরাধন।
আগমে বলে ঈশান শানঈ শানঈ শান,
মরা মরা বলিতে হবে রাম সম্বোধন॥
সাধনের এই সার অসার হবে সুসার
সদাশিব মনোসাধে সাধে সে পরমধন॥৪৩॥

—বিবিধ সঙ্গীত, পৃঃ ৭০২

বিবিধ সঙ্গীত

১

স্বরট মল্লার—একতালা

ধনি আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষ গুণ সে জানে॥
ওহে ব্রজাঙ্গনা কর কি কৌতুক, আমারি সৃষ্টি করা চতুর্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ, ভ্রমণ করি ভুবনে॥
চারি যুগে আমার আয়োজন হয়, একত্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়,
গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে।
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর, আমারি জানিবে সর্বাঙ্গসুন্দর,
জয় মঙ্গলাদি কোথা পায় নর, কেবল আমারি স্থানে॥
সংসার কুপথ্য ত্যেজে যে বৈরাগ্য, এ জন্মের মত করি তায় আরোগ্য,
বাসনা বাত্তিক, প্রবৃত্তি পৈত্তিক, ঘুচাই তার যতনে।
দৃষ্টিমাত্রে দেহে রাখিনে বিকার, তাইতে নাম আমি ধন্নি নির্বিকার,
মরণের তার কি থাকে অধিকার, সদা আমায় ডাকে যে জনে॥ ৪৪ ॥

—বৈদ্যকৃষ্ণ, কলঙ্কভঞ্জন (২), পৃঃ ১১৯

২

ললিতঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বরমালা।
গিরিপুরে দশভুজা হন দুর্গা গিরিবালা॥
দাঁড়াইলেন উমেশ সম্মুখে উর্ধ্বকর করি,
রাকা চন্দ্রঢাকা রূপধারিণী হরসুন্দরী,
নিরখি রূপ গগনে চঞ্চলা চঞ্চলা॥
কিবা কাঞ্চন কবরী আর কমলকুসুম হার,
কমল করে করি বিমলবদনী বিমলা।
দশকর আভায় দশদিক অন্ধকার হরে,
প্রতি কর নখরে কত শরদিন্দু শোভা করে,
নখর হেরি চকোর সুধা মানসে উতলা॥ ৪৫॥

—শিব বিবাহ, পৃঃ ৫১৩

ব্যজরঙ্গ

১

খট—পোস্তা

তেমনি সুখ সজনি লো, বিচ্ছেদের পর পিরীতখানি।
অনাবৃষ্টি পরে মেঘে দেখে যেমন চাতকিনী॥
যত্তপি পড়ে খুলে, অঞ্চলের মানিক জলে,
আবার তাই যদি কেউ করে তুলে দেয় লো ধনি।
পেয়ে প্রাণ বিচ্ছেদশরে, চৌদ্দ বৎসরের পরে,
হয় যেমন রামকে হেরে, অযোধ্যাবাসীর পরাণী॥ ৪৬॥

—প্রেমমণি, প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ, পৃঃ ৬৭২

২

সুরট—পোস্তা

বিধির নাই বিবেচনা থাকলে আর এমন হোতো না।
স্বর্ণভূমি ফেলে রেখে বেনা বনে মুক্ত বোনা॥

ধার্মিকের খাদি কাচা, অধার্মিকের উড়ে কোঁচা,
সতীদের অন্ন জোটে না, বেশ্যাদের জড়োয়া গহনা ॥
রাবণের স্বর্ণপুরী শ্রীরামচন্দ্র বনচারী,
পদ্মফুল ত্যাজ্য করি যত্ন করে ঘুগী পানা ॥
সৃষ্টি সব সৃষ্টি ছাড়া, বাজিয়ে পায় শালের যোড়া,
পণ্ডিতে চণ্ডী পড়ে দক্ষিণা পান চারটি আনা ॥ ৪৭ ॥

—হনুমান, সীতা অন্বেষণ, পৃঃ ৩৭৫

৩

পিলু খাম্বাজ—পোস্তা

অসার সংসার মধ্যে সার কেবল সংসারের ভাই।
এমন সম্বন্ধ মিষ্টি, বিধাতার সৃষ্টিতে নাই ॥
ভাই বন্ধু পিতা মাতা, মানে না কেউ তাদের কথা,
মেগের কথা শিক্ষাদাতা, সকলেরই দেখতে পাই ॥ ৪৮ ॥

—নন্দ, নন্দোৎসব, পৃঃ ১৯

৪

পিলু খাম্বাজ—পোস্তা

এখনকার ব্যাভার দেখে কংস থাকলে লজ্জা পেতো ॥
সে কি স্বধর্ম ত্যজে উইলসনের খানা খেতো ॥
আখড়াতে গুলি গাঁজা, খেতো কি কংস রাজা,
রাঁড় ভাঁড় লয়ে মজা, করিতে কি প্রবর্ত হোতো ॥ ৪৯ ॥

—পাঁচালীকারের মন্তব্য, নন্দোৎসব, পৃঃ ২৩

৫

মূলতান—ঠেকা

মরি কি বাবুগিরি, দিয়ে ঠোঁটে গিরি বেড়িয়ে বেড়ান।
আবাল শিক্ষে করেন ভিক্ষে, পরের খেয়ে দিনটি কাটান॥

ব্রাণ্ডি, রেণ্ডি, গাঁজা গুলি, ইয়ার জুটে কতগুলি,
মুখেতে সর্বদা বুলি হুট বলে দেয় গাঁজায় টান ॥
পড়ে থাকে বেশ্যা বাড়ি, হয়ে তাদের আজ্ঞাকারী,
হলে তাদের মনটি ভারি, হুঁকোটি কল্‌কেটি পানটি যোগান ॥ ৫০ ॥

—পাঁচালীকারের মন্তব্য, বিরহ (২), পৃঃ ৬৪০

পরিশিষ্ট—গ

দাশরথির প্রবাদ-প্রচবন প্রদর্শনী

দাশরথি পাঁচালীতে অফুরন্ত প্রবাদ, প্রবচন ও বাগ্বিধি বা ইডিয়ম ব্যবহার করিয়াছেন। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সংস্কৃত, বাঙ্গালার নানা প্রবাদাদি এবং উহাদের বিচিত্র প্রয়োগ ছাড়াও, দাশরথির নিজেরই এমন অনেকগুলি বাক্য ও বাক্যাংশ পাওয়া যায় যেগুলি প্রবাদ প্রবচনের মর্যাদা পাইবার যোগ্য। যেমন 'স্বখাত-সলিলে ডুবিয়া মরা', মনে হয় এই কথাটি দাশরথির সৃষ্টি। এই রকম আরও অনেক আছে।

ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁহার বিখ্যাত 'বাংলা প্রবাদ' সংগ্রহ গ্রন্থে দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৫৯), দাশরথির প্রায় দুইশত প্রবাদ সংকলন করিয়াছেন। বোধ হয় ইহাই অন্যান্য প্রবাদের মত দাশরথির প্রবাদ প্রবচনের সর্বাধিক সংগ্রহ।

এই স্বল্প পরিসরে আমরা দাশরথির প্রবাদ-প্রবচন-বাগ্বিধি-রত্নাকরের অতি সামান্য রত্ন মাত্র উদ্ধার করিলাম, অনেকটা নমুনা দেখাইবার উদ্দেশ্যে। এই কারণে এই প্রদর্শনী প্রবাদপ্রবচন-বাগ্বিধির বিপুল ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ না হইলেও বিবিধ ও বিচিত্র সংকলন হইয়াছে। একার্থক ও বিভিন্ন ভাষার (যেমন, অধিক কিছু ভাল নয় : অতিশয় সকলি বাড়াবাড়ি), পূরা বাক্য ও বাক্যাংশ (যেমন, ধনীর চিন্তা ধন ধন নিরানব্বুইর ধাক্কা : নিরানব্বুইর ধাক্কা) ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বিরুক্তি হইলেও বৈচিত্র্যের জন্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ডঃ দে সংগৃহীত দাশরথির প্রবাদপ্রবচনের প্রায় সবটাই এই প্রদর্শনীর মধ্যে আছে।

প্রবাদের দক্ষিণে নির্দিষ্ট সংখ্যা পালার সংকেতসূচক।

১। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী
২। নন্দোৎসব
৩। গোষ্ঠলীলা (১)
৪। গোষ্ঠলীলা (২)
৫। কালীয়দমন
৬। ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ
৭। কৃষ্ণকালী
৮। গোপীগণের বস্ত্রহরণ
৯। শ্রীরাধার দর্পচূর্ণ
১০। নবনারীকুঞ্জর (১)
১১। নবনারীকুঞ্জর (২)
১২। কলঙ্কভঞ্জন (১)

১৩। কলঙ্কভঞ্জন (২)
১৪। মানভঞ্জন (১)
১৫। মানভঞ্জন (২)
১৬। অক্রূরসংবাদ (১)
১৭। অক্রূরসংবাদ (২)
১৮। মাথুর (১)
১৯। মাথুর (২)
২০। মাথুর (৩)
২১। নন্দবিদায়
২২। উদ্ধবসংবাদ
২৩। রুক্মিণীহরণ
২৪। সত্যভামার ব্রত
২৫। সত্যভামা, সুদর্শন, গরুড়ের দর্পচূর্ণ
২৬। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ
২৭। দুর্বাসার পারণ
২৮। কুরুক্ষেত্র মিলন
২৯। রামচন্দ্রের বিবাহ
৩০। রামের বনগমম ও সীতাহরণ
৩১। সীতা অন্বেষণ
৩২। তরণী সন বধ
৩৩। মায়াসীতা বধ
৩৪। লক্ষ্মণশক্তিশেল
৩৫। মহীরাবণ বধ
৩৬। রাবণ বধ
৩৭। শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন
৩৮। লবকুশের যুদ্ধ
৩৯। দক্ষযজ্ঞ
৪০। ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল
৪১। শিববিবাহ
৪২। আগমনী (১)
৪৩। আগমনী (২)
৪৪। কাশীখণ্ড
৪৫। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন
৪৬। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী
৪৭। মহিষাসুর বধ
৪৮। প্রহ্লাদচরিত্র
৪৯। কমলেকামিনী
৫০। বামনভিক্ষা (১)
৫১। বামনভিক্ষা (২)
৫২। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব
৫৩। কর্তাভজা
৫৪। বিধবা বিবাহ
৫৫। বিরহ (১)
৫৬। বিরহ (২)
৫৭। কলিরাজার উপাখ্যান
৫৮। নবীনচাঁদ ও সোনামণি
৫৯। প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ
৬০। নলিনীভ্রমর (১)
৬১। নলিনীভ্রমর (২)
৬২। ব্যাঙের বৈরাগ্য
৬৩। বিবিধ সঙ্গীত
৬৪। শ্রীমন্ত ও ধনপতির দেশাগমন
৬৫। দুর্গা ও গঙ্গার কোন্দল (২)
৬৬। নবসংগৃহীত গীত

পরিশিষ্ট—ঘ

দাশরথির পাঁচালীর দল

পাঁচালীর দল দাশরথি প্রায় ২২ বৎসর কাল নিজে চালাইয়া গিয়াছেন। কাজেই তাঁহার দলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক যোগদান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকলের কথা জানিবার কোন উপায় নাই। পাঁচালীর দলে লোকও কম থাকিত না। দাশরথি নিজে পয়ার বলিতেন ও ছড়া কাটিতেন। দলের প্রধান গায়ক ছিলেন দাশরথির কনিষ্ঠ সহোদর তিনকড়ি রায়, সিঙ্গীর যাদু আচার্য, পীলার নীলমণি বিশ্বাস। ইহা ছাড়া ছিলেন পীলার শচী বিশ্বাস, অদ্বৈত বৈরাগী, ভগবান বৈরাগী, আখড়া বিষ্ণুপুরের মদন সেন, রাধামোহন সেন। বেহালাদার ছিলেন নীলমণি বিশ্বাস। অগ্রদ্বীপের দীনু পোদ্দার এবং পরে পীলার শ্যাম বাগচী বাজাইতেন। ইহা ছাড়া কালিকাপুরের দীননাথ মোদক ও গোঁবার দশরথ ঘোষেরও নাম পাওয়া যায়। এই দশরথকে দাশরথি বাবা বলিয়া ডাকিতেন।

সন্ন্যাসী চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তির পাঁচালীর দল ছিল। হয়তো দাশরথির পূর্ব হইতেই এই ব্যক্তি পাঁচালী গাহিতেন। দাশরথির সহিত ইহার বিশেষ সৌহার্দ ছিল। দাশু অনেক সময় তাঁহাকে গান বাঁধিয়া দিতেন বলিয়া জানা যায়। এই সন্ন্যাসী খুব ভাল বাজনদার ছিলেন। যদি দাশরথি ও সন্ন্যাসী দুইজনে কাটনদার ও বাজনদার হিসাবে একই আসরে নামিতেন তবে মণিকাঞ্চনযোগ হইত। ইহার জন্যই হয়তো "সন্ন্যাসী বাজিয়ে আর দাশরথি ছড়া কাটিয়ে" এই প্রবাদটি প্রচলন হইয়া থাকিবে।

পরিশিষ্ট—ঙ

অন্যান্য পাঁচালীকারগণ

দাশরথির সমসাময়িক ও পরবর্তী কয়েকজন পাঁচালীকারের নাম বিভিন্ন উৎস হইতে জানিতে পারা যায়। দাশরথির বন্ধু ও জীবনীকার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কয়েক জনের উল্লেখ করিয়াছেন, রসিক রায় ও ব্রজরায়ের জীবনীতেও কয়েক জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রাচীন সংবাদপত্রে, ডাঃ সুশীল দে মহাশয়ের গ্রন্থে এবং অন্যান্য নানা পুস্তকে এই নামগুলি পাইয়াছি। কলিকাতার গঙ্গানারায়ণ লস্কর ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, শান্তিপুরের রামপ্রসাদ চক্রবর্তী ও বাণীকণ্ঠ বসু, বর্ধমানের কৃষ্ণমোহন গাঙ্গুলী—ইহাদের সকলের দল ছিল। অন্যান্য নাম: রসিক রায়, ব্রজমোহন রায়, ঠাকুরদাস দত্ত, গোবর্ধন দাস, কেশবচাঁদ, ননীলাল, কৃষ্ণধন দে, যদু ঘোষ, সন্ন্যাসী চক্রবর্তী, নবীন চক্রবর্তী, গুরুদুম্বো, পরাণ মিত্র, নদেরচাঁদ পাল, রজনী চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সোনা পটুয়া, শশী চক্রবর্তী, ত্রিপুরা বিশ্বাস, গঙ্গাচরণ সরকার, ভাটপাড়ার আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীধর কথক, মনোমোহন বসু, নন্দলাল রায়, রাজকৃষ্ণ রায়, সীতারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। বলা বাহুল্য যে ইহাদের মধ্যে সকলেই পাঁচালীর কবি ছিলেন না, অনেকে গায়েন ছিলেন, দল করিয়া পাঁচালী গান করিতেন। আবার কেহ পাঁচালী গাহিতেন না, লিখিয়া দিতেন। কেহ কেহ বা দল করিয়া স্বরচিত পাঁচালী গান করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম দলে বাণীকণ্ঠ, দ্বিতীয় দলে রসিক রায়, তৃতীয় দলে ব্রজ রায়ের নাম করা যাইতে পারে।

উক্ত তালিকার মধ্যে গুরুদুম্বো কবিয়াল ও শ্রীধর কথক টপ্পা লেখক হিসাবেই সমধিক খ্যাত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই পাঁচালী ছাড়াও যাত্রা, কবি, হাফআখড়াই প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। সকলের জীবনী ও রচিত পুস্তকাদি পাওয়া যায় না। কাহারো বা পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে কিন্তু জীবনী ও বৃত্তান্ত জানা যায় নাই। যাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু জানা গিয়াছে, তাঁহাদের পরিচয়াদি সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

ঠাকুরদাস দত্ত

১২০৮ সালে (১৮০১ খ্রীঃ) ঠাকুরদাস হাওড়া জেলার ব্যাটরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামমোহন দত্ত। রামমোহন ফোর্ট উইলিয়মে কেরানী ছিলেন। পুত্র [illegible] তিনি ঐখানে চাকুরীতে লাগাইয়া দেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই যাত্রা পাঁচালী গানের দিকে ঠাকুরদাসের ঝোঁক ছিল, কাজেই চাকুরী ভাল লাগিল না। ইস্তফা দিয়া প্রথমে সখের, পরে পেশাদারী যাত্রার দল খুলিলেন। তাঁহার দলে বিদ্যাসুন্দর, লক্ষ্মণ-বর্জন প্রভৃতি পালা হইত। পরে তিনি নিজের দল ভাঙিয়া দিয়া অন্যান্য দলের জন্য পালা রচনা করিয়া দিতে থাকেন। বিদ্যাসুন্দর, হরিশ্চন্দ্র, শ্রীবৎসচিন্তা, নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন, শ্রীমন্তের মশান প্রভৃতি বহু যাত্রা পালা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন গ্রন্থই এখন দেখা যায় না।

তারপর ঠাকুরদাস নিজে পাঁচালীর দল করেন এবং অল্প কাল মধ্যে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রামের দেশাগমন, অক্রুর আগমন, শিববিবাহ, দান, মাথুর, মান, পারিজাতহরণ, ধ্রুবচরিত্র, প্রেমবিরহ প্রভৃতি বহু পাঁচালী পালা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা, জানা যায় নাই। কয়েকটি গান ছাড়া আর তাঁহার রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঁচালীকার ঠাকুরদাস প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে ঠাকুরদাসের সহিত দাশরথির পরিচয় ছিল। দাশু ঠাকুরদাসকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫।)

১২৮৩ সালে (১৮৭৬ খ্রীঃ) দুই পুত্র এক কন্যা রাখিয়া ঠাকুরদাস ইহলোক ত্যাগ করেন।

রসিক রায়

রসিকচন্দ্র ১২২৭ সালে (১৮২০ খ্রীঃ) বৈশাখী পূর্ণিমাতে মাতুলালয়ে প্রানাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রসিক হুগলী জিলার হরিপালের প্রসিদ্ধ

(দাস) রায় বংশের হরিকমল রায়[1] মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। পিতা হরিকমল রায় মাতামহ সম্পত্তি পাইয়া বড়া গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। রসিকের আরও চারিটি ভ্রাতা ছিল। বিদ্যালয়ে রসিক বেশি পড়েন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ছিল এবং তাহা তিনি অনুশীলন করিতেন।

এক সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার সৌহার্দ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশে তিনি শিশুদের পাঠোপযোগী প্রভাত বর্ণন, পরোপকার, চুরি, কাক ও কোকিল, ইত্যাদি বহু পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। শিশুদের জন্য পদ্যসূত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। নমুনা :

রাতি পোহাইল ভাতি দিল দিক সব।
কল কল কুল কুল পাখী করে রব॥
সোনার আলোর মত উঠল অরুণ।
ছুটিল চৌদিকে তার কিরণ করুণ॥ (প্রভাত বর্ণনা)

বিহারীলাল সরকার তাঁহার বিদ্যাসাগর গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "রসিকচন্দ্রের কোন কোন কবিতা পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিণত হইয়াছিল।"

বার বৎসর বয়সেই রসিকচন্দ্রের হাত পদ্যে পাকিয়াছিল। ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার 'জীবনতারা' প্রকাশিত হয় কিন্তু অশ্লীলতার জন্য গভর্ণমেণ্ট উহার মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করেন। পাঁচ বৎসর পর সংশোধন করিয়া 'নবজীবনতারা' নামে

(১) বঙ্গভাষার লেখকের মতে রামকমল রায়। কিন্তু স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র রায়ের জীবনী গ্রন্থে (সাঃ পঃ গ্রঃ সং ৮৮৫৬) শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন হরিকমল রায়। গ্রন্থখানি রসিকের মৃত্যুর ৬ বৎসর পর ১৩০৫ সালে বাহির হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার প্রথম খণ্ড পাঁচালীতে রসিক যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অংশ বিশেষ এই প্রকার :

"পূর্বে বাস হরিপাল, এক্ষণেতে হরিকাল, বসবাস করিয়া বড়ায়।
হরিপাল পরিহরি, সদা বলে হরি হরি, পিতে হরি লীন হরিপায়॥"

এইখানে "পিতে হরি" দ্বারা হরিকমল নাম নিশ্চিত হয়।

উহা পুনঃপ্রকাশ করেন। তাঁহার ১৮ হইতে ২৩ বৎসরের মধ্যে এই পাঁচ বছরে দুই খণ্ড জীবনতারা ছাড়াও ছয় খণ্ড পাঁচালী রচিত ও খুব সম্ভব প্রকাশিত হয়। অনেক পরে ১২৭১ সালে (১৮৬৪ খ্রীঃ) তিনি সপ্তম, অষ্টম ও নবম খণ্ড পাঁচালী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রসিক নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন এবং সর্বদাই কাব্যচর্চা করিতেন। একটি পুষ্পোদ্যান বাটির নাম দিয়াছিলেন "শান্তি নিকেতন"। এই শান্তি নিকেতনে তিনি কাব্যসাধনা করিতেন। দুর্গাচরণ পাঠক ছিলেন তাঁহার একান্ত সহচর। মুখ্যতঃ দুর্গাচরণের উৎসাহেই রসিকের ১১ খণ্ড পাঁচালী, এবং ঝড়ের কাণ্ড, ঘোর মন্বন্তর, ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি পালা প্রকাশিত হইয়াছিল।

দাশরথি অপেক্ষা রসিক বয়সে ১৫ বৎসরের ছোট ছিলেন। কিন্তু বয়সের ব্যবধান সত্বেও তাঁহাদের নিবিড় সৌহার্দ ছিল। শুনা যায় যে দাশরথি রসিকের শান্তিনিকেতনেও আসিয়াছেন। রসিক দাশরথিকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন দাশরথি।

পাঠ্যপুস্তক ও পাঁচালী গ্রন্থ ছাড়াও রসিকচন্দ্র অন্যান্য অনেক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাস, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর, বর্ধমানচন্দ্রোদয়, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলা বিহার, দশমহাবিদ্যা সাধন, বৈষ্ণবমনোরঞ্জন, নবরসাঙ্কুর, [illegible]ার, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানচন্দ্রোদয় লিখিয়া তিনি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

১২৯৮ সালে মাঘ মাসে রসিক বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পর বৎসর ১২৯৯ সালের (১৮৯২ খ্রীঃ) ৮ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে চার ঘটিকায় ৭২ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন।

নন্দবিদায়, বৃন্দাসংবাদ, কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, মানভঞ্জন, রাসখণ্ড, লঙ্কাদগ্ধ, তরণীসেনের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণবধ, রাবণহনুমান দ্বন্দ্ব, কাশীর মাহাত্ম্য, দক্ষযজ্ঞ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, মনোদীক্ষা, বিরহ, বসন্তবর্ণন, ঘোরকলি, খানকীদিগের দর্পচূর্ণ প্রভৃতি তাঁহার রচিত পাঁচালী। রসিকচন্দ্রের পাঁচালী তখন সাধারণতঃ সোনা পটুয়া, শশী চক্রবর্তী, ত্রিপুরা বিশ্বাস প্রভৃতির দলে গাওয়া হইত।

ব্রজমোহন রায়

১২৩৮ সালে (১৮৩১ খ্রীঃ) হুগলী জিলার তেঁতুলিয়া গ্রামে ব্রজমোহন জন্মগ্রহণ করেন। বয়সে ব্রজমোহন দাশরথি অপেক্ষা ২৫ বৎসরের ছোট। তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। পিতার নাম রামলোচন রায়। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকালমৃত্যুতে ব্রজমোহন ১২ বৎসর বয়সে চাকুরী করিতে বাধ্য হন। প্রথম মালদহ জিলার ইংরাজ বাজারে এক মহাজনের গদীতে মুহুরীর কাজ, পরে আবগারির নাজিরের কাজ করিতেন। চাকুরীর সঙ্গেই তিনি সঙ্গীতাভ্যাস করিতে থাকেন। পরে পাঁচালী পালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম পালা চালাইতে আরম্ভ করেন তাঁহার ছোট ভাই গোপীমোহন রায়। পরে ব্রজ রায় নিজেই পরিচালনা আরম্ভ করেন।

ব্রজ রায়ের গ্রন্থাবলী দুই ভাগে শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ীর সম্পাদনায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে যাত্রা গান। দ্বিতীয় ভাগে শ্লেষ খেউড় ও গীতাবলী লইয়া মোট ৩৪টি এবং তাহা বাদে মোট ৩২টি পালা আছে। পাঁচালী পালাগুলির তালিকা এই প্রকার : চণ্ডী, শিববিবাহ, আগমনী, বিজয়া, ভগবতী গঙ্গার বিবাদ, কাশীখণ্ড, রামায়ণ, রামলীলা, সাবিত্রী সত্যবান, রাম বনবাস, গোষ্ঠলীলা, কলঙ্কভঞ্জন, মানভঞ্জন, দানখণ্ড, অক্রূরসংবাদ, মথুরা লীলা, নন্দবিদায়, প্রভাসচরিত, সুভদ্রাহরণ, গৌরাঙ্গচরিত্র, ঋতুসংহার, অকালবর্ণন, বিরহ (১), বিরহ (২), ইয়ংবেঙ্গল, কুলীনের কীর্তি, বাবুদের কীর্তি, ৭১ সালের ঝড়, দ্বিতীয় ঝড়, রাণীর বর্ণনা, ডিউক আগমন, ইনকামট্যাক্স।

তাঁহার ভ্রাতা গোপীমোহন লিখিয়াছেন : "পাঁচালীর আসরে উপস্থিত উত্তর প্রত্যুত্তরক্রমে জঘন্য ভাবে শ্লেষ গাইবার রীতি হইয়া উঠাতে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১২৭৭ সালে যাত্রার দলের সৃষ্টি করেন। ৪ বৎসরকাল উন্নতির সহিত ঐ দল চালাইয়া রক্তাতিসার পীড়াতে ৪৫ বৎসর বয়সকালে (১৮৭৬ খ্রীঃ) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।"

ব্রজমোহন গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে ৯টি যাত্রার পালা সংকলিত হইয়াছে। তালিকা : অভিমন্যুবধ, রামাভিষেক, তারকাসুর বধ, সাবিত্রী সত্যবান, শতস্কন্ধ রাবণবধ, দানববিজয়, কংসবধ, লক্ষ্মণশক্তিশেল, লক্ষ্মণবর্জন।

কৃষ্ণধন দে

কৃষ্ণধন দের পিতার নাম রমণচন্দ্র দে, নিবাস কাটোয়া। কবি আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন "জন্মে আমি বেন্যা কুলে"। তাঁহার পাঁচালীর সম্পাদক শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য ভূমিকাতে লিখিয়াছেন: "কৃষ্ণধনের যখন বয়স দশ কি বার, সেই সময়ে কবিবর দাশরথি রায় পাঁচালী গান করিতে কাটোয়ায় আইসেন। দাশরথির সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই অথচ তিনি তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। হাস্যরসের অবতারণায় গুরু অপেক্ষা শিষ্যের কৃতিত্ব অল্প হইলেও ভক্তিরস প্রকাশে শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন।"

১৩১৯ বঙ্গাব্দে উক্ত যতীন্দ্রনারায়ণের সম্পাদনায় কৃষ্ণধনের পাঁচালী প্রথম খণ্ড [জাতীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থ সংখ্যা—182. Nc. 913-16] প্রকাশিত হইয়াছিল। সূচীপত্র: ১। রাধাষ্টমী, ২। শ্রীমতীর বাসরসজ্জা, মান ও কলহান্তরিতা, ৩। নানা রাগরাগিণীযুক্ত গীত (গণেশ, শ্যামা, ষটচক্রভেদ, মন, হরি, শ্রীচৈতন্য, শিব প্রভৃতি সম্বন্ধে ১৯ খানি গীত।) বইখানিকে সম্পাদক টীকাদ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

গঙ্গাচরণ সরকার

১২৩০ সালে (১৮২৩ খ্রীঃ) গঙ্গাচরণ চুঁচুড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামবল্লভ সরকার। গঙ্গাচরণ পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলেন। ৩৬ বৎসর পর্যন্ত সরকারী চাকুরী করিয়াছিলেন। পদোন্নতি করিয়া শেষকালে সবজজ হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। উহা ছাপা হইয়াছিল কিনা জানি না। ১২৯০ সালে (১৮৮৮ খ্রীঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

নন্দলাল রায়

নন্দলাল রায়ের পাঁচখণ্ড পাঁচালী দেখিয়াছি। পকেট সাইজের বটতলা সংস্করণ, পাঁচখণ্ড একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিজ্ঞাপনে নন্দলাল লিখিয়াছেন: "আমি বহু পরিশ্রম সহকারে এই পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী [illegible]স্তকখানি

প্রণয়ন করিয়াছি। এক্ষণে এই পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল শীল এই দুই ব্যক্তিকে উক্ত গ্রন্থখানি অর্পণ করিলাম। ইত্যাদি। গ্রন্থকারস্য শ্রীনন্দলাল রায়, জেলা হুগলী, সাকিম তড়া।"

তারপর উক্ত সত্ত্বাধিকারীদ্বয়ের "সতর্কতা" এই শিরোনামায় একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় "১৮৮৮ সালের ২রা জুন তারিখে যথাবিধি রেজেষ্টরী করিলাম।"

ভনিতাতে মাঝে মাঝে "দ্বিজ নন্দলাল" আছে। তাহাতে মনে হয় কবি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহা ছাড়া আর কোন কথা জানি না।

পাঁচ খণ্ডে ১৮টি পাঁচালী ও ২টি সঙ্গীত সংগ্রহ মোট ২০টি পালা আছে। সূচীপত্র এই প্রকার: **প্রথম খণ্ড**: ১। অথ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর কুরুক্ষেত্রে মিলন, ২। অথ প্রহ্লাদ চরিত্র, ৩। অথ আগমনী, ৪। অথ মানভঞ্জন, ৫। অথ নানাবিধ রাগরাগিণীর গীত (মোট পৃঃ ১-১৫২) **দ্বিতীয় খণ্ড**: ১। অথ রামবনবাস, ২। অথ লঙ্কাদগ্ধ, ৩। অথ সীতাহরণ, ৪। অথ অক্রূরসংবাদ, ৫। অথ দক্ষযজ্ঞ, ৬। অথ নন্দবিদায়, ৭। অথ নানা রাগরাগিণীর গীত (মোট পৃঃ ১৫২-৩০১)। **তৃতীয় খণ্ড**: ১। অথ সীতার বনবাস ও লবকুশের যুদ্ধ, ২। অথ বামনভিক্ষা, ৩। অথ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ৪। অথ দূতীসংবাদ, ৫। অথ নলিনীভ্রমর প্রসঙ্গ (মোট পৃঃ ৩০২-৪১৫)। **চতুর্থ খণ্ড**: ১। অথ রাবণবধ (পৃঃ ৪১৫-৪৪৪)। **পঞ্চম খণ্ড**: ১। অথ বিরহ বর্ণন, ২। অথ ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন (মোট পৃঃ ৪৪৫-৪৭৬)।

সীতারাম মুখোপাধ্যায়

"সীতারাম মুখোপাধ্যায় রচিত একখণ্ড পাঁচালী দেখিয়াছি প্রকাশ কাল [illegible] কলিকাতা ৫৩ নং বঙ্গভূমি কার্যালয় হইতে শ্রীশ্রীনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত। কোন ভূমিকা ও কবিপরিচয় নাই। গানের মধ্যে দ্বিজ সীতারাম এই ভনিতা আছে। রচনা দেখিয়া বহু পরবর্তী মনে হয়। পালার সূচী: ১। দুর্গামহিষের যুদ্ধ, ২। ধ্রুবচরিত্র, ৩। গুবরে ও পাছুরে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১৪১।

মনোমোহন বসু

মনোমোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগণার ছোট জাগুলিয়া গ্রাম। মনোমোহনের পিতার নাম দেবনারায়ণ বসু। মনোমোহন হেয়ার স্কুলে ও পরে জেনারেল এসেমব্লি কলেজে পড়াশুনা করেন। ছাত্রাবস্থায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। প্রথম তত্ত্ববোধিনী প্রমুখ পত্রিকাতে লিখিতেন, পরে নিজে সংবাদবিভাকর পত্রিকা প্রকাশ করেন। মধ্যস্থ নামে একখানি সাপ্তাহিকও বাহির করিয়াছিলেন।

তিনি বহু ও বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামাভিষেক, সতী, প্রণয় পরীক্ষা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নাটক ছাড়াও অন্যান্য নাটক, যাত্রা, হাফআখড়াই, কবি, বাউল, পাঁচালী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় তাঁহার রচনার অন্তর্গত। মনোমোহন গীতাবলীতে (১৮৮৭ খ্রীঃ) দশটি স্তবকে পাঁচালী, কবি প্রভৃতি সংকলিত হইয়াছে। মনোমোহন ১৯১২ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ৮১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।